অন্নদাশঙ্কর রায়
পথে প্রবাসে
ও নির্বাচিত প্রবন্ধ

পথে প্রবাসে

ও নির্বাচিত প্রবন্ধ

পথে প্রবাসে
ও নির্বাচিত প্রবন্ধ

অন্নদাশঙ্কর রায়

পা রু ল

পা রু ল

পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন কলকাতা ৭০০০০৯
আখাউড়া রোড আগরতলা ৭৯৯০০১

প্রথম পারুল সংস্করণ ২০১৯

ISBN 978 93 88303 59 0

বর্ণ সংস্থাপন পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
মুদ্রণ বসু মুদ্রণ ১৯এ শিকদার বাগান স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০০৪

সূচি

পথে প্রবাসে

শ্রীসরলা দেবী
আয়ুষ্মতীষু

ভূমিকা

আমি যখন *বিচিত্রা* পত্রিকায় প্রথম 'পথে প্রবাসে' পড়ি, তখন আমি সত্য সত্যই চমকে উঠেছিলুম। কলম ধরেই এমন পাকা লেখা লিখতে হাজারে একজনও পারেন না। শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্করের লেখা পড়লেই মনে হয় যে, তাঁর মনের কথা মন থেকে কলমের মুখে অবলীলাক্রমে চলে এসেছে। এ গদ্যের কোথাও জড়তা নেই এবং এর গতি সম্পূর্ণ বাধামুক্ত। আমরা যারা বাংলা ভাষায় মনোভাব প্রকাশ করতে চেষ্টা করি, আমরা জানি যে, ভাষাকে যুগপৎ স্বচ্ছ ও স্বচ্ছন্দ করা কতদূর আয়াসসাধ্য। সুতরাং, এই নবীন লেখকের সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত স্বপ্রকাশ ভাষার সঙ্গে যখন আমার প্রথম পরিচয় হয়, তখন যে আমি চমৎকৃত হয়েছিলুম, তাতে আর আশ্চর্য কী?

এই নবীন লেখকের ইন্দ্রিয় ও মন দুই-ই সমান সজাগ, আর তাঁর চোখে ও মনে যখন যা ধরা পড়ে তখনই তা ভাষাতেও ধরা পড়ে। আমি আগেই বলেছি যে, এই নবীন লেখকের ইন্দ্রিয় ও মন দুই-ই খোলা, আর প্রবাসে গিয়ে তাঁর চোখ-কান-মন আরও বেশ খুলে গিয়েছিল। তিনি বলেছেন, 'আমার চোখজোড়া অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো ভূপ্রদক্ষিণে বেরিয়েছে।' তিনি চোখ বুজে পৃথিবী ভ্রমণ করেননি, তার প্রমাণ 'পথে প্রবাসে'-র পাতায় পাতায় আছে। আমরা, অর্থাৎ এ যুগের ভারতবাসীরা অর্ধসুপ্ত জাত; আমরা এই বিচিত্র পৃথিবীতে আসি, আর কিছুদিন থেকে চলে যাই। মাঝামাঝি সময়টা একরকম ধ্যানস্তিমিত লোচনেই কাটাই। এর কারণ নাকি আমাদের স্বাভাবিক বৈরাগ্য। আমাদের এই মনোভাবের প্রতি কটাক্ষ করে তিনি বলেছেন :

'চুপ করে ঘরে বসে ভ্রমণকাহিনি লেখা ভালো, বৈরাগ্যবিলাসীর মতো সমস্ত ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ করে সর্ব প্রলোভনের অতীত হওয়া ভালো, সুরদাসের মতো দুটি চক্ষু বিদ্ধ করে ভুবনমোহিনী মায়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া ভালো।'—কিন্তু এ ভালো তিনি চাননি, কারণ তিনি বৈরাগ্যবিলাসী নন। এর ফলে তাঁর 'পথে প্রবাসে'-র মধ্য থেকে, 'মানবমানবীর শোভাযাত্রা থেকে কত রঙের পোশাক, কত ভঙ্গির সাজ, কত রাজ্যের ফুলের মতো মুখ' পাঠকের চোখের সুমুখে আবির্ভূত হয়েছে।

শ্রীমান অন্নদাশঙ্কর লিখেছেন যে :

> নতুন দেশে এলে কেবল যেসব ক-টা ইন্দ্রিয় সহসা চঞ্চল হয়ে ওঠে, তা নয়; সমস্ত মনটা নিজের অজ্ঞাতসারে খোলস ছাড়তে ছাড়তে কখন যে নতুন হয়ে ওঠে, তা দেশে ফিরে গেলে দেশের লোকের চোখে খট করে বাধে, নিজের চোখে ধরা পড়ে না।

সমগ্র 'পথে প্রবাসে' এই সত্যের পরিচয় দেয় যে ইউরোপের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ে লেখকের মন বিশেষ চঞ্চল ও ইন্দ্রিয় পুরোমাত্রায় সপ্রাণ হয়ে উঠেছে। এর কারণ, ইউরোপ আমাদের কাছে সম্পূর্ণ নতুন দেশ। আর যিনি কখনো ও-দেশে গিয়েছেন, তাঁর কাছেই এ সত্য ধরা পড়েছে যে, সে-দেশটা ঘুমের দেশ নয়, মহাজাগ্রত দেশ। জাগরণ অবশ্য প্রাণের ধর্ম, আর তার বাহ্যলক্ষণ হচ্ছে দেহ ও মনের সক্রিয়তা। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা দেশের বিষয়ে বলেছেন যে, এ দেশটা স্বপ্ন দিয়ে তৈরি আর স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। এককথায় যদি ইউরোপের বর্ণনা করতে হয় তো বলতে হয় যে, সে-দেশটা গতি দিয়ে তৈরি আর আশা দিয়ে ঘেরা।

প্রথম বয়সে যখন আমাদের ইন্দ্রিয় সব তাজা থাকে, আর যখন মন বাইরের রূপ বাইরের ভাব স্বচ্ছন্দে ও সানন্দে গ্রহণ করতে পারে, তখন ও-দেশের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে যেটা আমাদের দেশের যুবকরা সব প্রথম মনে ও প্রাণে অনুভব করে, সে হচ্ছে ও-জগতের প্রাণের লীলা। আমি যখন যৌবনে পদার্পণ করে তারপর ইউরোপে পদার্পণ করি তখন আমারও মন এই বিচিত্র প্রাণের লীলায় সাড়া দেয়। শ্রীমান অন্নদাশঙ্করের একটি কথায় আমাদের সকলেরই মন সায় দেয়, কারণ আমাদের লুপ্তপ্রায় পূর্বস্মৃতি সব আবার স্বরূপে দেখা দেয় :

'ইউরোপের জীবনে যেন বন্যার উদ্দাম গতি সর্বাঙ্গে অনুভব করতে পাই, ভাবকর্মের শতমুখী প্রবাহ মানুষকে ঘাটে ভিড়তে দিচ্ছে না, এক-একটা শতাব্দীকে এক-একটা দিনের মতো ছোটো করে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সবচেয়ে স্বাভাবিক বোধ হচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদিনের প্রতি কাজে সংযুক্ত থেকে নারী ও নরের

এক স্রোতে ভাসা।' আজকালকার ভাষায় যাদের তরুণ বলে, তাদের মন এর প্রতি কথায় সাড়া দেবে। কারণ সে হচ্ছে যথার্থ তরুণ, যার হৃদয়মন সহজে ও স্বচ্ছন্দে যা স্বাভাবিক তাতে আনন্দ পায়। অর্থাৎ যারা কোনো শাস্ত্রের আবরণের ভিতর থেকে দুনিয়াকে দেখে না, সে শাস্ত্র দেশি-ই হোক আর বিলেতিই হোক; শঙ্করের বেদান্তই হোক আর Karl Marx-এর *Das Kapital*-ই হোক। শ্রীমান অন্নদাশঙ্কর আমার বিশ্বাস বিলেত নামক দেশটা চোখ চেয়ে দেখেছেন, পুস্তকের পত্র-আবডালের ভিতর থেকে উঁকি মেরে দেখেননি। এর ফলে তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত যথার্থ সাহিত্য হয়েছে।

'পথে প্রবাসে'-র ভূমিকা আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে লিখতে বসেছি দু-কারণে। বাংলায় কোনো নতুন লেখকের সাক্ষাৎ পেলেই আমি স্বভাবত আনন্দিত হই। বলা বাহুল্য যে যিনি নতুন লিখতে আরম্ভ করেছেন তিনিই নতুন লেখক নন। যিনি প্রথমত লিখতে পারেন, আর দ্বিতীয়ত যাঁর লেখার ভিতর নূতনত্ব আছে, অর্থাৎ নিজের মনের বিশেষ প্রকাশ আছে, তিনি যথার্থ নতুন লেখক। 'পথে প্রবাসে'-র লেখকের রচনায় এ দুটি গুণই ফুটে উঠেছে। আমরা যারা সাহিত্যজগতে এখন পেনশনপ্রার্থী—আমরা যে নতুন লেখকদেরও যথার্থ গুণগ্রাহী, একথাটা পাঠকসমাজকে জানাতে পারলে আমরা আত্মতুষ্টি লাভ করি।

দ্বিতীয়ত, আমি সত্য সত্যই চাই যে, বাংলার পাঠকসমাজে এ বইখানির প্রচার ও আদর হয়। এ ভ্রমণবৃত্তান্ত যে একখানি যথার্থ সাহিত্যগ্রন্থ এ বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই, এবং আমার বিশ্বাস সাহিত্যরসের রসিক মাত্রেই আমার সঙ্গে এ বিষয়ে একমত। তবে আমি আশা করি যে, ও-রসে বঞ্চিত কোনো প্রবীণ অথবা নবীন পাঠক পুস্তকখানিকে শাস্ত্রহিসেবে গণ্য করবেন না, কারণ তা করলেই সোনা ফেলে আঁচলে গেরো দেওয়া হবে। পৃথিবীতে জলবুদবুদের মতো নানা মত উঠছে ও মিলিয়ে যাচ্ছে। মনোজগতে এই-জাতীয় মতামতের উত্থান-পতনের ভিতরও অপূর্বতা আছে। কিন্তু এই সব মতামতকেই মহাবস্তু হিসেবে দেখলেই তা সাহিত্যপদভ্রষ্ট হয়ে শাস্ত্র হয়ে পড়ে। মতামতের বিশেষ কোনো মূল্য নেই, যদি না সে মতামতের পিছনে একটি বিশেষ মনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। আর এ লেখকের মতামতের পিছনে যে একটি সজীব মনের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

পূর্বকথা

আমার পথের আরম্ভ হল শ্রাবণের এক মধ্যরাত্রে—তিথি মনে নেই, কিন্তু শুক্লপক্ষের চাঁদ ছিল না।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ ঘুরে ভারতবর্ষের বাইরে আমার পথ—কটক থেকে বম্বে, বম্বে থেকে লণ্ডন। বঙ্গোপসাগরের কূলে কূলে, পূর্বঘাট পর্বতমালার ধারে ধারে, চিল্কাহ্রদের কোল ঘেঁষে, গোদাবরীর বুক চিরে, হায়দরাবাদের তেপান্তরী মাঠ পেরিয়ে, পশ্চিমঘাট পর্বতমালার সানু জুড়ে আমার পথ—কটক, ওয়ালটেয়ার, বেজওয়াড়া, সেকেন্দ্রবাদ, পুনা, বম্বে।

চিল্কার সঙ্গে এবার আমার দেখা আঁধার রাতের শেষ প্রহরে, সুন্দরী তখন আলোর স্বপ্ন দেখছে, তার দিগন্তজোড়া চোখের পাতায় যোগমায়ার অঞ্জন শ্বেতাভ হয়ে আসছে।

তমালবন দেখতে পেলুম না, কিন্তু চিল্কা থেকে গোদাবরী পর্যন্ত—হয়তো আরও দক্ষিণেও—তালীবনের অন্ত নেই। পথের একধারে পাহাড়ের পর পাহাড়, কিন্তু সব কটাই রুক্ষ, গায়ে তরুলতার শ্যাম প্রলেপ নেই, মাথায় নির্ঝরিণীর সরস স্নেহ নেই। পথের অন্যধারে খেত—কিন্তু বাংলার মতো তরল হরিৎ নয়।

প্রকৃতির এই বর্ণ-কার্পণ্য মানুষ তার পরিচ্ছদের বর্ণবৈচিত্র দিয়ে পুষিয়ে দিয়েছে। বিধাতা যেখানে শিল্পী সাজেন না মানুষকে সেখানে শিল্পী সাজতে হয়। মেয়েরা তো রঙিন ছাড়া পরেই না, পুরুষেরাও রঙিন পরে, এমন দেখতে পেলুম। এ দেশে অবরোধপ্রথা নেই, পথে ঘাটে সুবেশা সুকেশীর সাক্ষাৎ মেলে—'সুকেশী', কারণ এ দেশের মেয়েরা মাথায় কাপড় দেয় না, বিধবারা ছাড়া। এ দেশের জীবননাট্যে নারীর ভূমিকা নেপথ্যে নয়। দক্ষিণ ভারত নারীকে তার জন্মস্বত্ব থেকে বঞ্চিত না করে পুরুষকে সহজ হবার সুযোগ দিয়েছে। মুক্ত প্রকৃতির কোলে Wordsworth-এর Lucy যেমন ফুলের মতো ফুটেছিল, মুক্ত সমাজের কোলে মানুষও তেমনি মাধবীলতার মতো সুন্দর এবং সহকারের মতো সবল হতে হয়। বদ্ধ সমাজের অর্ধজীবী নারী-নর এহেন সত্য অস্বীকার করবে জানি, কিন্তু এ দেশের লোককে তর্কের দ্বারা বোঝাতে হবে না যে, মানুষ মানে পুরুষ ও মানুষ মানে নারী। নারীকে নিজের কাছে দুর্লভ করে আমরা উত্তর ভারতের লোক নিজেকে চিনতে ভুলেছি এবং যে আনন্দ আমরা হেলায় হারিয়েছি তার ধারণাও করতে কষ্ট পাচ্ছি। জন্মান্ধের যেমন আলোকবোধ থাকে না আমাদের তেমনি নারী-বোধ নেই, যা আছে তার নাম দিতে পারা যায় 'কামিনী-জননী-বোধ'।

এখন যার নাম হায়দরাবাদের নিজামরাজ্য আগে তার নাম ছিল গোলকোণ্ডা। দেশটি সুদৃশ্য নয়, সুজলা সুফলাও নয়। যতদূর দৃষ্টি যায় কেবলি প্রান্তর, কদাচ কোথাও শৈলগুণ্ঠিত, কদাচ কোথাও শস্যচিত্রিত। মাঝে মাঝে দেখা যায়—পাহাড়ের গায়ে দুর্গ। সন্দেহ হয় পাহাড়টাই দুর্গ, না দুর্গটাই পাহাড়। সমস্ত দেশটাই যেন একটা বিরাট ঘুমন্তপুরী—জনপ্রাণী নেই, গাছপালা নেই, পাখি-পাখাল নেই। তা বলে হায়দরাবাদের লোকসংখ্যা বড়ো অল্প নয়—প্রায় দেড় কোটি। এর পূর্বভাগে তেলেগুদের বাস, পশ্চিমভাগে মারাঠা ও কানাড়িদের। আর এ দেশের রাজার জাত মুসলমানেরা। রেলে যাদের দেখলুম তাদের বেশির ভাগ মুসলমান। উর্দুজবান জানা থাকলে ভ্রমণের অসুবিধা নেই।

কানাড়ি মেয়েদের অবরোধ নেই। তারা পুরুষের সঙ্গে পুরুষেরই মতো কঠিন খাটছে, এমন দেখা গেল। পথের ধারে ক্ষেত, কিসের ক্ষেত জানিনে, ধানের নয়, জোয়ারের কিংবা বাজরার কিংবা অন্য কিছুর। ছাব্বিশজন পুরুষের মাঝখানে হয়তো একজন মেয়েও খাটছে, 'লজ্জাশরম' নেই। নারী যে কর্মসহচরীও।

মহারাষ্ট্র পাহাড় পর্বতের দেশ—বহিঃপ্রকৃতি রুদ্র সুন্দর। নরনারীর মুখে-চোখে কমনীয়তা প্রত্যাশা করাই অন্যায়। বেশভূষায় নারী যেন পুরুষের দোসর। মালাবারে যেমন পুরুষেও কাছা দেয় না, মহারাষ্ট্রে তেমনি মেয়েমানুষেও কাছা দেয়। ফলে, পায়ের পশ্চাদ্ভাগ অনাবৃত ও কটু দেখায়। কিন্তু নারীকে যদি পুরুষের মতো স্বচ্ছন্দে চলাফেরা ও ছুটোছুটি করতে হয়, তবে এ ছাড়া উপায়ান্তর নেই। আমেরিকায় কর্মী-মেয়েরা পায়জামা পরে কাজ করে। মারাঠা মেয়েরা কর্মী-প্রকৃতি। তাদের অবরোধ নেই, তরুণীরা পায়ে হেঁটে স্কুল-কলেজে যাচ্ছে, বয়স্কারা attaché case হাতে বাজার করতে বেরিয়েছেন, কত মেয়ে একাকী ট্রামে উঠছে,

ট্রেনে বেড়াচ্ছে, ভয়ডর নেই, লজ্জা সংকোচ নেই, পুরুষের সঙ্গে সহজ ব্যবহার। পায়ে বর্মা চটির মতো হালকা খোলা চটি, পরনে নীল বা বেগুনি—একটু গাঢ় রঙের—ঈষৎ কোঁচা কাছা দেওয়া শাড়ি, পিঠের ওপর একরঙা শাড়ির বহুরঙা আঁচল চওড়া করে বিছানো, মাথায় কাপড় নেই, কবরীতে ফুলের পাপড়ি গোঁজা কিংবা ফুলের মালা গোল করে জড়ানো, হৃষ্টপুষ্ট সুবলয়িত দেহবয়বে অল্প কয়েক খানা অলংকার, প্রশস্ত সুগোল মুখমন্ডলে সুপ্রতিভ পুরুষকারের ব্যঞ্জনা—মহারাষ্ট্রের মেয়েদের দেখে মোটের ওপর মহাসম্ভ্রম জাগে। তন্বী ওদের মধ্যে চোখে পড়ল না। কিন্তু পৃথুলাও চোখে পড়ে না। সুস্থ সবল ও সপ্রতিভ বলে এদের অধিকাংশকেই সুশ্রী দেখায়, কিন্তু 'রমণীয়' দেখায় বললে বোধ হয় বেশি বলা হয়। এদের চালচলনে-চেহারায় পৌরুষের ছায়া পড়েছে বলে এদের নারীত্বের আকর্ষণ কমেছে এমনও বলা যায় না। পুরুষের কাছে নারী যদি কাবুলি পায়জামার ওপরে গেরুয়া আলখাল্লা ও গাড়োয়ানি ফ্যাশানের দশ আনা ছ-আনা চুলের ওপরে চিমনি প্যাটার্নের সিল্ক টুপি পরে, তবু পুরুষের কাছে সে এমনি চিত্তাকর্ষক থাকবে। মারাঠা পুরুষের চোখে মারাঠা মেয়েদের যে অপূর্ব রমণীয় ঠেকে এ তো স্বতঃসিদ্ধ, আমার চোখেও তাদের নারীর মতোই ঠেকেছে। দৃষ্টিকটু বোধ হচ্ছিল কেবল শ্রমিক-শ্রেণির মেয়েগুলিকে; মালকোচ্চা মারা পালোয়ানদের বুকে একটুকরো জামার উপর ময়লা নীল কাপড় জড়িয়ে বাঁধলে যেমন দেখাত এদেরও অনেকটা তেমনি দেখায়। যেমন এদের ভারবহন ক্ষমতা, তেমনি এদের ছুটে চলার ক্ষিপ্রতা। আমাদের অঞ্চলের পুরুষরা পর্যন্ত এদের তুলনায় কুঁড়ে।

মারাঠা পুরুষদের বাহুবল সম্বন্ধে যে প্রসিদ্ধি আছে সেটা সত্য নয়, অন্তত আপাতদৃষ্টিতে। এদের মনের বল কিন্তু অসাধারণ। মুখের ওপর আত্মসম্মানবত্তার এমন সুস্পষ্ট ছাপ অন্য কোনো জাতের মধ্যে লক্ষ্য করিনি। অর্থনৈতিক জীবনযুদ্ধে কিন্তু মারাঠারা গুজরাটিদের কাছে হটতে লেগেছে। বম্বে শহরটার স্থিতি মহারাষ্ট্রেরই জিওগ্রাফিতে বটে, বম্বে শহরের জিওগ্রাফিতে কিন্তু মহারাষ্ট্রের স্থিতি গলির বস্তিতে আর গুজরাটের স্থিতি সড়কের চারতলায়। বাঙালি বাঘের ঘরে যেমন মাড়োয়ারি ঘোঘের বাসা, মারাঠা বাঘের ঘরে তেমনি গুজরাটি ঘোঘের বাসা। গুজরাটি মানে পারসিও বুঝতে হবে। পারসিদেরও মাতৃভাষা গুজরাটি। ইদানীং অবশ্য ওরা কায়বাক্যে ইংরেজ হবার সাধনায় লেগেছে।

গুজরাটি জাতটার প্রতি আমার কেমন একরকম পক্ষপাত আছে। শুনেছি ওদের সাহিত্য বাংলা সাহিত্যেরই ঠিক নীচে এবং রবিহীন বাংলা সাহিত্যের সমকক্ষ। গান্ধীর মতো ভাবশিল্পী যে জাতির মনের স্তন্যে পুষ্ট সে জাতির মনকে বাঙালিমনের অনুজ ভাবা স্বাভাবিক। গুজরাটিরা পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে নানা দেশের ধনের সঙ্গে সঙ্গে নানা দেশের মনেরও আমদানি করছে এবং বিদেশি মনের সোনার কাঠি আমাদের মতো ওদের সাহিত্যকেও সোনা করে দিচ্ছে। তফাত এই যে, আমরা যা বইয়ের মারফত পাই ওরা তা সংসর্গের দ্বারা পায়।

গুজরাটি পুরুষরা যে পরম কষ্টসহিষ্ণু ও কর্মঠ এ তো আমরা দেশে থেকেও জানি, তাদের ব্যবসায়বুদ্ধিও বহুবিদিত। গুজরাটি মেয়েদের মধ্যেও এইসব গুণ আছে কি না জানিনে। তাদের পর্দা নেই, তবে উত্তর ভারতের সঙ্গে সংস্পৃষ্ট বলে গতিবিধির স্বাধীনতা মারাঠাদের চেয়ে কিছু কম। গুজরাটি মেয়েদের পরিচ্ছদ-পারিপাট্য আমাদেরই মেয়েদের মতো; কাপড় পরার ভঙ্গিতে ইতরবিশেষ থাকলেও মোটের ওপর মিল আছে। মারাঠা মেয়েরা সচরাচর যে অন্তর্বাস পরে তার ঝুল বুকের নীচে পর্যন্ত—কোমরের কাছটা অনাবৃত ও শাড়ি দিয়ে ঢাকতে হয়। গুজরাটি মেয়েরা কিন্তু আপাদচুম্বী অন্তর্বাস পরে তার ওপরে শাড়ি পরে। শুনেছি আমাদের মেয়েদের অন্তর্বাস পরা শুরু হয় গুজরাটেরই অনুকরণে ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পত্নীর দ্বারা।

আমাকে সকলের চেয়ে মুগ্ধ করল গুজরাটি মেয়েদের দেহের তনুত্ব ও মুখের সৌকুমার্য। মারাঠাদের সঙ্গে এদের অমিল যেমন স্পষ্ট, বাঙালিদের সঙ্গে এদের মিলও তেমনি স্পষ্ট। তবে বাঙালি মেয়েদের দেহের

গড়নের চেয়ে গুজরাটি মেয়েদের দেহের গড়ন অনেক বেশি সুসমঞ্জস; এবং বাঙালি মেয়েদের মুখশ্রীতে যেমন স্নিগ্ধতার মাত্রাধিক্য, গুজরাটি মেয়েদের মুখশ্রীতে তেমন নয়।

পারসিরাই হচ্ছে এ অঞ্চলের Leaders of fashion। তারা কাঞ্চনকুলীন তো বটেই, রীতিরুচিতেও অভিজাত। পারসি মেয়েদের জাঁকালো বেশভূষার সঙ্গে ইঙ্গবঙ্গদের পর্যন্ত তুলনা করা চলে না। অন্তত তিনপ্রস্থ অন্তর্বাস বাইরে থেকে লক্ষ করতে পারা যায়; প্রৌঢ়াদেরও শাড়ির বাহার আছে। মারাঠাদের যেমন আঁচলের বাহার পারসিদের তেমনই পাড়ের বাহার। হালকা রঙের আদর এ অঞ্চলে নেই। হাজার হাজার নানা বয়সি মেয়ের মধ্যে মাত্র কয়েক জন কিশোরীকেই হালকা রঙের শাড়ি পরতে দেখলুম। সাদার চল একমাত্র গুজরাটিদের মধ্যেই পরিলক্ষ্য। বলতে ভুলে গেছি, গুজরাটি ও পারসিরা মাথায় কাপড় দেয়, কিন্তু ঘোমটার মতো করে নয়, খোঁপার সঙ্গে এঁটে। গহনার বাহুল্য নেই—আমাদের মেয়েদের তুলনায় এরা নিরলংকার। পারসি মেয়েরা ইংরেজি জুতো পায়ে দেয়—গুজরাটি মেয়েরা সচরাচর কোনো জুতোই পায়ে দেয় না—মারাঠা মেয়েরা চটি পরে।

বম্বে শহর কলকাতার চেয়ে আকারে ছোটো কিন্তু প্রকারে সুন্দর। প্রায় চারিদিকে সমুদ্র, অদূরে পাহাড়, ভিতরেও 'মালাবার হিল' নামক অনুচ্চ পাহাড়, তার ওপরে বড়ো বড়ো লোকের সাজানো হর্ম্য। শহরের রাস্তাগুলি যেন প্লান করে তৈরি। বম্বেবাসীদের রুচির প্রশংসা করতে হয়—টাকা তো কলকাতার মাড়োয়ারিদেরও আছে, কিন্তু তাদের রুচির নিদর্শন তো বড়োবাজারের 'ইটের পর ইট'! বম্বের প্রত্যেকখানি বাড়িরই যেন বিশেষত্ব আছে—প্রত্যেকেরই ডিজাইন স্বতন্ত্র। শহরটা ছবিল কিন্তু আমার মনে হয় এ সত্ত্বেও বম্বে ভারতীয় নগর-স্থাপত্যের ভালো নিদর্শন নয়। বম্বের বাস্তুশিল্পের গায়ে যেন ইংরেজি গন্ধ পেলুম, তাও খাঁটি ইংরেজি নয়। তবু কলকাতার নাই-শিল্পের চেয়ে বম্বের কানা শিল্প ভালো।

ভারতবর্ষের মাটির ওপর থেকে শেষবারের মতো পা তুলে নিলুম আর সদ্যোজাত শিশুর মতো মায়ের সঙ্গে আমার যোগসূত্র এক মুহূর্তে ছিন্ন হয়ে গেল। একটি পদক্ষেপে যখন সমগ্র ভারতবর্ষের কক্ষচ্যুত হয়ে অনন্ত শূন্যে পা বাড়ালুম তখন যেখান থেকে পা তুলে নিলুম সেই পদ-পরিমাণ ভূমি যেন আমাকে গোটা ভারতবর্ষেরই স্পর্শ-বিরহ অনুভব করিয়ে দিচ্ছিল; প্রিয়জনের আঙুলের ডগাটুকুর স্পর্শ যেমন প্রিয়জনের সকল দেহের সম্পূর্ণ স্পর্শ অনুভব করিয়ে দেয়, এও যেন তেমনি।

জাহাজে উঠে বম্বে দেখতে যেমন সুন্দর তেমনি করুণ। এত বড়ো ভারতবর্ষ এসে এতটুকু নগরপ্রান্তে ঠেকেছে, আর কয়েক মুহূর্তে ওটুকুও স্বপ্ন হবে, তখন মনে হবে আরব্য উপন্যাসের প্রদীপটা যেমন বিরাটাকার দৈত্য হয়ে আলাদিনের দৃষ্টি জুড়েছিল, ভারতবর্ষের মানচিত্রখানা তেমনি মাটি জল ফুল পাখি মানুষ হয়ে আজন্ম আমার চেতনা ছেয়েছিল, এত দিনে আবার যেন মানচিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে।

আর মানচিত্রে যাকে ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার মাঝখানে গোষ্পদের মতো দেখাত সে-ই এখন হয়েছে পায়ের তলার আরব সাগর, পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ কোনো দিকে চক্ষু তার অবধি পায় না। ঢেউগুলো তার অনুচর হয়ে আমাদের জাহাজখানাকে যেন গলাধাক্কা দিতে দিতে তার চৌকাঠ পার করে দিতে চলেছে। ঋতুটার নাম বর্ষা ঋতু, মনসুনের প্রভঞ্জনাহুতি পেয়ে সমুদ্র তার শতসহস্র জিহ্বা লকলক করছে, জাহাজখানাকে একবার এদিকে কাত করে একবার ওদিকে কাত করে যেন ফুটন্ত তেলে পাঁপরের মতো উলটে-পালটে ভাজছে।

জাহাজ টলতে টলতে চলল, আর জাহাজের অধিকাংশ যাত্রী-যাত্রিণী ডেক ছেড়ে শয্যা আশ্রয় করলেন। অসহ্য সমুদ্রপীড়ায় প্রথম তিন দিন আচ্ছন্নের মতো কাটল, কারোর সঙ্গে দেখা হবার জো ছিল না, প্রত্যেকেই নিজের নিজের ক্যাবিনে শয্যাশায়ী। মাঝে মাঝে দু-একজন সৌভাগ্যবান দেখা দিয়ে আশ্বাসন করেন, ডেকের খবর দিয়ে যান। আর ক্যাবিন স্টুয়ার্ড খাবার দিয়ে যায়। বলা বাহুল্য জিহ্বা তা গ্রহণ করতে আপত্তি না-করলেও উদর তা রক্ষণ করতে অস্বীকার করে।

ক্যাবিনে পড়ে পড়ে বমনে ও উপবাসে দিনের পর রাত রাতের পর দিন এমন দুঃখে কাটে যে, কেউ-বা ভাবে মরণ হলেই বাঁচি, কেউ-বা ভাবে মরতে আর দেরি নেই। জানিনে হরবল্লভের মতো কেউ ভাবে কি না যে, মরে তো গেছি, দুর্গানাম করে কী হবে। সমুদ্রপীড়া যে কী দুঃসহ তা ভুক্তভোগী ছাড়া অপর কেউ ধারণা করতে পারবে না। হাতের কাছে রবীন্দ্রনাথের *চয়নিকা*, মাথার যন্ত্রণায় অমন লোভনীয় বইও পড়তে ইচ্ছা করে না। ইচ্ছা করে কেবল চুপ করে পড়ে থাকতে, পড়ে পড়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে।

সদ্য-দুঃখার্ত কেউ সংকল্প করে ফেললেন যে, এডেনে নেমেই দেশে ফিরে যাবেন, সমুদ্রযাত্রার দুর্ভোগ আর সইতে পারবেন না। তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হল এডেন থেকে দেশে ফিরে যেতে চাইলেও উটের পিঠে চড়ে মরুভূমি পেরিয়ে পারস্যের ভিতর দিয়ে ফেরবার যখন উপায় নেই তখন ফিরতে হবে সেই সমুদ্রপথেই। আমরা অনেকেই কিন্তু ঠিক করে ফেললুম মার্সেলসে নেমে প্যারিসের পথে লণ্ডন যাব।

আরব সাগরের পরে যখন লোহিত সাগরে পড়লুম তখন সমুদ্রপীড়া বাসি হয়ে গেছে। আফ্রিকা-আরবের মধ্যবর্তী এই হ্রদতুল্য সমুদ্রটি দুর্দান্ত নয়, জাহাজে থেকে থেকে জাহাজটার ওপর মায়াও পড়ে গেছে; তখন না মনে পড়ছে দেশকে, না ধারণা করতে পারা যাচ্ছে বিদেশকে। কোথা থেকে এসেছি ভুলে গেছি, কোথায় যাচ্ছি বুঝতে পারছিনে; তখন গতির আনন্দে কেবল ভেসে চলতেই ইচ্ছা করে, কোথাও থামবার বা নামবার সংকল্প দূর হয়ে যায়।

বিগত ও আগতের ভাবনা না-ভেবে উপস্থিতের ওপরে দৃষ্টি ফেললুম—আপাতত আমাদের এই ভাসমান পান্থশালাটায় মন ন্যস্ত করলুম। খাওয়া-শোয়া লেখা-পড়া-গল্প করার যেমন বন্দোবস্ত যে কোনো বড়ো হোটেলে থাকে এখানেও তেমনি, কেবল ক্যাবিনগুলো যা যথেষ্ট বড়ো নয়। ক্যাবিনে শুয়ে থেকে সিন্ধু-জননীর দোল খেয়ে মনে হয় খোকাদের মতো দোলনায় শুয়ে দুলছি। সমুদ্রপীড়া যেই সারল ক্যাবিনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অমনি কমল। শোবার সময়টা ছাড়া বাকি সময়টা আমরা ডেকে কিংবা বসবার ঘরে

কাটাতুম। ডেকে চেয়ার ফেলে বসে কিংবা পায়চারি করতে করতে সমুদ্র দেখে দেখে চোখ শ্রান্ত হয়ে যায়; চারদিকে জল আর জল, তাও নিস্তরঙ্গ, কেবল জাহাজের আশেপাশে ছাড়া ঢেউয়ের অস্তিত্ব নেই, যা আছে তা বাতাসের সোহাগ চুম্বনে জলের হৃদয়স্পন্দন। বসবার ঘরে অর্ধশায়িত থেকে খোশগল্প করতে এর চেয়ে অনেক ভালো লাগে।

লোহিত সাগরের পরে ভূমধ্যসাগর। দুয়ের মাঝখানে যেন একটি সেতু ছিল, নাম সুয়েজ যোজক। এই যোজকের ঘটকালিতে এশিয়া এসে আফ্রিকার হাত ধরেছিল। সম্প্রতি হাতের জোড় খুলে দুই মহাদেশের মাঝখানে বিয়োগ ঘটিয়ে দেওয়া হয়েছে। যার দ্বারা তা ঘটল তার নাম সুয়েজ ক্যানেল। সুয়েজ ক্যানেল একদিকে বিচ্ছেদ ঘটাল বটে, কিন্তু অন্যদিকে মিলন ঘটাল—লোহিতের সঙ্গে ভূমধ্যের মিলন যেন ভারতের সঙ্গে ইউরোপের মিলন। কলম্বাস যা পারেননি, লেসেপস তা পারলেন। ভূমধ্য ও লোহিতের মধ্যে কয়েক শত মাইলের ব্যবধান, ওইটুকুর জন্য ভূমধ্যের জাহাজকে লোহিতে আসতে বহু সহস্র মাইল ঘুরে আসতে হত। মিশরের রাজারা কোন যুগ থেকে এর প্রতিকারের উপায় খুঁজছিলেন। উপায়টা দেখতে গেলে সুবোধ্য। ভূমধ্য ও লোহিতের মধ্যবর্তী ভূখন্ডটাতে গোটা কয়েক হ্রদ চিরকালই আছে, এই হ্রদগুলোকে দুই সমুদ্রের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিলেই সেই জলপথ দিয়ে এক সমুদ্রের জাহাজ অন্য সমুদ্রে যেতে পায়। কল্পনাটা অনেক কাল আগের, কিন্তু সেটা কার্যে পরিণত হতে হতে গত শতাব্দীর দুই-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়ে গেল। ক্যানেলটিতে কলাকুশলতা কী পরিমাণ আছে তা স্থপতিরাই জানেন, কিন্তু অব্যবসায়ী আমরা জানি যাঁর প্রতিভার স্পর্শমণি লেগে একটা বিরাট কল্পনা একটা বিরাট কীর্তিতে রূপান্তরিত হল সেই ফরাসি স্থপতি লেসেপস একজন বিশ্বকর্মা; তাঁর সৃষ্টি দূরকে নিকটে এনে মানুষের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর করেছে। যান্ত্রিক সভ্যতার শত অপরাধ যাঁরা নিত্য স্মরণ করেন, এই ভেবে তাঁরা একটি অপরাধ মার্জনা করুন।

সুয়েজ ক্যানেল আমাদের দেশের যেকোনো ছোটো নদীর মতোই অপ্রশস্ত, এতে বড়োজোর দুখানা জাহাজ পাশাপাশি আসা-যাওয়া করতে পারে, কিন্তু ক্যানেল যেখানে হ্রদে পড়েছে সেখানে এমন সংকীর্ণতা নেই। ক্যানেলটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি দিকে নানান রকমের গাছ, যত্ন করে লাগানো, যত্ন করে রক্ষিত; অন্যদিকে ধু-ধু করা মাঠ, শ্যামলতার আভাসটুকুও নেই। ক্যানেলের দুই দিকেই পাথরের পাহাড়, যেদিকে মিশর সেই দিকেই বেশি। এই পাহাড়গুলিতে যেন জাদু আছে, দেখলে মনে হয় যেন কোনো কিউবিস্ট এদের আপন খেয়ালমতো জ্যামিতিক আকার দিয়েছে আরএক-একটা পাথর কুঁদে গড়েছে।

ক্যানেলটি যেখানে ভূমধ্যসাগরে পড়েছে সেখানে একটি শহর দাঁড়িয়ে গেছে, নাম পোর্ট সৈয়দ। জাহাজ থেকে নেমে শহরটায় বেড়িয়ে আসা গেল। শহরটার বাড়িঘর ও রাস্তাঘাট ফরাসি প্রভাবের সাক্ষ্য দেয়। কাফেতে খাবার সময় ফুটপাথের ওপর বসে খেতে হয়, রাস্তায় চলবার সময় ডান দিক ধরে চলতে হয়। পোর্ট সৈয়দ হল নানা জাতের নানা দেশের মোসাফিরদের তীর্থস্থল; কাজেই সেখানে তীর্থের কাকের সংখ্যা নেই, ফাঁক পেলে একজনের ট্যাঁকের টাকা আর একজনের ট্যাঁকে ওঠে।

পোর্ট সৈয়দ মিশরের অঙ্গ। মিশর প্রায় স্বাধীন দেশ। ইউরোপের এত কাছে বলে ও নানা জাতের পথিক-কেন্দ্র বলে মিশরিরা ইউরোপীয়দের সঙ্গে বেশি মিশতে পেরেছে, তাদের বেশি অনুকরণ করতে শিখেছে, তাদের দেশে অনায়াসে যাওয়া-আসা করতে পারছে। ফলে ইউরোপীয়দের প্রতি তাদের অপরিচয়ের ভীতি বা অতিপরিচয়ের অবজ্ঞা নেই, ইউরোপীয়দের স্বাধীন মনোবৃত্তি তাদের সমাজে ও রাষ্ট্রে সঞ্চারিত হয়েছে।

পোর্ট সৈয়দ ছেড়ে আমরা ভূমধ্যসাগরে পড়লুম। শান্তশিষ্ট বলে ভূমধ্যসাগরের সুনাম আছে। প্রথম দিন কতক চতুর ব্যবসাদারের মতো ভূমধ্যসাগর 'Honesty is the best policy' করলে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভদ্রতা রক্ষা করলে না। আর একবার করে কেউ কেউ শয্যাশায়ী হলেন। অধিকাংশকে মার্সেলসে নামতেই হল। পোর্ট সৈয়দ থেকে মার্সেলস পর্যন্ত জল ছাড়াও দুটি দৃশ্য ছাড়া দেখবার আর কিছু নেই। প্রথমটি ইটালি ও সিসিলির মাঝখানে মেসিনা প্রণালী দিয়ে যাবার সময় দুই ধারের পাহাড়ের সারি। দ্বিতীয়, স্ট্রম্বলি আগ্নেয় গিরির কাছ দিয়ে যাবার সময় পাহাড়ের বুকে রাবণের চিতা।

মার্সেলস ভূমধ্যসাগরের সেরা বন্দর ও ফরাসিদের দ্বিতীয় বড়ো শহর। ইতিহাসে এর নাম আছে, বন্দে মাতরম 'La Marseillaise' এই নগরেই জন্ম। কাব্যে এ অঞ্চলের নাম আছে, ফরাসি সহজিয়া কবিদের (troubadour) প্রিয়ভূমি এই সেই Provence —বসন্ত যেখানে দীর্ঘস্থায়ী ও জ্যোৎস্না যেখানে স্বচ্ছ। এর পূর্ব দিকে সমুদ্রের কূলে কূলে ছোটো ছোটো অসংখ্য গ্রাম, সেই সব গ্রামে গ্রীষ্মযাপন করতে পৃথিবীর সব দেশের লোক আসে। Bandol নামক তেমনি একটি গ্রামে আমরা একটি দুপুর কাটালুম। মোটরে করে পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে সেখানে যেতে হয়। পাহাড়ের ওপর থেকে মার্সেলসকে দেখলে মনে হয় যেন সমুদ্র তাকে সাপের মতো সাতপাকে জড়িয়ে বেঁধেছে। মার্সেলস শহরটাও পাহাড় কেটে তৈরি, ওর একটা রাস্তার সঙ্গে আরেকটা রাস্তা সমতল নয়, কোনো রাস্তায় ট্রামে করে যেতে ডান দিকে মোড় ফিরলে একেবারে রসাতল, কোনো রাস্তায় চলতে চলতে বাঁ-দিকে বেঁকে গেলে সামনে যেন স্বর্গের সিঁড়ি। মার্সেলসের অনেক রাস্তার দু-ধারে গাছের সারি ও তার ওপারে ফুটপাথ।

মার্সেলস থেকে প্যারিসের রেলপথে রাত কাটল। প্যারিস থেকে রেলপথে ক্যালে, ক্যালে থেকে জলপথে ডোভার এবং ডোভার থেকে রেলপথে লণ্ডন।

লণ্ডনের সঙ্গে আমার শুভদৃষ্টি হল গোধূলি লগ্নে। হতে-না-হতেই সে চক্ষু নত করে আঁধারের ঘোমটা টেনে দিলে। প্রথম পরিচয়ের কুমার-বিস্ময় গোড়াতেই ব্যাহত হয়ে যখন অধীর হয়ে উঠল তখন মনকে বোঝালুম, এখন এ তো আমারই। আবরণ এর দিনে দিনে খুলব।

পরের দিন সকালে উঠে দেখি আকাশ কলের ধোঁয়ায় মুখ কালো করে ছিঁচকাঁদুনে ছেলের মতো যখন-তখন চোখের জল ঝরাচ্ছে। সূর্যদেবের ঠিকঠিকানা নেই। সম্ভবত তিনি কাঁদুনেটাকে খেপিয়ে দিয়ে মাস্টারের ভয়ে দুষ্টুছেলের মতো ফেরার হয়েছেন। লণ্ডনের চিমনিওয়ালা বাড়িগুলো চুরুটখোরদের মতো মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আকাশের দিকে চেয়ে হাসছে, আর যে দু-চারটে গাছপালার বহু কষ্টে সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তারা আমাদের অসূর্যম্পশ্যাদের মতো চিকের আড়ালে দাঁড়িয়ে পাতা খস খস করতে করতে হতভাগ্য আকাশটার দিকে ছলছল চোখে তাকাচ্ছে।

ক্রমে জানলুম এইটেই এখানকার সরকারি আবহাওয়া। মাঝে মাঝে এর নিপাতন হয়, গ্রীষ্মকালে এর ব্যতিক্রম হয়, কিন্তু সারা শীতকালটা নাকি এমনি চলে। কদাচ কোনোদিন আকাশের উঠোন নিকিয়ে নির্মল করা হলে রুপালি সূর্য উঠে ধূমলা নগরীকে বলে, 'গুডমর্নিং'। অমনি ঘরে ঘরে খবর রটে, পথে পথে পথিক দেখা দেয়, চেনামুখ চেনামুখকে বলে, 'হাও লাভলি! আজ সারাদিন যদি এমনি থাকে...!' মুখের কথা মুখ থেকে না-মিলাতেই সূর্য বলে এখন আসি; বৃষ্টি বলে এবার নামি; একদল পথিক ভাবে ছাতা না-এনে কী বোকামি করেছি, আরেক দল পথিক ভাবে ভাগ্যে রেনকোটখানা সঙ্গে ছিল। ইংল্যাণ্ডের ওয়েদার এমনই খোশমেজাজি যে, খবরের কাগজওয়ালারা প্রতিদিন তার ভাবী চালের খবর নেয় ও কাগজের সর্বপ্রথম পৃষ্ঠায় সর্বোচ্চে ছেপে দেয়—কাল বাতাস প্রথমে পশ্চিম থেকে ও পরে নৈর্ঋত থেকে বইবে, ক্রমশ তার বেগ বাড়বে, সূর্য গা-ঢাকা দেবে, কিন্তু বৃষ্টি জোরে পড়বে না।

এ গেল লণ্ডনের অন্তরিক্ষের খবর। জলস্থলের বৃত্তান্ত বলা যাক।

লণ্ডন শহর টেমস নদীর কূলে। কিন্তু গঙ্গা গোদাবরীর দেশের লোক আমি টেমসকে নদী বলি কেমন করে? লণ্ডনের যেকোনো দুটো চওড়া রাস্তাকে পাশাপাশি করলে টেমসের চেয়ে এক এক জায়গায় কম অপ্রশস্ত হয় না। ছোটো হলে কী হয়, নদীটি নৌবাহ্য। বড়ো বড়ো জাহাজকে অনায়াসে কোল দেয়, বলিষ্ঠ শিশুর তম্বঙ্গী মায়ের মতো। লণ্ডনের যোজনজোড়া জটায় জাহ্নবীর মতো এঁকেবেঁকে নির্গমের পথ খুঁজছে, পিছু হটছে, মোড় ফিরছে। শহরের বাইরে তার উভয় তটে ছবির মতো বন, তার কূল সবুজ মখমলে মোড়া। কিন্তু শহরের ভিতর তার জল কলকাতার গঙ্গার মতো বিবর্ণ, কাশীর গঙ্গার মতো স্বচ্ছ নয়। তার ধারে দাঁড়ালে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে; বাতাস তো নেই, আছে ধোঁয়া। ঝাপসা চোখে দু-ধারের দৃশ্য দেখি, শিপিয়া-কালো ইট-কাঠের স্তূপ, তাদের গায়ে বড়ো বড়ো হরফে বিজলি আলোর বিজ্ঞাপন—'মদ' কিংবা 'সিগরেট' কিংবা 'খবরের কাগজ'। ওই তিনটে তিন রকমের বিষ এদেশে প্রচুর বিক্রি হয়।

লণ্ডন শহর গোটা সাত-আট কলকাতার সমান। আয়তন ছাড়া নতুন কিছু দেখবার নেই। সেই ট্রাম সেই বাস সেই ট্যাক্সি সেই ট্রেন সেই গলি সেই বস্তি সেই মাঠ সেই প্রাসাদ। প্রভেদ এই যে, সমস্তই সুপারলেটিভ, সমস্তই অতিকায়। লণ্ডনের দীনতমঅঞ্চলগুলিও প্রত্যেকটি যেন এক-একটি দক্ষিণ কলকাতা, ঐশ্বর্যে অতটা না-হোক পরিচ্ছন্নতায় অতটা। এত বড়ো শহর কিন্তু সেই অনুপাতে কোলাহলমুখর নয়। অবশ্য কলের কর্কশ আওয়াজে বাড়ির ভিত পর্যন্ত নড়ে এবং মোটরের দাপাদাপিতে রাস্তাগুলোর বুক দুড়দুড় করে, কিন্তু জনতার মুখে কথা নেই। ভিড়ের মধ্যে ফিসফিস করলেও শোনা যায়। ফেরিওয়ালার রকমারি হাঁক নেই, তার চলন্ত বিজ্ঞাপন পড়ে বুঝতে হয় সে কী বেচতে চায় ও কত দামে। দুধওয়ালা ঘরে ঘরে দুধ বিলি করে যাবার সময় এমন সুরে 'milk' বলে যে, শুনলে মনে হয় কোকিলের 'কু—উ'। ডাকপিয়োন কাঠঠোকরার মতো দরজায় দুই ঠোক্কর দিলে বুঝতে হয় দরকারি চিঠি এসেছে, রুটিওয়ালা, মাংসওয়ালা, কয়লাওয়ালা ইত্যাদি প্রত্যেকেরই নিজস্ব 'চিচিং ফাঁক' আছে, সেই সংকেত শুনলে বন্ধ দুয়ার আপনি খুলে

যায়, অর্থাৎ বাড়ির ঝি দরজা খুলে দেয়। এককথায় বলতে গেলে এখানে হাটের মধ্যে তেমন হট্টগোল নেই যেমন আমাদের দেশের ঘরে ঘরে। কিন্তু এতটা নিস্তব্ধতা কি স্বাভাবিক না সুন্দর? সুর করে 'দই নেবে গো, মিষ্টি দই' হাঁকতে হাঁকতে চুড়ি বাজিয়ে যাওয়া সুন্দর, না পিঠে বিজ্ঞাপন এঁটে বোবার মতো পায়চারি করা সুন্দর? এদেশে নিরক্ষরতা নেই বলে এদের কানের ক্লেশ কমেছে কিন্তু চোখের জ্বালা? বিজ্ঞাপনওয়ালারা যেন পণ করে বসেছে মানুষের চোখে আঙুল গুঁজে বোঝাবে যে, বিধাতা মানুষকে চোখ দিয়েছেন দোকানদারের ঢাকপেটা চোখ পেতে শুনতে।

লণ্ডনের পথে পথে রথযাত্রার ভিড়, কিন্তু ভিড়ের মধ্যেও শৃঙ্খলা আছে। পুলিশের বন্দোবস্ত অতুলনীয়। কিন্তু কথা হচ্ছে পুলিশের নয়, জনতার—শৃঙ্খলা মেনে চলা যেন এদের দ্বিতীয় প্রকৃতি। রাস্তায় কিছু একটা ঘটেছে, কৌতূহলীরা দাঁড়িয়ে দেখছে, লাইনের পিছনে লাইন; যে লোকটা সকলের শেষে এসে পৌঁছোল সে লোকটা মাত্র দুটো কনুইয়ের জোরে সকলের সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে না, যে আগে এসেছে সে আগে, যে পরে এসেছে সে তার পিছনে কিংবা পাশে। রেলের টিকিট করতে হবে, ঠেলাঠেলি ধস্তাধস্তি ইতর ভাষায় গালাগালি কোনোটাই কোনো কাজে লাগবে না; যে আগে আসবে সে আগে দাঁড়াবে, তার পিছনে তার পরের। ড্রিলের ভাষায় যাকে file বলে কিংবা চলতি ভাষায় যাকে queue বলে তেমনি করে সকলে দাঁড়ালে পরে একজনের পর একজন টিকিট নেবে; সিঁড়ি দিয়ে একে একে ট্রেনের কাছে যাবে, ট্রেনের থেকে যাদের নামবার কথা তারা নামলে পরে ট্রেনে যাদের ওঠবার কথা তারা উঠবে এবং জায়গা থাকে তো আগে মেয়েরা বসবে, না থাকে তো যারা আগে থেকে বসে আসছে তারা উঠে মেয়েদের জায়গা দিয়ে নিজেরা দাঁড়াবে। এইটুকু করতে আমাদের দেশে হাত-পা মুখ-কান সব ক-টা অঙ্গের কসরত হয়ে যায়, বিশেষ করে কানের। এদেশের কিন্তু সমস্ত নিঃশব্দে সারা হয়। ট্রেনে চড়ে হনুমানজির ভজন কিংবা পটলার মার পুরাবৃত্ত শুনে বধির হতে হয় না। কিন্তু এদের এই নিঃশব্দ প্রকৃতি আমার নিছক ভালো লাগেনি। ট্রেনে পাশাপাশি বসতে-না-বসতেই দেশের কেউ গায়ে পড়ে পিতৃপিতামহের নাম শুধায় না। বিয়ে হয়েছে কি না, ক-টি ছেলেমেয়ে, কত মাইনে, কত উপরি পাওনা ইত্যাদি খুঁটিয়ে জেরা করে উত্যক্ত করে না। কিন্তু ওই অনাহূত উপদ্রবের মধ্যে মানুষের ওপরে মানুষের একটা স্বাভাবিক দাবি থাকে—অন্তরঙ্গতার দাবি, সামাজিকতার দাবি; মানুষ যে সমাজপ্রিয় জীব। এদেশের লোকও ও-দাবি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারে না, কিন্তু ওর সঙ্গে কিছু মৌখিকতার খাদ মিশিয়ে দেয়। 'আজ দিনটা বড়ো ঠাণ্ডা, না?' 'তা ঠাণ্ডাই বটে।' এমনি করে আলাপ আরম্ভ হয়, কিন্তু বেশি দূর এগোয় না, কারণ কথাবার্তার পুঁজিই হল ওয়েদার, পুঁজি ফুরোলে নিঃশব্দে সিগরেট ভস্ম করা ছাড়া অন্য পন্থা থাকে না। এরা বাচাল নয় বটে, কিন্তু বাকপটুও নয়। কথোপকথনের আর্ট এদের অজানা।

বলেছি লণ্ডন শহরে নতুন কিছু দেখবার নেই, আয়তন সমৃদ্ধি ও সজ্জা ব্যতীত। তবু মোটা গোছের গোটা কয়েক প্রভেদ স্থূলদৃষ্টি এড়ায় না। এই যেমন মাটির নীচে টিউব বা ইলেকট্রিক রেলরাস্তা—যেন পাতালপুরীর রাজপথ। যাত্রীরা নীচে নামছে, মিনিটে মিনিটে ট্রেন পাচ্ছে, মাইলের পর মাইল যাচ্ছে, ট্রেন থেকে মাটির ওপরে উঠে আপিস আদালত করছে। মাটির নীচে রেল, মাটির ওপরে ট্রাম-বাস-ট্যাক্সি। কিংবা যেমন কলে পয়সা ফেললে সিগরেট চকোলেট সর্দি-কাশির ট্যাবলেট থেকে আরম্ভ করে রেলের টিকিট, ডাকঘরের স্ট্যাম্প, স্নানের জল, উনুনের আগুন পর্যন্ত আপনা-আপনি হাজির হয় যেন দেবতাদের বাহন, স্মরণমাত্র উপস্থিত। কিংবা উঁচু-নীচু পাহাড়কাটা রাস্তা, দু-ধারে একই রঙের একই সাইজের এক-এক সারি বাড়ি, একটা দেখলেই একশোটা দেখা হয়ে যায়। বাড়ির আশেপাশে হয়তো এক টুকরো সবুজ, সবুজের ওপরে এক ঝলক রক্ত বা একমুঠো হরিদ্রা। কিংবা যেমন শহরের স্থানে স্থানে মাঠ; গড়ের মাঠের চেয়ে চওড়া তাদের বুক কিন্তু তেমন চিক্কণ নয়, বন্ধুর। মাঠের কোলে কৃত্রিম হ্রদে নরনারী দাঁড় টানে, সাঁতার দেয়, দমদেওয়া পুতুলজাহাজ ভাসায়, হাঁসের সাঁতার দেখে, ছিপ ফেলে মাছের আশায় দিন কাটায়। মাঠের মেঝের ওপরে সবুজ দূর্বার কার্পেট বিছানো, এত সবুজ আর এত প্রচুর যে মুহূর্তকাল অনিমেষ চেয়ে রইলে যেন

সবুজ জন্ডিস জন্মায়, তখন যেদিকে চোখ ফিরাই সেদিকে সবুজ। কালো কুৎসিত চিমনির ধোঁয়ায় চোখ যখন নির্জীব হয়ে আসে তখন ওই এক ফোঁটা সবুজ আরক তাকে প্রাণ ফিরিয়ে দেয়।

লণ্ডনের উপবনগুলি নানা জাতের গাছপালায় গহন, গাছেদের মাথায় সোনালি চুল। দুঃখের কথা এ দেশের ফুলে গন্ধ নেই। গুণ নেই রূপ আছে, ফুল নয় তো ফুলবাবু। তাই হাওয়া ফুলের গন্ধে বেহুঁশ হয় না, রাত ফুলের গন্ধে উতলা হয় না, মানুষের একটা ইন্দ্রিয় বুভুক্ষু থেকে যায়। মাঠ বা পার্কগুলি এদের ন্যাশনাল প্লে-গ্রাউণ্ড। সেখানে ছোটো ছেলেরা গাছে ওঠে, ছোটো মেয়েরা বল নাচায়, কিশোরেরা ঘুড়ি ওড়ায়, কিশোরীরা বাজি রেখে দৌড়ায়, যুবক-যুবতীরা টেনিস খেলে, বৃদ্ধেরা বসে বসে ঝিমায়, বৃদ্ধারা কুকুরের শিকল হাতে ঠুকঠুক করে হাঁটে। সেখানে খোকাবাবুরা খুকুমণিরা ঠেলাগাড়িতে চড়ে দিগবিজয়ে বাহির হন, মায়েরা ঠেলতে ঠেলতে চলেন ও চেনামুখ দেখলে ফিক করে হেসে দুটো কথা কয়ে নেন, বাবারা সময় করে উঠতে পারলে খোকা-খুকুর সফরে মায়েদের সহগামী হন, এবং সেখানে যুগলের দল ‘আড়াল বুঝে আঁধার খুঁজে সবার আঁখি এড়ায়।’

মাঠ বা পার্কগুলিতে যতক্ষণ থাকা যায় ততক্ষণ বুঝতেই পারা যায় না যে লণ্ডনের ভিতরে আছি। জনসমুদ্রের মাঝখানে এগুলি এক-একটি দ্বীপ, দ্বীপের চারধারে ঢেউয়ের ওপরে ঢেউ ভেঙে পড়ছে, সেখানে অনন্ত কলরোল। কিন্তু দ্বীপের কেন্দ্রস্থলে তার প্রতিধ্বনি পৌঁছোয় না, তার দুঃস্বপ্ন মিলিয়ে আসে সবুজ আসন পেতে মাটি বলে ‘একটু বসো’ সোনালি চামর দুলিয়ে গাছেরা বলে, ‘একটু জিরিয়ে নাও।’ কিন্তু লণ্ডনের মানুষকে শান্তির মন্ত্রে বশ-মানানো যায় না, দু-দন্ড সে স্থির হয়ে বসতে চায় না, উদ্ভিদের মতো স্থাবর হতে তার আপত্তি, সে জন্ম-যাযাবর। কাজ আর অকাজ তাকে নানান সুরে ডাকে, তার ব্যস্ততার ইয়ত্তা নেই। যেখানে সে আপিস করতে শেয়ার কিনতে টাকা রাখতে যায় সেটার নাম সিটি, প্রায় হাজার দুয়েক বছর আগে তাকে নিয়ে লণ্ডনের পত্তন হয়। সিটির পশ্চিম দিকে ওয়েস্ট এণ্ড। সে অঞ্চলে লোকে বাজার করতে আমোদ করতে আহার করতে যায়। সেখানে বড়ো বড়ো দোকান বড়ো বড়ো হোটেল বড়ো বড়ো ক্লাব বড়ো বড়ো থিয়েটার সিনেমা নাচঘর কনসার্ট হল চিত্রাগার মিউজিয়াম প্রদর্শনী। সিটিতে বড়ো কেউ বাস করে না, ওয়েস্ট এণ্ডে ধনীরা বাস করেন। দরিদ্রের জন্যে ইস্ট এণ্ড আর মধ্যবিত্তদের জন্যে শহরতলিগুলো। এগুলি মোটের ওপর নিরালা স্বাস্থ্যকর ও সুবিন্যস্ত। আমার আক্ষেপ কেবল এই যে, এদের নগরকল্পনায় বিশিষ্টতার স্থান নেই। সবটা জুড়েছে ইউটিলিটি বা প্রয়োজনীয়তা। সুবিধা স্বাচ্ছন্দ্য ও সৌষ্ঠব কার না দরকার? কিন্তু সেই দরকারটাই চরম হল, সৌন্দর্য হল অবান্তর। তাই দেখি প্রশস্ত পরিচ্ছন্ন বাঁধানো পথঘাট, বাতায়নবহুল উপকরণাঢ্য পরিপাটি বাড়িঘর, কিন্তু রাস্তার সব ক-টা বাড়ি একই ধাঁচের, একেবারে হুবহু এক, যেন ছাঁচে ঢালা সিসের টাইপ। এরা সৈনিক নাবিকের জাত কচি বয়স থেকে ড্রিল করতে অভ্যস্ত, সারি বেঁধে গির্জায় যায়, সারি বেঁধে ইস্কুল থেকে ফেরে, এদের চালে চলনে উঠতে-বসতে ড্রিল। তাই এদের ঘরবাড়িগুলো পর্যন্ত লাইন বেঁধে পরস্পরের সঙ্গে সমান ব্যবধান রেখে অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে খাড়া, তাদের সকলের গায়ে ইউনিফর্ম, তার একই মাপ একই রং একই রেখা একই গড়ন। চোখের ক্ষুধায় ক্ষুধার্ত হয়ে তাকাই আর ক্ষোভে নৈরাশ্যে মরিয়া হয়ে উঠি। শুনলুম সমগ্র ইংল্যাণ্ড নাকি সপ্তাহের একই বারে কাপড় কাচতে দেয়, একই বারে কাপড় ফিরে পায়।

শহরের যেকোনো রাস্তায় পা দিলে যে দশটা দোকান সর্বপ্রথম চোখে পড়ে তাদের গোটা দুই মদের দোকান, গোটা দুই রেস্তরাঁ, একটা সিগরেটের, একটা জামাকাপড়ের ও একটা আসবাবের দোকান, একটা খবরের কাগজের স্টল, একটা চুল সাজাবার সেলুন, একটা ব্যাঙ্ক। এর ওপরে যদি টিপ্পনির দরকার হয় তো বলি rum খেয়ে নাকি এরা Somme জিতেছিল, তাই সোমরসের এত আদর। রবিবারেও যে তিনটি দোকান খোলা থাকে তাদের নাম মদের দোকান, সিগরেটের দোকান, খবরের কাগজের স্টল। সিগরেট সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ওর একটা ডিবে কাছে না-থাকলে ভদ্রতা রক্ষা হয় না; কারুর সঙ্গে দেখা হলেই ওটা সামনে ধরে বলতে হয়, ‘নিতে আজ্ঞা হোক।’ এ দেশের মেয়েরা যখন ভালো-মন্দ উভয় বিষয়ে পুরুষের অনুধর্মিণী

হবেই বলে কোমর বেঁধেছে তখন তাদের কারোর আলতাপরা মুখে আগুন জ্বলতে দেখলে আশ্চর্য হইনে, কিন্তু কোনো কোনো ভারতবর্ষীয়া যখন স্মার্ট দেখাবার লোভে চিবুকের সঙ্গে সমান্তরাল করে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে সিগরেট লকলক করতে করতে ভুরু কাঁপিয়ে মাথা নাচিয়ে কথা বলেন তখন রিজেন্টস পার্ক চিড়িয়াখানার দৃশ্যবিশেষ মনে পড়ে যায়। দৃশ্যটা আর কিছু নয়, বাঁদরদের টি-পার্টি। মানুষকে ওরা অবিকল নকল করতে পেরেছিল, দুঃখের বিষয় তবু কেউ ওদের মানুষ বলে ভুল করলে না। এদিকে আমি যুবকদের সঙ্গে কথা কয়ে দেখেছি ওরা নিজেরা সিগরেট খায় বলে কুণ্ঠিত বোধ করে ও নিজের বোনকে খেতে দেখলে লজ্জিত বোধ করে; কিন্তু পরের বোনকে খেতে দেখলে কেমন বোধ করে এ প্রশ্নটার উত্তরে তাদের মতবিচ্যুতি দেখা গেল। অমন অবস্থায় পড়লে সবারই মত বদলায়।

রেস্তরাঁ যে এ শহরে কত লক্ষ আছে তার গণনা চলে না। আহারের জন্যে রেস্তরাঁ, নিদ্রার জন্যে ফ্ল্যাট বা রুমস—সাধারণ গৃহস্থের জন্যে এই হচ্ছে এখানকার ব্যবস্থা। এ দেশের স্বাচ্ছন্দ্যনীতির সঙ্গে তাল রেখে গৃহস্থালি গড়া বহুসংখ্যক স্ত্রী-পুরুষের পক্ষে দুঃসাধ্য। যাদের সংগতি আছে তারাও বাড়িতে না-খেয়ে বাইরে খায় এই জন্যে যে, সারাদিন যেখানে জীবিকার জন্যে খাটতে হয় বাড়ি সেখান থেকে অনেক দূরে, কিংবা বাড়িতে রান্না করতে যেটুকু সময় লাগে সেটুকুর বাজারদর রেস্তরাঁয় খাবার খরচের চেয়ে বেশি কিংবা বাড়িতে অল্পসংখ্যক লোকের রান্নার যত খরচ রেস্তরাঁয় বহুসংখ্যক লোকের রান্নায় সে অনুপাতে কম। কথা উঠবে তবে বাড়ির মেয়েরা করে কী? তার জবাব এই যে, বাড়ির মেয়েরাও আপিস করে। সকলে নয় অবশ্য, কিন্তু অনেকে। তরুণী মাত্রেই স্কুল কলেজে যায়, বয়স্কা মাত্রেরই কোনো কাজ আছে। মায়েরাও ছেলেদের স্কুলে দিয়ে কাজে যায়, তবে কোলের ছেলে হলে তার গাড়ি ঠেলে মাঠে নিয়ে যায়, খোকা যতক্ষণ হাওয়া খায়, অন্তত ফিডিং বটল চুষে দুধ খায়, খোকার মা ততক্ষণ জামা সেলাই করে। কাজ করে না, বসে খায়, এমন লোক তো দেখছিনে; যার আর কিছু না জোটে সে একটা সভাসমিতি খুলে বসে। সে সব সভাসমিতির উদ্দেশ্যও বিচিত্র; কোনোটার উদ্দেশ্য জবাই করবার অনিষ্ঠুর উপায় উদ্ভাবন, কোনোটার উদ্দেশ্য সদস্যদের মৃতদেহ কবরস্থ না-করে অগ্নিসাৎ করা। ভালো-মন্দ দরকারি অদরকারি কত রকমের অনুষ্ঠান যে এদেশে আছে তার আভাস পাওয়া যায় রবিবারে হাইড পার্কের বেড়ার ভিতর প্রবেশ করলে। একখানা করে চেয়ার জোগাড় করে তার ওপর দাঁড়িয়ে হাত-পা নেড়ে কত বক্তাই যে ভূমিতে দন্ডায়মান বা সম্মুখ দিয়ে চলন্ত শ্রোতৃমন্ডলীকে সম্বোধন করে কত তত্ত্বই প্রচার করেন তার সংখ্যা হয় না। এদেশে ধর্মের হাজারো সম্প্রদায় আছে, রাজনীতির হাজারো দল আছে, বক্তৃতা দেওয়া কাজটাও কঠিন নয়, আর লোকের ভিড়ের ভিতরে এমন দশ-পঁচিশ জন অখন্ড ধৈর্যশীল সহিষ্ণু শ্রোতা বা শ্রোত্রী কি পাওয়া যাবে না যারা অন্তত পঁচিশ মিনিট বিনা পয়সায় গলাবাজি দেখবে বা নাম সংকীর্তন শুনবে? এমনি করেই পাবলিক ওপিনিয়ন সৃষ্ট হয়। শ্রোতারা তর্ক করে, টিটকিরি দেয়, এক বক্তার লোক ভাঙিয়ে নিয়ে আরেক বক্তা উলটো বক্তৃতা শোনায়, তবু সে বক্তার মেজাজ তরুর চেয়ে সহিষ্ণু ও সংকল্প মেরুর মতো অটল; একটিও যদি শ্রোতা না-রয় তবু তার বাক্যের ফোয়ারা ফুরোবে না। হাতে কোনো একটা কাজ না-থাকলে যেন এরা বাঁচতে পারে না, জীবনটা ফাঁকা ঠেকে। চুপ করে বসে থাকা এদের ধাতে সয় না, তাই ছুটি পেলে এরা বড়ো বিব্রত হয়ে ভাবে ছুটি কেমন করে কাটাবে। ভিক্ষা করা এদেশে আইনবিরুদ্ধ; করলে কঠিন সাজা। তাই ভিক্ষুকেরাও কোনো একটা কাজ করবার ভান করে পয়সা রোজগার করে, হয় দু-পয়সার দেশলাই চার পয়সায় বেচে অর্থাৎ বেচবার ভান করে হাত পাতে, নয় ফুটপাথের ওপরে ছবি এঁকে পথিকদের সামনে টুপি খোলে, নয় কিছু একটা বাজিয়ে বা গেয়ে দাতাকে খুশি করে কিন্তু মুখ ফুটে বলে না যে ভিক্ষা দাও, বললেই পুলিশে ধরে নিয়ে যায়। এত কথা এ প্রসঙ্গে বলবার উদ্দেশ্য, এরা কাজ জিনিসটাকে কী চক্ষে দেখে তাই বোঝানো। নিষ্ক্রিয়তাকে এদেশে ধর্ম বলে না।

জামাকাপড়ের দোকানের এত বাহুল্য কেন? একটা কারণ, শীতের দেশের মানুষ কম্বল সম্বল করে ধুনি জ্বালিয়ে নিষ্ক্রিয়ভাবে পরকালের ধ্যান করলে পরকালের দিন ঘনিয়ে আসে, দেহ সম্বন্ধে নির্বিকল্প হলে দেহী

মাত্রেই বরফ হয়ে যায়, তাই পথের ভিখারিরও গায়ে ওভার কোট ও পায়ে বুটজুতো চাই। মেয়েরা স্কার্ট হ্রস্ব করে ও গলা খোলা রেখে পরিধেয় সংক্ষেপ করেছে বটে, তবু ওদের পরিধেয় শুধু একখানা শাড়ির মতো সরল নয়। আর একটা কারণ, আংটি বা হার বা দুল ছাড়া অন্য অলংকার বড়ো কেউ পরে না, তাই ভূষণের রিক্ততার ক্ষতিপূরণ করতে হয় বসনের বাহারে। একটু আগে বলেছি এদের নগরস্থাপত্যে বিউটির চেয়ে বড়োকথা ইউটিলিটি। এদের বেশভূষা সম্বন্ধেও ওকথা সমান খাটে। মেয়েরাও এখন কাজের লোক হয়েছে, গজেন্দ্রগমনে চললে ট্রেন ফেল করে আপিস কামাই করে বসবে সেই আশঙ্কায় পক্ষীরাজের মতো মাটি ছুঁয়ে ওড়ে, ছুটে ছুটে হাঁপাতে হাঁপাতে ট্রেনের ওপরে লাফ দিয়ে ওঠে, জায়গা পেলে বসে না-পেলে দাঁড়ায়, এক সেকেণ্ড সময় নষ্ট না-করে খবরের কাগজ কিংবা গল্পের বই বার করে পড়তে আরম্ভ করে দেয়। ছুটোছুটির সুবিধার জন্যে স্কার্টের ঝুল হাঁটুর ওপরে উঠে কোমর অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে। দম আটকাবার ভয়ে গলার ফাঁস খুলতে খুলতে আবক্ষ বিস্তৃত হচ্ছে। স্নান প্রসাধন সুখকর হবে বলে মাথার চুল ছেটে কবরীর অনুপযুক্ত করা হচ্ছে। ফলে শরীর হালকা লাগছে, প্রতি অঙ্গে বাতাস লাগছে, স্বাস্থ্য ভালো থাকছে, স্বাস্থ্যজনিত শ্রীও বাড়ছে; এককথায় স্ত্রীজাতির তথা সমাজের বহুতর উপকার হচ্ছে—ইউটিলিটির দিক থেকে জয়জয়কার। এবং এর দরুন মেয়েরা যে সেক্সলেস বা পুরুষালি হয়ে উঠেছে এমনও নয়। নারীর নারীত্ব যে সাগরতলের চেয়েও অতল; পরিবর্তন সে তো জলপৃষ্ঠের বুদবুদ, কোনো কালেই তা অতলস্পর্শী হতে পারে না; বিপ্লবের মন্দর দিয়ে মথন করেও নারীর নারীত্বকে নড়ানো যায় না, কেবল কাড়তে পারা যায় তার সুধা আর তার বিষ।

পরিবর্তনকে আমি দোষ দিইনে আর ইউটিলিটিকে আমি মহামূল্য মনে করি। তবু আমার ধারণা এ যুগের নারীর পরিচ্ছদ যদি এ যুগের নারীর প্রতিবিম্ব হয় তবে বিম্ব দেখে বলতে পারি বিম্ববতী সুন্দরী নয়। নারীত্বের বিষ যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে সুধাও যাচ্ছে। পরিচ্ছদকে উপলক্ষ্য করে এত কথা বলবার অভিপ্রায়—পরিচ্ছদ তো কেবল নগ্নতার আচ্ছাদন বা শীত বর্ষার বর্ম নয় যে তার প্রয়োজনীয়তাই তার পক্ষে চূড়ান্ত হবে; পরিচ্ছদ যে দেহেরই সম্প্রসারণ, দেহেরই বহির্বিকাশ, দেহের চারপাশে সৌন্দর্যের পরিমন্ডল। এরা জীবনকে ব্যস্ততায় ভরে এমন সংক্ষিপ্ত করে আনছে যে, মানুষের মনের আর সে-অবসর নেই, যে-অবসর নইলে মানুষ নিজের পরিমন্ডল নিজে রচনা করতে পারে না। তখন ডাক পড়ে পোশাক বিক্রেতার আপিসের পোশাক ডিজাইনারকে এবং পোশাক বিক্রেতার দোকানের ম্যানিকিনদের। গণতন্ত্রের বিবেক বন্ধক দেওয়া হয়েছে মন্ত্রীমন্ডলীর কাছে, আর গণতন্ত্রের রুচি বন্ধক দেওয়া হয়েছে লার্জ স্কেল ম্যানুফ্যাকচারওয়ালাদের কাছে। যখন দেখি আজানুলম্বিত আলখাল্লার মতো লোমশ ওভার কোটের অন্তরালে নারীদেহের contour (রেখাভঙ্গি) ঢাকা পড়েছে, দেখা যাচ্ছে কেবল কচ্ছপের খোলার ভিতর থেকে বার করা আজানু উন্মুক্ত পা দুটি আর টুপির দ্বারা রাহুগ্রস্ত মুখটি, তখন মনে হয় যেন দুটি চলন্ত স্তম্ভের ওপরে কালো বা মেটে রঙের একটি বস্তা উপুড় করা হয়েছে; সেই বস্তার পৃষ্ঠভাগ একেবারে প্লেন, তার কোথাও একটা রেখা বা একটা বন্ধনী নেই, কটির স্থিতি যে কোনখানে আর পরিধি যে কতখানি তা অনুমান করে নিতে হয়।

পুরুষের পোশাক সম্বন্ধে কিছু না-বলাই ভালো কারণ পুরুষ চিরকাল কাজের লোক, সে যে ইউটিলিটি ছাড়া অন্য কিছু বোঝে এত বড়ো প্রত্যাশা তার কাছে করা যায় না। মজার কথা এই যে, নারীর পোশাক যত সরল হচ্ছে পুরুষের পোশাক তত জটিল হচ্ছে, তার আপাদমস্তক পোশাক দিয়ে মোড়া; সে-পোশাকের স্তরের পর স্তর, আণ্ডারওয়্যারের ওপরে আণ্ডারওয়্যার, কোটের ওপরে ওভার কোট, জুতোর ওপরে জুতো, মোজার স্পাট, টাই-কলারের ওপরে মাফলার!

শীতের দেশের লোককে বিছানা পুরু করবার জন্যে লেপ কম্বলের বহুল আয়োজন করতে হয়, আর ইউরোপীয় পরিচ্ছদ পরে মেজের ওপরে শোয়া-বসা চলে না বলে খাট পালঙ্ক কৌচ সোফা চেয়ার টেবিল দরকার হয়। এ ছাড়া কাপড় রাখবার ওয়ার্ডরোব, খাবার রাখবার কাবার্ড, হাতমুখ ধোবার সরঞ্জাম, প্রসাধনের আয়না-দেরাজ, রান্নার স্টোভ, ঘর গরম রাখবার অগ্নিস্থলী ইত্যাদি গরিব-দুঃখীরও চাই। দেশে

আমাদের বাড়ির ঝি বারান্দায় ছেঁড়া মাদুর পেতে গায়ে ছেঁড়া কম্বল জড়িয়ে শীতের দিনে ঘুঁটের আগুন পোহায়। এখানে আমাদের বাড়ির ঝির জন্যে স্বতন্ত্র ঘর, ঘরের মেজেতে কার্পেট পাতা, দেয়ালে ওয়ালপেপার আঁটা, লোহার খাটে আধ ফুট পুরু বিছানা, ঘরের একপাশে অগ্নিস্থলী, সেখানে কয়লা পোড়াতে হয়, একপাশে টেবিল চেয়ার আয়না দেরাজ আলনা, ওপরে ইলেকট্রিক আলো ও জানালায় নকশাকাটা পর্দা। এই জন্যেই এদেশে আসবাবের দোকান এত। দোকান থেকে আসবাব ভাড়া করে আনতে হয় কিংবা কিনে এনে মাসে মাসে দামের ভগ্নাংশ দিতে হয়। আসবাব সম্বন্ধেও ইউটিলিটির সঙ্গে বিউটির ছাড়াছাড়ি। সৌষ্ঠব আছে কিন্তু বৈশিষ্ট্য নেই, বৈচিত্র্য আছে কিন্তু কলে তৈরি প্রাণহীন বৈচিত্র্য। যন্ত্ররাজ বিভূতির কল্যাণে একালের রামশ্যামও সেকালের রাজরাজড়াদের চেয়ে স্বচ্ছন্দে আছে। কিন্তু রামের সঙ্গে শ্যামের এখন একতিলও তফাত নেই; রামের নাম ৪৬৩ তো শ্যামের নাম ৪৭৩; নামের তফাত নেই, সংখ্যার তফাত। 'কলি' যুগ বটে!

আমাদের বাড়ির ঝি ফুরসত পেলেই খবরের কাগজ পড়ে; কোনো কোনো দিন খাবার সময়, কোনো কোনো দিন পরিবেশন করবার ফাঁকে। এই থেকে বুঝতে হয় এদেশে খবরের কাগজের কেমন প্রচার ও প্রভাব। যে কাগজ আমাদের ঝি পড়ে সে কাগজে গুরুগম্ভীর লেখা থাকে না, তার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ আধ কলমও নয়, সম্পাদক মহাশয় হালকা সুরে গ্রেহাউণ্ড রেসিং বা শরৎ কালের ফ্যাশন সম্বন্ধে দু-চার কথা বলে আমাদের ঝি ঠাকরুনের সন্তোষবিধান করেন, উঁচুদরের রাজনৈতিক চাল বা অর্থনৈতিক সমস্যার ধার দিয়েও যান না; সংবাদের কলমে থাকে খেলাধুলা, ঘোড়দৌড়, চোর-ডাকাত, বিবাহ ও বিবাহভঙ্গ ইত্যাদি চটকদার ও টাটকা খবর। আদালতে কে কেঁদেছে, এরোপ্লেনে কে হেসেছে, থিয়েটারে কে নেচেছে তাদের ফোটো তো থাকেই, সময় সময় তাদের সঙ্গে 'আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি'-র সাক্ষাৎকারের লোমহর্ষণ বিবরণ থাকে। 'আমাদের দেশের কাগজের সঙ্গে এদেশের কাগজগুলোর মস্ত একটা তফাত এই যে, এদেশের কাগজে গালাগালি থাকে না; ক্যাথরিন মেয়োর ওপর রাগ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু তাকে বেশ্যা বলে গালাগাল দেওয়াটা ইতরতা। অমন ইতরতা এদেশের কাগজওয়ালারা এদের প্রধানতম শত্রুদের বেলাও করে না। পাঞ্চ কাগজখানার পেশাই হচ্ছে ভাঁড়ামি, কিন্তু সে ভাঁড়ামির মধ্যে অশ্লীলতা থাকে না। এদেশে ক্যাথরিন মেয়োর যারা প্রশংসা গেয়েছে তারা স্পষ্ট করে বলতে ভোলেনি যে লেখিকা ইংরেজ নয়, আমেরিকান; এবং অনেকে ইঙ্গিতে বুঝিয়েছে যে, ইংরেজ লেখক হলে কুরুচি-পরিচায়কপ্রসঙ্গগুলো অমন খোলাখুলিভাবে বীরদর্পে উল্লেখ করত না। বাস্তবিক, অশ্লীলতা সম্বন্ধে ইংরেজ জাতির একটা স্বাভাবিক ভীরুতা আছে, তাই এদেশের খবরের কাগজে কেলেঙ্কারির বর্ণনাটাও নীচু গলায় হয়। মোটকথা, রেসপেক্টেবল বলে গণ্য হবার জন্যে এদেশের 'ইতরেজনা'-র একটা ঝোঁক আছে, তাই ডেলি হেরাল্ডকেও টাইমসের আদর্শ অনুসরণ করতে হয়। আমাদের ঝি ঠাকরুনের শ্রেণির মেয়েরাও মনে মনে এক-একটি লেডি। ইংল্যাণ্ডের গণতন্ত্রে অভিজাতদের ক্ষমতা কমেছে, কিন্তু প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে, অর্থাৎ এদেশ কুলীনকে অন্ত্যজ না-করে অন্ত্যজকে কুলীন করে তুলছে।

এর পরের প্রসঙ্গ, চুল সাজাবার সেলুন। এই জিনিসটা আগে এদেশে পুরুষদের জন্যে অভিপ্রেত ছিল, সুতরাং সংখ্যায় অর্ধেক ছিল। এখন মেয়েরা হয় পুরুষের মতো ছোটো করে চুল ছাঁটে, নয় হরেক রকমের বাবরি রাখে। শিংল করাটা একটা আর্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে, এ আর্টের আর্টিস্ট হচ্ছেন নরসুন্দর আর তুলি হচ্ছে তাঁর কাঁচি। যার চুল যেমন করে শিংল করলে মানায় তার চুল তেমনি করে শিংল করাটা যথেষ্ট সৌন্দর্যবোধের পরিচায়ক। তবে ব্যাপারটা ব্যয়সাধ্য, মাসে মাসে নরসুন্দরকে খাজনা গুনতে হয়। চুল ছেঁটে নাকি মেয়েরা সোয়াস্তি পায়। সম্ভবত পায়, কিন্তু এক্ষেত্রেও সেই ইউটিলিটির প্রশ্ন। আগে ইউটিলিটি, তারপরে ওরই ওপরে একটু সৌষ্ঠবের ব্যবস্থা, সেজন্যে নরসুন্দরের শরণাপন্ন হওয়া। নিজের রুচি পরের কাছে বন্ধক রাখা ও শতসংখ্যকের জন্যে লার্জ স্কেলে সৌন্দর্য ম্যানুফ্যাকচার করা। ভবিষ্যতে নরসুন্দরের কুটিরশিল্পটা বিদ্যুৎচালিত কারখানাশিল্পে পরিণত হবে না তো? সুন্দরীরা দলে দলে কলের নীচে মাথা পেতে

slot-এ ছ-পেনি ফেললে আপনা-আপনি চুল ছাটা টেড়ি কাটা ঢেউ-খেলানো শিং-বাঁকানো কান-ঢাকানো কলপ-মাখানো পাঁচ মিনিটে সমাপ্ত হবে না তো?

এবার ব্যাঙ্কের কথা বলে আজকের মতো পাততাড়ি গুটাই। সকল বাবুয়ানা সত্ত্বেও ইংরেজরা হিসাবি জাত, যেমন ফুর্তি করে তেমনি খাটে এবং খাটুনির অর্জন থেকে যতটা ব্যয় করে ততটার বহুগুণ সঞ্চয় করে। ব্যাঙ্ক হচ্ছে প্রত্যেকের খাজাঞ্চিখানা। ঘরে টাকা না-রেখে সেইখানে গছিয়ে দেয় ও দরকার হলেই চেক লিখে দেয়। আমাদের বাড়ির ঝিও ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেয়, সে-টাকা দেশের ব্যবসাবাণিজ্যে খাটে, তার থেকে সে সুদ পায়। ইংল্যাণ্ডে অগণ্য ব্যাঙ্ক আছে, পাড়ায় পাড়ায় ব্যাঙ্কের শাখা। পাড়ায় ওই ব্যাঙ্কটি না থাকলে পাড়ায় ওই ন-টি দোকানও থাকত না, এ সমৃদ্ধিও থাকত না। আমাদের বাড়ির ঝি টাকা না জমিয়ে উড়িয়ে দিত কিংবা মাটিতে পুঁতে টাকার ব্যবহারই করত না। ব্যাঙ্ক থাকায় আমাদের বাড়ির ঝির দশ-বিশ টাকা পৃথিবীর সর্বত্র ঘুরছে, এই মুহূর্তে হয়তো নিউজিল্যাণ্ডের চাষারা ওই টাকা ধার নিলে, কিংবা দক্ষিণ আফ্রিকার সোনার খনির মালিকেরা ওই টাকার সুদ দিলে, কিংবা হাওড়ার পাটের কলওয়ালারা ওই টাকার শেয়ারে ওর দু-গুণ ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করলে।

৩

নতুন দেশে এলে মানুষের সব ক-টা ইন্দ্রিয় একসঙ্গে এমন সচেতন হয়ে ওঠে যে, মিষ্টান্নের দোকানে শিশুর মতো মানুষ কেবলই উতলা হয়ে ভাবে কোনটা ছেড়ে কোনটা দেখি, কোনটা ছেড়ে কোনটা শুনি, কোনটা রেখে কোনটা নিই। একান্ত তুচ্ছ যে, সেও নবীনত্বের রসে ডুব দিয়ে রূপকথার দাসীকন্যার মতো রানির যৌবন নিয়ে সম্মুখে দাঁড়ায়। বলে, দ্যাখো দ্যাখো আমাকে দ্যাখো, আমি ভালো নই মন্দ নই, সুন্দর নই কুৎসিত নই, আমি রূপবান আমি নতুন। তখন মানুষের ভিতরকার রসিকটি দেহ-দুর্গের চার দেয়ালের দশ জানালা খুলে দিয়ে জানালার ধারে বসে। সে নীতিনিপুণ নয়, সে ভালো-মন্দ ভাগ করে ওজন করে বিচার করতে পারে না, সে কেবল দেখতে শুনতে চাখতে ছুঁতে চায়; কিন্তু কত দেখবে, কত শুনবে, কত চাখবে, কত ছোঁবে! হায়, আমার যদি সহস্রটা চোখ সহস্রটা কান থাকত, আর থাকত সহস্রটা—না না, পাঁচশোটা মন, তাহলে জগতের আনন্দ-যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ এমন ব্যর্থ যেত না। তাহলে আমি হাল ছেড়ে দিয়ে ঘরের কোণে বাতির নীচে আগুনের দিকে পিঠ করে বসে *বিচিত্রা*-র জন্য ভ্রমণকাহিনি লিখতুম না, আমি আর এক বিচিত্রার দ্যুলোক-ভূলোকব্যাপী অফুরন্ত লীলা উপভোগ করতে পথে বেরিয়ে পড়তুম। কিন্তু দ্যুলোকব্যাপী?—হায়, লণ্ডনের কি দ্যুলোক আছে! লণ্ডনের লঙ্কাপুরীতে ভুবনের ঐশ্বর্য আহৃত, কিন্তু আকাশ নেই, সূর্য নেই, চন্দ্র নেই, তারা নেই। দিনের পর দিন যায়, সূর্য ওঠে না, আকাশ মানিনীর মতো মুখ আঁধার করে রাখে, আর আমরা নিরীহ লণ্ডনবাসীরা পিতামাতার দ্বন্দ্বে অবোধ শিশুর মতো অবহেলিত হয়ে আলোর ক্ষুধায় অতিষ্ঠ হই। আমাদের জ্যেষ্ঠরা যাঁরা লণ্ডনের কোলে দীর্ঘকাল আছেন তাঁরা হিন্দু বিধবার মতো উপবাস সইতে অভ্যস্ত কিন্তু আমরা কনিষ্ঠরা আলোর দেশ থেকে সদ্য আগন্তুক, ডাল-ভাতের বদলে মাংস-রুটি খেয়ে দেহধারণ করতে যদিচ পারি, তবু সূর্যের আলোর অভাবে গ্যাসের আলো ছুঁইয়ে মনের বৃন্তে ফুল ধরাতে পারিনে। শুনেছি রবীন্দ্রনাথ ইউরোপে এলে, শ্রীকৃষ্ণ বিয়োগে অর্জুন যেমন গাণ্ডিব তুলতে অক্ষম হয়েছিলেন, রবির বিরহে কবিতা লিখতে তেমনি অক্ষম হন। আলোর দেশের মানুষের দেহ আলোর সঙ্গে ছন্দ রেখে গড়া, তার লোমকূপে-কূপে আলোর আকাঙ্ক্ষা জঠরজ্বালার মতোই সত্য। সেই দেহের ওপরে যখন সপ্তাহের পর সপ্তাহ অনবচ্ছিন্ন অন্ধকারের চাপ পড়ে তখন মন বেশিদিন অস্বস্তির ছোঁয়াচ এড়াতে পারে না, সূর্যাস্তের পরে তরুর মতো মাথা যেন নিস্তেজ হয়ে নুয়ে পড়ে।

এক একদিন কালো কুয়াশায় দিনের ভিতর রাতের জের চলে, রাতের দুঃস্বপ্ন যেন বুকের ওপরে বসে ক্ষান্ত হয় না, দিনের বেলা মনেরও ওপরে চাপে। এক-একদিন সাদা কুয়াশায় সামনের মানুষ দেখা যায় না, পদাতিকের দল 'চলি-চলি-পা-পা' করে শিশুর মতো হাঁটে, মোটর গাড়িতে ঘোড়ার গাড়িতে মন্থরতার প্রতিযোগিতা বাঁধে, তবু তো শুনি গাড়িতে গাড়িতে মাথা ফাটাফাটি হয়, পথের মানুষ গাড়ি চাপা পড়ে মরে। হঠাৎ এক এক দিন মেঘ-ধোঁয়া-কুয়াশার পর্দা তুলে আকাশের অন্তঃপুরে সূর্যের পদপাত হয়, আমাদের মুখের ওপরে খুশির হাসির লহর খেলে যায়। দু-তিন সপ্তাহে একদিন করে আলোর জোয়ার আসে, দু-এক ঘণ্টায় তার ভাটা পড়ে, তবু সেই দুটি-একটি ঘণ্টার জন্যে আমরা সমরখন্দ ও বোখারা দান করতে রাজি আছি। এক সহস্র ক্যাণ্ডল-পাওয়ার-বিশিষ্ট বিজলির আলোর চেয়ে এক কণা সূর্যের আলোর দাম যে কত বেশি তা যেদিন নয়নঙ্গম হয়, সেদিন—

> না চাহিতে মোরে যা করেছ দান
> আকাশ আলোক তনু মন প্রাণ

সে মহাদানের মূল্য হৃদয়ঙ্গম করে লণ্ডনের বিভবসম্ভোগ তুচ্ছ মনে হয়। দৈবাৎ এক-আধ বার চাঁদ দেখা দেয়। আমার বিরহী বন্ধুটি খবর দিয়ে যায় চাঁদ উঠেছে—সাত সমুদ্দুর পেরিয়ে আসা চাঁদ, কোনো বিরহিণীর পাঠিয়ে দেওয়া চাঁদ। আমাদের কাছে চাঁদের মতো আশ্চর্য আর নেই; সে তো কেবল আলো দেয় না, সে দেয় সুধা। বিজলির আলোর সঙ্গে তার তফাত ওইখানে। সভ্যতা আমাদের কেরোসিনের আলোর পরে

গ্যাসের ও গ্যাসের আলোর পরে বিজলির আলো দিয়ে অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে চলেছে, কিন্তু প্রকৃতি আমাদের দয়া করে যে সুধাটুকু দিয়েছে সভ্যতা তার পরিমাণ বাড়াতে পারেনি।

কথা হচ্ছিল নতুন দেশে এলে মানুষের সব ক-টা ইন্দ্রিয় একসঙ্গে এমন সচেতন হয়ে ওঠে যে, মানুষের দশা হয় সেই ভদ্রলোকের মতো যে-ভদ্রলোক একপাল আত্মীয় পরিবৃত হয়ে কাশীতে বা পুরীতে ট্রেন থেকে নামেন। দশটা পান্ডা যখন দশটি আত্মীয়কে ছিনিয়ে নিয়ে দশ দিকে রওনা হয় এবং আরও দশটা এসে কর্তার দশ অঙ্গে টান মারে, তখন তাঁর যে অবস্থা হয় আমার মনেরও এখন সেই অবস্থা। ঘর ছেড়ে একবার যদি বার হই তো লণ্ডন শহরের সব ক-টা রাস্তা একসঙ্গে আহ্বান করতে থাকবে—'এদিকে, বন্ধু, এদিকে', সব ক-টা মাঠ উদ্যান, সব ক-টা মিউজিয়াম, আর্ট গ্যালারি, থিয়েটার, কনসার্ট সমবেত স্বরে গান করে উঠবে—'এখানে বন্ধু, এখানে।' তাদের আহ্বান যদি না-ই শুনি, যদি কোনো একটা রাস্তা ধরে খ্যাপার মতো যেদিকে খুশি পা চালাই, তবে মানব-মানবীর শোভাযাত্রা থেকে কত রঙের পোশাক, কত ভঙ্গির সাজ, কত রাজ্যের ফুলের মতো মুখ আমার চোখ দুটিকে এমন ইঙ্গিতে ডাকবে যে, মনটা হাল ছেড়ে দিয়ে ভাববে, এর চেয়ে চুপ করে ঘরে বসে ভ্রমণকাহিনি লেখা ভালো, বৈরাগ্যবিলাসীর মতো সমস্ত ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ করে সর্ব প্রলোভনের অতীত হওয়া ভালো, সুরদাসের মতো দুটি চক্ষু বিদ্ধ করে ভুবনমোহিনী মায়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া ভালো।

আমি ঘরে বসে লিখছি, আমার চোখজোড়া অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো ভূপ্রদক্ষিণে বেরিয়েছে। প্রথমে যেখানে গেল সেটা আমাদের বাড়ির পাশের টেনিস কোর্ট, সেখানে যুবক-যুবতীরা লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে ছুটে হেসে হেসে খেলছে। যে দুটো জাতির পরস্পরের থেকে শতহস্ত ব্যবধানে থাকা উচিত, সেই দুটো জাতি যে বয়সে মানুষের শিরায় শিরায় ভোগবতীর বন্যা ছোটে সেই বয়সে কেবল যে স্বাস্থ্যের জন্যে শীতবাতাসের মধ্যে আঁধার আকাশের তলে খেলা করছে তা নয়, সেইসঙ্গে এত প্রচুর হাসছে যে ভারতবর্ষের লোক মোহমুদগরের আমল থেকে আজ অবধি সব মিলিয়ে এত হাসেনি। আমার চোখ ঘরের জানলা ছেড়ে রাস্তায় নামল। আমাদের পাড়ার বাড়িগুলো এক পায়ে দাঁড়িয়ে-থাকা ঘুমন্ত বকের মতো নিস্তব্ধ। এটা একটা শহরতলি। সামনের বাড়ির ঝি মাটিতে হাঁটু গেড়ে কোমরে কাপড় জড়িয়ে সিঁড়ির ওপর ন্যাতা বুলোচ্ছে, তার হাত প্রতি দেশের কল্যাণী নারীর হাত, ধুলা যার স্পর্শ পেয়ে প্রত্যহ শুচি হয়। আমার চোখ এগিয়ে চলল। এরপরের রাস্তাটা পাহাড় থেকে নেমেছে, তার নামবার মুখে খাস লণ্ডন। নামতে নামতে দেখছি ছেলের দল পায়ে চাকা বেঁধে ফুটপাথের ওপর দিয়ে সোঁ করে নেমে চলেছে, চলতে চলতে বাঁধালো হয়তো কোনো বুড়ো ভদ্রলোকের গায়ে ধাক্কা, বার্ধক্যের চোখ তারুণ্যের দিকে কোমল ভাবে চাইল। ছোটো মেয়েরা দোকানের কাচের বাইরে থেকে ভিতরের কেক চকোলেটের দিকে লুব্ধ নিরাশ দৃষ্টি ফেলছে; হয়তো দার্শনিকের মতো ভাবছে, কমল যদি এত সুন্দর তো কমলে কণ্টক কেন? চকোলেট যদি এত সুস্বাদ তো চকোলেটের চারপাশে কাচের বেড়া কেন? আমার চোখ পথে চলতে চলতে দেখছে মদের দোকানের ওপর বিজ্ঞাপনের নামাবলি, গির্জার দ্বারদেশে মুদ্রিত ধর্মানুশাসন, কসাইয়ের দোকানে দোদুল্যমান হৃতচর্ম পশুর শব, কেমিস্টের দোকানে নানা রোগের দাওয়াই, পোশাকের দোকানের কাচের এক পারে হঠাৎ থামা নারীর কৌতূহলদৃষ্টি, অন্য পারে চোখ-ভুলানো পোশাকের নমুনা ও দাম। ফলের দোকানের কর্মচারিণী বাইরের কাচ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করছে। 'এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সি'-র কর্ত্রী ঝিদের জন্যে গিন্নি ও গিন্নিদের জন্যে ঝি ঠিক করে দিচ্ছেন। সরকারি ইস্কুলের এক প্রান্তে ছেলেরা ও অপর প্রান্তে মেয়েরা সমান বিক্রমে মাতামাতি করছে; তাদের ভাগ্য ভালো, ভারতবর্ষে জন্মায়নি; সে দেশে জন্মালে এতদিনে ছেলেরা গোপাল হয়ে উঠত, মেয়েরা মেয়ের মা হত।

আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেলস্টেশনের কাছে এসে আমার চোখ দোটানায় পড়েছে—ট্রেনে চড়বে না বাসে উঠবে? বাসেই উঠল, দোতলার এককোণে আসন নিল। দু-পাশে দোকান-বাজার, দোকানে ক্রেতা-ক্রেত্রীর ভিড়, কর্মচারিণীদের ব্যস্ততা; উভয় পক্ষে শিষ্টাচার। রেস্তরাঁ—দলে দলে নরনারী আহারে রত;

পরিবেশনকারিণীদের মরবার ফুরসত নেই, ছুরি-কাঁটা-প্লেটের ঝনৎকার; সুখভোগ্য খাদ্যপেয়ের সুগন্ধবাহী ধোঁয়া। রেস্তরাঁর বাইরে অন্ধ ভিক্ষুক চীরধারিণী পত্নীর হাত ধরে দেশলাই বেচছে বা বাজনা বাজাচ্ছে বা ফুটপাথে ছবি আঁকছে। রাস্তা মেরামত করছে কুলিরা, তাদের পরিধান কাদামাখা ও জীর্ণ, মুখে প্রতি দেশের কুলি-মজুরের মতো সরলতাব্যঞ্জক প্রাণখোলা হাসি। জমকালো পোশাকপরা অশ্বারোহী সৈনিক চলেছে, বুড়িরা হাই তুলতে তুলতে নির্নিমেষে দেখছে। গত যুদ্ধে তাদের এমনি-সব ছেলেরা তো মরেছে! তরুণীরা গৃহবাতায়ন থেকে উল্লাসধ্বনি করছে, যৌবন যে ঠেকেও শেখে না, হারিয়েও হারায় না। থিয়েটারের ম্যাটিনির সময় হল, টিকিট কেনবার জন্যে স্ত্রী-পুরুষ 'কিউ' (queue) করে দাঁড়িয়েছে, দুজনের পেছনে দুজন—পুরুষের চেয়ে স্ত্রী সংখ্যা বেশি। সর্বত্র পুরুষের চেয়ে স্ত্রী সংখ্যা বেশি—সভাসমিতিতে স্কুলে কলেজে থিয়েটার কনসার্টে দোকানে আপিসে সর্বত্র নারীর আক্রমণে পুরুষ পলাতক। কেরানি মানে নারী, স্কুলশিক্ষক মানে নারী, গৃহভৃত্য মানে নারী। রাস্তার মোড়ে বাস থামল, শালপ্রাংশু বলিষ্ঠকায় পুলিশের তর্জনী সংকেতে শত শত বাষ্পীয় যান থেমেছে, শতশত নরনারী রাস্তা পারাপার করছে। মেয়েরা ধাক্কা দিতে দিতে ধাক্কা খেতে খেতে ভিড়ের মধ্যে ছুটে মিলিয়ে যাচ্ছে ছটকে বেরিয়ে পড়ছে। শিশু কাঁখে নিয়ে শিশুর বাবা তার মা-র পশ্চাদবর্তী হচ্ছেন। বুড়িকে ঠেলাগাড়িতে বসিয়ে বুড়ির ছেলেমেয়েরা মাঠে হাওয়া খাওয়াতে যাচ্ছে। প্রেমিক যুগল হাতে হাত জড়িয়ে বাজার করে ফিরছেন। বাস চলতে আরম্ভ করল, একটা পার্কের কাছ দিয়ে যাচ্ছে, পার্কের বেঞ্চিতে বসে কাগজ পড়তে পড়তে দরিদ্ররা রুটি কামড়ে খাচ্ছে—তাদের মধ্যাহ্নভোজনটা দু-একখানা রুটিতেই সমাপ্ত হচ্ছে।

বাস কলেজের কাছে থামতেই আমার চোখজোড়া তৎক্ষণাৎ নেমে পড়ে দৌড় দিলে কলেজের অভিমুখে। কোনো অগ্রগামিনী হয়তো দয়া করে দরজাটা খুলে রাখলেন, প্রবেশ করে ধন্যবাদ দিয়ে কপাটটা খুলে ধরা গেল পশ্চাদাগতের জন্যে। তারপর ক্লাসে গিয়ে আসন অধিকার করা; অধ্যাপকের আগমনের আগে মেয়েদের তুমুল ফিসফাস; কে কী সাজ করে এসেছে অন্যমনস্কতার ভান করে দেখা ও দেখানো লাফ দিয়ে পেছনের চেয়ার থেকে সামনের চেয়ারে যাওয়া; অধ্যাপকের প্রবেশ; অধ্যাপকোবাচ—সুবোধ বালিকাদের কর্তৃক একান্ত তন্ময়ভাবে তাঁর প্রত্যেকটি কথার শ্রুতিলিখন; পলাতকমতি উন্মনা বালক কর্তৃক উপন্যাস পাঠ বা কবিতাসংরচন; বার বার ঘড়ির দিকে চাতক দৃষ্টিক্ষেপ; অবশেষে ছাত্র-ছাত্রীদের ছত্রভঙ্গ; ধাক্কাধাক্কিপূর্বক ক্লাস থেকে বহির্গম।

নতুন দেশে এলে কেবল যে সব ক-টা ইন্দ্রিয় সহসা চঞ্চল হয়ে ওঠে তা নয়, সমস্ত মনটা নিজের অজ্ঞাতসারে খোলস ছাড়তে ছাড়তে কখন যে নতুন হয়ে ওঠে তা দেশে ফিরে গেলে দেশের লোকের চোখে খট করে বাঁধে, নিজের চোখে ধরা পড়ে না। মানুষ খাদ্য পেয় সম্বন্ধে বোধ হয় কিছু রক্ষণশীল, দেশি রান্নার স্বাদ পেলে রসনা আর কিছু চায় না। কাঁচা বাঁধাকপি চিবিয়ে খেতে যতখানি উৎসাহ দরকার, বাঁধাকপির ডালনাচোখা রসনা কোনো জন্মে ততখানি উৎসাহ সংগ্রহ করতে পারে না। কিন্তু পরিচ্ছদ সম্বন্ধে মানুষের এতটা রক্ষণশীলতা নেই। দেশে যখন এক-আধ দিন কোট-ট্রাউজার্স পরা যেত সে কী অস্বস্তি আর সে কী সাহেব মানসিকতা! ধুতি-পাঞ্জাবিপরা বাঙালিগুলোর ওপরে তখন কী অকারণ করুণা! জাহাজে থাকবার সময় জাহাজি কানুনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ধুতি-পাঞ্জাবি পরার স্মৃতি মনে পড়ে গেলে হাসি পায়। এতদিনে ইউরোপীয় ধড়াচূড়া গায়ে বসে গেছে, চব্বিশ ঘণ্টা এই বেশে থাকতে একটুও বেখাপ্পা বোধ হয় না; এখন মনে হয় এইটেই স্বাভাবিক, যেন এই পোশাক পরে ভূমিষ্ঠ হয়েছি। প্রতিদিন যন্ত্রচালিতের মতো টাইটা বাঁধি, ট্রাউজার্স জোড়াটার হাঁ-দুটোতে পা জোড়াটা গলিয়ে দিই, মন খানেক ভারী ওভারকোটটার বাহন হয়ে চলি। দৈবাৎ কোনোদিন ধুতি পাঞ্জাবি চাদর বার করে পরি তো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারিনে; আমোদের অন্ত থাকে না, জগৎকে দেখিয়ে আসতে ইচ্ছা করে আমাদেরও জাতীয় পরিচ্ছদ আছে। কিন্তু আমাদের জাতীয় পরিচ্ছদ কি একটা? মাদ্রাজি ভায়াদের সঙ্গে পাঞ্জাবি ভায়াদের আপাদমস্তক অমিল, বাঙালি মুসলমান পেশোয়ারি পাঠানের যমজ ভ্রাতা নন। আমার সফেদ ধুতি আর সবুজ

পাঞ্জাবিটার ওপরে নীলকৃষ্ণ উত্তরীয়খানা জড়িয়ে ঘরের বাইরে পা বাড়াই তো রাস্তায় ভিড় জমে যাবে; পুলিশ যদি-বা আমাকে মানুষ বলে চিনতে পেরে চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষদের হাতে সমর্পণ না-করে তো ট্রাফিক বন্ধ করার অজুহাতে সর্বজনীন শ্বশুরালয়ে চালান দেবে।

নতুন দেশে এলে নতুন আবহাওয়ায় নিশ্বাস নিয়ে গোটা মানুষটারই একটা অন্তঃপরিবর্তন ঘটে যায়। যাঁরা বলেন তাঁদের পরিবর্তন হয়নি তাঁরা খুব সম্ভব জানেন না কোথায় কী ঘটে গেছে। দেশে ফেরবার সময় তাঁরা সর্বাংশে, এমনকী মতবাদেও, ঠিক সেই মানুষটি থেকেই ফিরতে পারেন; কিন্তু মনেরও অগোচরে মানুষের কোনখানে কোন প্যাঁচটি আলগা হয়ে যায় তা মানুষ কোনোদিন না জানতে পারলেও সত্যের নিয়ম অমোঘ। নিজেকে জেরা করলে বুঝতে পারি দেশে ফিরে গেলে আমার যেন সেই অবস্থা হবে যে অবস্থা হয় দিঘিতে ফিরে গেলে স্রোতের মাছের। ইউরোপের জীবনে যেন বন্যার উদ্দাম গতি সর্বাঙ্গে অনুভব করতে পাই। ভাবকর্মের শতমুখী প্রবাহ মানুষকে ঘাটে ভিড়তে দিচ্ছে না, এক-একটা শতাব্দীকে এক-একটা দিনের মতো ছোটো করে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সবচেয়ে স্বাভাবিক বোধ হচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদিনের প্রতি কাজে সংযুক্ত থেকে নারী ও নরের একস্রোতে ভাসা। নারী সম্বন্ধে এদেশের পুরুষ দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা নিয়ে মুমূর্ষুর মতো বাঁচে না, নারীর মাধুর্য তার দেহকে ও মনকে তুল্যরূপ সক্রিয় করে তোলে। কেবল চোখে দেখারও একটা সুফল আছে, মানুষের রূপবোধকে তা ঐশ্বর্যান্বিত করে দেয়। নারীকে অবরুদ্ধ রেখে আমাদের দেশের পুরুষ নিজের চোখের জ্যোতিকে নিজের হাতে নিভিয়েছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে অন্য কোনোবার লিখব। যা আমার কাছে তর্ক নয়, রহস্য নয়, সহজ অনুভূতি, তাই আমাদের দেশের লোকের কাছে বাক্যের সাহায্যে বোঝাতে হবে—দুর্ভাগ্য! বেশ বুঝতে পারি দেশে ফিরে গেলে দেশটা পার্টিশন দেওয়া ঘরের মতো ঠেকবে—একপাশে পুরুষ একপাশে নারী মাঝখানে সহস্র বৎসরের অন্ধ সংস্কার।

আর একটা সহজ অনুভূতি, মানুষের সঙ্গে মানুষের সমস্কন্ধের মতো মেশা, কোনো ব্রাহ্মণের কাছে নতশির থাকতে হয় না, কোনো দারোগার কাছে বুকের স্পন্দন গুনে চলতে হয় না, কোনো মনিবের কাছে মাটিতে মিশিয়ে যেতে হয় না, মনুষ্যমর্যাদাগর্বে প্রত্যেকটি মানুষ গর্বিত। ভারতবর্ষের মাটিতে পা দিলে এই মুক্ত মানসিকতার অভাব সমস্ত মন দিয়ে বোধ করব। ভারতবর্ষ যে প্রভু-মানসিকতার দেশ, দাস-মানসিকতার দেশ, সেখানে প্রত্যেকটি মানুষ একজনের দাস অন্য জনের প্রভু।

বড়োদিনের ছুটিতে লণ্ডন ছেড়ে লেজাঁয় গিয়ে দেখি, সে এক তুষারময় স্বপ্ন, যেন নিসর্গের তাজমহল। নিবিড় নীল অকূল আকাশে সেটি একটি পর্বতদিগবলয়িত নিরালা তুষারদ্বীপ; তার মাটি বরফের, মেঘ বরফের; তার জল-স্থল-অন্তরিক্ষের ভিত দেয়াল ছাদ মর্মরনিভ বরফের। যেন আকাশসিন্ধুর ঢেউয়ের পর ঢেউ পাহাড়ের পর পাহাড় হয়ে উঠেছে আর ফেনায় ফেনায় মাটির বেলা ঢেকে গেছে। সে আকাশ এতই নীল আর এত উজ্জ্বল আর এত সুন্দর যে চাতকের মতো দিবারাত্র অনিমেষ চেয়ে থেকে সাধ মেটে না, মনে হয় এ এক মহার্ঘ বিলাসিতা, শুধু এরই জন্যে এক সমুদ্র একাধিক নদী পেরিয়ে ফ্রান্সের এক সীমানা থেকে আরেক সীমানা অবধি রেলদৌড় দিয়ে সুইস আল্পসের শাখাশিখরে উঠতে হয়। সে তো লণ্ডনের মাথার ওপরে কালো শামিয়ানার মতো খাটানো দশ হাত উঁচু দশ হাত চওড়া দশ হাত লম্বা আকাশ নয় যে চোখ বাড়ালেই নাগাল পাব, মন বাড়ালেই মাথা ঠুকে মরব, দশ দিকের পেষণে ধৃতনিশ্বাস হব। লেজাঁয় যেদিন নামলুম সেদিন অসহ আনন্দে নিজেকে শতধা করতে পারলে বাঁচতুম। মুক্ত আকাশের মধ্যে মানবাত্মার যে মুক্তি সে মুক্তি আর কিছুরই মধ্যে নেই। সেই আকাশকে যারা কয়লার ধোঁয়া দিয়ে কালো করে দশ-তলা বাড়ির ঘের দিয়ে খাটো করে তুলেছে তারা কুবের হলেও কৃপার পাত্র, তারা স্বখাদ-সুড়ঙ্গতলের যখ।

সেই উজ্জ্বল নীল প্রশস্তপরিধি আকাশে যখন এক পাহাড়ের ওপার থেকে সূর্য উঠি-উঠি করে, মেঘের মুখে সেই সংবাদ পেয়ে আর পাহাড়ের এপারের বরফ হিরের মতো ঝকমক করে, রঙের সপ্তকের ওপর আলোর আঙুল ঝলমল ঝিলমিল করে পিয়ানোর ঝংকার তুলে যায়, তখন মুহূর্তের জন্য অনুভব করতে পারি আদিযুগের ধ্যানীর চেতনায় কেমন জ্যোতি ঝলসে উঠেছিল, কোন আবিষ্কারের অসম্বরা বাণী তাঁর কণ্ঠভেদ করে আপনি ফুটেছিল, কীসের আনন্দে তাঁকে বলিয়েছিল :

শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ
বেদহং মেত পুরুষং মহান্তম আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

সারাদিন সূর্যকিরণ ছোঁয়াতে ছোঁয়াতে চলে আর মাটির বরফ মাঠের বরফ গাছের বরফ ছাদের বরফ ঝরনার বরফ পাহাড়ের বরফ কখনো সোনা হয়ে ওঠে রুপালি রঙের মুকুরে সোনালি মুখের ছায়ার মতো, কখনো রাঙা হয়ে ওঠে শ্বেতপদ্মিনীর কপোলে অশোকরঙা লজ্জার মতো, কখনো নীলাভ হয়ে ওঠে শ্বেতশঙ্খিনীর নয়নতারার নীল চাউনির মতো। সূর্য বিদায় নিলে চন্দ্রের পালা। চাঁদের অপলক দৃষ্টির তলে তুষারময়ী পুরী বিবশার মতো শায়িতা, তার তরুণ দেহের নিটোল কঠিন চূড়ায় চূড়ায় জ্যোৎস্নার চুম্বন, তার রজত আভরণের গাত্রে তারার ঝিকিমিকি। দন্তুর পর্বতের সারি পার্শ্বরক্ষীর মতো সারারাত্রি পাহারা দিচ্ছে, বিমুগ্ধা 'শালে'গুলি গবাক্ষের ঘোমটা তুলে বিজলি-আলোর উঁকি মেরে দেখছে, টোপরপরা পাইন গাছের দল স্থগিতযাত্রা পদাতিকের মতো খাড়া রয়েছে।

শুধু শোভা নয়, সংগীত। এক নিশান্ত থেকে আরেক নিশান্ত অবধি মিষ্টি সুরের নহবত বাজে গ্রাম-কুক্কুটের অনবসন্ন কণ্ঠে, তার সঙ্গে সুর মিলায় স্লেজবাহী অশ্বের গলার ঘণ্টা, তার সঙ্গে তাল দেয় গিরিগৃহত্যাগিনী অভিসারিণী ঝরনার 'চল চল চল'। দিনের কাজের সঙ্গে রাতের স্বপ্নের সঙ্গে চেতনার আড়ালে ধ্বনি মিশিয়ে রয়, যারা কাজ করে স্বপ্ন দেখে তারা হয়তো শুনতে পায় না জানতে পারে না কীসে তাদের অমৃত দেয়।

কাজ? সেখানকার কাজের নাম খেলা। ডাকঘরের ছোকরা চিঠি বিলি করতে যাচ্ছে, তার গাড়িখানার না আছে চাকা না আছে ঘোড়া, দুই হাতে একবার ঠেলা দিয়ে দুই পায়ে দিলে গাড়ির মধ্যে লাফ, গাড়ি চলল বরফ-ঢাকা ঢালু রাস্তায় পিছলে, এক রাস্তার থেকে আরেক রাস্তায় বেঁকে, এক দরজার থেকে আরেক দরজায় থেমে। এক বাড়ির লোক আরেক বাড়ি যাচ্ছে, যার পিঠে চড়ে বসেছে সেটার নাম লুজ, উঁচু একখানা পিঁড়ির মতো তার আসনটা, বাঁকা দুখানা শিঙের মতো তার পায়া দুটো, চড়ে বসে পা তুলে নিয়ে হাত ছেড়ে দিলে বরফের রাস্তার ওপর ঘষতে ঘষতে চলে। যারা খেলাই করতে চায় তারা দুই পায়ে দুটো

নৌকাকৃতি কাঠ বেঁধে হাতের লগি তুলে নিচ্ছে, আর দুই নৌকায় পা রেখে জমাট জলের ওপর দিয়ে রসাতলে নেমে যাচ্ছে। এরই নাম শী-খেলা (Skiing)। শুধু খেলা করতে কত দেশ থেকে কত পুরুষ কত নারী প্রতি শীতকালে সুইটজারল্যাণ্ডে আসে, বরফের ওপর দিয়ে পাহাড়ে ওঠে, শী করে, স্কেট করে, লুজে চড়ে, শ্লেজে চড়ে। কী অমিতোদ্যম স্বাস্থ্যচর্চা বলচর্চা যৌবনচর্চা! ভূতের মতন খাটতে পারে শিশুর মতন খেলতে পারে, যুবক-যুবতীর তো কথাই নেই, বৃদ্ধবৃদ্ধাদেরও উৎসাহ দেখলে মনে হয় বানপ্রস্থে গেলে এরা বনকে জ্বালাত। খাটো আর খেলো আর খাও—এই হচ্ছে এদের ত্রি-নীতি। ইউরোপে এতদিন আছি, কাঁদতে কাউকে দেখিনি, কান্নাটা এদের ধাতবিরুদ্ধ। যার মুখে সহজ হাসি নেই তার অন্তত হাসির ভান আছে, কিন্তু সহজ হাসি নেই এমন মানুষ তো দেখিনে। আরেক দিক থেকে দেখতে গেলে খুব-একটা গভীরতার দাগও কারও মুখে দেখিনে; তরঙ্গহীন শান্তি অন্তঃসলিলা অনুভূতি অতলস্পর্শী তৃপ্তি কারও চোখে-মুখে চলনে-বলনে দেহের গড়নে লক্ষ করিনে। সাত্ত্বিকতার চর্চা ইউরোপে নেই, কোনো কালে ছিল না। ইউরোপের খ্রিস্টধর্ম যিশুর ধর্ম নয়, সেন্ট পলের ধর্ম; রামের ধর্ম নয়, হনুমানের ধর্ম। তার মধ্যে বীর্য আছে, লাবণ্য নেই।

কিন্তু লাবণ্য নাই থাক, ক্লীবত্ব নেই। প্রচন্ড শীতে যে দেশে দেহের রক্ত হিম হয়ে যায়, দেহকে সে দেশে মায়া বলে কার সাধ্য? দেহরক্ষার জন্যে সে দেশে এত রকমের এত কিছু তোড়জোড় চাই যে, তার আহরণে সামান্য অনবহিত হলে 'দেহরক্ষা' অবশ্যম্ভাবী। সেইজন্যে দেহ থেকে দেহোত্তরে উঠতে, হয় উপনিষদ লিখতে নয় মোহমুদগর লিখতে, ইউরোপের লোক কোনো দিনই পারলে না। দেহের সঙ্গে সঙ্গে মনকে নিয়ত উত্তপ্ত রাখতে যারা ব্যাপৃত, শীতল শান্তির সুযোগ-অবকাশ তাদের দেহ মনের আবহাওয়ায় কই? এদের ভিতরে বাহিরে কেবলই দ্বন্দ্ব কেবলই ব্যস্ততা, এদের মনীষীরা সত্যকে পান দ্বৈরথ সমরে, তাঁদের মনন একটা যুদ্ধক্রিয়া। এদের দেহীরা নিজেদের অভাব মেটায় প্রকৃতির স্তনে দাঁত বসিয়ে, তাদের জীবনধারণ প্রকৃতির ওপর দস্যুতায়। ইউরোপের মাটি বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য দেয় না, বিনা যত্নে তাতে নীবার ধান্য গজায় না, তার ঝরনার জল এত হিমেল যে স্টোভে গরম না-করলে ব্যবহারে লাগে না। বাল্মীকি যদি এদেশে জন্মাতেন তবে ধ্যান করতে বসে বল্মীকে নয়, বরফে ঢেকে যেতেন; বুদ্ধদেব যদি এদেশে জন্মাতেন তবে তপস্যায় বসে কোনো সুজাতার কল্যাণে ক্ষুধাশান্তি করতে পেতেন হয়তো, কিন্তু বেশিক্ষণ খালি গায়ে থাকলে তাঁকে যক্ষ্মা চিকিৎসালয়ের সুজাতাদের শুশ্রূষা গ্রহণ করতে হত।

ইউরোপের সেই নিষ্ঠুরা প্রকৃতিকে মানুষ দেবী বলে পূজা করেনি, কালী বলে তার পায়ের তলায় শব বিছিয়ে দেয়নি, তার বিষদাঁত ভেঙে তাকে নিজের বাঁশির সুরে খেলিয়েছে, তাই একদিন যে ছিল নিষ্ঠুর আজ সে-ই হয়েছে কৌতুকের। তাই বরফ পড়লে কোথায় ভয় পেয়ে ঘরে লুকিয়ে আগুন জ্বালবে, না, মানুষ বেরিয়ে পড়ল বরফের বুকের ওপর পা রেখে কালীয়দমন করতে—স্কেট করতে শী করতে লুজে চড়তে শ্লেজে চড়তে।

সুইটজারল্যাণ্ডের এই পার্বত্য পল্লিটি জেনেভা হ্রদের অনতিদূরে ও অনতিউচ্চে। প্যারিস থেকে লোজান ছাড়িয়ে মিলানের পথে ট্রিয়েস্টের অভিমুখে যে রেলপথটি এঁকেবেঁকে চলে গেছে, এগ্লের কাছে তাকে নীচে রেখে অন্য একটি রেলপথে পাহাড়ের পর পাহাড় উঠতে হয়। এই রেলপথটি শীর্ণকায় এবং এর ট্রেনগুলি ছোটো। পাহাড়ের ওপর ওঠবার সময় পেছনের দিকে ঝুঁকে পড়ে শিশুর মতো হামাগুড়ি দেয়, পোকার মতো মন্থর বেগে চলে। পথের দু-পাশে দু-সারি পাহাড় কিংবা একপাশে পাহাড় ও একপাশে খাদ। দু-পাশে পাইনের বন, বনের ফাঁক দিয়ে ঝরনা ঝরে পড়ছে। পাইনের কাঁচা চুলে পাক ধরিয়ে দিয়েছে বরফগুঁড়ো, ঝরনার পথ রোধ করে দাঁড়াচ্ছে বরফের বাঁধ।

গ্রামটি নিকট হয়ে এলে একটি দু-টি করে 'শালে' দেখা দেয়। 'শালে' (chalet) হচ্ছে এক ধরনের বাড়ি, যেমন আমাদের দেশে 'বাংলো'। বাড়ির আগাগোড়া কাঠের, কেবল ছাদটা হয়তো শ্লেটের এবং ভিতরটা হয়তো পাথরের। প্রত্যেকটির গড়ন স্বতন্ত্র, স্থিতি ছাড়া ছাড়া, আকার বিভিন্ন এবং রঙের সমাবেশ বিচিত্র।

দোচালা ছাদ, ঝুলানো বারান্দা, ছোটো গবাক্ষ, জ্যামিতিক নকশা, রঙিন আলপনা, উৎকীর্ণ উক্তি, দু-তিনশো বছর বয়স—সব মিলিয়ে প্রত্যেকটি এমন একটি বিশিষ্ট দৃশ্য যে একবার চাইলে চোখ আটকে যায়, ফিরিয়ে নেবার সাধ্য থাকে না। দেশটির প্রকৃতি এত সুন্দর, তাতেও মানুষের তৃপ্তি হল না, সে ভাবলে এমন সুন্দর আকাশ এমন সুন্দর পাহাড় এমন সুন্দর বরফ পাইন ঝরনা, দশদিকে এমন অকৃপণ সৌন্দর্য, কিন্তু এর মধ্যে আমি কোথায়? এই ভেবে সে বাইরের সৌন্দর্যের অঙ্গে অন্তরের সৌন্দর্য মাখিয়ে দিলে, সকলের অস্তিত্বের সঙ্গে নিজের অস্তিত্ব জুড়ে দিলে; বিধাতার সৃষ্টি আর মানুষের সৃষ্টি, এ বলে আমায় দ্যাখ, ও বলে আমায় দ্যাখ। তিন dimension-এর ছবির মতো বহুকোণ 'শালে', ধাপে ধাপে লাফ-দিয়ে-নামা পাথর বাঁধানো ঝরনা, বাঁকে বাঁকে ঘুরে-ঘুরে-নামা পাহাড়-কাটা রাস্তা, রাস্তার ধারে ধারে গাছ, রাস্তার স্থানে স্থানে বেঞ্চি, দুশো-তিনশো বছরের বাড়িতেও অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য—বিজলি আলো জলের কল সেন্ট্রাল হিটিং। ইউরোপের লোক যুগোচিত পরিবর্তন বোঝে। সেইজন্যে চার হাজার ফুট উঁচু পর্বতশ্রেণির পিঠে নিরালা একটি ছোট্ট গ্রামে বাস করে কোনো কিছুর অভাববোধ করে না। লেজাঁর পাঁচ-দশ মাইল দূরের দুটি গ্রামে বেড়িয়ে এসেছি, সেসব গ্রামেও কমবেশি এমনই স্বাচ্ছন্দ্য, অস্থায়ী পর্যটকদের জন্যে অন্তত কয়েকটি কাফে তো আছেই।

লেঁজা গ্রামটিতে দু-তিন হাজার লোকের বাস, তাদের বোধ হয় অর্ধেক নানা দিগদেশাগত যক্ষ্মারোগী। ইংরেজ আমেরিকান জার্মান ওলন্দাজ হাঙ্গেরিয়ান রুমেনিয়ান পোর্তুগিজ ইটালিয়ান জাপানি ভারতীয়—কত নাম করব। তাঁদের মধ্যে আমাদের এক বাঙালি ভদ্রলোকও আছেন, তাঁর ভাই 'রমলা'-কার মণীন্দ্রলাল বসু মহাশয় তাঁর তত্ত্ব নেন।

যক্ষ্মা রোগের সৌরচিকিৎসার পক্ষে এই স্থানটির উপযোগিতার কারণ এখানে সূর্যের আলো প্রচুর অথচ তার আনুষঙ্গিক তাপপ্রাচুর্য নেই। শীত ও রৌদ্রের এহেন সমাবেশ অন্যত্র বিরল। পার্বত্য হাওয়া, মুক্ত প্রকৃতি, স্তব্ধ গ্রাম, পাখির গান, পাইনের মরমর, ঝরনার কলকল, বাসি শেফালির মতো অতি আলগোছে মৃদু তুষারপাত। একত্রে এত গুণ কোন শহরের ক-টা গ্রামের আছে? রোগীর জন্যে কেবল প্রাকৃতিক নয়, কৃত্রিম আনন্দেরও বহুল ব্যবস্থা হয়েছে। তাদের জন্যে ছোটো বড়ো বহুসংখ্যক ক্লিনিক; তাদের আত্মীয়দের জন্য বহুসংখ্যক হোটেল, উভয়ের জন্যে দোকান বাজার ডাকঘর ব্যাঙ্ক সিনেমা গির্জা কাফে। বড়ো ক্লিনিক ও বড়ো হোটেলগুলিতে নাচগানের বন্দোবস্ত। যারা দু-তিন বছর একাদিক্রমে শয্যাশায়ী, যাদের পাশ ফিরে শুতেও দেওয়া হয় না, তাদের নিজের নিজের ঘরে গ্রামোফোন বাজছে, কাগজপড়া হচ্ছে, খাবার পৌঁছোচ্ছে, নার্স পরিচর্যা করছে, বন্ধুরা গল্প করছে। নিজের নিজের ঘর থেকে শয্যাসমেত তুলে নিয়ে তাদের সকলকে একঠাঁই একজোট করে দেওয়া হচ্ছে, সেখানে সকলে মিলে গল্প করছে কনসার্ট শুনছে সিনেমা দেখছে এবং তাদের বন্ধু-বান্ধবীদের নাচ উপভোগ করছে।

একটি বড়ো ক্লিনিকের কথা বলি। ক্রিসমাস ট্রি স্থাপন হল, ট্রির ওপরে শতসংখ্যক মোমবাতি জ্বলে উঠল, রোগীদের শয্যাসমেত বয়ে এনে সারি করে সাজিয়ে রাখা গেল, তাদের বন্ধুবান্ধবীরা সারি বেঁধে বসলেন, কনসার্ট চলল, ধর্মোপাসনা হল, প্রসিদ্ধ ফরাসি গ্রন্থকারের স্ত্রী মাদাম দুআমেল আবৃত্তি শোনালেন। নিকোলা বুড়ো সেজে একজন এসে যতগুলি ছেলেমেয়ে সেখানে জুটেছিল তাদের সকলকে এক-একটা উপহার দিলে, সকলের সঙ্গে রঙ্গতামাশা করলে। বাতি নিভল, কনসার্ট থামল, উৎসব শেষ হল, রোগীরা নিজ নিজ ঘরে ফিরলে—অবশ্য ইতিমধ্যে সকলে কিছু পানাহার করলে।

একটি ছোটোদের ক্লিনিকের কথা বলি। ক্রিসমাস ইভে ক্রিসমাস ট্রির শাখায় শাখায় পুতুল ঝুলছে, ইলেকট্রিক আলোর নকল মোমবাতি জ্বলছে, ইংরেজ জার্মান ফরাসি ইটালিয়ান ইত্যাদি নানা জাতের নানাভাষী রুগণ ছেলেমেয়েগুলি এক-একটি শয্যায় দুজন করে শুয়েছে, তাদের আত্মীয়েরা তাদের বিছানার কাছে বসে তাদের আনন্দে যোগ দিচ্ছেন, নার্সেরা পিয়ানো বাজাচ্ছে। প্রেমিক-প্রেমিকা সেজে দুটি সুস্থ ছেলেমেয়ে গীতাভিনয় করলে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে দুটি রুগণ ছেলেমেয়েতে ডুয়েট হল, দুজন নার্স

ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলা সেজে রঙ্গ করলে। ছেলেরা নিকোলা বুড়োর জন্যে অধীর হয়ে উঠল। একটি নার্স এল নিকোলা বুড়ো সেজে, 'নিকোলা এসেছে' 'ওই রে নিকোলা' 'নিকোলা...নিকোলা' করে শোরগোল পড়ে গেল, প্রত্যেকের জন্যে নিকোলা কত উপহার বয়ে এনেছিল, বিছানায় শুয়ে শুয়ে প্রত্যেকে উপহারের ভারে চাপা পড়তে লাগল, কত রকমের খেলনা, কত রকমের ছবির বই; একজনের একটা খুদে গ্রামোফোন এনেছিল, সেটা বের করে সেএকটা খুদে রেকর্ড চড়িয়ে দিলে, সকলের তাক লেগে গেল! এতজনের এত উপহার এসেছিল যে স্বয়ং ক্লিনিকের কর্ত্রী এসে নিকোলার সাহায্য করতে লাগলেন, নার্সেরা ছুটোছুটি করে যার উপহার তার বিছানায় পৌঁছে দিতে লাগল, কারও উপহারের পর উপহারই পৌঁছোচ্ছে, কারও দেরি হচ্ছে, সে বেচারা পরের উপহার নাড়াচাড়া করে সান্ত্বনা পাচ্ছে।

বৎসরের শেষ রাত্রের উৎসব (Sylvester) সেই বড়ো ক্লিনিকে। রোগীরা সেই হলে সমবেত। প্রত্যেকেই একটা-না-একটা ফ্যান্সি পোশাক পরে এসেছে। যে রোগী দু-তিন বছর এক শয্যায় সর্বদা শুয়ে রয়েছেন তাঁরও কত শখ, তিনি রেড ইন্ডিয়ানের মতো মাথায় পালক পরেছেন, কিংবা নকল দাড়ি গোঁফ পরচুলা লাগিয়েছেন। বন্ধু-বান্ধবীরাও সেজে এসেছেন। কেউ সেজেছেন দাঁড়কাক, কেউ সেজেছেন মুসলমানি, কেউ অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসি অভিজাত, কেউ রঙিন কাপড়পরা স্পেন দেশের পল্লিবাসিনী। বন্ধু-বান্ধবীদের নাচ হচ্ছে, ব্যাণ্ড বাজছে, নারীতে-পুরুষে বাহু ধরাধরি করে তালে তালে পা ফেলছে। বাজনার সুরটা এমনই যে যারা নাচছে না তাদেরও পা নেচে নেচে উঠছে। দুআমেল বললেন, নাচের বাজনার থেকে ইউরোপীয় সংগীতের বিচার করবেন না। দুআমেল আত্মস্থ প্রকৃতির স্বল্পভাষী সুপুরুষ, তাঁর Civilization গ্রন্থখানা ফ্রান্সের সুপ্রসিদ্ধ Goncourt prize পেয়েছে।

অনেকক্ষণ ধরে নাচ চলল, মাঝে মাঝে থেমে থেমে। তারপর রোগীদের খাটের কাছে বসে তাদের বন্ধু-বান্ধবীদের পানাহার ও রোগীদের শুয়ে শুয়ে যোগদান। রাত বারোটায় বছর বদলাল, দলে দলে গান গেয়ে উঠল, গ্লাসে গ্লাস ঠুকিয়ে নববর্ষের স্বাস্থ্যকামনা করলে। পানাহার শেষে আবার নাচ। ইতিমধ্যে ফ্যান্সি পোশাকের উৎকর্ষ বিচার করে যে কয়জনকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল দাঁড়কাক তাঁদের মধ্যে প্রথম।

এমনি করে ইউরোপীয়রা রোগশোককে তুচ্ছ করে, খেলার দাপটে জরাকে ভাগিয়ে দেয়। একাদিক্রমে তিন বছর এক শয্যায় শায়িত থাকা কী ভয়ানক দুর্ভোগ তা সুস্থ মানুষে কল্পনা করতে পারবেন না। এ সত্ত্বেও রোগীদের মুখে হাসি, তাদের আত্মীয়দের মুখে ভরসা, তাদের সেবিকাদের মুখে আশ্বাসনা। মৃত্যুর কাছে ব্যাধির কাছে জরার কাছে কিছুতেই হার মানব না, তালি দিয়ে গান গেয়ে হালকা তালে নেচে যাব—এই হল ইউরোপের পণ। অনাদ্যন্ত জীবনপ্রবাহে জরা ব্যাধি মৃত্যুর কতটুকুই-বা স্থান, সেই স্থানকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা কত সহস্র বৎসর ধরে বৈরাগ্য চর্চা করে আসছি। আমাদের সন্ধান সংসার হতে মুক্তি, জীবনশিখার নির্বাণ। আমাদের সাধনা দুঃখকে এড়িয়ে চলবার সাধনা, নিজেকে নিশ্চিন্ত করবার সাধনা। বুদ্ধ-শংকর-রামকৃষ্ণ কেউ তো বলেননি, 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাহি।'

স্ত্রী-পুরুষের মিলিত নাচ ব্যাপারটাকে আমরা কুনীতিকর ভেবে থাকি, ইউরোপীয়রা ভাবে না। ইউরোপে প্রতিদিন নতুন নাচের আমদানি ও উদ্ভাবন চলেছে, নাচ না হলে ওদের উৎসবই হয় না। স্বাস্থ্যবান সমাজ মাত্রেই মিলিত নৃত্যের চলন আছে; আমাদের দেশের সরলপ্রকৃতি আদিমদের নাচ কত স্থানে দেখেছি, তা দেখে কুনীতির কথা মনেই ওঠেনি। অনাদিকাল থেকে যেসব সমাজে উৎসব তিথিতে স্ত্রী-পুরুষের যৌথনৃত্য প্রচলিত রয়েছে ও আশৈশব যারা একত্র নাচতে অভ্যস্ত হয়েছে, পরস্পরের অঙ্গ স্পর্শ করলে তাদের চিত্তবিক্ষেপ না-হবারই কথা। আমাদের দেশে নারী ও পুরুষ দুই স্বতন্ত্র জগতে বাস করেন, নিজের নিকট আত্মীয়-আত্মীয়া ছাড়া এত বড়ো সমাজের যত পুরুষ যত নারী সকলেই পরস্পরের কাছে অলক্ষ অস্পর্শ্য। তার ফলে নীতির দিক থেকে অস্বাস্থ্যকর কৃত্রিম কৌতূহলের সৃষ্টি ও রুচির দিক থেকে জন্মান্ধতার উদ্ভব। আমাদের রূপবোধের একদেশদর্শিতা স্পর্শবোধের অস্বাভাবিক বুভুক্ষা আমাদের সমাজকে তো ক্লীবত্বের অচলায়তন করেছেই, আমাদের সাহিত্যকেও খণ্ডিত (repressed) রিরংসার ব্যবচ্ছেদাগার করে তুলছে।

বিচিত্র রূপ দেখতে দেখতে, বিচিত্র গীত শুনতে শুনতে, বিচিত্র স্পর্শ পেতে পেতে মানুষের সৌন্দর্যচেতনা বাড়ে; মানুষ সৌন্দর্যবিচারক হয়; এসবের সুযোগ আমাদের সমাজে বিরল বলে আমাদের চিত্রকলা সংগীতকলা ভাস্কর্যকলা মাথা তুলতে পারলে না, আমাদের পোটোরা কেবল দু-দশটি টাইপের নারীমূর্তি আঁকেন, আমাদের অভিনেত্রীরা অবিদগ্ধা বাইজি আর ভাস্কর্য আমাদের নেই। চিত্রকরের যেমন জীবন্ত মডেল দরকার ভাস্করেরও তেমনি। আমাদের ছবিই বলো কাব্যই বলো গল্পই বলো এমন ফিকে এমন অবাস্তব এমন এক ছাঁচে ঢালা হবার কারণ কি এই নয় যে আমাদের সমাজে একটা সেক্স সম্বন্ধে আরেকটা সেক্স একান্ত স্বল্পচেতন?

বল রুমের নাচ উঁচুদরের কেন কোনো দরেরই আর্ট নয়। ওটা হচ্ছে সামাজিকতার একটা অঙ্গ, সমাজের দশজন পুরুষের সঙ্গে দশজন নারীকে পরিচিত করে দেবার একটা উপায়। যে সমাজে নিজের স্বামী বা নিজের স্ত্রী নিজেকে অর্জন করতে হয় সে সমাজে এই প্রকার পরিচয়ের সুযোগ থাকা আবশ্যক। এমন সমাজে প্রতি পুরুষের পৌরুষের ওপরে সর্বনারীর নারীত্বের দাবি যেমন প্রতি পুরুষকে বলবান প্রিয়দর্শন ও সুগঠিতদেহ হতে প্রেরণা দেয়, প্রতি নারীর নারীত্বের ওপর সর্বপুরুষের দাবি তেমনি প্রতি নারীকে রূপবতী স্বাস্থ্যবতী ও সুগঠিতদেহ হতে প্রেরণা দেয়। সর্বপুরুষের ভিতর থেকে বিশেষ করে একটি পুরুষের দাবি এবং সর্বনারীর ভিতর থেকে বিশেষ করে একটি নারীর দাবি বলবানকে করে প্রেমবান ও রূপবতীকে করে প্রেমবতী। পুরুষের সাধনা সকলকে এড়িয়ে কেবল একটি নারীর জন্যে নয়, সকলকে ছাপিয়ে বিশেষ একটি নারীর জন্যে। নারীর সাধনা সকলকে বাদ দিয়ে কেবল একটি পুরুষের জন্যে নয়, সকলকে স্বীকার করে বিশেষ একটি পুরুষের জন্যে। ইউরোপের পুরুষ একটি নৈর্ব্যক্তিক স্বামী হয়ে সুখ পায় না, সে স্বয়ংবর সভার জেতা। ইউরোপের নারীও একটি নৈর্ব্যক্তিক স্ত্রী হয়ে সুখ পায় না, সে বহুর মধ্যে বিশিষ্টা।

এ সমস্ত বাদ দিয়ে বলরুমের নাচ একটা কসরত এবং অবসর বিনোদনের একটা উপায়। ইউরোপীয় স্ত্রী-পুরুষের পা অত্যন্ত স্থূল পুষ্ট মাংসপেশিবহুল। নৃত্যকালে পরস্পরের হাত উঁচু করে ধরার ফলে বাহুরও রীতিমতো চালনা হয়। পুরুষের পক্ষে কসরতটা কিছু বেশি, কারণ সঙ্গিনীটি যদি গুরুভার হয়ে থাকেন তো সঙ্গিনীকে মোড় ফেরাবার সময় বাহুবলের অগ্নিপরীক্ষা হয়ে যায়।

বলরুম নাচের বিরুদ্ধে আমাদের দেশে নৈতিক আপত্তি শুনতে পাই। যে দেশে পরপুরুষ বা পরনারীকে চোখে দেখলে পাপ হয় ও ছোটোভাইয়ের স্ত্রীকে বড়োভাইয়ের দেখা নিষেধ, যে দেশের পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে বয়স্ক ভাইয়ের সামনে বয়স্কা বোনকে ঘোমটা দিতে হয়, সে দেশের লোক অনাত্মীয়ের সঙ্গে অনাত্মীয়ার মৌখিক আলাপেই যখন বিভীষিকা দেখে তখন দৈহিক সংঘর্ষে যে নরক দেখবে এর সন্দেহ নেই। যদি বলি ব্যাপারটা এত নির্দোষ যে ভাই-বোন বাপ-মেয়ে ও মা-ছেলে পর্যন্ত হাত ধরাধরি করে সকলের সামনে নাচে তবে হয়তো 'উলটো বুঝলি রাম' হবে, এদেশের পিতৃত্ব মাতৃত্ব সৌভ্রাত্রের ওপরেও সন্দেহ পড়বে। মানবচরিত্রের প্রতি যাদের সশ্রদ্ধ বিশ্বাস আছে আমাদের দেশের সেই সকল ব্যক্তিকে মনে করিয়ে দিই—মিলিত নাচ সরল প্রকৃতি আদিমদের মধ্যেও আছে এবং ইউরোপীয়রা যখন আদিম ছিল সেই সময় থেকে তাদের মধ্যে চলিত হয়ে আসছে। এটা তাদের সংস্কারগত এবং কচিবয়স থেকে বালক-বালিকা মাত্রেই এর অনুশীলন করতে শেখে। মানুষকে যাঁরা গ্রিন হাউসে পুরে সতী বা যতি বানাতে চান সেসব নীতিনিপুণদের বললে হয়তো বিশ্বাস করবেন না যে এদেশেও সতী ও যতির অপ্রতুল নেই, কিন্তু সমাজের ফরমায়েশে নয়, অন্তরের নিয়মে।

ক্লিনিকের কথায় নাচের কথা উঠল, পাঁসিআঁর কথায় খাওয়ার কথা বলি। আমাদের পাঁসিআঁতে (একটু ঘরোয়া ধরনের হোটেলকে ফরাসিতে পাঁসিআঁ বলে) আমরা অনেক দেশের লোক থাকতুম, যখন খাবার ঘণ্টা পড়ত তখন খাবার টেবিলে যারা সমবেত হতুম তাদের মধ্যে মণিদা ও আমি বাঙালি, অন্যদের কেউ আমেরিকান, কেউইংরেজ, কেউ জার্মান, কেউ হাঙ্গেরিয়ান, রুমেনিয়ান ফিন, ইটালিয়ান, ওলন্দাজ। এতগুলি জাতের লোক একসঙ্গে একঘণ্টা বসলেই নান দেশের কথা ওঠে। রাজনীতি অর্থনীতি আর্ট সমাজ ধর্ম সকল

বিষয়ে আলোচনা চলে। আলোচনার ফাঁক দিয়ে জাতির স্বভাব ধরা পড়ে যায়, আন্তর্জাতিক জানাশোনা হয়; ফরাসিরা দেখে জার্মান মাত্রেই শয়তান নয়, আমেরিকানরা বোঝে ক্যাথরিন মেয়োর বর্ণনার সঙ্গে এই দুটি হিন্দুর মেলে না। সভাসমিতিতে সব দেশের লোক ততটা অন্তরঙ্গ ভাবে মিশতে পারে না যতটা মেশে খাবার টেবিলে। এই সত্যটা জানা থাকলে আমরা হিন্দু-মুসলমানে জনসভা না-করে জনভোজ করতুম এবং ব্রাহ্মণের ডান দিকে মুসলমানকে ও বাঁ-দিকে নমঃশূদ্রকে আসন দিয়ে দুটো মহাসমস্যার মীমাংসা দুটো দিনেই করতুম।

পরিবারের বড়ো-ছোটোতে মিলে এক টেবিলে খাবার সময় ছোটোরা বড়োদের কথা কান পেতে শোনে ও বড়োদের রীতি চোখ বুলিয়ে দেখে। আমরা যা বই পড়ে বা মাস্টারের উপদেশে শিখি এরা তা খেতে খেতেই শেখে। আমেরিকার মহিলাটির সঙ্গে জার্মানির মার্ক-মুদ্রার বিনিময় হার সম্বন্ধে কথা হচ্ছে, তাঁর বালিকা মেয়ে দুটি তা সাগ্রহে শুনছে ও সে-বিষয়ে প্রশ্ন করছে, অথচ এক্সচেঞ্জের মতো দুরূহ বিষয় যে কী, তা আমরা মা-র কাছে শেখা দূরে থাক বিএ ক্লাসের অধ্যাপক মহাশয়ের কাছে শুনেও সহজে বুঝে উঠতে পারিনে, কারণ আমাদের ঘরে ও বিষয়ে চর্চা নেই, আমাদের সমাজ বলতে কেরানি, উকিল, ডাক্তার, ইস্কুলমাস্টারের সমাজ। আমেরিকান মহিলাটি যে বেশ একজন বিদুষী তা নয়, সম্ভবত তিনিও ওসব শুনতে শুনতে শিখেছেন নিজের ঘরের ব্রেকফাস্ট টেবিলে সকলে মিলে দৈনিক পত্র পড়তে পড়তে কিংবা পরের ঘরের চায়ের টেবিলে জাহাজের ব্যাপারীদের সঙ্গে আলাপ করতে করতে। কেবল কি টাকাকড়ির কথা? ভালো-মন্দ দরকারি-অদরকারি হরেক রকমের অনেক তথ্য অনেক গুজব এবং অনেক মিথ্যাই মগজে জমিয়েছেন। জার্মান মহিলাটির স্বামী ডাক্তার, আত্মীয়েরা কেউ চিত্রকর, কেউ যোদ্ধা, কেউ ব্যবসাদার। তাঁদের সঙ্গে কথা কয়ে তাঁর নিজের শিক্ষাও ঘরে ঘরে যতটা হয়েছে স্কুলে ততটা হয়নি এবং ছবি ও গান সম্বন্ধে তিনি যেরকম রসগ্রাহিতার পরিচয় দিলেন আমাদের দেশের কোনো ডাক্তারের স্ত্রী সেরকম পারতেন না। তবে স্কুলেও যে এঁরা কেবল পড়েন না সেকথাও জানিয়ে রাখতে চাই। এঁদের প্রতি স্কুলে সংগীতশিক্ষা আদিষ্ট, প্রতি স্কুলে কলেজে প্রতি সপ্তাহে নাচের আয়োজন আছে, স্কুল থেকে এঁরা প্রত্যেকেই দুটো-একটা বিদেশি ভাষা শিখে রাখেন এবং প্রত্যেকেই কয়েকটা গৃহশিল্পের ট্রেনিং পান। ফরাসি ইংরেজি ও জার্মান এই তিনটে ভাষা ব্যবসা বা সামাজিকতার খাতিরে ইউরোপের মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রত্যেক স্ত্রী-পুরুষই অল্পবিস্তর জানেন এবং জানবার প্রধান সুযোগ পেয়েছেন নানা দেশে বেড়াবার সময় নানা দেশের লোকের সঙ্গে কাফেতে রেস্তরাঁয় হোটেলে এক টেবিলে বসে আড্ডা দিতে দিতে। এহেন আড্ডার পক্ষে সুইটজারল্যাণ্ড যেমন অনুকূল তেমন আর কোনো দেশ নয়।

ওই তো ছোট্ট একটুখানি দেশ, ওর লোকসংখ্যা ছত্রিশ লক্ষ, আয়তন আমাদের ছোটোনাগপুরের মতো হবে, তবু টুরিস্টদের দৌলতে এবং ঘড়ি ও চকোলেট বিক্রি করে ওদেশ বড়োমানুষ। ওইটুকু দেশে তিন-তিনটে ভাষা আর দু-দুটো ধর্ম চলিত, অথচ ওর ঐক্য ইতিহাসবিশ্রুত।

সুইটজারল্যাণ্ডের প্রত্যেক শহরে টুরিস্টদের জন্যে হোটেল পাঁসিঅঁ কাফে আর ব্যাঙ্ক ডাকঘর ঔষধালয় তো আছেই, প্রত্যেক স্থানে তাদের খেলার বন্দোবস্ত ও বাজারের আয়োজন আছে। সমগ্র দেশটাই যেন টুরিস্টদের জন্যে তৈরি একটা বিরাট পান্থশালা।

পৃথিবীর প্রত্যেক দেশই এখন বিজ্ঞাপন দিয়ে অন্যান্য দেশের টুরিস্টদের ডাকছে এবং দেশ দেখিয়ে তাদের পকেট হালকা করছে। ভারতবর্ষ যদি সুইটজারল্যাণ্ডের মতো উদ্যোগী হত ভারতবর্ষের দারিদ্র্য ঘুচত। কিন্তু ভারতবর্ষের এক প্রদেশের লোকই আরেক প্রদেশে সমাজ পায় না, ইউরামেরিকার টুরিস্টদের সমাজ দেবে কে? তারা যদি ইউরোপীয় হোটেলেই থাকে ইউরোপীয়দের সঙ্গেই খায় ইউরোপীয়দের সঙ্গেই খেলে ও ইউরোপীয়দের সঙ্গেই আড্ডা দেয় তবে তাদের অর্থে ভারতবাসী ধনী হবে না এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে ধারণা নিয়ে তারা দেশে ফিরবে সে ধারণা আমাদের অনুকূল হবে না। এবং দু-দশটা মুসলমান বাবুর্চি হিন্দু দোকানদার ও ফিরিঙ্গি আয়া দেখে যদি তারা ভারতবর্ষের লোক সম্বন্ধে বই লেখে তবে সে বইয়ের

দেশব্যাপী প্রতিবাদ করলেই আমাদের কাজ ফুরাবে না। আমাদের সমাজের সত্যিকার পরিচয় তারা পাবে কী করে? সে যে অভিমন্যুর ব্যূহের উলটো, তার মধ্যে তাদের প্রবেশপথ কোথায়? ইউরোপের এক দেশের সমাজের সঙ্গে অন্য দেশের সমাজের মিল আছে, ভাষা জানা থাকলে এক সমাজের লোক আর এক সমাজে মিশে যেতে পারে; জাতীয় সংস্কার স্বতন্ত্র হলে কী হয়, সামাজিক আচার সর্বত্র প্রায় এক। এই বৈচিত্র্যহীনতা অনেকসময় মনকে পীড়া দেয়। আমেরিকান মহিলাটি বললেন, তিনি আমেরিকা থেকে ইউরোপে এসে নতুন কিছু দেখবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু এই যান্ত্রিকতার যুগে সমস্তই এমন এক ছাঁচে ঢালা যে ইউরামেরিকার সব দেশের পুরুষের একই পোশাক, সব দেশের নারীর একই পরিচ্ছদ—স্থলে স্থলে এমনকী একই প্যাটার্নের একই রঙের একই ভঙ্গির। কোনো লিগ অব নেশনস ফতোয়া দিয়ে এত দেশের এতগুলো মানুষকে একইরকম সাজ করতে বলেনি, কোনো মিশনারি এ বিষয়ে প্রচারকার্য করেননি, তবু কেমন করে যে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ইউরোপের রুমানিয়া অবধি প্রায় প্রতি নারীই কবরী ছেঁটে স্কার্ট ছেঁটে জামার হাত কেটে পূর্ব নারীদের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ সাজলে, সেই এক আশ্চর্য! অথচ সর্বত্র পুরুষ তার পূর্বপুরুষের মতোই জবরজং সাজে বিদ্যমান, ক্যালিফোর্নিয়া থেকে রুমনিয়া অবধি তেমনি কোট ট্রাউজার্স টুপি ওভারকোট। অবশ্য ইতরবিশেষ আছে, তবু মোটামুটি বলতে গেলে সর্বত্র হোটেলমূলক সভ্যতা, গির্জামূলক ধর্ম, নাচঘরমূলক সমাজ এবং খাটা, খেলা, খাওয়া নামক ত্রিনীতি। এহেন সমাজে খাপ খেয়ে যেতে বেশি কষ্ট হয় না, এমনকী আমরা বাইরের লোকও অল্পায়াসেই এ সমাজের মধ্যে স্থান পেতে পারি।

লেঁজার পর্বতমালার নীচে জেনেভা হ্রদকে বেষ্টন করে অগণ্য পল্লি, কিন্তু তাদের প্রত্যেকটাই টুরিস্টদের জন্যে হোটেলে দোকানে ছাওয়া। এমনই এক পল্লিতে রম্যাঁ রল্যাঁ থাকেন, মণিদা ও আমি একদিন তাঁর সঙ্গে চা খেয়ে এলুম।

রল্যাঁর কুটিরটির একদিকে হ্রদ অপর দিকে পর্বত। হ্রদের শাড়িটির পাড় ধরে যেমন পর্বতের পর পর্বত চলে গেছে, হ্রদের জল থেকে সোপানের মতো তেমনি পর্বতের ওপর পর্বত উঠে গেছে। হ্রদের কূলে কূলে পর্বতের মূলে মূলে পল্লির পর পল্লি। রল্যাঁদের পল্লিটির নাম Villeneuve, আর রল্যাঁর কুটিরটির নাম Villa Olga।

ভিলনভের অদূরে Chateau de Chillon নামক দ্বাদশ শতাব্দীর একটি প্রসিদ্ধ দুর্গ। বায়রনের কাব্যে এর বর্ণনা আছে, Bonnivard-কে এখানে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। দুর্গটির তিন দিকে জল, এক দিকে পর্বত। Bonnivard-এর কারাকক্ষটির গবাক্ষ থেকে যতদূর চোখ যায় কেবল জল আর আকাশ, আর উভয়ের হস্তগ্রন্থির মতো দিগবলয়। দেহকে যারা বেঁধেছিল কতটুকুই-বা তারা বেঁধেছিল! আসল মানুষটি যে চোখের ফাঁক দিয়ে সারাক্ষণই ফাঁকি দিত। বরং বন্দি ছিল তাঁর প্রহরীটা।

ভিলা অলগার একপাশে Hotel Byron নামক বৃহৎ হোটেল। রল্যাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে রবীন্দ্রনাথ নাকি এইখানে ছিলেন।

রল্যাঁর কুটিরটির বাহিরটা নিঃস্ব। দেখলে প্রত্যয় হয় না যে এত বড়ো একজন সাহিত্যিক এরকম একটা অসুন্দর ছোটো জরাজীর্ণ 'শালে'-তে থাকেন। কিন্তু ভিতরটি সাজানো—বসবার ঘরে বই ভরা শেলফ, বই-ছড়ানো টেবিল, ফুলের সাজি, ফুল গাছের টব, দেয়ালে দেয়ালে ছবি ও দেয়াল-জোড়া পিয়ানো।

রল্যাঁর সক্ষাৎ পাবার পরমুহূর্ত পর্যন্ত মনেই জাগেনি যে তাঁর ঘরের অন্তর বাহির তাঁর নিজের অন্তর বাহিরের প্রতিরূপক!

দীর্ঘদেহ ন্যুব্জপৃষ্ঠ মানুষটি, মুখখানি লাজুকের মতো ঈষৎ নত, মুখের গড়ন উলটো-করে-ধরা পেয়ার ফলের মতো চওড়া সরু উঁচু-নীচু। প্রশস্ত উন্নত ললাট, সুদীর্ঘ শানিত নাসা, ক্ষুধিত শীর্ণ কপোল, উদগ্র সংকীর্ণ চিবুক। চোখ দুটিতে কতকালের ক্লান্তি, হরিণশিশুর নিরীহতা। ওষ্ঠে গান্ধীর চেয়েও সরল হাসি, বেদনায় পান্ডুর। সাদাসিধে পোশাক; নীলকৃষ্ণ সুট, টাই নেই, পাদরিসুলভ কলার। এক হাতে দারিদ্র্যের সঙ্গে অন্য হাতে অসত্যের সঙ্গে জীবনময় যুদ্ধ করে এসেছেন, তবু ক্ষান্তি নেই, কঠিন খাটছেন; সকাল বেলাটা শুয়ে শুয়ে লেখেন। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের জীবনী রচনায় এমন ব্যাপৃত যে, *L'ame Enchantee* (মন্ত্রমুগ্ধ আত্মা)-র চতুর্থ ভাগ এখনও লেখা হয়ে উঠল না।

মণীন্দ্রলাল বসুর *পদ্মরাগ*-এর সুখ্যাতি করলেন, Wagner-কৃত জার্মান অনুবাদ পড়েছিলেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *শ্রীকান্ত*-এর ভূয়সী প্রশংসা করে তাঁর সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রকাশ করলেন। *শ্রীকান্ত*-এর ইটালিয়ান অনুবাদ হয়েছে, ফরাসি অনুবাদ হচ্ছে। দিলীপকুমার রায়ের কণ্ঠে ভারতীয় সংগীত শুনে প্রীত হয়েছেন, মধ্যযুগের ইউরোপীয় ধর্মসংগীতের সঙ্গে তার সাদৃশ্য লক্ষ করেছেন, কিন্তু মধ্যযুগের পরে উভয় সংগীতের ধারা বিভিন্ন পথে প্রবাহিত হওয়ায় ভারতীয় সংগীতের সঙ্গে আধুনিক ইউরোপীয় সংগীতের বহুদূর ছাড়াছাড়ি ঘটে গেছে, এখনকার ইউরোপ ও-সংগীত গ্রহণ করবে কি না নিশ্চয় করে বলতে পারলেন না।

এতক্ষণ সহজভাবে কথা বলছিলেন আপনার লোকের মতো ঘরোয়াভাবে মৃদুমিষ্ট হেসে। যেই ভাবী যুদ্ধের সম্ভাবনার প্রসঙ্গ উঠল অমনি উত্তেজিত হয়ে পড়লেন রাজা লিয়ারের মতো। নির্বাণোম্মুখ শিখার মতো স্তিমিত নেত্রে আবেগ জ্বলে উঠল। দক্ষিণ হস্ত আবেগে উঠতে-পড়তে লাগল বেগময়ী ভাষার সঙ্গে তাল রেখে। তন্ময় হয়ে চেয়ার থেকে সরে সরে এসে খসে পড়েন বুঝিবা। গত মহাযুদ্ধের প্রারম্ভ থেকে তাঁর হৃদয়ের এক স্থলে একটি ক্ষত আছে, সেই ক্ষতটিতে আঙুল ছোঁয়ালে যাতনায় অধীর হয়ে ওঠেন।

প্রতীতির সহিত বললেন, নেশনরা যতদিন-না ঠেকে শিখছে যে এক নেশনের ক্ষতিতে সব নেশনের ক্ষতি, যুদ্ধ ততদিন থাকবেই। কাতর স্বরে বললেন, মানুষের ইতিহাসে যুদ্ধের দেখছি অবসান হল না! তবু অসীম ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখলে আশার আমেজ থাকে। উদ্দীপ্ত হয়ে বললেন, আলো জ্বালান, আলো জ্বালান; দিকে দিকে আলো জ্বালিয়ে তুলুন। যুদ্ধের প্রতিষেধ শিক্ষা।

শিক্ষা সম্বন্ধে আর্টিস্টের কর্তব্য নিয়ে কথা উঠল। আর্টিস্ট কি কেবল চিরকালের সৌন্দর্য সৃষ্টি নিয়েই থাকবে না স্বকালের সমস্যা সমাধানেও সাহায্য করবে? বললেন, দুই-ই করবে। সকল যুগের জন্য কিছু, নিজের যুগের জন্যে কিছু। মানুষের মধ্যে একাধিক আত্মা আছে; কোনোটার কাজ আর্টের পূজা, কোনোটার কাজ সমাজের সেবা। যে-মানুষ আর্টিস্ট সে-মানুষ কেবল আর্ট চর্চা করে ক্ষান্ত হবে না, সে ভালোর স্বপক্ষে ও মন্দের বিপক্ষে প্রোপাগাণ্ডা করবে, ভলতেয়ার ও জোলার মতো অন্যায়ের বিরুদ্ধে মসিযুদ্ধ চালাবে। এরজন্যে যে তার যুগোত্তর সৃষ্টির ক্ষতি হবে এমন নয়, কেননা তার যুগোত্তর সৃষ্টির ভার তার যে-আত্মাটির হাতে সে-আত্মাটি কিন্তু সর্বক্ষণ সজাগ নয়।

মানুষের একাধিক আত্মা আছে একথা রল্যাঁর রচনার অনেক স্থলেই পড়েছি, তবু মানুষের অখন্ড ব্যক্তিত্বটাকে এমন খন্ড খন্ড করে দেখার প্রস্তাবে মন সায় দিলে না। তা ছাড়া সমস্যা তো প্রতি যুগেই আছে, প্রতি যুগেই থাকবে, সেজন্যে ভাববার ও খাটবার লোকও যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। আর্টিস্ট তাঁদের কাজ কেড়ে নেবে কেন? তাঁদের বাহন হবে কেন? বিশুদ্ধ আর্টের দেবী কি বড়ো সহজ দেবী? অসপত্ন পূজা না পেলে কি তিনি বরদান করেন? কালিদাসের যুগের সমস্যার জন্যে কালিদাস কী করেছিলেন? গ্যেটের যুগের সমস্যার জন্যে গ্যেটে কী করেছিলেন? জিজ্ঞাসা করলুম, শেক্সপিয়ারের যুগেও তো সমস্যা ছিল, তাঁর সৃষ্টিতে তার ছায়া দেখিনে কেন? তাঁর স্বকালের প্রতি তাঁর দায়িত্ব দেখিনে কেন? উত্তরে বললেন, কিছু কিছু দেখি বই কী। কিন্তু তাঁর যুগে হয়তো এ-যুগের মতো বড়ো কোনো সমস্যা ছিল না।

মন না মানলেও প্রতিবাদ করলুম না। এই যথেষ্ট যে, আর্টিস্টকে রল্যাঁ দেশকালের অনুরোধে বিশুদ্ধ আর্ট চর্চা মুলতুবি রাখতে বলছেন না, বিসর্জন দিতে বলছেন না, বলছেন শুধু তাই করে নিরস্ত না হতে, তাতেই আবদ্ধ না রইতে। রুশ নায়কদের মতো ফরমায়েশ দিচ্ছেন না যে, 'হে আর্টিস্ট, তুমি যূথের মনোরঞ্জন করো, যূথতন্ত্রের জয়গান করো, বলো বন্দে যূথম'; কিংবা ভারতনায়কদের মতো ফতোয়া দিচ্ছেন না যে, 'ঘর যখন পুড়ে যাচ্ছে তখন হে কবি, তোমার কাব্যবিলাস ছাড়ো, ফায়ার বিগ্রেডে ভরতি হও, নেহাত যদি তা না পার তো অন্যদের কর্তব্য সচেতন করতে সব রস ছেড়ে কেবল ঝাল রসের কবিতা লেখো।' তিনি যা বলছেন তার মর্ম এই যে, মানুষের সমস্তটা যখন আর্টিস্ট নয় তখন বিশুদ্ধ আর্ট সৃষ্টির অবসরে সে অপর কিছুও করতে পারে, এবং যেহেতু তার অস্ত্র হচ্ছে লেখনী কিংবা তুলিকা সেহেতু তারই সাহায্যে সে ধর্মযুদ্ধ করলে ভালো হয়। এইটে লক্ষ করবার বিষয় যে, তিনি আর্টিস্টকে অন-আর্টিস্ট হয়ে যুগ-ঋণ শোধ করতে বললেও অন-আর্টকে আর্ট বলেননি, প্রোপাগাণ্ডাকে আর্টের থেকে পৃথক করে ষত্ব-ণত্ব জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন।

কথায় কথায় বললেন, টাকার জন্যে আর যা-ই করুন বই লিখবেন না। টাকার জন্যে অন্য খাটুনি, আনন্দের জন্যে বই-লেখা। তাঁর নিজের যৌবনে তিনি দারিদ্র্যদায়ে শিক্ষকতা করেছেন, আরও কত কী করে স্বাস্থ্য হারিয়েছেন, কষ্টার্জিত স্বল্প পরিমিত অবসর সময়কে ফাঁকি দিয়ে সরস্বতীর সেবা করেছেন, কিন্তু সরস্বতীকে ফাঁকি দিয়ে লক্ষ্মীর সেবা করেননি।

সমাজের প্রতি আর্টিস্টের দায়িত্ব প্রসঙ্গে বললেন, প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য কিছু করে কায়িক শ্রম করা। আর্টিস্টও যখন ব্যক্তি তখন আর্টিস্টেরও এই কাজ করা উচিত।

ম্যাদলিন রল্যাঁ টিপ্পনী দিলেন, স্বয়ং কায়িক শ্রম করবার অবসর পাননি বলে রল্যাঁর একটা আক্ষেপ থেকে গেছে; তাঁর শরীর ভেঙে পড়বার ওটাও একটা কারণ।

কিন্তু যে-মানুষ জগৎকে জাঁ ক্রিস্তফ দিতে পারেন সে-মানুষের শক্তি কায়িক শ্রমে অপচিত হলে কি জগৎ ক্ষতিগ্রস্ত হত না? আর্টিস্ট যদি কায়িক শ্রমে হাত দেয় তো 'ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টে'র আশঙ্কা থাকে না কি?

ম্যাদলিন রল্যাঁ বললেন, এমন কোনো কথা নেই। এই যে তিনি অর্থাভাবে ছেলে পড়িয়ে সময় ক্ষয় করতে বাধ্য হলেন, এর বদলে যদি কায়িক শ্রম করলে চলত (অর্থাৎ অন্নবস্ত্রের জন্যে আবশ্যক অর্থ জুটত) তবে তাঁর স্বাস্থ্যের এ দশা হত না, তিনি আরও কত সৃষ্টি করতে পারতেন। তা ছাড়া তাঁর বিশ্বাস এই

আত্যন্তিক স্পেশালিজেশনের যুগে সর্বমানবকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত রাখবার জন্যেও একটা কিছু দরকার, নইলে ঊর্ধ্বশ্রেণির মানুষ নিম্নশ্রেণির মানুষকে বুঝবে কী সূত্রে? যারা গতর খাটিয়ে খায় তাদের উপর থেকে যারা মাথা খাটিয়ে খায় তাদের অবজ্ঞা ঘুচবে কী করে?

বুঝলুম মহাত্মাজির সর্বভারতীয় যোগসূত্র যেমন চরকা, রল্যাঁর সর্ব-মানবিক মিলনসূত্র তেমনি কায়িক শ্রম। উভয়ের মনের এই ভাবটি টলস্টয়ের সুরে বাঁধা। শ্রমীদের ওপরে বিশ্রামীদের পরগাছাবৃত্তি পৃথিবীসুদ্ধু মানবপ্রেমিককে ভাবিয়ে তুলেছে। সমাজের যেসব দাস-মক্ষিকা এত যুগ ধরে সমাজের রানি-মক্ষিকাদের জন্যে আনন্দহীন খাটুনি খেটে এসেছে, সেই সব দলিত মানব আজ ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে। এটা হচ্ছে শূদ্র বিদ্রোহের যুগ। তারা বলছে, পেটের দায় তো প্রতি মানুষেরই আছে, একলা আমরা কেন খেটে মরব? এসো সকলে মিলে দায় ভাগ করে নিই, কায়িক শ্রম তোমরাও করো আমরাও করি। শূদ্র বিদ্রোহের এই মূল-ধুয়াটার জগৎ জুড়ে মহলা চলেছে, বৈশ্যরা ভয়ে কাঁপছেন, ক্ষত্রিয়রা ঘটা করে গোঁফে তা দিচ্ছেন, ব্রাহ্মণরা রফার উপায় খুঁজছেন।

সাময়িক একটা রফার দিক থেকে রল্যাঁ-গান্ধীর প্রস্তাবমতো প্রতি মানুষের আংশিক শূদ্রীকরণের মূল্য আছে সন্দেহ নেই। এরা না বললেও ঘটনাচক্রে বাধ্য হয়ে শূদ্রধর্ম স্বীকার করতেই হবে সকলকে! ঘটনাচক্রে বাধ্য হয়ে সকলেই একদিন ক্ষাত্রধর্ম স্বীকার করেছিল। ঘটনাচক্রে বাধ্য হয়ে সকলকেই আজ বৈশ্যধর্ম স্বীকার করতে হচ্ছে। এখনকার দিনে এমন কোনো আর্টিস্ট আছেন, ব্রাহ্মণ আছেন, যিনি অন্ন-বস্ত্রের জন্যে অর্থ উপার্জন করছেন না? কেউ আর্টের বিনিময়ে করছেন, কেউ অন্য কিছুর বিনিময়ে করছেন। আর্টের বেশ্যাবৃত্তি যাঁর কাছে নীতিবিরুদ্ধ আর্টেতরো বৈশ্যবৃত্তি তাঁর ভরসা। রল্যাঁ টাকার জন্যে বই লেখেননি, কিন্তু ইস্কুলমাস্টারি করেছেন। রবীন্দ্রনাথ টাকার জন্যে বই লেখেননি, কিন্তু জমিদারি করেছেন। দায়ে পড়ে পরধর্মের শরণ না-নিয়ে যখন উপায় নেই তখন শূদ্রোচিত কায়িক শ্রম ভালো না বৈশ্যোচিত মস্তিষ্ক-বিক্রয় ভালো? রল্যাঁর মতে প্রথমটা। যদিও কার্যত তিনি দ্বিতীয়টার আশ্রয় না-নিয়ে পারেননি। কারণ, হাতের দাসত্বের চেয়ে মাথার দাসত্বের বাজারদর বেশি—এক বলশেভিক রাশিয়া ছাড়া সর্বত্র।

কিন্তু একটা-না-একটা দাসত্ব কি করতেই হবে চিরকাল? এমন দিন কি আসবে না যেদিন মানুষ মাত্রেই সর্বতোভাবে স্রষ্টা হবে নিজের নিজের ক্ষেত্রে, বিচ্যুত হতে বাধ্য হবে না স্ব-স্ব-ধর্ম থেকে? শূদ্রত্বের অগৌরব সকলে মিলে ভাগ করে নিলে তো রোগের জড় মরে না, সকলে মিলে রোগে ভোগা যায় মাত্র। লেবারের ডিগনিটি প্রমাণ করার জন্যে সকলে মিলে ম্যানুয়াল লেবার করলে তো বেগার খাটার নিরানন্দ অপ্রমাণ হয় না, কর্মের দাসত্বকে 'কর্তব্য' আখ্যা দিয়ে নিজেদের ভোলানো হয় মাত্র। প্রতিভার প্রেরণায় যে মানুষ চাষ করে সুতো কাটে, সে মানুষের শূদ্রত্বে দাসত্বের গ্লানি কোথায় যে তাই ভাগ করে নেবার জন্যে রল্যাঁকে চাষ করতে হবে, রবীন্দ্রনাথকে চরকা কাটতে হবে? সমাজ ধনী হবে, যদি প্রতি মানুষের প্রতিভা পায় আপন চরিতার্থতা। বিকচ ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্য স্বীকার করে যে জটিল সামঞ্জস্যের সৃষ্টি হবে সেই সামঞ্জস্যই তো সমাজের আদর্শ, সেই তো সনাতন, সেই তো সম্পূর্ণ। চাতুর্বর্ণ্যের সাংকর্য ঘটিয়ে দিয়ে বৈচিত্র্যধ্বংসী বহিঃসাম্য স্থাপনা করলে সাময়িক একটা রফা হয় তো হয়, কিন্তু এতে মানুষের তৃপ্তি নেই। মানুষ চায় স্রষ্টত্বের স্বাধীনতা, এ ছাড়া আর সমস্তই তার পক্ষে দাসত্ব। শূদ্রকে দাও স্রষ্টত্বের স্বাধীনতা, তার শ্রম হোক তার কাছে গান গাওয়া ছবি আঁকার মতো আনন্দময়, তার শ্রমের পুরস্কারে সে রাজা হোক—কিন্তু অশূদ্রকে স্বধর্মচ্যুত করে পূর্ণত হোক অংশত হোক শূদ্র কোরো না; তার বীণা তুলি কেড়ে নিয়ে তাকে কাস্তে হাতুড়ি ধরিয়ো না; মাত্র আধ ঘণ্টার জন্যে হলেও তাকে দিয়ে চরকা কাটিয়ো না।

কায়িক শ্রম সম্বন্ধে আমার এইসব ধারণা আমি রল্যাঁকে জানাইনি। জানালে সম্ভবত তিনি বলতেন যে, একই মানুষ কি ব্রাহ্মণ শূদ্র দুই হতে পারে না? প্রতি মানুষের মধ্যে যে একাধিক আত্মা আছে। Maeterlinck নাটক লেখেন, লাঙল ঠেলেন, মৌমাছি ও পিঁপড়েদের তদারক করে প্রামাণ্য বিজ্ঞানগ্রন্থ লেখেন—তাঁর তা

হলে গোটা তিনেক আত্মা। কোনোরকম কায়িক শ্রমের প্রতি যার একটাও আত্মার একটুও রুচি নেই এমন মানুষ সম্ভবত একজনও পাওয়া যাবে না।

এমন যদি তিনি বলতেন তবে আমি আপত্তি করতুম না। নিজেকে নানাদিকে কুশলী করবার সাধ মানুষ মাত্রেই আছে। এই সাধ যদি মানুষ মাত্রকেই সুতোকাটা নামক কাজটিতে কৃতী হতে প্রেরণা দেয় তবেই সে চরকা ধরবে নতুবা স্পেশালিজেশনের প্রতিকার স্বরূপ কিংবা সর্বতোভাবে আত্মসম্পূর্ণ হবার দুরাশায় কিংবা সর্বমানবের সঙ্গে যুক্ত হবার ধারণায় যদি ধরে বা ধরতে বাধ্য হয় তবে সেটা হবে তার সৃষ্টির সতিন, তার অন্তরের দাসত্ব। আধ ঘণ্টার জন্যে হলেও সেটা তার স্বাধীনতার শ্বাসরোধী। সার্বজনীন দাসত্বের দ্বারা সর্বমানবের যে একীকরণ সে-মন্ত্রের উদগাতা যদি রল্যাঁ-গান্ধী-টলস্টয়ও হন তবু সেটা ছদ্মবেশী জড়বাদ।

মণীন্দ্রলাল জিজ্ঞাসা করলেন, এ যুগের লোক কাব্য পড়ে না কেন? রল্যাঁ বললেন, এ যুগের লোকের দুঃখ-সুখের কথা কেউ কাব্যে লেখে না বলে। ভিক্টর উগোর মতো জনসাধারণের কবি থাকলে জনসাধারণ কাব্য পড়ত বই কী।

এবার তাঁর মনের আরেকটা কোণ ছোঁয়া গেল। তাঁর কাছে আর্টের অভীষ্ট সমঝদার, আলটিমেট সমঝদার—জনসাধারণ। জনসাধারণের জন্যেই আর্ট। তিনিই একদিন People's Theatre-এর পরিকল্পনা দিয়েছিলেন। যা-কিছু সুন্দর যা-কিছু শিব তা থেকে যদি একজন মানুষও বঞ্চিত থাকে তবে আর্টিস্টের আনন্দ অপূর্ণ থেকে যায়। তা বলে তিনি কোথাও এমন বলেননি যে, জনসাধারণের আর্ট জনসাধারণের দিকে নেমে যাবে। অন্যত্র তিনি বলেছেন, খাঁটি আর্টের আবেদন এমন গভীর যে, নিম্নতম অধিকারীর হৃদয়ও তাতে সাড়া দেয়। প্রমাণ, শেক্সপিয়রের নাটক। ও-জিনিস বোঝবার জন্যে বৈদগ্ধ্যের দরকার থাকতে পারে, কিন্তু বোধ করবার পক্ষে প্রকৃতি যা দিয়েছে তাই যথেষ্ট। শেক্সপিয়র দেখবার জন্যে ইতর সাধারণের আগ্রহ শিক্ষিতদের আগ্রহকে ছাড়িয়ে যায়।

চা খেতে খেতে শেষ কথা হল সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে। সাহিত্যের প্রভাবে যদি নৈতিক অরাজকতা ঘটে তবে তারজন্যে কি সাহিত্যিক দায়ী হবে? বললেন, ধর্মের প্রভাবে জগতে কত যুদ্ধই ঘটে গেছে তারজন্যে কি কেউ ধর্মসংস্থাপকদের দায়ী করে? সাহিত্যিক যদি সুস্থমনা হয়ে থাকে তবে সমাজের সত্যিকার আদর্শের সঙ্গে সাহিত্যের সত্যিকার আদর্শের বিরোধ হবে না; আর যদি অসুস্থমনা হয়ে থাকে তবে তার রচনাকে সাহিত্য নাম দিয়ে সাহিত্যকে সাজা দেওয়া সাজে না।

রল্যাঁর কথাগুলির প্রতিলিপি দিতে পারলুম না, ভাবছায়া দিলুম। এইখানে বলে রাখি যে, এই আলাপ-আলোচনার অধিকাংশই হয়েছিল মণি দা-তে ও রল্যাঁ-তে; এবং আমি ফরাসি ভালো না-বুঝতে পারায় তথা রল্যাঁ ইংরেজি আদৌ না-বলতে পারায় মণি-দার ও কুমারী রল্যাঁর ওপরে আমাকে এতটা নির্ভর করতে হয়েছে যে, এই লেখায় অনেক ভুলচুক থেকে গিয়ে থাকতে পারে। তবু মোটের ওপর এতে কিছু এসে যাবে না এইজন্যে যে, এই আলাপ-আলোচনার আগে ও পরে বহু বার আমি রল্যাঁর মতবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিত হয়েছি। এসব তাঁর মুখে নতুন শুনলুম এমন নয়। আমরা তাঁর কথা শুনতে যাইনি, আমরা গিয়েছিলুম তাঁকে শুনতে ও তাঁকে দেখতে। কাব্য পড়ে যেমন ভাবি কবি তেমন কি না, এইটি জানবার জন্যে প্রত্যেকেরই একটি স্বাভাবিক কৌতূহল থাকে। সৃষ্টি দেখে স্রষ্টার যে-কল্পমূর্তিটি গড়া যায় বাস্তবের সঙ্গে তার তুলনা করে না-দেখা পর্যন্ত যেন সৃষ্টিটাকেই পূর্ণরূপে দেখা হয় না।

জাঁ ক্রিস্তফের স্রষ্টাকে তাঁর ফোটোর সঙ্গে মিলিয়ে মনে মনে যে কল্পমূর্তিটিকে গড়েছিলুম সে-মূর্তিটিকে ভেঙে ফেলতে হল বলে দুঃখ হল, কিন্তু মানুষটিকে ভালোবাসতে বাধল না। বলিষ্ঠমনা পুরুষের বাহিরটা বলিষ্ঠদেহ পুরুষের মতো হয়ে থাকলে শ্রদ্ধা বাড়ত, কিন্তু ঐশ্বর্যময় মনের বাহিরটা শিশু ভোলানাথের মতো দেখে মমতা জন্মাল। দেহে-মনে সুসমঞ্জস পার্সোন্যালিটি বলতে একমাত্র রবীন্দ্রনাথকে দেখেছি; গান্ধীকে দেখে নিরাশ হয়েছিলুম, রল্যাঁকে দেখে হলুম। এঁদের দেহ এঁদের মনের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে ও আগুনকে ঢেকেছে; সন্ন্যাসীর গায়ের বিভূতি যেমন তার অন্তরের তপস্যাকে ঢাকে। কিন্তু যেমন গান্ধীর প্রতি

তেমনি রল্যাঁর প্রতি এমন একটি মমতা জাগল যেমনটি নিছক গুণীব্যক্তির প্রতি জাগে না। ভালোবাসা ও ভালোলাগার মধ্যে কোনখানে যে একটি সূক্ষ্ম রেখা আছে চিন্তা করে তার নিরিখ পাইনে, বোধ করে তার অস্তিত্ব জানি। এক-একটা বিরাট পার্সোন্যালিটির সংস্পর্শে এলে এই বোধ-ক্রিয়াটি একান্ত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ফরাসিদের পারি নগরীর নামে পৃথিবীসুদ্ধ লোক মায়াপুরীর স্বপ্ন দেখে। আরব্য রজনির বাগদাদ আর কথাসাহিত্যের পারি উভয়েরই সম্বন্ধে বলা চলে, 'অর্ধেক নগরী তুমি অর্ধেক কল্পনা।' পৃথিবীর ইতিহাসে পারির তুলনা নেই। দুই হাজার বৎসর তার বয়স, তবু চুল তার পাকল না। কত বার তাকে কেন্দ্র করে কত দিগবিজয়ীর সাম্রাজ্য বিস্তৃত হল, কত বার তার পথে পথে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার রক্তগঙ্গা ছুটল, কত ত্যাগী ও কত ভোগী, কত জ্ঞানী ও কত কর্মী, কত রসজ্ঞ ও কত দুঃসাহসী, বিপ্লবে ও সৃষ্টিতে স্বাধীনতায় ও প্রেমে তাকে অমর মানবের অমরাবতী করলেন, সাহিত্যে চিত্রকলায় ভাস্কর্যে নাট্যকলায় সুগন্ধি শিল্পে পরিচ্ছদকলায় স্থাপত্য ও বাস্তুকলায় সে সভ্যজগতের শীর্ষে উঠল। পারিই তো আধুনিক সভ্যতার সত্যিকারের রাজধানী, অগ্রসরদের তপস্যাস্থল, অনুসারকদের তীর্থ। এর একটি দ্বার প্রতি দেশের কাঞ্চনবান সম্ভোগপ্রার্থীদের জন্যে খোলা, অন্য দ্বারটি প্রতি দেশের নিঃসম্বল শিল্পী ভাবুক বিদ্যার্থীদের জন্যে মুক্ত। একদিক থেকে দেখতে গেলে পারি রূপোপজীবিনী, আমেরিকান টুরিস্টদের হিরে-জহরতে এর সর্বাঙ্গ বাঁধা পড়েছে, তবু জাপান অস্ট্রেলিয়া আর্জেন্টিনা থেকেও শৌখিন বাবুরা আসেন এর দ্বার-গোড়ায় ধরনা দিয়ে একটা চাউনি বা একটু হাসির উচ্ছিষ্ট কুড়োতে। অন্যদিক থেকে দেখতে গেলে পারি অন্নপূর্ণা, সর্বদেশের পলাতকদের আশ্রয়দাত্রী, তার জাতিবিদ্বেষ নেই, সে পোল রুশ রুমানিয়ানকেও শ্রমের বিনিময়ে অন্ন দেয়, নিগ্রোকেও শ্বেত-সেনার নায়ক করে এবং নানা দেশের যে অসংখ্য বিদ্যার্থীতে তার প্রাঙ্গণ ভরে গেছে তাদের কত বিদ্যার্থীকে সে বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে জীবিকাও জোগায়।

পৃথিবীর অন্য কোনো নগর দেখতে পৃথিবীর এত দেশের এত টুরিস্ট আসে না; পারি দেখতে প্রতি বৎসর যে কয় লক্ষ বিদেশি আসে, তাদের পনেরো আনা আমেরিকান ও ইংরেজ। আমেরিকানদের চোখে পারিই হচ্ছে ইউরোপের রাজধানী, আর ইউরোপের লোকের চোখে পারি হচ্ছে লণ্ডন ভিয়েনা বার্লিন মস্কোর চেয়েও আন্তর্জাতিক। আমেরিকান বিদ্যার্থীতে পারি ছেয়ে গেছে, আর ইউরোপের নানা দেশের বিদ্যার্থীদের কাছে পারি চিরকালই আমাদের কাশীর মতো কালচার-পীঠ। শুধু কাশী নয় কামরূপও বটে, যত রাজ্যের রোমান্সপিপাসু এই নগরীতেই তীর্থ করতে আসে।

আয়তনে ও লোকসংখ্যায় পারি লণ্ডনের প্রায় অর্ধেক, কলকাতার প্রায় তিনগুণ। আজকালকার দিনে একটা শহরের সঙ্গে আরেকটা শহরের বাইরে থেকে যে তফাত সেটা ছোটোভাইয়ের সঙ্গে বড়োভাইয়ের তফাত, বয়স ও বৃদ্ধির উনিশ-বিশ থাকলেও পারিবারিক সাদৃশ্য উভয়েরই মুখে।

পারিতে ট্রাম মেট্রো বাস ট্যাক্সি ধোঁয়া কাদা বস্তি ব্যারাক লণ্ডনের মতো সমস্তই আছে, কিন্তু মোটর গাড়ি কিছু বেশিসংখ্যক, বাড়িগুলো কিছু স্বাধীন গড়নের, কাদাটা কিছু গভীর ও গাঢ়। মোটের ওপর পারি লণ্ডনের মতো ফিটফাট নয়, বেশ একটু নোংরা এবং অনেক বেশি গরিব। উঁচু দরের বাস্তুকলা তার কয়েকটি প্রাসাদে সৌধে থাকলেও লণ্ডনের সৌষ্ঠব তার অধিকাংশ বাড়ির নেই। ঐতিহাসিক প্রাসাদ সৌধের ছবি দেখে পারিকে যা ভাবি সর্বসাধারণের বাসগৃহ দেখলে সে কল্পনা ছুটে যায়। কিন্তু পারির আসল সৌন্দর্য তার প্রশস্ত সরল রাজপথগুলি, তার বৃহৎ চতুষ্কোণ প্লাসগুলি, তার সপ্তসেতুবেষ্টিত সর্পিণী নদীটি, সর্পিণীর দুই রসনার মতো সেন নদীর দুটি অর্ধের মধ্যবর্তী দ্বীপটি এবং নগরীর দুই উপান্তের প্রমোদোদ্যান দুটি।

পারিতে লণ্ডনের মতো পার্ক বিরল; তবে তার এক-একটি রাজপথ এক-একটি সরলরেখাকৃতি পার্ক বিশেষ। পারির নিতান্ত মাঝারি রাজপথগুলিও সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউর চেয়ে চওড়া। 'সাঁজেলিসি'-র এক পাশ থেকে আর এক পাশ দেখা যায় না, পাশাপাশি দশটা চৌরঙ্গির মতো। সে তো একটি রাজপথ নয়, একসঙ্গে অনেকগুলি রাজপথ; রাজপথের মাঝখানে এক সারি বাগান, রাজপথের ওপরে এক-একটি দোকান বা প্রাসাদ বা থিয়েটার। এক-একটা বুলভার্দ এক-একটা বিরাট ব্যাপার, যেমন দীর্ঘ তেমনি প্রস্থ। অধিকাংশ রাস্তার সম্বন্ধে একথা খাটে যে, একটি রাস্তা মানে একটি রাস্তা নয়, সমান্তরাল দুটি-তিনটি রাস্তা, কোনো কোনো স্থলে পাঁচটি রাস্তা। অর্থাৎ প্রতি রাস্তার অনেকগুলি করে ভাগ আছে, যেমন ইন্দ্রধনুর সাতটি ভাগ।

প্রথমে ফুটপাথ, ফুটপাথের পরে রাস্তা, রাস্তার পরে গাছের সারি, গাছের সারির পরে ঘোড়দৌড়ের রাস্তা, সে রাস্তার পরে গাছের সারি ও বসবার বেঞ্চি, তারপরে আবার ঘোড়দৌড়ের রাস্তা, তারপরে আবার গাছের পার্টিশন, তারপরে আবার রাস্তা, তারপরে আবার ফুটপাথ। সব রাস্তার অবশ্য একইরকম ভাগ নয়, তবে অধিকাংশ রাস্তাই অসাধারণ চওড়া আর অনেক রাস্তার ফুটপাথের ওপরে স্থলে স্থলে ছোটো ছোটো দোকান আছে, যেমন পুরীর 'বড়ো দান্তের'-র ওপরে অস্থায়ী ছোটো ছোটো দোকান। এক-একটা ফুটপাথও রাস্তার মতো চওড়া, স্থলে স্থলে এইসব দ্বীপের মতো দোকান, অধিকাংশ ছেলেদের খেলনার বা মেয়েদের এটা-ওটার দোকান। ঠিক আমাদের দেশের মতো সেসব দোকান; ভিড় জমেছে, দরদস্তুর চলেছে, হইচই হট্টগোল।

আমাদের সঙ্গে ফরাসি, ইটালিয়ান প্রভৃতি দক্ষিণ ইউরোপীয়দের প্রকৃতিগত মিল আছে। এরাও খুব গোলমাল ভালোবাসে, অতিরিক্ত রকম বাচাল, আর বাদশাহি রকমের কুঁড়ে। কুঁড়ে বললে বোধ হয় ভুল বলা হয়, বরং বলি বিশ্রামপ্রিয়। সময়ের দাম এরা ইংরেজ আমেরিকানদের মতো বোঝে না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিয়ে কাটিয়ে দেয়। তা বলে এরা বড়ো কম খাটে না। পারির যারা আসল অধিবাসী, খুব খাটতে পারে বলে তাদের সুনাম আছে। মেয়েরা গল্প করবার সময়েও জামা সেলাই করছে—শৌখিন জামা। জামাকাপড়ের সখটা ফরাসিদের অসম্ভব রকম বেশি, বিশেষ করে ফরাসি মেয়েদের ও শিশুদের। পুরুষরা কতকটা বেপরোয়া। তাদের প্রধান সম্পদ তাদের জাঁদরেলি গোঁফ, তাদের সেই ব্রহ্মাস্ত্রটিতে শান দেবার দিকে তাদের যত নজর তত নজর তাদের স্নান না-করা গাত্রের দিকে নেই। সুগন্ধিশিল্প পারিকে আশ্রয় করবার কারণ হয়তো এই। হ্যাঁ, পারির লোক খুব খাটতে পারে বটে। খুব ভোরে উঠে খাটতে আরম্ভ করে দেয়, অনেক রাত অবধি খাটে, কিন্তু পানাহারটা সেই অনুপাতে ঘটা করেই করে। এরা ব্রেকফাস্ট বেশি খায় না, লাঞ্চটা ইংল্যাণ্ডের তুলনায় বেশি খায়, আর ডিনারটা ইংল্যাণ্ডের তুলনায় রাত করে খায়। আহার সম্বন্ধে এদের মোগলাই রুচি, গোপালের মতো যাহা পায় তাহা খায় না। রন্ধনশিল্প ইউরোপের কোথাও থাকে তো পারিতে। এত রকমের খাদ্য এত সস্তায় কেন অনেক দাম দিয়েও লণ্ডনে পাবার জো নেই। দুনিয়ার সব দেশের খানার এরা সমঝদার, সেইজন্যে যেকোনো রেস্তরাঁয় সব নেশনের খাদ্যের একটা-না-একটা নমুনা পাওয়া যাবেই। সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, পারিতে অত্যল্প খরচে অনেকখানি তৃপ্তির সহিত খেতে পারা যায়। রান্নাটা উঁচু দরের তো বটেই, রান্নাটা টাটকা। শাকসবজি ও মাংসের জন্যে ইংল্যাণ্ড অন্য দেশের মুখাপেক্ষী, ফ্রান্স তেমন নয়।

এ তো গেল আহার তত্ত্ব। ফরাসিরা পাননিপুণও বটে। যেকোনো রেস্তরাঁয় গেলে ভোজ্য তালিকার সঙ্গে সঙ্গে একটা পানীয় তালিকাও দেয়। ও-রসে বঞ্চিত বলে খাঁটি খবর দিতে পারব না, কিন্তু সেজন্যে অপদস্থ হয়েছি পদে পদে। এ কেমন মানুষ যে 'ভ্যাঁ' খায় না? এই ভেবে ওরা হাঁ করে তাকায়। আমি মনে করেছিলুম ইংরেজরাই ভারি মদ খায়, কেননা লণ্ডনের অলিতে-গলিতে 'পাবলিক বার'। ও হরি! পারির গলিতে গলিতে যে একটা নয় দুটো নয় পঞ্চাশটা কাফে! লণ্ডনে কাফে নেই, কাফে নামধেয় যা আছে আসলে তা রেস্তরাঁ, লণ্ডনের রেস্তরাঁ; সংখ্যা পারির তুলনায় আঙুলে গোনা যায়।

এই কাফে জিনিসটি ফরাসি সভ্যতার একটা অঙ্গ। ফ্রান্সের আধুনিক ইতিহাস তার কাফেগুলিতেই তৈরি হয়েছে, ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস যেমন তৈরি হয়েছে তার ইস্কুলগুলির প্লেগ্রাউণ্ডগুলিতে! পঞ্চাঙ্ক নাটকের মতো যতগুলি বিপ্লবের অভিনয় পারিতে হয়ে গেছে সকলগুলির রিহার্সাল হয়েছিল কাফেগুলিতে; কাফেই হচ্ছে ফরাসিদের চণ্ডীমণ্ডপ, ফরাসিদের ক্লাব। কাফেতে গিয়ে এক পেয়ালা কাফি বা শোকোলা ('Chocolat') বা হালকা মদের ফরমাশ করে যতক্ষণ খুশি বসে আড্ডা দাও—দু-ঘণ্টা তিন ঘণ্টা পাঁচ ঘণ্টা! তাস খেলো, দাবা খেলো, গানবাজনা শোনো, কাগজ পড়ো, চিঠি লেখো; ছাত্র হয়ে থাকো তো পড়া করো। কাফেতে একবার গিয়ে বসলে আর উঠতে ইচ্ছে করে না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলতে থাকে ইয়ার্কি দেওয়া, ফ্লার্ট করা। একটু-আধটু নেশায় ধরলে রঙ্গকৌতুক থেকে মাথা ফাটাফাটি পর্যন্ত উদারা মুদারা তারা। ওরই মধ্যে একটু

স্থান করে নিয়ে একটু-আধটু নাচাও স্থল বিশেষে হয়। অনেক তপস্বীর তপস্যা আর অনেক কুঁড়ের কুঁড়েমি দুই-ই একসঙ্গে চলতে থাকে যখন, তখন একথা বিশ্বাস হয় না যে এদের কেউ কোনোদিন জগৎকে ধন্য করে দেবে চিন্তাবৈশিষ্ট্যে, অবাক করে দেবে কর্মনেতৃত্বে, মুগ্ধ করে দেবে অভিনেত্রীরূপে। তখন এই কথা মনে হয় যে, এদের যেমন খাটুনির সীমা নেই তেমনি কুঁড়েমিরও সীমা সেই—ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেবল মজলিশি রসিকতা আর মজলিশি আদবকায়দা আর মজলিশি সুরাপান।

এই একটা মস্ত জিনিস যে কাফে ভয়ানক সস্তা, দু-চার আনা খরচ করে দু-ঘণ্টা এক স্থানে বসা ও প্রাণ খুলে গল্প করা; লণ্ডনে এমন সুযোগ নেই। আমাদের দেশে চায়ের দোকানগুলোতে তর্কসভা বসে, সেইগুলোই আমাদের ভাবী যুগের কাফে। তাই থেকে আমাদের ভাবী সাহিত্যিকদের উদ্ভব হবে, ভাবী রাষ্ট্রনেতাদের অভ্যুত্থান ঘটবে। ব্যয়সাধ্য ক্লাব যে আমাদের মাটিতে শিকড় গেড়ে আমাদের বট-অশ্বত্থের মতো দীর্ঘজীবী হবে এমন আমার মনে হয় না। ওই চায়ের আড্ডাগুলোর সঙ্গে একটা করে পাঠাগার জুড়ে দিলে ওইগুলোই হবে জনসাধারণের বিশ্রাম, আমোদ ও শিক্ষার স্থান।

কাফের মতো 'পাতিসেরি'গুলোতেও আড্ডা বসে। পাতিসেরি মানে কেক রুটির দোকান, ওখানে গিয়ে কেক কিনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেতে পারা যায়। অনেক পাতিসেরিতে চা-কফি খাবার জন্যে একটু ঠাঁই করে দেওয়া হয়, সেই সুযোগে গল্প জমে, তর্ক ওঠে, আলাপ পরিচয় হয়, দেশের মানুষ দেশের মানুষকে চিনতে চিনতে দেশকে চেনে, বিদেশের মানুষকে চিনতে চিনতে বিদেশকে চেনে। ফরাসিরা ইংরেজদের মতো নীরবপ্রকৃতি নয়, গম্ভীরপ্রকৃতি নয়; ওরা ভদ্রতার খাতিরে আবহাওয়া সম্বন্ধে দু-একটা তুচ্ছ প্রশ্ন করে চুপ করে না, ওরা বকে আর বকায়।

পারির লোক জন্ম-রসিক। আমোদের জন্যে এমন অকৃপণ ব্যবস্থা কুত্রাপি নেই। অবশ্য আমোদ মাত্রেই বিশুদ্ধ নিষ্পাপ হরিনাম জপ করা নয়, বরং বহুক্ষেত্রে পঙ্কিল। পথে ঘাটে জুয়োর আড্ডা। এ আপদ লণ্ডনে নেই। পথে ঘাটে নাগরদোলা প্রভৃতি শিশুসুলভ কৌতুক। খেলাধুলার রেওয়াজ ইংল্যাণ্ডের মতো নেই। ইংল্যাণ্ডে মাঠে মাঠে ফুটবল খেলা, টেনিস খেলা, সাঁতার। ইংরেজরা জন্ম খেলোয়াড়। স্বাস্থ্যচর্চাটাকেই ওরা চরম বলে জেনেছে। ওইখানে ওদের জিত।

পারিতে অন্তত বিশটি উঁচু দরের থিয়েটার আছে। এ ছাড়া সিনেমা, 'কাবারে' (cabaret), সংগীতশালাও আছে অগুনতি। 'কাবারে'গুলি পারির বিশেষত্ব, লণ্ডনে নেই, লণ্ডনে প্রবর্তন করবার প্রস্তাব অনেকে করছেন। এর সঙ্গেও ফরাসি ইতিহাসের যোগ আছে, কেননা এতে যেসব নাচ তামাশা হয়, সেসব অনেকসময় পলিটিক্যাল ব্যঙ্গবিদ্রূপ। সংগীতশালা পর্যায়ভুক্ত এমন সব রঙ্গালয় আছে যেখানে কেবল দৃশ্যের পর দৃশ্য দেখানো হয়, কোনোটার সঙ্গে কোনোটার সম্বন্ধ নেই, এবং দৃশ্যের সঙ্গে বাদ্য আছে কিন্তু কথা নেই। একে বলে 'revue', এ জিনিস লণ্ডনেও প্রবর্তিত হয়েছে, কিন্তু এ জিনিস আসরে নামাতে অনেক টাকা অনেক বুদ্ধি ও অনেকখানি 'নির্লজ্জতা' দরকার। এ সকলের সমন্বয় লণ্ডনে দুর্লভ, লণ্ডনের লোক এক নম্বরের শুচিবায়ুগ্রস্ত। পারির লোক বিবসনা স্ত্রীমূর্তি দেখে শকড হবে এমন কচি খোকা নয়। তারা অতি অল্প বয়স থেকে পারির দশ-বারোটা মিউজিয়ামে গ্রিক ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দেখে চোখকে শিক্ষিত ও চিত্তকে নির্বিক্ষেপ করেছে। তারা রুশো ভলতেয়ার ও জোলা-ফ্লোবেয়ারের রচনা পড়ে সুনীতি-দুর্নীতি ও সুরুচি-কুরুচির হিসাব-নিকাশ করে রেখেছে। তারা আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যের নাগরিক, ন্যাকামি বা নাসিকা-সিটকারকে তারা উচ্চাঙ্গের মর‍্যালিটি বলে না; তারা সুন্দরের সমঝদার, মানবদেহকেও সুন্দর বলে জানে। 'মুল্যাঁ রুজ' বা 'ফোলি বেরজেয়ারে' অর্ধ-বিবসনাদের নির্নিমেষনেত্রে নিরীক্ষণ করে শকড হতে পিউরিটান নিউ ইংল্যাণ্ডের টুরিস্টরা দলে দলে যান, আসল ফরাসিরা যায় কি না সন্দেহ; যদি-বা যায় নৃত্যনৈপুণ্য খুঁটিয়ে বিচার করবার মতো শিক্ষা নিয়ে যায়, কেবল এক জোড়া কৌতূহলী চক্ষু ও একটা শুচিবায়ুগ্রস্ত মন নিয়ে যায় না। পারির বহুসংখ্যক প্রমোদাগার বিদেশিদের জন্যেই অভিপ্রেত এবং তাদেরই দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত। মার্কিনের টাকার লোভে মার্কিনের বৈশ্যসুলভ স্থূল রুচির ফরমাশ তারা খাটছে। এই আভিজাত্যহীন

পঙ্করসবোধ, এই চর্চা অবসরহীন পল্লবগ্রাহী সমঝদারি, এই অবিশ্রান্ত অফুরন্ত থ্রিল-পিপাসা ফরাসি কালচারকে ডলারের গোলা মেরে উড়িয়ে দিতে বসেছে, এর আক্রমণে ফরাসিদের বিশুদ্ধ আর্ট হয়তো আর বেশিদিন টিকবে না, ফরাসি সভ্যতার সরস্বতী অবশেষে বাইজির মতো সস্তা গান শুনিয়ে ও সস্তা নাচ নেচে সরাব পান করে নাসিকাধ্বনি করবেন। ফরাসি জাতিটার অমেয় জীবনীশক্তির ওপরে আমার অটল আস্থা আছে বলেই যা আশা চতুর্দশ লুই ও প্রথম নাপোলেঅঁর দেশ এই নতুন আঘাতকেও যথাকালে কাটিয়ে উঠবে, এই বিষয়কেও পরিপাক করবে নীলকণ্ঠেরমতো।

ফরাসিরা একটা আত্মবিপরীত জাতি, তাদের ধাতটা এক্সট্রিমিস্ট, তারা দু-দল চরমপন্থীর সমন্বয়—গোঁড়া ক্যাথলিক আর গোঁড়া যুক্তিবাদী। যারা মানে তারা সমস্ত মানে, ঈশ্বর, শয়তান, স্বর্গ, নরক, যিশু, যিশুর কুমারী মাতা, পোপ কনফেসন, প্রতিমা, কর্মকান্ড। যারা মানে না তারা কিছুই মানে না, তারা জ্ঞানমার্গের নাইহিলিস্ট, তারা বদ্ধ সিনিক, তারা পাঁড় এপিকিয়োর। জাতটা অতিমাত্রায় শক্তের ভক্ত অথচ নৈরাজ্যবাদী। বাঙালি জাতটার সঙ্গে এ বিষয়ে এদের মিল আছে—যেমন ইমোশনাল তেমনি নাস্তিক, যারা মানে তারা মন দিয়ে মানে না, হৃদয় দিয়ে মানে; যারা মানে না তারা মন দিয়ে উড়িয়ে দেয়, হৃদয় দিয়ে পারে না। নইলে আনাতোল ফ্রাঁসের মতো তীক্ষ্ণদৃষ্টি পুরুষ কখনো গত মহাযুদ্ধের মতো নির্বোধ একটা ব্যাপারের তলা পর্যন্ত দেখেও সস্তা পেট্রিয়টিজমের ঢাক পিটোতে যান।

গোঁড়া ধার্মিক হোক, গোঁড়া অধার্মিক হোক, রসবোধ জিনিসটা এদের জাতিগত; ও জিনিস এরা খ্রিস্টধর্মের মতো বাইরে থেকে পায়নি বলে ও নিয়ে এরা ঝগড়া করে না। Venus de Milo-র উলঙ্গ সৌন্দর্য এরা পিতা-পুত্র মিলে দেখে এবং পিতা-পুত্রে মিলে আলোচনা করে। উলঙ্গতা নিয়ে তর্ক বাঁধে না, ওটা চোখসওয়া হয়ে গেছে, ওটা উভয় পক্ষেই আবশ্যক বলে ধরে নিয়েছে; তর্ক বাঁধে সৌন্দর্য নিয়ে। এই প্রসঙ্গে বললে অবান্তর হবে না যে, দক্ষিণ ইউরোপের সঙ্গে উত্তর ইউরোপের এইখানে একটা তফাত আছে। ফরাসি, ইটালীয়, গ্রিক প্রভৃতি জাতিরা দেহকে প্রগাঢ় ভালোবাসে ও ভক্তি করে, সহজিয়াদের মতো দেহের মধ্যে তত্ত্ব খুঁজে পায়। এরা প্রতিমাপূজক জাতি, এদের দেবতারা সশরীরী, এদের শিল্পীরা যখন মাতৃমূর্তি আঁকে তখন স্তনের ওপরে বস্ত্র টেনে দেয় না, যখন বালক যিশু আঁকে তখন খামোখা কৌপীন পরিয়ে দেয় না, বাস্তবকে স্বীকার করে নিয়ে তার ওপরে এরা সৃষ্টি খাড়া করে, মাতৃমূর্তির মুখে তৃপ্তি ফুটিয়ে তোলে। উত্তর ইউরোপের লোক প্রোটেস্টান্ট, গোঁড়া নিরাকারবাদী, ওদের চিত্রকলা একান্ত দরিদ্র, ভাস্কর্যের বালাই ওদের নেই। ওরা মুসলমান, এরা হিন্দু। ওদের তেজ বেশি, এদের লাবণ্য বেশি।

এখন বলি পারির থিয়েটারগুলির কথা। প্রথমত, পারির থিয়েটারগুলি অসম্ভব সস্তা। দ্বিতীয়ত, তাদের আয়োজন অসম্ভব জাঁকালো। লণ্ডনে যত খরচ করে যে-দরের সাজসজ্জা বা যে-দরের অভিনয় দেখতে পাওয়া যায় পারিতে তার সিকিভাগ খরচ করে তার চারগুণ ভালো সাজসজ্জা চারগুণ ভালো অভিনয় দেখতে পাওয়া যায়। এর একটা কারণ এই যে, ফরাসিরা ভালো জিনিসের কদর বোঝে, দলে দলে দেখতে যায়, প্রত্যেকে অল্প অল্প দিলেও সবসুদ্ধ অনেক টাকা ওঠে, ফলে প্রযোজনার খরচ পুষিয়ে যায়। এ ছাড়া গভর্নমেন্টও থিয়েটারওয়ালাদের অর্থসাহায্য করে, যদিও সাহায্য স্বরূপ ডান হাতে যা দেয় ট্যাক্স স্বরূপ বাঁ-হাতে তা ফিরিয়ে নেয় বলে থিয়েটারওয়ালাদের আক্ষেপ। তবু এটা তো অস্বীকার করা যায় না যে, গভর্নমেন্ট ডান হাতে যা দেয় ওটা মূলধনের কাজ করে ও ওর থেকে উচ্চাঙ্গের প্রযোজনার গোড়াকার খরচ জোটে।

পারির থিয়েটারগুলোর জাতিবিভাগ আছে; যেটাতে অপেরা হয় সেটাতে কেবল অপেরাই হয়, যেটাতে কমেডি হয় সেটাতে কেবল কমেডিই হয়, যেটাতে ক্লাসিক (গ্রিক নাটকের অভিনয়) হয় সেটাতে কেবল ক্লাসিকই হয়। লণ্ডনে কোনো স্থায়ী অপেরা গৃহ নেই এবং জাতিবিভাগ নেই। একটি স্থায়ী অপেরার স্কিম চলেছে, কিন্তু গভর্নমেন্ট এক পেনিও সাহায্য করবে না এবং জনসাধারণও যথা প্রয়োজন শেয়ার কিনবে কি না সন্দেহ। সুতরাং, যতদূর দেখছি লণ্ডনের ভাগ্যে আছে ভ্রাম্যমাণ অপেরার দলগুলির মধ্যে মধ্যে

শুভাগমন। তাদের মধ্যে যেগুলি খাঁটি ব্রিটিশ সেগুলি গভর্নমেন্টের সাহায্য পায় না বলেই হোক কিংবা জনসাধারণের ঔদাসীন্যবশতই হোক কন্টিনেন্টাল দলগুলির কাছে মাথা তুলতে পারে না। কন্টিনেন্টাল দলগুলিতে অনেক দেশের শিল্পীরা যোগ দেয়, তাদের পেছনে অনেক দেশের টাকার জোর। পারির যেটি স্থায়ী অপেরাগৃহ সেটি পৃথিবীর বৃহত্তম রঙ্গালয়, তার পেছনে সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে, তার সাজসজ্জা বহুকালগত, তার নট-নটীরা সমাজে বিশিষ্ট সম্মান পায়, তাতে তাদের গভর্নমেন্ট অনেক টাকা ঢালে ও সেটি তাদের জাতীয় সম্পত্তি*। অথচ তার সিটগুলি যথেষ্ট সস্তা। পারির দরিদ্রতম শ্রমিকও তার নিম্নতম শ্রেণির দাম জোটাতে পারে। ধনী দরিদ্র সকলেরই জন্যে শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা মহার্ঘ বেশভূষা পরে মহৈশ্বর্যময় স্টেজে অবতীর্ণ হন। পারির অন্যান্য থিয়েটারগুলোরও প্রযোজনা খুব চমকপ্রদ, অথচ সিট আরও সস্তা; চার আনা দিয়ে তিন ঘণ্টা আমোদ উপভোগ করতে পারা যায়। তবে এটা ঠিক, লণ্ডনের সিটের আরাম পারির সিটে নেই, লণ্ডনের লোক চেয়ার ছেড়ে কাঠের বেঞ্চিতে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসতে চাইবে না। পারিতে অনেক শ্রেণির সিট আছে, অন্তত দশ-বারো শ্রেণির; কিন্তু উচ্চতম থেকে নিম্নতম অবধি অল্প দামের ক্রমান্বিত ব্যবধান চার আনার পরে ছ-আনা, ছ-আনার পরে আট আনা, এমনি করে সবচেয়ে দামি সিট হয়তো চার টাকা। লণ্ডনে কিন্তু এক টাকার পরে দু-টাকা তার পরে তিন টাকা, এমনি করে সবচেয়ে দামি সিট হয়তো পনেরো টাকা। সেইজন্যে ইংরেজরা থিয়েটারের চেয়ে সিনেমাই দেখে বেশি, গরিব লোকদের সংগতি নেই বলে তাদের রসবোধ অচরিতার্থ থেকে যায়। ইংরেজরা আর্টকে সর্বসাধারণের হাতে দেবার মতো স্বল্পব্যয়সাধ্য করতে পারেনি, (এদিকে একমাত্র সফল প্রচেষ্টা ‘Old Vic’), সেইজন্যে আর্ট এদের কাছে গঙ্গাজলের মতো ন্যাশনাল নয়। আমরাও যে গ্রামের লোককে গ্রামছাড়া করে শহরের কোণে কোণে বস্তি গড়ছি আমাদেরও ভাবা উচিত গ্রামের যাত্রা পার্বণ কথকতা থেকে ও শহরের নাট্য সংগীত ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত হয়ে তারা সমগ্র দেশকে নিরানন্দ করে তুলছে কি না। নাগরিকতার নাগপাশে জড়িয়ে ইংল্যাণ্ডের আত্মা যে একান্ত ক্লিষ্ট বোধ করছে ইংল্যাণ্ডের অসামান্য স্বাস্থ্যের আড়ালে ঢাকা পড়লেও তা সত্য। নাগরিক ইংল্যাণ্ড প্রাণবান কিন্তু অমৃতবান নয়, অজর কিন্তু অমর নয়।

ফরাসিদের আর একটা জাতীয় সম্পদ তাদের মিউজিয়ামগুলো। জগৎপ্রসিদ্ধ লুভর ছাড়া লুকশাঁবুর্গ, ত্রোকাদেরো, গিমে ইত্যাদি আরও ডজন খানেক ছোটো-বড়ো মিউজিয়াম আছে পারিতে। লুভরের ঐশ্বর্যের তুলনাই হয় না, তার আকার এত বড়ো যে সেটা একটা জাদুঘর নয় একটা জাদুপাড়া; সমস্তটি একবার চোখ বুলিয়ে দেখতে দু-দিন লেগে যায়। Venus de Milo-কে একটা স্বতন্ত্র ঘর দেওয়া হয়েছে, সে-ঘরে তার বন্ধুদের জন্যে চমৎকার বসবার বন্দোবস্ত রয়েছে, সেসব আসনে বসে যেকোনো কোণ থেকে তাকে নিরীক্ষণ করতে পারা যায়; বলা বাহুল্য যে-দিক থেকেই দেখি-না কেন সব দিক থেকেই সে সমান সুদর্শনা। তাজমহলকে যেমন বার বার নানা আলোকে দেখেও চির-অপূর্ব মনে হয়, গ্রিক ভাস্করের এই মানসী মূর্তিটিকেও তেমনি। তবে আমার ভারতবর্ষীয় চোখ নিছক রূপ দেখে তৃপ্তি পায় না, এবং বিউটিফুলের অতৃপ্তির চেয়ে সাব্লাইমের তৃপ্তিই তাকে প্রগাঢ়তর রস দেয়। সেইজন্যে ‘প্রজ্ঞা পারমিতা’-র ওপরে তার একটা পক্ষপাত আছে, সে-পক্ষপাত নিয়ে সে বিশ্বের সামনে তর্ক করতে চায় না, সেটা ভারতবর্ষীয় ধাতের পক্ষপাত।

আমাদের কালিদাস যে নীতিনিপুণ ছিলেন এহেন অপবাদ তাঁকে তাঁর শত্রুতেও দেবে না, আশা করি স্বয়ং দিঙনাগাচার্যও দেননি। সেই শিল্পীই কিনা উমাকে শেষকালে জননীরূপে না এঁকে তৃপ্তি পেলেন না। ফুলবতীর চেয়ে ফলবতী লতার প্রতি আমাদের ধাতুগত পক্ষপাত ‘উর্বশী’-র কবিকেও ‘কল্যাণী’ লিখিয়েছে। পারফেকশন নয়, পরিণতিই আমাদের প্রিয়; এবং নীতি নয় রুচিই আমাদের অন্তর্মুখীন করেছে। বিবসনা শ্যামাকে মা বলতে পারি তো বিবসনা Venus-কেও প্রিয়া বলতে পারতুম, তবু যে বলিনে এর কারণ যতই নিখুঁত হোক না-কেন Venus-এর পরিণতি নেই, বৃদ্ধি নেই। সে আমাদের শুধু একটা রসই দেয়, জীবনের

সমস্ত রস দেয় না। তার মধ্যে আমাদের কুমারের জননীকে দেখিনে—'নহ মাতা নহ কন্যা নহ বধূ সুন্দরী রূপসী।'

লুভর মিউজিয়ামে 'মোনালিসা'-কেও (লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি-কৃত) দেখলুম। তার সেই রহস্যময় হাসি মানুষের পিছু নেয়, তাকে ভোলবার সাধ্য নেই, ইচ্ছা করলেও চেষ্টা করলেও ভুলতে পারিনে। লুভরে কিছু না-হোক লাখ খানেক ছবি তো আছেই, পৃথিবীর সেরা শিল্পীদের আঁকা। কেমন করে বলব যে তার চেয়ে কেউ সুন্দরী নয়? তখন তো মনে হচ্ছিল অনেকেই সুন্দরতরা। একে একে সকলেই মিথ্যা হয়ে গেছে স্বপ্নদৃষ্টার মতো। প্রভাতী তারার মতো চোখে লেগে আছে শুধু 'মোনালিসা'-র হাসিটি।

ফরাসিরা এসব ছবি এসব মূর্তি নানা উপায়ে সংগ্রহ করেছে, সব উপায় সাধুও নয়। এদের অনেকগুলি যুদ্ধলব্ধ। রাজ্য জয় করে অনেক বিজেতা অনেক রত্নই হরণ করে, কিন্তু ফরাসিরা হরণ করেছে শিল্পসম্ভার। ফরাসিদের হারিয়ে দিয়ে বিসমার্ক অনেক কোটি স্বর্ণমুদ্রা আদায় করেছিলেন, সে-সোনা এতদিনে ধুলা হয়ে গেছে, জার্মানি এখন পুনর্মূষিক। কোন জাতি কোন জিনিসকে বেশি দাম দেয় তাই নিয়েই তার ইতিহাস। ভারতবর্ষ যদি আত্মাকে সত্যিই তার সর্বস্ব দিয়ে কিনে থাকে তবে ভারতবর্ষের আত্মা মরবে না।

ইংল্যাণ্ডের ব্রিটিশ মিউজিয়াম প্রভৃতি জাতীয় সম্পদ দেখে যা মনে হয়েছিল ফ্রান্সের লুভর ত্রোকাদেরো প্রভৃতি জাতীয় সম্পদ দেখে তাই মনে হল। ভাবলুম ইংল্যাণ্ডে ফ্রান্সে জন্ম নিয়ে আত্মিক সুবিধা আছে, বাল্যকাল থেকেই মিউজিয়াম দেখতে দেখতে মানুষ হব। বিশ্বমানবের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়ে সৃষ্টিরহস্য ভেদ করে, তখন যদি আর্টক্রিটিক হয়ে উঠি তো বাংলা মাসিকপত্রের মাসিক সাহিত্য সমালোচনা করতে গিয়ে রসবোধের শ্রাদ্ধ করব না, চোখ পাকবে কিন্তু মন পাকবে না, প্রতিদিন একটু করে বড়ো হব কিন্তু বুড়ো হব না, আমার প্রাচীন দেশের পরিপক্ক শিক্ষাকে আমার চিরতরুণ অন্তরে ধারণ করব এবং প্রতি দেশের নিজস্ব শিক্ষাকে আমার নিজস্ব শিক্ষার মধ্যে গ্রহণ করব।

ফরাসি জাতিটা হচ্ছে যাকে বলে কসমোপলিটান। এর মানে এ নয় যে ওরা বিশ্বপ্রেমিক, এর মানে ওরা বিশ্বচেতন। প্রমাণ ওদের পথঘাটের নামগুলো। পৃথিবীর সব দেশের ইতিহাস ও সব দেশের ভূগোল পড়বার যাঁদের সময় নেই তাঁরা কেবল পারির মানচিত্রখানার ওপরে চোখ বুলিয়ে যান, দেখবেন রাস্তার নাম লণ্ডনের মতো প্রত্যেক পাতায় একটা করে Old Street, New Street. High Street ও Park Road নয়, রাস্তার নাম Moscou, Tokio, Pekin, Constantinople ইত্যাদি ও President Wilson, Edouard VII, Garibaldi, Hausmann ইত্যাদি। প্লাসের নাম Etats-unis (ইউনাইটেড স্টেটস,) Italie, Europe ইত্যাদি ও রেলস্টেশনের নাম George V, St. Francis Xavier, Michel-Ange (মাইকেল এঞ্জেলো) ইত্যাদি। এ ছাড়া স্বদেশের মহাপুরুষ মাত্রেরই ও স্বদেশের প্রতি অংশের নাম পারির সর্বাঙ্গে বৈষ্ণবের সর্বাঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামের মতো ছাপা। ফ্রান্সের লোকের দেশাত্মজ্ঞান অমনি করেই হয় বলেই তাদের দেশাত্মবোধ আপনা-আপনি জন্মায়। শৈশব থেকেই তারা পথে চলতে চেনে তাদের জাতীয় পূর্বপুরুষদের—যাদের নিয়ে তাদের ইতিহাস লেখা হয়েছে; আর দেশের প্রতি জেলার প্রতি শহরের প্রতি পর্বতের নাম—যাদের কোলে তাদের অখণ্ড জাতি লালিত হয়েছে। স্বদেশকে চেনে বলেই তারা স্ববিশ্বকেও চিনতে পারে।

এদেশে স্বতন্ত্র বর্ষা ঋতু নেই বলে প্রত্যেক ঋতুই অংশত বর্ষা ঋতু। সময় নেই অসময় নেই বর্ষা ঋতুর বর্গিরা অপর ঋতুদের খাজনা থেকে চৌথ আদায় করে যায়। সকাল বেলা শুয়ে শুয়ে দেখলুম আলোতে ঘর ভরে গেছে, ফুটফুটে খোকার মুখে হাসি আর ধরে না, আকাশের সেই হাসি তরুণী ধরণির মাতৃমুখখানিকে পুলকে গর্বে উজ্জ্বল করে তুলেছে। এটা বসন্তকাল। কোকিলের কুহু শুনছিনে, কিন্তু সমস্ত দিন কত পাখির কিচিমিচি। গাছেরা নতুন দিনের নতুন ফ্যাশন অনুযায়ী সাজ বদলে ফেলেছে, তাদের এই কাঁচা সবুজ রঙের ফ্রকটিকে তারা নানা ছলে দেখাচ্ছে, ঘুরে ফিরে দেখাচ্ছে, আধেক খুলে দেখাচ্ছে। বাতাস একজন গ্যালান্ট যুবার মতো তাদের শ্রীমুখের তুচ্ছতম মামুলিতম কায়দাদুরস্ত ফরমাশ শুনবে বলে উৎকর্ণ হয়ে নিমেষ গুনছে এবং শুনবামাত্র শশব্যস্ত হয়ে দিগ্বিদিক ছুটে বেড়াচ্ছে। তার সেই ব্যস্ততার উষ্ণ স্পর্শ পেয়ে উঠে বসলুম। ভাবলুম এবারকার বসন্তটাকে এক ফার্দিং-ও ফাঁকি দেব না, পরিপূর্ণভাবে ভোগ করে নেব। আকাশ এত নীল, মাটি এত সবুজ, বাতাস এত কবোষ্ণ, পাখি এত অস্থির, ফুল এত অজস্র—এই ভরা ভোগের মাঝখানে আমি যদি আনমনা থাকি তো আমার শিরশি চতুরানন কী না লিখবেন?

কিন্তু, এ কী হা হন্ত কোথা বসন্ত! দেখতে দেখতে এলেন কিনা ইন্দ্ররাজের ঐরাবতের পাল, স্বর্গরাজ্যের স্কুলমাস্টার তাঁরা, অত্যন্ত পক্ব প্রবীণ অভ্রান্ত তাঁদের গুম্ফশ্মশ্রু-ধবল বদনমন্ডল। তাঁদের স্থূল হস্তাবলেপনে আকাশের চোখ ফেটে জল পড়তে লাগল, তার সদ্যোজাত লাবণ্য গেল এক ধমকে মলিন হয়ে। হায় হায় করে উঠল পৃথিবীর জননী-হৃদয়টা।

এদেশের এই খেয়ালি ওয়েদার দু-দিনেই মানুষকে মরিয়া করে তোলবার পক্ষে যথেষ্ট। বার বার আশাভঙ্গের মতো পরীক্ষা আর নেই, প্রতিদিন সেই একই পরীক্ষা। সকালের আশা দুপুরে ভাঙে, রাত্রের আশা সকালে ভাঙে। নিত্য অনিশ্চয়ের মধ্যে বাস করতে করতে জীবনের ফিলসফিটাই যায় বদলে। মনে হয়, দূর হোক ছাই, বাইরের কাছ থেকে খুব বেশি প্রত্যাশা করব না, কালেভদ্রে যখন যেটুকু পাই তখন সেইটুকুকেই হাতে হাতে ভোগ করে নিতে প্রস্তুত থাকি, অন্যমনস্কভাবে লগ্ন না বইয়ে দিই, কিংবা চপল লগ্নকে রয়ে-সয়ে ভোগ করতে গিয়ে মুখের গ্রাস থেকে বঞ্চিত না হই।

বাইরের কাছ থেকে আনুকূল্য না পেয়ে ইংল্যাণ্ড একদিকে হয়েছে ভোগগ্রাহী, অন্য দিকে হয়েছে ভোগসংগ্রাহী। সে বাইরে থেকে যা পায় তার তলানি অবধি শুষে নেয়, যা পায় না তাকে প্রাণপণে অর্জন করে। বার বার আশাভঙ্গজনিত অনিশ্চয়তাকে অভিভূত করতে পারলে সে কবে মরত, কিন্তু ওতে তাকে অভিভূত করা দূরে থাক, তার জেদ বাড়িয়ে দিয়েছে। বাইরের সঙ্গে তার যে পরিচয় সে যেন 'খড়্গে খড়্গে ভীম পরিচয়।' প্রতিপক্ষকে হার মানাবে বলে সে প্রতিপক্ষের নাড়িনক্ষত্র জেনে নিয়েছে—সেই হচ্ছে তার বিজ্ঞান। জগৎটাকে মায়া বলবার মতো সাহস যে তার হয়নি তার কারণ মরীচিকা দেখতে পাবার মতো চোখ-ধাঁধানো সূর্যালোক এদেশে দুর্লভ। যা পায় তাকে অনিত্য বলে ত্যাগ করবার মতো বাবুয়ানাও তার সাজে না, কেননা সে যা পায় তা অপ্রসন্না প্রকৃতির বাম হস্তের মুষ্টিভিক্ষা, আর আমরা যা পাই তা অন্নপূর্ণা প্রকৃতির অঞ্জলিভরা দান। ভিক্ষা করে এদেশে একমুঠো ভিক্ষার সঙ্গে এক মুঠো অপমান মেলে যে, নিতান্ত দায়ে ঠেকলে ভিক্ষার চেয়ে উদবন্ধনই হয় শ্রেয়। অথচ ভিক্ষা করাটা আমাদের উপনয়নের অঙ্গ, সন্ন্যাসের অবলম্বন, আমাদের শিব স্বয়ং ভিখারি। অবশেষে এমন দাঁড়িয়েছে যে, আমাদের দেশে সন্ন্যাসী যত আছে গৃহস্থ তত নেই, মুখের চেয়ে হাতের সংখ্যা কম, পুরুষকারের অভাবে দেশজোড়া ক্লৈব্য। সেইজন্য ভোগের নামটা পর্যন্ত আমাদের কানে অশ্লীল।

ইংল্যাণ্ডের মানুষের একমাত্র ভাবনা সে জীবনটাকে এনজয় করতে পারছে কি না; এনজয় করা ছাড়া তার কাছে জীবনের অন্য কোনো মানে নেই। ভোগের জন্যে সে প্রাণপণে ভুগেছে, বার বার আশাভঙ্গ সত্ত্বেও প্রাণ ভরে আশা রেখেছে, যে-লক্ষ্মীকে সে অর্জন করল তাকে যদি সে ভোগ করতে না পারল তবে তার জীবনটাই ব্যর্থ হল। তার স্ত্রীকে তো সে পিতার হাত থেকে পায়নি যে অতি সহজে ত্যাগ করে

সন্ন্যাসীয়ানা করবে! সে স্বয়ংবর সভার বীর, প্রকৃতি তার ভোগ্যা। প্রকৃতিকে এড়াবার তপস্যা তার নয়—মুক্তি নয়, ভুক্তিই তার লক্ষ্য; এর জন্যে যে-ক্ষমতা চাই সেই ক্ষমতার তপস্যাই ইংল্যাণ্ডের তপস্যা।

ইস্টারের ছুটিতে লণ্ডনের বাইরে গিয়ে ভোগের চেহারা দেখলুম। তপস্যার জন্যে কাজের জন্যে লণ্ডন! ভোগের জন্যে ছুটির জন্যে সমস্ত ইংল্যাণ্ড। যেখানে যাই সেখানে দেখি অসংখ্য হোটেল, বোর্ডিং হাউস, সরাই, রেস্তরাঁ; পেয়িং গেস্ট রাখতে ইচ্ছুক গৃহস্থবাড়ি। সর্বত্র মোটরগম্য মজবুত তকতকে রাস্তা। সমুদ্রতীরবর্তী স্থানগুলিতে স্নান, সাঁতার, নৌচালনার আয়োজন। কোথাও মাছধরা, কোথাও শিকার-করা। সর্বত্র টেনিস কোর্ট, সর্বত্র গলফ কোর্স। এমন স্থান অতি অল্পই আছে যেখানে সিনেমা নেই, টেলিগ্রাফ-টেলিফোন-ডাকঘর নেই, সারকুলেটিং লাইব্রেরি নেই। যার যতদূর সাধ্য সে ততদূর খরচ করে ছুটি কাটাতে যায়, অত্যন্ত স্বল্পবিত্তদের পক্ষেও এর ব্যতিক্রম হয় না। আমাদের যেমন তীর্থযাত্রার বাতিক, এদের তেমনি হলিডে হ্যাবিট। কাজের সময় যেমন কাজকে এক মিনিট ফাঁকি দেয় না, ছুটির সময় তেমনি ছুটিকে এক সেকেণ্ড ফাঁকি দেয় না। ছুটি পেলেই এক-একখানা সুটকেস হাতে করে বালকবৃদ্ধবনিতা কর্মস্থল ছেড়ে ক্রীড়াস্থলে রওয়ানা হয়। তারপর একস্থানে যতদিন খুশি হোটেলবাস, char-a-banc পূর্বক স্থান পরিক্রমা, খেলাধুলার ধুম, পানাহারের আড়ম্বর, নাচ-গানের মজলিশ। গত যুগের পূজাপার্বণ আর নেই, দেড় শতাব্দীর ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন ইংল্যাণ্ডের চেহারা বদলে দিয়েছে। কর্মের সঙ্গে ধর্মের এবং ছুটির সঙ্গে পার্বণের যে সোদর সম্বন্ধ ছিল এখন সে-সম্বন্ধ অনেক দূর সম্বন্ধ, মাঝখানে অনেক পুরুষ গত হয়েছে।

আমি যে-অঞ্চলে গিয়েছিলুম তার নাম আইল অব ওয়াইট। দ্বীপটির পরিধি প্রায় ৬০ মাইল, কিন্তু তারই মধ্যে গুটি আট-দশ ছোটো ছোটো শহর ও বিশ-পঁচিশটি ছোটো ছোটো গ্রাম। এই শহর ও গ্রামগুলির অধিকাংশই টুরিস্টজীবী। গ্রীষ্মকালে যেসব টুরিস্ট আসে তাদের খাইয়ে খেলিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাদেরই দৌলতে বৎসরের বাকি সময়টা নিশ্চিন্তে ঘুমোয়। তখন হোটেলগুলো খাঁ-খাঁ করতে থাকে, দোকানপাট কোনোমতে বেঁচেবর্তে রয়, খেলার মাঠে আগাছা গজায়। স্থানীয় লোকগুলি সাধারণত চাষা-মুদি-রুটিনির্মাতা-মাঝি-জেলে-মজুর। তবু এরাই নিজেদের প্রতিনিধি দিয়ে এইসব শহর গ্রাম শাসন করে। খুব ছোটো ছোটো গ্রামগুলিতেও স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত।

শহর যেমন সব দেশেই প্রায় একইরকম, গ্রামও দেখলুম সব দেশেই প্রায় একরকম। মুক্ত প্রকৃতির মাঝখানে ইট-পাথরের দেয়ালের ওপরে খড়ের চালা বা টালির ছাদ, দেয়ালের গায়ে লতা উঠেছে, ছাদের উপর ঘাস গজিয়েছে—এরই নাম কটেজ। তবে নতুনের সঙ্গে সন্ধি না করে পুরাতনের গতি নেই। সংকীর্ণ গবাক্ষ কিন্তু কাচের শার্সি, সেকেলে গড়ন কিন্তু একেলে সরঞ্জাম। মুদির দোকানে ডাকঘর বসেছে, তামাক-চকোলেটের দোকানে টেলিফোনের আড্ডা, রেলস্টেশনের ভিতরে সস্ত্রীক স্টেশনমাস্টারের আস্তানা। প্রত্যেক গ্রামে ছেলেদের খেলার মাঠ আছে, পাবলিক লাইব্রেরি আছে। স্কুলের চেয়েও এ দুটো জিনিস উপকারী। স্কুলের সংখ্যা কমে এ দুটোর সংখ্যা বাড়লে ছেলেগুলি বাঁচে। শিক্ষার নামে শিশুমনের ওপর যে-বলাৎকার সব দেশেই চলে এসেছে এ যুগের শিশু সে-বলাৎকার সহ্য করবে না। শিশুও চায় স্বরাজ। তার নিজস্ব শিক্ষা সে নিজেই খুঁজে নেবে।

শহর ও গ্রামগুলি যেমন পরিষ্কার তেমনি পরিপাটি। ক্ষুদ্রতম গ্রামেরও পথঘাট অনবদ্য এবং বাড়িঘর সুখদৃশ্য। অতি দরিদ্র ঝাড়ুদার (চিমনি-সুইপ) যে-বাড়িতে থাকে সে-বাড়ির বাইরে বেল আছে, তার কাচের জানালার ওপাশে ধবধবে পর্দা, যথাস্থানে সন্নিবেশিত অল্পবিস্তর আসবাব; সমস্ত গৃহটির বাইরে-ভিতরে এমন একটি শৃঙ্খলা ও পারিপাট্যের আভাস যে তেমনটি আমাদের ধনীদের গৃহেও বিরল। ধন নয়, মনই রয়েছে এর পিছনে; সে-মন ভোগ-তৎপর মন। সেটি যদি থাকে তো উপকরণের অভাব হয় না; যা জোটে তাকেই কাজে লাগানো যায়, যা জোটে না তাকে অর্জন করে নেওয়া যায়। এ সংকেত আমরা জানিনে, কেননা পরলোকে বাসা বাঁধবার ব্যস্ততায় ইহলোকের বাসাকে আমরা এক রাত্রির পান্থশালা ভেবে এসেছি, তার প্রতি আমাদের দায়িত্ব মানিনি। যে-দেহে বাস করি সে-দেহকে যেমন অনিত্য ভেবে অনাস্থা দেখাই, যে-গৃহে

বাস করি সে-গৃহকেও তেমনি অনিত্য ভেবে অবহেলা করি। এদিকে কিন্তু ইহলোককে এরা মরেও ছাড়তে চায় না, কফিনের ভিতরে শুয়ে মাটিকে আঁকড়ে ধরে। এদের বিশ্বাস জগতের শেষ দিন অবধি এদের এই মাটির শরীরখানা থাকবে।

তা ছাড়া আমার মনে হয় এ দেশের এই গৃহ-পারিপাট্য ও পরিচ্ছদ-পারিপাট্যের মূলে রয়েছে এদেশের নারীশক্তির সক্রিয়তা। আমাদের ইহবিমুখ ধর্ম হচ্ছে নারীবিমুখ ধর্ম, আমাদের একান্নবর্তী পরিবারে নারীর অন্তরের সায় নেই, আমাদের গৃহ নারীর সৃষ্টি নয় এবং গৃহের বাইরেও নারী আমাদের সৃষ্টি করতে পায় না। ইংল্যাণ্ডের নারী তার স্বামীগৃহের রানি, শাশুড়ি জা-দের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নেই, নিজের ঘরের সমস্ত দায়িত্ব এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তার হাতে, সেইজন্যে ইংল্যাণ্ডের গৃহিণীর হাত এক মুহূর্ত বিশ্রাম পায় না, ঘরটির ঝাড়া-মোছা ঘষা-মাজাতে সর্বক্ষণ ব্যাপৃত। সন্তান সম্বন্ধেও ঠিক তেমনি দায়িত্ব এবং ততখানি স্বাধীনতা। জা শাশুড়ির সাহায্য নেই হস্তক্ষেপ নেই। ইংল্যাণ্ডের ছেলেরা 'হোম' নামক যে-জিনিসটি পায় সেটির একদিকে মা অন্যদিকে বাবা, মাঝখানে ছোটো-বড়ো ভাইবোনগুলি। সকালে-দুপুরে-সন্ধ্যায় এক টেবিলে সকল ক-টিতে মিলে খায়, রাত্রে এক অগ্নিস্থলে সকল ক-টিতে মিলে গল্প বা গান-বাজনা করে; অল্পে সম্পূর্ণ ছোটো একটুখানি নীড়। এর মধ্যে শৃঙ্খলারক্ষা সহজ, এর মধ্যে দায়িত্ব ভাগাভাগি করতে গিয়ে নিত্য কলহ নেই, এটা একটা বিরাট যজ্ঞশালার মতো কোলাহলমুখর নয়।

সে যা-ই হোক, ইংল্যাণ্ডের গৃহিণীদের কাছ থেকে আমাদের গৃহিণীদের অন্তত একটি বিষয় ভক্তিভরে শিক্ষা করবার আছে, সেটি গৃহের শৃঙ্খলাবিধান ও পারিপাট্যসাধন। নিজের আশপাশকে নিয়েই নারীর সৃষ্টি। নারীর আভামন্ডল হচ্ছে নারীর পরিচ্ছদ, নারীর গৃহ। কিন্তু আমাদের রন্ধনপর্ব এত অধিক সময় নেয় যে, তারপরে অন্য কিছু করবার না-থাকে অবসর না-থাকে বল। অথচ গ্যাসের উনুনের সাহায্যে এদেশে দরিদ্রতমা গৃহিণীরাও আধ ঘণ্টায় এক বেলার রান্না চুকিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত। তারপরে হায়ার পারচেজ প্রথার প্রবর্তন হয়ে অবধি গরিবের ঘরের আসবাবের নিঃস্বতা নেই, অনেকের একটি পিয়ানো পর্যন্ত আছে। কোন বিষয়ে খরচ কমিয়ে কোন বিষয়ে খরচ বাড়াতে হয় সেটা একটা আর্ট। খরচ কমানো মানে কেবল টাকার খরচ না, সময়েরও খরচ। আমাদের দেশে যা দাসীর কাজ এদেশের গৃহিণীরাও তা যন্ত্রের সাহায্যে সংক্ষিপ্ত করে স্বহস্তে সারেন। তার ফলে যে-টাকা ও সময় বাঁচে সে-টাকায় ও সময়ে বিদ্যাবতী-কলাবতী-স্বাস্থ্যবতী হওয়া যায়। গ্রামে দেখলুম প্রায় প্রত্যেকেরই বাগান আছে; সে-বাগানে বাড়ির মেয়েরাই কাজ করে, ছেলেরা বাইরের কাজে ব্যস্ত। লণ্ডনেও অনেক বাড়িতে ছোটো একটুখানি বাগান আছে, বাগানকে ইংরেজরা বড়ো ভালোবাসে। বাইরের কাজ থেকে ফিরে এসে বাগানের কাজ করা এদের অনেকেরই একটা হবি। গ্রামে দেখলুম অবসর পেলেই গৃহিণীরা সেলাই নিয়ে বসেছেন, গল্পগুজবে গা ঢেলে দিয়েও হাতের কাজটিতে ঢিলে দিচ্ছেন না। হাজারো বিলাসিতা করুক, এদেশের মেয়েরা উপার্জন করতে পটু, তথা উপার্জন বাঁচাতেও পটু। গ্রামের মেয়েদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয় কারুশিল্পের ও গার্হস্থ্য অর্থনীতির। জনপিছু ছ-পেনি খরচ করে কতখানি সাপার (নৈশ ভোজন) রাঁধা যেতে পারে কিংবা অল্প খরচে কী কী পোশাক স্বহস্তে তৈরি করা যেতে পারে—প্রতিযোগিতার এইরূপ বিষয় নির্দেশ করে দেন গ্রামের কর্তৃপক্ষ। অনেক বাড়িতে যে বাগান আছে সেই বাগানে পর্যটকদের চা খাইয়ে অনেকে সংসারের আয় বাড়ায়। এইসব 'টি-গার্ডেন' ছাড়া অনেকের বাড়িতে বা ফার্ম হাউসে দু-তিনটে ঘর খালি থাকে, সেখানে পেয়িং গেস্ট রাখা হয়। অধিকাংশ গৃহস্থের মুরগি শুয়োর গোরু ইত্যাদি প্রয়োজনীয় পোষ্য আছে। অর্থাগমের ও অর্থ সঞ্চয়ের যত উপায় আছে কোনোটাই কেউ পারতপক্ষে বাদ দেয় না।

গ্রামে দেখলুম সাইকেলের চল কিছু বেশি, এবং ওটা সাধারণত মেয়েদেরই যান। মেয়েরা ওই চড়ে বাজার করতে যায়। ছেলেরা চড়ে মোটর সাইকেল। তবে মেয়েরা যেমন উঠেপড়ে লেগেছে আর-কিছুকাল পরে ওটাও হবে প্রধানত মেয়েলি যান। এরোপ্লেনে করে আটলান্টিক অতিক্রম করতে গিয়ে মরাটাই হচ্ছে এখন তাদের আধুনিকতম ফ্যাশন। হিস্টিরিয়ায় মরার চেয়ে এটা তবু স্বাস্থ্যকর ফ্যাশন। মহাযুদ্ধের পর থেকে

ইউরোপে cult of joy-এর চর্চা বেড়েছে। যুবকরা জেনেছে যেকোনো দিন দেশের ডাকে প্রাণ দিতে হবে, এই নিষ্ঠুর যুগে প্রাণের মূল্য নেই, প্রাণ সম্বন্ধে সিরিয়াস কেউ নয়। সুতরাং যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আস। যুবতীরা জেনেছে পুরুষসংখ্যার স্বল্পতাবশত বিবাহ অনেকের ভাগ্যে নেই, আর্থিক অসচ্ছলতাবশত মাতৃত্ব আরও অনেকের ভাগ্যে নেই। সুতরাং, যতটুকু পাই হেসে লব তাই। ঘোরতর মোহভঙ্গের ভিতরে এ যুগের তরুণ-তরুণীরা বাস করছে। ছেলেদের চোখে ডেমোক্রেসির কালো দিকটা ধরা পড়ে গেছে, ঊনবিংশ শতাব্দীর সব আদর্শ খেলো হয়ে গেছে। জীবন নামক চিত্রিত পর্দাখানা তারা তুলে দেখছে এর পেছনে লক্ষ্য বলে কিছু নেই—শুধু বাঁচবার আনন্দে বাঁচতে হবে, হাসবার আনন্দে হাসতে হবে। এ যুগের তরুণ যত হাসে তত ভাবে না। মেয়েরা বুঝতে পেরেছে ভোট এবং আর্থিক অনধীনতাই সব কথা নয়, ওসব পেয়েও যা বাকি থাকে তার ওপরে জোর খাটে না, সেটা হচ্ছে পরের হৃদয়। এ যুগের মেয়েদের মতো দুঃখিনী আর নেই। তবু তারা পণ করেছে কিছুতেই কাঁদবে না, কিছুতেই হটবে না। জীবনের কাছ থেকে খুব বেশি প্রত্যাশা করা চলে না, এইটে এ যুগের ইউরোপের মূল সুর। যেটুকু আমাদের নিজেদের আয়ত্তগম্য সেইটুকুর ওপরে এ যুগের ইউরোপের ঝোঁক পড়েছে। সেইজন্যে এত দেহের দিকে নজর, যৌবনের দিকে নজর। ক্রমশই ইউরোপের লোকের স্বাস্থ্য বেড়ে চলেছে, আয়ু বেড়ে চলেছে, যৌবন বেড়ে চলেছে। সেই গর্বে এ যুগের অগ্রসরপন্থীরা খ্রিস্টীয় চরিত্রনীতি মানতে চায় না, ইউরোপে এখন পেগানিজমের যুগ ফিরে এসেছে, দেহের উৎকর্ষের জন্যে এখন চরিত্রের সাতখুন মাপ।

এ যুগের মানুষ নির্জনতাকে বাঘের মতো ডরায়, গ্রামের আদিম নির্জনতার ভয়েই সে শহর শরণ করেছে। শহরে অরুচি হলে মাঝে মাঝে মুখ বদলাবার জন্যে সে গ্রামে যায়, সেইসঙ্গে শহরে আমোদপ্রমোদ আরাম বিলাসগুলোকেও পুটলি বেঁধে গ্রামে নিয়ে যায়। প্রতি গ্রামের যে একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল নাগরিক সভ্যতার স্টিম রোলার তাকে থেঁতলে গুঁড়িয়ে সমতল করে দিচ্ছে। সেই সমতলের ওপর দিয়ে নাগরিকের দল char-a-banc চড়ে দু-ঘণ্টায় ষাট মাইল চক্কর দিয়ে যান, তারই নাম দেশভ্রমণ। এবং ছেঁটে কেটে সমান করে আনা দৃশ্যগুলোকে মুহূর্তমাত্র চোখে ছুঁইয়ে পরমুহূর্তে বিস্মৃতিরওয়েস্ট পেপার বাস্কেটের মধ্যে নিক্ষেপ করেন, তারই নাম দেশ দর্শন। তারপর সন্ধ্যা জুড়ে বন্ধ ঘরে সিগরেটের ধোঁয়ায় অন্ধকূপ রচনা করে সেই গর্তের মধ্যে সিনেমা দেখা এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে আহার-নিদ্রা-বিশ্রম্ভালাপ। কাজের দিনে ভূতের মতো খাটুনি, ছুটির দিনে অরসিকের মতো সময়ক্ষেপ।

শহরে এ জিনিস চোখে লাগে না, কিন্তু গ্রামে যখন এই জিনিস দেখি তখন কেমন খাপছাড়া ঠেকে, চারিদিকের সঙ্গে এর মেলে না। প্রকৃতি সেই আদিকালের মতো শান্ত সুস্থির আত্মস্থভাবে কাজের সঙ্গে ছুটির মিতালি করে গরজের সঙ্গে আনন্দের তাল রেখে একঠাঁই দাঁড়িয়ে একটি পায়ে নূপুর বাজাচ্ছে। আর মানুষ কিনা কাজকে দাসখত লিখে দিয়ে তার অনুগ্রহদত্ত অবকাশটুকু লাটিমের মতো ঘুরে অপচয় করছে। সমুদ্রের কলরোলের দিকে কান দেবার অবসর নেই, তৃণের সীমাহীন শ্যামলতার আহ্বানে চোখ সাড়া দেয় না। মাথার ওপরে উড়ছে এরোপ্লেন, সমুদ্রের ওপরে ভাসছে লাইনার জাহাজ, রাস্তা তোলপাড় করছে বাস মোটর, মাঠ তোলপাড় করছেন গলফ ক্রীড়ারত টেনিস ক্রীড়ারত মানব-মানবীর দল। গতিশীল সভ্যতা যে জীবনের আনন্দ বাড়িয়েছে এমন তো মনে হয় না, বাড়িয়েছে কেবল জীবনের উত্তেজনা। জীবনকে সচেতনভাবে ভোগ করা নয়, কোনোমতে হেসে-খেলে ভুলে কাটিয়ে দেওয়া। নির্জনতার মধ্যে নিজের সঙ্গে একলা থাকার মতো শাস্তি আর নেই। কাজে হোক অকাজে হোক কিছু-একটাতে ব্যাপৃত না থাকতে পারলে মনে হয় সময়টা মাটি হল, এই সময়টা অন্যেরা কাজে লাগাচ্ছে, ফুর্তি লুটছে। কাজের দিনে এক মুহূর্ত ধ্যানস্থ হবার জন্যে স্থির হবার জো নেই পাছে প্রতিযোগীর দল মাড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে যায়, পেছিয়ে পড়ে প্রাণে মরি। ছুটে চলার এই বেগ ছুটির দিনেও সংবরণ করতে পারিনে, নানা ব্যসনে নিজেকে ব্যস্ত রেখে মনে করি খুব এনজয় করছি বটে, এই তো সক্রিয় আনন্দ, এই তো জ্যান্ত মানুষের মতো। আসলে কিন্তু

এইটেই হচ্ছে চূড়ান্ত নিষ্ক্রিয়তা। ঢেউয়ের সঙ্গে ভেসে চলার চেয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ঢেউ ভাঙা বড়ো কঠিন আনন্দ। আত্মস্থ না হয়ে ভোগ নেই।

তবে এই একটা মস্ত কথা যে, একালের ব্যসন সেকালের মতো বলক্ষয়ী নয়। একালের মানুষ হয়তো দৃশ্য-গন্ধ-সংগীতের রসগ্রাহী নয়, কলার নামে কৃত্রিমতাকেই সে মহামূল্য মনে করে, বাস্তবতার অন্বেষণে সে কল্পনাবৃত্তি খুইয়েছে, প্রগাঢ় প্যাশনের পরিবর্তে উগ্র সেনসেশনই তার অনুভূতি জুড়েছে। তবু এসব সত্ত্বেও সে স্বাস্থ্যবান প্রাণবান বলবান। বিষপান করেও সে নীলকণ্ঠ, প্রচুর হাস্যরস তার স্বাস্থ্য বাড়িয়ে দিচ্ছে, অজস্র খেলাধুলা তার বল বাড়িয়ে দিচ্ছে, বিজ্ঞান তাকে আশ্বাস দিয়ে বলছে—'অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।'

আইল অব ওয়াইট বড়ো সুন্দর স্থান। নীল রঙের ফ্রেমে-বাঁধানো একখানি সবুজ ছবির মতো সুন্দর। তবে এদেশের সবুজ যেন আমাদের সবুজের মতো কান্ত নয়, স্নিগ্ধ নয়, কেমন যেন তীব্র আর ঝাঁঝালো। তৃপ্তি দেয় না, উন্মাদনা দেয়; ছাড়তে চায় না, টেনে রাখে; আবেশের চেয়ে জ্বালা বেশি। দ্বীপটির কোনো কোনো স্থল এত নিরালা যে নেশার মতো লাগে। দিন যেদিন উজ্জ্বল থাকে চোখ সেদিন তন্দ্রালসে নুয়ে পড়তে চায়। বাতাসে পাল তুলে দিয়ে নৌকা ভেসে যাচ্ছে। গম্ভীরভাবে ওপারের পাশ দিয়ে যাচ্ছে দূরদেশগামী জাহাজ। মাথার ওপরে চিলের মতো উড়ছে এরোপ্লেন—এত ওপরে যে তার বিকট কণ্ঠস্বর কানে পৌঁছোয় না। কানে বাজছে শুধু জলকণ্ঠের ছলাৎ ছল ছলাৎ ছল ছলাৎ ছল। তটকে যেন আদিকাল থেকে সেধে আসছে, তবু তার মান ভাঙাতে পারছে না। মাটি তার সবুজ চুল এলিয়ে দিয়েছে, যেমন তার রূপ তেমনি তার গন্ধ—ঘুমের থেকে প্রশান্তি কেড়ে নেয়, চেতনার থেকে প্রতীতি কেড়ে নেয়। সব মিলিয়ে মনে হতে থাকে—স্বপ্ন না মায়া না মতিভ্রম! সত্য কেবল ওই আপনভোলা শিশুগুলি, ওই যারা বালি দিয়ে ঘর তৈরি করছে, বাঁধ তৈরি করছে, ঘরের মধ্যে ভালোবাসার পুতুলকে রাখছে। সমুদ্রের এক ঢেউ এসে সব ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, ওরা তাই দেখে হো-হো করে হেসে উঠছে, আবার সেই ঘর ইত্যাদি।

গ্রামের লোকগুলিকে ভালো লাগল। বিদেশি দেখলেই সম্মান করে কুশল প্রশ্ন করে, সাহায্য করতে ছুটে আসে। শহুরে ইংরেজদের দেখে ইংরেজ জাতিকে যতটা নিঃশব্দপ্রকৃতি ভেবেছিলুম গ্রাম্য ইংরেজদের দেখে ততটা মনে হল না। সৌজন্যের চেয়ে বড়ো জিনিস সৌহার্দ্য। গ্রামের লোকের কাছে অল্পেতেই ও-জিনিস পাওয়া যায়। শহরের লোকের সঙ্গে বিনা ইনট্রোডাকশনে ভাব করবার উপায় নেই, যেটুকু আলাপ হয় সেটুকু ঘড়ির উপরে চোখ রেখে। কিন্তু গ্রামের লোকের হাতে কাল অন্তহীন। সময়কে তারা ফাঁকি দিতে ডরায় না, সময়ের মূল্য নামক কুসংস্কারটা তাদের তেমন জানা নেই। তাদের নিজেদের মধ্যে পরস্পরের মনের অন্তরঙ্গতা যেমন সব দেশে, তেমনি এদেশেও। নিজের গ্রামের যেকোনো লোকের সঙ্গে দেখা হলেই নমস্কার বিনিময়, সুখ-দুঃখের আলোচনা। মুখ গুঁজে না দেখার ভান করে পালাবার পথ খোঁজা নেই, কিংবা ওয়েদার সম্বন্ধে দুটো তুচ্ছ প্রশ্নোত্তর করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চুপ করে এক গাড়িতে ভ্রমণ করা নেই।

তবে গ্রাম্য সভ্যতার এখন দিন ঘনিয়ে এসেছে সব দেশে। ইংল্যাণ্ডে এখন পল্লিতে যত লোক থাকে তার তিন গুণ থাকে নগরে। ফ্রান্সে জার্মানিতেও ক্রমশ গ্রামকে শোষণ করে নগর মোটা হচ্ছে। Back to the village যে ভারতবর্ষে সম্ভব হবে এমন তো মনে হয় না। বড়োজোর গ্রাম থাকবে দেহে, তার আত্মা যাবে বদলে। গ্রাম্য সভ্যতার শবখানাতে ভর করবে নাগরিক সভ্যতার তালবেতাল। গ্রামগুলি হবে নগরেরই খুদে সংস্করণ। তা ছাড়া গ্রামে-নগরে ভেদরেখা কোনখানে টানব? লোকসংখ্যা বাড়লেই গ্রামের নাম হচ্ছে নগর। নগরে ও গ্রামে যে প্রভেদ সেটা আকৃতিগত নয়, আকারগত প্রভেদ। নগরেরই মতো গ্রামও হোটেলে ভরে যাচ্ছে, ভাড়াঘরে ভরে যাচ্ছে। এর মানে এই যে, এ যুগের মানুষ কোথাও স্থায়ী হতে চায় না। বেদেরা তাঁবু ঘাড়ে করে বেড়ায়, আমরা তা করিনে। অন্যলোক আমাদের জন্যে তাঁবু খাটিয়ে রাখে, সারাজীবন আমরা কেবল এক তাঁবু থেকে আরেক তাঁবুতে পাড়ি দিতে থাকি। এককালে আমরা যাযাবর ছিলুম, তারপর কোনো একদিন ধানের খেতের ডাকে ঘর গড়লুম, স্থিতিশীল হলুম। এখন আমরা বাণিজ্যের পণ্য নিয়ে ফেরিওয়ালার

মতো পথে বেরিয়ে পড়েছি, আমরা গতিশীল। পথও মনোহর, এতে শীত-আতপের কষ্ট আছে ধুলো-বালির ঝড় আছে, কোথাও কর্দম কোথাও কঙ্কর, তবু এও ভালো।

লণ্ডনের বাইরে গিয়ে দেখলুম লণ্ডনের জনতার ভিড়কে অন্যমনস্কভাবে ভালোবেসে ফেলেছি। কাউকে চিনিনে তবু সকলের প্রতি অজ্ঞাত টান। যেখানে যাই সেখানে দেখি লণ্ডনের লোক পরস্পরকে ঠিক চিনে নিচ্ছে। লণ্ডনে থাকলে যার সঙ্গে কোনোদিন নমস্কার বিনিময়টা পর্যন্ত হয়ে উঠত না, তার সঙ্গে অল্পেতেই ঘনিষ্ঠতা জন্মে যাচ্ছে। শহরের আড়ষ্টতা বাইরে থাকে না, আদবকায়দা চুলোয় যায়। শহর ছেড়ে যারা গেছে তাদের সেই অল্প কজনের মধ্যে কতকটা পারিবারিক সম্বন্ধের মতো দাঁড়ায়। তবে এটা দীর্ঘকালের নয় বলেই এত মধুর। সকলেই মনে মনে জানে যে, ছাড়াছাড়ি যেকোনো মুহূর্তে হতে পারে। বিচ্ছেদটা অনিশ্চিত নয়, মিলনটাই অনিশ্চিত। অবুঝের মতো ভাবতে ইচ্ছা করে, বলেও বসা যায় যে আবার দেখা হবে, পুনর্দর্শনায় চ। কিন্তু আঁধার রাতের অপার সমুদ্রের জাহাজ দুটির সেই যে সংকেত বিনিময়, সেই আরম্ভ সেই শেষ। তারপর মাথা খুঁড়লেও আর দেখা হবে না। যদি হয়ও তবে সে-দেখা বন্দরের সহস্র জাহাজের ভিড়ে। তখন জনতার টানে টানছে, জলের টান গায়ে লাগে না। তখন সে-দেখায় চমক থাকে না, মামুলি মনে হয়।

এটা পুনর্যাযাবরতার যুগ, আমরা সকলকেই চাই, কাউকেই চাইনে, আমাদের আলাপী বন্ধু শত শত, কিন্তু দরদি বন্ধু একটিও নেই। আমরা বিশ্বসুদ্ধ প্রসিদ্ধ লোকের নাড়ির খবর জানি কিন্তু আমাদেরই পাড়াপড়শিদের নাম পর্যন্ত জানিনে। পাড়াপড়শি দূরে থাক, আমাদেরই ফ্ল্যাটের নীচের তলায় যারা থাকে চোখেও তাদের দেখিনি। রেল-স্টিমার-এরোপ্লেনের কল্যাণে জগৎটা তো ছোটো হয়ে গেল, কিন্তু ঘরের মানুষকে যে মনে হচ্ছে লক্ষ যোজন দূর। তবু এও সুন্দর। আমরা পথিক, আমাদের স্নেহ প্রীতি বন্ধুতার বোঝা হালকা হওয়াই তো দরকার, নইলে পদে পদে বাঁধা পড়তে পড়তে চলাই যে হবে না। একটি প্রেমে আমরা সকল প্রেমের স্বাদ পেয়েছি, সেটি চলার পথের প্রেম। এর মধ্যে আর যা-ই থাক আসক্তি নেই। আমরা নিষ্কাম ভোগী, আমরা ভোগ করি লোভ করিনে, কেননা লোভ করলে থামতে হয়, আর পথে থামাই হচ্ছে পথিকের মৃত্যু।

এই ক-টি দিন সুধায় গেল ভরে। কয়েক দিন থেকে আলোর আর অবধি নেই, ভোর চারটের থেকে রাত (?) ন-টা অবধি আলো। যেদিন সূর্য থাকে সেদিন তো স্বর্গসুখ, যেদিন মেঘলা সেদিনও সুখ বড়ো কম নয়, কেবল আলো—সেও অনেকখানি। আর উত্তাপ কোনো দিন আমাদের ফাল্গুন মাসের মতো, কোনোদিন আমাদের চৈত্র মাসের মতো। আমার পক্ষে তো বেশ আরামের কিন্তু এদেশের লোকগুলি ছটফট করতে শুরু করেছে। এদের মতে এটা অকালগ্রীষ্ম। শীত বর্ষা কুয়াশা এদের গা-সওয়া হয়ে গেছে, ও নিয়ে এরা প্রতিদিন খুঁতখুঁত করে বটে কিন্তু ও-ছাড়া আর কিছু ভালোও বাসে না।

অবশ্য সাধারণের কথাই বলছি, কেননা অসাধারণেরা তো এখন কোনো দেশের বাসিন্দা নন, তাঁরা সব দেশের বাসাড়ে। তাঁরা শীতকালটা রিভিয়েরায় কাটান, বসন্তটা সুইটজারল্যাণ্ডে, গ্রীষ্মকালটা বরফের সন্ধানে কাটান, শরৎকালটা পৃথিবী পরিক্রমায়। তা বলে সাধারণরাও যে একই স্থানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেছে এমন নয়। তারাও এক শহর থেকে আরেক শহরে এবং এক দেশ থেকে আরেক দেশে বাসা বদলাতে লেগেছে। অসাধারণদের সঙ্গে তাদের তফাতটা কেবল এই যে, তাদের টান ছুটির টান নয়, কাজের টান। তবু কাজের টানে বারোমাস কেউ কর্মস্থলে কাটায় না, এক-আধ মাসের জন্যে হলেও দশ-বিশ ক্রোশ দূরে গিয়ে মুখ বদলিয়ে আসে। আর ছুটির টানে বারোমাস যাঁরা বিশ্বময় ঘুরপাক খাচ্ছেন তাঁরাও বড়ো সাবধানি পথিক, তাঁরা এজেন্সি নিয়ে বক্তৃতা দিয়ে কাগজে লিখে পাথেয় জোটান।

পাথেয় যে যেমন করেই জোটাক সকলেই একালে পথিক, কেউ একালে গৃহস্থ হতে চায় না। এই লণ্ডন শহরে কত ফরাসি ফ্যাশনজ্ঞ, জার্মান সংগীতজ্ঞ, ইটালিয়ান নৃত্যনিপুণ, রাশিয়ান পলাতক, দিনেমার চাষিদের এজেন্ট, চাটগেঁয়ে জাহাজের খালাসি, চাইনিজ কোকেন চালানদার ইত্যাদি নানা দিগদেশাগত মানুষ এক-আধ বৎসরের জন্যে বাসা বেঁধেছে। এ শহরে না পোষালে নিউ ইয়র্কে কিংবা বুয়েন্স এয়ার্সে ভাগ্যান্বেষণ করবে। এদের সামনে সারা পৃথিবী পড়ে রয়েছে, যেখানে যতদিন থাকতে পারে ততদিন থাকবে, তারপরে সুটকেস হাতে নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়বে।

রোজ এমন লোকের সঙ্গে দেখা হয় যে পৃথিবীর কোনো-না-কোনো অঞ্চলে কাটিয়ে এসেছে। কেউ জাহাজে কাজ নিয়ে হনলুলু ঘুরে এসেছে, কেউ সৈন্যদলে যোগ দিয়ে লড়ে এসেছে। রোজ এমন লোকও দেখি যে কিছু পয়সা জমাতে পারলে এখানকার ব্যবসা তুলে দিয়ে আর্জেন্টাইনায় ব্যবসা ফাঁদবে, কিংবা নিউজিল্যাণ্ডে চাকরি জোগাড় করবে। এদের কাছে পৃথিবীটা এত ছোটো বোধ হচ্ছে যে, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত যেন কলকাতা থেকে কাশী। এদের অপরাধ কী, আমারই তো এখন মনে হচ্ছে যেন ভারতবর্ষ ছোটো একটা দেশ, বম্বে কলকাতা ছোটো এক-একটা শহর। নিউ ইয়র্কের লোক জাহাজে চড়ে ছ-সাত দিনে প্যারি পৌঁছোয়, সেখানে বাড়ির লোকের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে। আর কিছুকাল পরে যখন প্যারির সঙ্গে নিউ ইয়র্কে এরোপ্লেন চলাচল সহজ হবে, তখন নিউ ইয়র্কে ডিনার খেয়ে প্যারিতে ব্রেকফাস্ট খেতে পারা যাবে, যেমন কলকাতায় ডিনার খেয়ে কাশীতে ব্রেকফাস্ট।

এর ফলে দেশে আর মানুষের মন টিকছে না, বিদেশের স্বপ্নে মন বিভোর। শনিবার হলেই চলো লণ্ডন ছেড়ে প্যারি, সেখানে রবিবারটা কাটিয়ে ফিরে এসো লণ্ডনে। পরের শনিবারে চলো বেলজিয়াম কিংবা হল্যাণ্ড। সাত দিনের ছুটি পেলে চলো জার্মানি কিংবা সুইটজারল্যাণ্ড। তিন সপ্তাহের ছুটি পেলে চলো নিউ ইয়র্ক কিংবা ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দেড় মাসের ছুটি পেলে চলো সাউথ আফ্রিকা কিংবা ইন্ডিয়া। ছ-মাসের ছুটি পেলে চলো ওয়ার্ল্ড টুরে। এগুলো অবশ্য জাহাজি যুগের মানুষের স্বপ্ন। এরোপ্লেনি যুগের মানুষ—অর্থাৎ এরোপ্লেন যখন জাহাজের মতো সস্তা ও নিরাপদ এবং সর্বত্রগামী হবে তখনকার মানুষ অফিসের ঘড়িতে ছ-টা বাজলেই ছুটবে প্যারির এরোপ্লেন ধরতে। এখন এরোপ্লেনে প্যারি পৌঁছোতে তিন ঘণ্টা লাগছে, তখন লাগবে দেড় ঘণ্টা। সুতরাং ডিনারের সময় প্যারিতে হাজির হতে পারবে। শনিবার হলে সে ভাববে যাওয়া যাক ইজিপ্টে, রবিবারটা পিরামিড দেখে সোমবার সকালে পৌঁছে ব্রেকফাস্ট খেয়ে লণ্ডনের অফিসে আসা

যাবে গাধাখাটুনি (ড্রাজারি) খাটতে। খাটুনির ফাঁকে রেডিয়োতে শোনা যাবে বুয়েন্স এয়ার্সের ট্যাঙ্গো নাচের বাজনা আর টেলিভিশনে দেখা যাবে সেই নাচের দৃশ্য। ওই উত্তেজনায় আরও কিছুক্ষণ গাধাখাটুনি সুসহ হবে। তারপরে ছুটি, প্যারি গমন, রাত্রিভোজন, থিয়েটার দর্শন, নিদ্রা।

আমাদের নাতি-নাতনিরা ভাববে, এই তো জীবন! আমরাই তো সেন্ট পারসেন্ট বাঁচছি! আমাদের পূর্বপুরুষগুলো কি বাঁচতে জানত? ছিল ওদের আমলে এমন সব পাড়াময় শহরময় হোটেল? পেত ওরা এমন সব কলে তৈরি বিশুদ্ধ হাইজেনিক খাবার? পারত ওরা নিউ ইয়র্কের ব্যাণ্ড শুনতে শুনতে কলকাতায় নাচতে? সারা জগতের কোথায় কী ঘটছে তা চোখে দেখতে দেখতে বিশ্রামকাল কাটাতে? ওদের সময় নাকি স্নেহ প্রেম আতিথ্য ইত্যাদির ছড়াছড়ি ছিল—বাজে কথা। ওদের সময় গ্রামে গ্রামে মামলা-মোকদ্দমা দেশে দেশে যুদ্ধ লেগেই থাকত—ইতিহাসে লেখে। মেয়েরা নাকি গৃহকোণে বন্দি হয়ে স্বামী-পুত্রের সেবা করত—ধিক। মেয়েদের যেন নিজস্ব প্রতিভা নেই, তারা যেন পুরুষের মতো তাই নিয়ে দিনরাত ব্যাপৃত থাকতে পারে না, তাদের যেন পাবলিকের প্রতি দায়িত্ব নেই, তারা থাকবে স্বার্থপরের মতো গৃহসংসার নিয়ে!

হায়! গতি-গর্বে গর্বিত হয়ে ওরা তো বুঝবে না ওদের পূর্বপুরুষদের স্থিতিসুখ। ওরা যখন ঘণ্টায় একশো মাইল বেগে এরোপ্লেন চালিয়ে থ্রিলের আতিশয্যে মূর্ছাসুখ পাবে, তখন তো ওরা বুঝবে না গোরুর গাড়িতে চড়ে ঘণ্টায় এক মাইল অগ্রসর হবার তন্দ্রাসুখ। মার্স ভিনাসের সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধাবার উত্তেজনায় ওরা ভুলে থাকবে আমাদের ভাইয়ে ভাইয়ে দাঙ্গা বাঁধাবার উত্তেজনা। পৃথিবীটাই যখন ওদের আরাম করে পা ছড়াবার পক্ষে নিতান্ত অপরিসর ঠেকবে তখন ওরা কী করে বুঝবে আমার নগণ্য আঙিনাটুকুই আমার স্ত্রীর চোখে কত বৃহৎ বলে সে-বেচারি লজ্জায় ভয়ে ঘোমটা টেনে দেয়। আমাদের সেই রাত ভোর করে বেলা দশটা অবধি যাত্রা দেখা, দুপুর বেলা ঘুম দিয়ে রাত ন-টায় ওঠা, একটি গ্রামে একটা জীবন সাঙ্গ করেও তৃপ্তি না মানা, ভান্ডের মধ্যে ব্রহ্মান্ডকে দেখা—এসব ওদের কাছে তুচ্ছ মনে হবে। 'সেকেলে' বলে ওরা আমাদের অবজ্ঞা করবে।

তা করুক, কিন্তু একথা আমরা কোনো মতেই স্বীকার করব না যে, কোনো একটা যুগ কোনো আরেকটা যুগের চেয়ে সুখের, কোনো এক যুগের মানুষ কোনো এক যুগের মানুষের চেয়ে সুখী। পৃথিবী দিন দিন বদলে যাচ্ছে, সমাজ দিন দিন বদলে যাচ্ছে, কিন্তু উন্নতি? প্রগতি? পারফেকশন? তা কোনোদিন ছিলও না, কোনোদিন হবারও নয়। অতীত-পূজকরা বলবেন, সত্য যুগ ছিল না তো কোন আদর্শের আমরা অনুসরণ করব? ভবিষ্যৎ পূজকরা বলবেন, সত্য যুগ হবে না তো কোন আদর্শের অভিমুখে আমরা যাব? আমরা কিন্তু বর্তমান-প্রেমিক, আমরা বলি এইটেই সত্য যুগ এইটেই কলি যুগ, এটা ভালোও বটে মন্দও বটে। লাখ বছর পরে যারা আসবে তাদের যুগ এর থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হলেও এমনি ভালোয়-মন্দে মেশা দুঃখে-সুখে বিচিত্র প্রেমে হিংসায় জটিল থাকবেই। আমরা চলার আনন্দে চলি, কারুর অনুসরণেও না, কারুর অভিমুখেও না। গতিটাই আনন্দের; শম্বুকের গতি আর পক্ষীরাজের গতি বেগের দিক থেকে ভিন্ন, আনন্দের দিক থেকে একই।

কিন্তু এটা মিথ্যা নয় যে, ক্রমেই আমাদের চলার বেগ বাড়ছে, ধীরে চলার আনন্দ গিয়ে ছুটে চলার আনন্দ আসছে। মানুষ এখন ঘর ভেঙে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ল, উদ্ভিদের মতো একঠাঁই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চলতে চাইল না, পাখির মতো ঠাঁই ঠাঁই উড়তে উড়তে চলল। কোনো স্থানের প্রতি তার স্থায়ী আসক্তি রইল না। আগে ছিল গ্রামের প্রতি পেট্রিয়টিজম, তারপরে দেশের প্রতি পেট্রিয়টিজম, তারপরে পৃথিবীর প্রতি। দেখতে দেখতে এক-একটা দেশের বৈশিষ্ট্য চলে যাচ্ছে, দেশের লোক বিদেশে যাচ্ছে, বিদেশের লোক দেশে আসছে, কে যে কোন দেশে জন্মাচ্ছে কোথায় বিয়ে করছে কোনখানে মরছে তার ঠিক নেই। এই ইংল্যাণ্ডের এক অতি অখ্যাত অতি বিজন পল্লিগ্রামে এক তামিল চাষা—ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ও ঘোর অশিক্ষিত—ইংরেজ মেয়ে বিয়ে করে ছেলেপিলে নিয়ে সংসার করছে। সামান্য পুঁজি নিয়ে সে ঘর ছেড়েছিল, এখন বেশ

সংগতিসম্পন্ন হয়েছে। এর ছেলেপিলে হয়তো কানাডায় বাসা বাঁধবে কিংবা অস্ট্রেলিয়ায়। কোন দেশের প্রতি তাদের পেট্রিয়টিজম যাবে? বাপের মাতৃভূমি না নিজের মাতৃভূমি না নিজের ছেলের মাতৃভূমি—কার প্রতি?

কত চীনা-মালয়-কাফ্রির ইংরেজ ছেলে দেখছি, কত কত ইংরেজের ফরাসি জার্মান জাপানি ছেলে দেখছি, কত সাদা রঙের আয়া লালচে কালো রঙের ছেলেকে ঠেলাগাড়ি করে বেড়াতে নিয়ে যায়, কত আর্য ধাঁচের মুখে মোঙ্গলীয় ধাঁচের ভুরু শোভা পায়। জগৎ জুড়ে একটা সংকর জাতি গড়ে উঠেছে, সে-জাতির নাম মানবজাতি। এই নতুন মানবের জন্যে যে নতুন সমাজ খাড়া হচ্ছে সে-সমাজের নীতিসূত্রও নতুন। সে সব নীতিসূত্র এরোপ্লেনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে তৈরি, গোরুর গাড়ির সঙ্গে অত্যন্ত বেখাপ্পা।

দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরো নর-নারীর মিলননীতি। গোরুর গাড়ির যুগের নর-নারী অল্পবয়সে বিবাহ করত পিতামাতার নির্বন্ধে, পরস্পরকে ছাড়া অন্য অনাত্মীয় স্ত্রী-পুরুষকে চিনতনা, জানত না, দেখত না; দুজনেই একস্থানে থেকে জীবন শেষ করত এবং একজন করত গৃহের অন্দরের কাজ, অন্যজন করত গৃহের সদরের কাজ। এরোপ্লেনের যুগের নর-নারী বিবাহ করে বেশি বয়সে পঞ্চশরের নির্বন্ধে; পরস্পরকে ছাড়া অন্য অনাত্মীয় স্ত্রী-পুরুষকে শৈশবে দেখতে পায় স্কুলে; যৌবনে দেখতে পায় অফিসে; বিবাহের পূর্বে দেখতে পায় ক্লাবে নাচঘরে টেনিস কোর্টে কাফে-রেস্তরাঁয়; বিবাহের পর দেখতে পায় অফিসের সহকর্মিণী বা সহকর্মীরূপে, একলা পথের সহযাত্রিণী বা সহযাত্রীরূপে, একলা প্রবাসের বান্ধবী বা বান্ধবরূপে। তারপর স্বামী-স্ত্রী এক স্থানে থাকতে পায় না, দুজনের দুই স্থানে জীবিকা। দুজনেই বাইরের কাজ করে, হোটেলে বাস করে, রেস্তরাঁয় খায় এবং সুবিধা না হলে দেখা করতে পায় না। সন্তানরা মেটার্নিটি হোমে জন্মায়, বোর্ডিং স্কুলে বাড়ে এবং বড়ো হলে জীবিকার সন্ধানে দেশ-বিদেশে বেড়ায়।

এহেন যুগে প্রেম ও সতীত্বের নীতি বদলাতে বাধ্য। প্রেম বা সতীত্ব থাকবে না এমন নয়, থাকবে, কিন্তু তাদের সংজ্ঞা হবে অন্যরকম। একনিষ্ঠতা সুখকর ছিল যখন স্বামী-স্ত্রী থাকত একস্থানস্থ এবং যখন অনাত্মীয়-আত্মীয়াদের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ ছিল অল্পই। এখন স্বামী লণ্ডনের দোকানে কাজ করে তো স্ত্রী কাজ করে চিকাগোর দোকানে, এবং উভয়েরই দোকানে বা দোকানের বাইরে বান্ধব-বান্ধবীর সংখ্যা নেই। একদিন যে-প্রেম আটলান্টিকের এক জাহাজে যেতে যেতে হয়েছিল, চিরদিন সে-প্রেম নাও টিকতে পারে এবং সে-প্রেমের পথে প্রলোভনও তো অল্প নয়, সুতরাং ডিভোর্স এবং পুনর্বিবাহ এবং আবার ডিভোর্স। কিংবা বিবাহটা একজনের সঙ্গে পাকা, মিলনটা অন্যান্য জনের সঙ্গে কাঁচা। এটা অবশ্য গোরুর গাড়ির ধর্মনীতির সঙ্গে এরোপ্লেনের হৃদয়গীতির সন্ধি করার প্রয়াস, কেননা ডিভোর্স আইন এখন গোরুর গাড়ির অনুশাসন অনুসারে কড়া এবং রোম্যান ক্যাথলিক ধর্মে নিষিদ্ধ। ভবিষ্যতে সন্ধির দরকার হবে না, গোরুর গাড়ি হটবেই, ডিভোর্সটা বিবাহের মতো সোজা হবে এবং বিবাহটা স্থান পরিবর্তনের সঙ্গে বদলাবে। কেবল মুশকিল এই যে, মানুষের হৃদয়টা অত সহজে বদলাবার নয়—এডোনিসকে হারিয়ে ভেনাস কেঁদে আকুল হবে, ইউরিডিসকে খুঁজতে অর্ফিউস পাতালপ্রবেশ করবে, সীতার শোকে রঘুপতি স্বর্ণসীতাকেই হৃদয় দেবেন।

এতদিন নারী-নরের সম্বন্ধগুলো ছিল পারিবারিক—মাতা ও পুত্র, ভগিনী ও ভ্রাতা, স্ত্রী ও স্বামী, কন্যা ও পিতা। এখন এক নতুন সম্বন্ধের সূত্রপাত হয়েছে—সখা ও সখি। বিয়ের আগে বুঝতে পারা যাচ্ছে না শতেক সখির মধ্যে কোনটি প্রিয়তমা, কোনটি স্ত্রী। বিয়ের পরেও পদে পদে সন্দেহ হচ্ছে, যাকে বিয়ে করেছি সে স্ত্রী না সখি এবং যাদের সঙ্গে সখ্য হচ্ছে তাদের মধ্যে কোনো একজন সখি না স্ত্রী। গুরুজনের নির্বন্ধে যখন বিয়ে করা যেত এবং অনাত্মীয়া নারীর সঙ্গে পরিচয় ঘটত না, তখন যাকে পাওয়া যেত সেই ছিল স্ত্রী। কিন্তু এখন নিজের বিবাহের দায়িত্ব নিজের হাতে, ঠিক করতে গিয়ে ভুল করে ফেলা অতি সহজ এবং ভুল থেকে উদ্ধার পাওয়া অতি শক্ত। এখন অনাত্মীয়দের সঙ্গে নানা সূত্রে পরিচয়। বিয়ের আগে তো বটেই, বিয়ের পরেও স্ত্রীর সঙ্গে যত না সাক্ষাৎ হয় সখিদের সঙ্গে ততোধিক। স্ত্রী যখন নিকটে থাকে তখন

শোবার সময় ছাড়া অন্য সময় দেখা করবার ফুসরত কোনো পক্ষেরই নেই। যে যার নিজের কাজে যায় ও রেস্তরাঁয় একা একা খায়। আর স্ত্রী যখন দূরে থাকে তখন তো দেখা হবারই নয়।

এই দূরে থাকাথাকিটাই বেশিরভাগ স্থলে ঘটছে। কেননা বিয়ের আগে স্ত্রী যে-কাজে বিশেষজ্ঞ হয়েছে বিয়ের পরে সে-কাজটি ছেড়ে দিয়ে স্বামীর সঙ্গে এক কর্মস্থল থেকে আরেক কর্মস্থলে ঘুরতে থাকা তার পক্ষে মস্তবড়ো ত্যাগ, এবং সে-ত্যাগে সমাজেরও ক্ষতি। সুতরাং প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রীর স্বামী যদি সংবাদপত্রের ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি হয় তো স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয় তার বৎসরান্তে এক বার। কিংবা কৃষক স্বামীর স্ত্রী যদি ভ্রাম্যমাণ চিত্রকর হয় তো স্বামীর সঙ্গে সে একেবারে বেশিদিন থাকতে পারে না। অথচ অভিনেত্রীর সঙ্গে প্রতিদিন নূতন পুরুষের আলাপ-বন্ধুতা এবং সংবাদদাতার সঙ্গে প্রতিদিন নূতন নারীর সাক্ষাৎ পরিচয়। এরূপ স্থলে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক—কে স্ত্রী, কে সখি। যাকে বিবাহ করেছি সেনাও হতে পারে স্ত্রী, যাকে বিবাহের আগে দেখিনি সেই হতে পারে সখির অধিক। যারা হৃদয় সম্বন্ধে অনেস্ট তাদের পক্ষে এটা এক বিষম সমস্যা, যারা সমাজকে ভয় করে ফাঁকি দিতে চায় তাদের পক্ষে কিছু নয়। তারা হয় চুপ করে সয়ে যায়, কাঁদে; নয় যতক্ষণ-না ধরা পড়ে ততক্ষণ ডুবে ডুবে জল খায়।

বিশ বছর আগেও স্ত্রী-পুরুষের বন্ধুতা ছিল সমাজের চোখে সন্দেহাত্মক; বিশেষত বিবাহের পরেও স্বামীর বা স্ত্রীর অনভিমতে। এখন বিবাহের সময় স্বামী-স্ত্রীতে স্পষ্ট বোঝাপড়া হয়ে যাচ্ছে যে স্ত্রীর সখাদের নিয়ে স্বামী কিছু বলতে পারবে না, স্বামীর সখিদের নিয়ে স্ত্রী কিছু বলতে পারবে না; পরস্পরের ওপরে বিশ্বাস রাখতে হবে। পরপুরুষের বা পরস্ত্রীর সঙ্গে বন্ধুতা কোনো কোনো স্থলে সংকট ঘটালেও মোটের ওপর সমাজসম্মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজসম্মত না হলে চলতও না কারণ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এখন একটা ব্যবধান অনিবার্য হয়ে পড়েছে—দূরত্বজনিত ব্যবধান। স্ত্রী আর গৃহিণী নয়, হোটেলবাসীর গৃহিণীর প্রয়োজন হয় না। স্ত্রী আর সচিবও নয়, ভ্রাম্যমাণ সংবাদদাতা তার অভিনেত্রী স্ত্রীর কাছে কী মন্ত্রণা প্রত্যাশা করতে পারে? স্ত্রী নিজের কাজে ব্যস্ত, বরং একজন সাংবাদিকার কাছে মন্ত্রণা প্রত্যাশা করা স্বাভাবিক। তারপর স্ত্রী যদি-বা সখি হয় তবু দূরে থাকে বলে বন্ধুতার সব দাবি মেটাতে পারে না। ধরো একসঙ্গে টেনিস খেলতে পারে না, সিনেমায় যেতে পারে না, হোটেলে খেতে পারে না, মোটরে বেড়াতে পারে না, অবসরকালে গল্প করতে পারে না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই যে অনিবার্য ব্যবধানটি, এটিকে পূরণ করতে পারে অন্য নারী বা অন্য পুরুষ —সে বিবাহিত-অবিবাহিত যা-ই হোক-না কেন। সেইজন্যে এখন পুরুষে পুরুষে বা নারীতে নারীতে বন্ধুতার মতো স্ত্রী-পুরুষে বন্ধুতাও চলতি হয়ে গেছে, এ নিয়ে কেউ কাউকে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য হয় না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে সেকালের প্রেম ও সতীত্বের সংজ্ঞা একালে অচল। প্রথমত, প্রেম যে চিরস্থায়ী, এমনকী দীর্ঘস্থায়ী হবেই এমন কোনো কথা নেই। বিবাহের সময় এখনকার তরুণ-তরুণীরা তাদের ঠাকুরদাদা ঠাকুরমার মতো গম্ভীরভাবে প্রতিজ্ঞা করে না যে, যাবজ্জীবন পরস্পরের প্রতি একনিষ্ঠ থাকবেই। প্রতিজ্ঞা যদিও বাঁধানিয়ম মেনে করে, তবু লঘুভাবেই করে, মুখে যা বলে মনে তা বলে না। মনে মনে যোগ করে দেয়—'আশা করি'। যেক্ষেত্রে ডিভোর্স যত সুলভ, সেক্ষেত্রে লঘুভাবটা তত বেশি। এই লঘুভাবটা না থাকলে মানুষ ভয়ে আধমরা হত। কেননা, এখন তো বিবাহ পিতা-মাতার নির্বন্ধে নয় যে ভুলের দায়িত্ব অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে ভগবানকে ডেকে আশ্বস্ত হবে। নির্বন্ধ যখন নিজেরই হাতে তখন ভুলের দায়িত্বও নিজেরই। একদিনের ভুলের জন্যে চিরজীবন প্রায়শ্চিত্ত করা অসহ্য। তা ছাড়া ভুল না-ই হোক, ঠিকই হোক, একদিনের ঠিক কি চিরদিন ঠিক থাকে? বিশ বছর বয়সের ঠিক কি ত্রিশ বছর বয়সেও ঠিক থাকে? দু-পক্ষই বদলায়, দু-পক্ষই নতুন সত্যকে পায়, পুরানো সত্যকে ভোলে। রল্যাঁর 'আনেত' যাকে প্রাণ ভরে ভালোবাসত তাকে কথা দিতে পারলে না যে চিরদিন তেমনি ভালোবাসবে, সেইজন্যে তাকে বিবাহই করতে পারলে না, অথচ তার ভালোবাসার চিহ্ন ধারণ করলে তার সন্তানের মা হয়ে।

দ্বিতীয়ত, সতী নারীর স্বামী ছাড়া অপর পুরুষের সঙ্গে তেমনি অন্তরঙ্গতা থাকতে পারে, যেমন অন্তরঙ্গতা এযাবৎ কেবল সখির সঙ্গেই সম্ভব ছিল। পরপুরুষকেও ভালোবাসা যায়, তার সঙ্গে গা-ঘেঁষে বসা যায়, তার

কোলে মাথা রাখা যায়, অভিনয়কালে তাকে চুম্বন আলিঙ্গনও করা যায়, এমনকী অন্য সময়ও। স্বামীর সঙ্গে যেমন ব্যবহার সখার সঙ্গে তেমনি। অথচ সতী ধর্মের ব্যত্যয় হয় না। স্বামীর প্রতি প্রগাঢ়তম ভালোবাসা থাকে। এককথায় সখ্য প্রেম ও মধুর প্রেম পরস্পরবিরোধী নয়, একই হৃদয়ে দুয়েরই স্থান হতে পারে এবং এমনও একদিন হতে পারে যে সখ্য প্রেমই মধুর প্রেমে পরিণত হয়েছে, মধুর প্রেম সখ্য প্রেমে পর্যবসিত। সেরূপ স্থলে সম্বন্ধ পরিবর্তন অবশ্যপ্রয়োজন। স্বামী-স্ত্রী ঠাঁই ঠাঁই থাকার ফলে এমন ঘটা বিচিত্র নয়। স্বামী ও স্ত্রী দুজনেই স্বতন্ত্র, দুজনেই স্বাবলম্বী, দুজনেই ভ্রাম্যমাণ। একদিন যে দুটি নক্ষত্র ঘুরতে ঘুরতে একস্থানে মিলেছিল চিরদিন তারা সেই স্থানে থাকতে পারে না, পরস্পরের থেকে সমান দূরত্ব রাখতে পারে না, দূরত্বের কম-বেশি ঘটে, অন্য নক্ষত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, এক সম্বন্ধ আরেক হয়ে ওঠে। যেক্ষেত্রে তেমন ঘটে না—দাম্পত্য ও সখ্য যেমন ছিল তেমনি থাকে, সেক্ষেত্রেও যে সতীত্বের পুরোনো আদর্শ খাটে না এটা স্বতঃসিদ্ধ। কেননা পুরোনো সতীত্বের সঙ্গে ছিল নিজের দ্বারা স্ত্রীকে স্বামীকে সাতপাকে ঘিরে রাখা, এখন অনেকখানি ঢিলে দিতে হচ্ছে, কোনো পক্ষেই বিশ্বস্ততার জন্যে পীড়াপীড়ি নেই, বিশ্বস্ততার জন্যে বাধ্যবাধকতা নেই, ওথেলো ক্রমশ সেকেলে হয়ে পড়ছে। স্বামী স্ত্রীর কাছে যা পাচ্ছে না অন্যের কাছে তা পাচ্ছে, স্ত্রী স্বামীর কাছে যা পাচ্ছে না অন্যের কাছে তা পাচ্ছে। চিরকুমার থাকলে সে কালে উপবাসী থেকে যেতে হত, চিরকুমার থাকলে একালে আধপেটা থাকতে পারা যায়—সখি থাকে কাছে। বিবাহ করলে সে কালে পেট ভরে উঠত, বিবাহ করেও একালে আধপেটা থাকতে হয়—স্ত্রী থাকে দূরে। একালের কুমারীদের অনেক দুঃখ থেকে অব্যাহতি মিলেছে, সেইজন্যে তারা বিবাহের জন্যে কেঁদে মরছে না এবং একালের বিবাহিতারাও অনেক সুখ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, সেইজন্যে তারা সৌভাগ্যগর্বে বাড়াবাড়ি করছে না।

তবে ইংল্যাণ্ড ফ্রান্স প্রমুখ দেশে স্ত্রী-পুরুষের সাতিশয় সংখ্যা বৈষম্যের দরুন প্রেম-পরিণয়ের ক্ষেত্রে কতকটা কৃত্রিমতার উৎপত্তি হয়েছে বটে। কর্তারা দুনিয়া দখল করতে ব্যস্ত, যুদ্ধ না করলে তাদের চলে না, দেশের নারীসংখ্যার অনুপাতে পুরুষসংখ্যা যে কমতেই লেগেছে আর সেজন্যে নারী ও পুরুষ উভয়েরই যে নীতিভ্রংশ (demoralisation) হচ্ছে একথা কর্তারা বুঝেও বুঝছেন না। ছেলেরা জানে মেয়েরা তাদের চেয়ে সংখ্যায় বেশি, সুতরাং বিবাহের গরজটা মেয়েদেরই বেশি, সাধতে হয় তো ওরাই সাধবে, তপস্যাটা একেবারে ও-তরফা। মেয়েরা জানে সকলের বরাতে বিবাহ নেই, বিবাহ যদি-বা হয় তবু স্বামীকে ধরে রাখতে পারা যাবে না, একজনকে হারালে আরেক জনকে পাবার আশা নেই, তপস্যাটা অনর্থক এ-তরফা। এর পরিণাম এই হচ্ছে যে, তপস্যাটাকে কোনো তরফই স্বীকার করছে না, হাতে হাতে যখন যা পাচ্ছে তখন তা নিচ্ছে। পরমুহূর্তে ছেলেরা ফেলে যাচ্ছে, মেয়েরা কান্না চাপছে। এ বড়ো নিষ্ঠুর খেলা। দু-পক্ষে সমান নিয়ম খাটছে না, একপক্ষ ফাউল করতে করতে অতি সহজে জিতছে, অপরপক্ষ ফাউল সইতে সইতে অতি সহজে হারছে। দু-পক্ষেরই নীতিভ্রংশ, তবু মেয়েরা দোষ ধরছে ছেলেদের, ছেলেরা দোষ ধরছে মেয়েদের। মেয়েরা বলছে, বাপ রে! একেলে ছেলেগুলোর কী দেমাক! এরা আমাদের খাওয়াবে না পরাবে না প্রতিপালন করবে না, শুধু আমাদের বিয়ে করে মাথা কিনবে, এরই জন্যে এত খোশামোদ! আমাদের ঠাকুরমাদের জন্যে আমাদের ঠাকুরদারা কী না-করতেন, ডুয়েল লড়ে প্রাণ বিপন্ন করতেন, যাকে অত কষ্টে পেতেন তাকে কত যত্নে রাখতেন! আর আমাদের এরা...! ছেলেরা বলছে, তোমরা সব স্বাধীনা স্বতন্ত্রা আলোকপ্রাপ্তা শি-ম্যান, আমাদেরকে না হলে তোমাদের যে চলে না এ তো বড়ো লজ্জার কথা! আর আমরা তো বেশ লক্ষ্মীছেলেই ছিলুম, তোমরা এতগুলোতে মিলে আমাদের মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছ, অশ্বিনী ভরণী কৃত্তিকা রোহিণীর কাকে ছেড়ে কাকে ধরা দেব আমরা পুরুষ চন্দ্রমারা!

এদেশে এসে অবধি দেখছি বিপুলভাবে ধর্মচর্চা চলেছে। পাড়ায় পাড়ায় গির্জা, পথে-ঘাটে ধর্মপ্রচার, কুলির পিঠে ধর্মবিজ্ঞাপন। যে-জাতীয় সংবাদপত্রে কুকুর-দৌড়ের, শেয়ার মার্কেটের ও ডিভোর্স কোর্টের খবর থাকে সে-জাতীয় সংবাদপত্রেও ধর্ম সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর। রেলে ও বাসে, অফিস থেকে ফেরবার সময় এক হাতে সান্ধ্য কাগজ ও অন্য হাতে ছয় পেনি দামের ধর্মগ্রন্থ নিয়ে একবার এটাতে ও একবার ওটাতে চোখ বুলিয়ে যেতে কত লোককেই দেখি। শুনতে পাই এখন ধর্মগ্রন্থগুলোর যত কাটতি, নভেল নাটকেরও নাকি তার বেশি নয়। বছর পনেরো-কুড়ি আগে নাকি এতটা ছিল না। যুদ্ধের পর থেকে হঠাৎ ধর্মচর্চার মরা গাঙে বান ডেকেছে। তা বলে অর্থচর্চা বা কামচর্চা কিছুমাত্র কমেছে এমন নয়। একসঙ্গে ত্রিমূর্তির উপাসনা চলেছে—গড, ম্যামন, Eros। ব্যাঙ্কে, এক্সচেঞ্জে, ডারবিতে, থিয়েটারে, নাচঘরে, হোটেলে, পার্কে, গির্জায় সর্বত্র লোকারণ্য, কোনো একটার ওপরে বিশেষ পক্ষপাত কারুর নেই; স্কুলে কলেজে লাইব্রেরিতে কারখানায় যেখানে যাই সেখানে লোকের ভিড়। মিউজিয়ামে চিত্রশালায় হাসপাতালে, অন্ধ-আতুর-অনাথাশ্রমে, যুদ্ধনিবারণী সভায় কোথাও কারুর আগ্রহ কম নয়। একটা জীবন্ত জাতির হাজারো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবই সমান জীবন্ত; যেমন তাদের বৈচিত্র্য তেমনি তাদের বৈপরীত্য—ভালো-মন্দ, সুন্দর-কুৎসিত, পদ্ম-পাঁক, ঐশ্বর্য-দৈন্য, প্রেম-হিংসা সবই একাধারে বিধৃত এবং সবই সমান প্রচুর; সেইজন্যে ধর্ম সম্বন্ধে সকলেই ভাবতে শুরু করেছে, একুশ বছর বয়সের ফ্ল্যাপার পর্যন্ত। শনিবারের দিন সন্ধ্যা বেলা যেসব যুবক-যুবতী পরস্পরের কোলে মাথা রেখে মাঠে বাগানে সকলের সামনে প্রেমালাপ করে, রবিবারের দিন সকাল বেলা সেইসব যুবক-যুবতী গির্জায় ভিড় করে অখন্ড মনোযোগের সহিত ধর্মোপদেশ শোনে, কলের পুতুলের মতো হাঁটু গাড়ে এবং সোমবারের দিনদুপুরে যখন তারা অফিসে গিয়ে পাশাপাশি কাজ করে তখন কেউ কারুর সঙ্গে ইঙ্গিতেও কথা বলে না, এমনই কঠোর ডিসিপ্লিন। কাল যদি যুদ্ধ বাঁধে ছেলেরা হাসিমুখে বন্দুক কাঁধে নিয়ে মরণযাত্রা করবে, মেয়েরা দেশের ভার কাঁধে নিয়ে ঘর ও বাহির দুই আগলাবে। সুখের সময় সুখ, দুঃখের সময় আশা, সবসময় প্রস্তুত ভাব—এই হচ্ছে ইংল্যাণ্ডের ধর্ম, ইউরোপের ধর্ম।

সামরিক সংস্কার বহুদিন হতে আমাদের সমাজে নেই, যখন ছিল তখন সমস্ত সমাজটার একটি বিশেষ অংশেই নিবদ্ধ ছিল। ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে ক্ষাত্রধর্মেরও উচ্ছেদ হয়েছে। ইউরোপের সমাজের সর্বশ্রেণির আবালবৃদ্ধবনিতা কিন্তু যুদ্ধে বিশ্বাসী, এ বিশ্বাসের ওপরে এদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা খাটে না, এ বিশ্বাস এদের প্রকৃতিগত; যুদ্ধহীন জগৎ এরা মনেও আনতে পারবে না। মানুষে মানুষে যুদ্ধ যে মন্দ তা এদের অনেকে বুদ্ধি দিয়ে বুঝেছে কিন্তু সংস্কার থেকে পায়নি। পশুতে-মানুষে যুদ্ধ যে মন্দ তা আমরা আড়াই হাজার বছর আগে বুদ্ধের সময় থেকে জেনেছি, এরা এখনও জানেনি। প্রকৃতিতে-পুরুষে যুদ্ধ যে মন্দ তা আমরা দৈববাদীরা কবে শিখলুম জানিনে, এরা কোনোদিন শিখবে না। এদের ভাবজগতেও আইডিয়াতে আইডিয়াতে যুদ্ধ। এদের ধর্ম যুদ্ধের জন্যে সদা প্রস্তুত থাকার ধর্ম। ন কিঞ্চিদপি বলহীনেন লভ্যম। নিশ্চেষ্ট যদি এক মুহূর্তের জন্যেও হও তবে অপরে তোমাকে মাড়িয়ে দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়ে যাবে।

ধর্ম ও রিলিজিয়ন এক জিনিস নয়। আমাদের ধর্মের নাম সনাতন ধর্ম, লোকমুখে হিন্দু ধর্ম; হিন্দু মানে ভারতীয়, সুতরাং ভারতীয় ধর্ম। আমাদের রিলিজিয়নগুলোর নাম বৈষ্ণব মত, শাক্ত মত, শৈব মত, সৌর মত, গাণপত্য মত ইত্যাদি। আমরা যদি খ্রিস্টীয় মত বা মহম্মদীয় মত নিই তবু আমরা হিন্দুই থাকব—ধর্মত হিন্দু; কিন্তু ধর্মের সঙ্গে ধর্মমতের তেমন সহজ সম্বন্ধ থাকবে না, কতকটা স্বতঃবিরোধ এসে পড়বে। আমাদের মধ্যে যাঁরা মুসলমান বা খ্রিস্টান হয়েছেন তাঁরা হিন্দুই আছেন, কিন্তু ভিতর থেকে সৃষ্টির স্ফূর্তি পাচ্ছেন না। ইচ্ছানুসারে ইসলামকে বা খ্রিস্টীয়নিয়ানিকে পরিবর্তন করতে পারছেন না, পরমুখাপেক্ষী হচ্ছেন। ইউরোপেরও এই দশা। ইউরোপের ধর্ম ও ধর্মমত অঙ্গাঙ্গি নয়, বিরুদ্ধ।

ইউরোপের প্রকৃতি হোমারের আমলে যা ছিল এখনও তাই, কিন্তু মাঝখানে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে প্যালেস্টাইন অঞ্চলের একটি বিশ্বাস। সে-বিশ্বাস ইউরোপের প্রকৃতির পক্ষে আড়ষ্টতাজনক। খ্রিস্টিয়ানিটির

দ্বারা ইউরোপের অশেষ উপকার হয়েছে, কিন্তু খ্রিস্টিয়ানিটির পেষণে ইউরোপের আত্মা সৃষ্টির স্বতঃস্ফূর্তি পায়নি। ইউরোপের ধাত বিশ্লেষণশীল, এশিয়ার ধাত সংশ্লেষণশীল। ইউরোপের কীর্তি বিজ্ঞানে, এশিয়ার কীর্তি যোগে। ইউরোপ বিনা পরীক্ষায় কিছু মানে না, পরীক্ষার পর যা মানে তার বাইরে সত্য খুঁজে পায় না। আমরা অম্লানবদনে সব মেনে নিই, অধিকারী ভেদে মিথ্যাকেও বলি সত্য। ইউরোপ বিশ্বাস করে যোগ্যতমের ঊর্ধ্বতনে, আমরা বিশ্বাস করি সমন্বয়ে। এহেন যে ইউরোপ, তাকে তার নিজস্ব রিলিজিয়ন অভিব্যক্ত করতে না দিয়ে রাহুগ্রস্ত করে রাখল খ্রিস্টিয়ানিটি। সেই দুঃখে গোটা মধ্যযুগটা ইউরোপ অন্ধকারেই কাটাল। যেদিন গ্রিসকে দৈবাৎ পুনরাবিষ্কার করে সে আপনাকে চিনল সেদিন ঘটল Renascence, তারপর থেকে শুরু হল Reformation অর্থাৎ খ্রিস্টিয়ানিটির অগ্নিপরীক্ষা। সে-অগ্নিপরীক্ষা এখনও শেষ হয়নি, কিন্তু ধর্মচর্চার এই প্রাবল্য দেখে মনে হয় ও বোধ হয় নির্বাণ দীপের শেষ দীপ্তি, এরপরে হয় খ্রিস্টিয়ানিটিকে ভেঙে বিজ্ঞানের আলোয় নিজস্ব করে গড়া হবে, নয় বিজ্ঞানের ভিতর থেকে নতুন একটা রিলিজিয়ন বার করা হবে। বিজ্ঞান কথাটা আমি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছি। ইউরোপীয় দর্শনটাও বিজ্ঞানেরই তাঁবেদার, এবং বিজ্ঞান বলতে কেবল Physics ও Biology নয়, Psychology-ও বোঝায়। এখনও বিজ্ঞানের সামনে বিরাট একটা অজানা রাজ্য রয়েছে—মানুষের মন। ক্রমে ক্রমে যতই তাকে চেনা যাবে ততই একটা নতুন রিলিজিয়নের মালমশলা পাওয়া যাবে।

রিলিজিয়নের জন্যে মানবহৃদয়ের যে সহজ তৃষা তাকে শান্ত করবার ভার অপরকে দিলে চলে না; নিজেরই ওপরে নিতে হয় সে-ভার। ইউরোপের ভার এতদিন অন্যে বয়েছে। অন্যের ফরমাশ খেটে ও বাঁধা বরাদ্দ পেয়ে ইউরোপের তৃষা তো মেটেনি, অধিকন্তু খ্রিস্টিয়ানিটির ওপরে রাগ করে রিলিজিয়নের প্রতি জন্মেছে অনাস্থা—যেন রিলিজিয়নকে না হলেও মানুষের চলে। গত দেড়শো বছরের মধ্যে বিজ্ঞানের যে আশ্চর্য উন্নতি ঘটেছে সে-উন্নতি বহু দিনের রুদ্ধ জলের নিষ্কাশন, তাই সে এমন তাক লাগিয়ে দিয়েছে। গ্রিসের যদি মরণ না হত, তবে গ্রিসের ছেলেটি আয়ার কোলে অমানুষ না হয়ে তার নিজের কোলে দিন দিন শশীকলার মতো বাড়তে বাড়তে এতদিনে কেমন হয়ে উঠত জানিনে, কিন্তু খ্রিস্টিয়ানিটির ওপরে আধুনিক ইউরোপের মহা মনীষীদের এমন অশ্রদ্ধা ও রিলিজিয়নের ওপরে তাঁদের এমন অনাস্থা দেখতুম না। তাঁরা বলছেন, এই হতভাগা ধর্মমতটার জন্যেই এত যুদ্ধ, এত অশান্তি, এত গোঁড়ামি, এত কুসংস্কার। অন্ধবিশ্বাসী যাজকরা সেক্সকে পাপ বলে নিজেরা বৈরাগী হয়েছেন অথচ অন্যদের বলেছেন বহু সন্তানবান হতে, আর জনবৃদ্ধির ফলে যখন যুদ্ধ বেঁধেছে তখন এঁরাই দিয়েছেন মরণ-মারণের উত্তেজনা; এঁরা প্রচার করেছেন আত্মসম্মাননাশী উৎকট পাপবাদ—*'We are born in sin,'* আমরা অধম, একমাত্র যিশুই ভরসা। গণতন্ত্রের এঁরাই শত্রু, স্বাধীন মানুষকে এঁরা সহ্য করতে পারেন না; দাস ব্যবসায়ের সমর্থক এঁরা; এঁরা বড়োলোকের মোসাহেব, ক্যাপিটালিস্টের বাহন ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। ফলে রাশিয়া থেকে চার্চ উঠে গেল, ফ্রান্সে চার্চের ওপরে কড়া নজর, ইংল্যাণ্ডে চার্চের প্রতিপত্তি যতটা দেখা যাচ্ছে কিছুদিন আগে ততটা ছিল না। তবে ইংল্যাণ্ডের চার্চ ইংল্যাণ্ডের স্টেটেরই মতো জনসাধারণের ইচ্ছাধীন। সেইজন্যে জনসাধারণকে খুশি রাখার জন্য এর অবিশ্রাম চেষ্টা।

চার্চ ও স্টেট এদেশের সমাজের এপিঠ-ওপিঠ। যাঁরা চার্চের নেতা তাঁরা পার্লামেন্টে বসেন, যাঁরা স্টেটের কর্ণধার তাঁরাও পার্লামেন্টে বসেন, পার্লামেন্টই হচ্ছে এদেশের সমাজপতিদের আড্ডা। আমাদের দেশে স্টেট ও সমাজ এক নয় এবং চার্চ আমাদের নেই। চার্চ যে এদের কতখানি তা আমরা দূর থেকে ঠিক বুঝতে পারব না, কেননা চার্চ মানে শুধু গির্জা নয়, চার্চ মানে সংঘ এবং সংঘ আমাদের দেশে বৌদ্ধ যুগের পর থেকে নেই। কেশবচন্দ্র সেন সংঘের পুনঃপ্রবর্তন করেন, আমাদের আধুনিক সংঘের নাম ব্রাহ্মসমাজ। ব্রাহ্মসমাজকে কেউ কেউ ব্রাহ্ম চার্চ বলে থাকেন, প্রবর্তক সংঘকেও চার্চ নাম দেওয়া চলে। কিন্তু হিন্দুসমাজকে হিন্দু চার্চ বলা চলে না। হিন্দুসমাজ কোনো একটা বিশেষ ধর্মমতকে প্রতিপদে মেনে চলবার জন্যে গঠিত একটা কৃত্রিম সংঘ নয়, হিন্দুর কাছে ধর্মমত একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার; স্বামী শাক্ত, স্ত্রী বৈষ্ণব

ও সন্তান নাস্তিক হলেও হিন্দুসমাজ আপত্তি করে না। আজ যদি হিন্দুসমাজ সেকালের মতো জীবন্ত থাকত তবে স্বামী শৈব ও স্ত্রী মুসলমান হলেও আপত্তি করত না। হিন্দু ধর্ম ছিল দেশের ধর্ম, দেশে যে-কেউ বাস করত সে ছিল হিন্দু। জাতিভেদের উৎপত্তি হয়েছিল পেশাভেদের দ্বারা, পেশা বদলালে জাতিও বদলাত। কিন্তু ভারতবর্ষের কোনো অধিবাসীকেই অহিন্দু বলা হত না, যা-ই হোক-না কেন তার ধর্মমত বা রিলিজিয়ন।

হিন্দুসমাজ কোনো দিন ধর্মমত নিয়ে মাথা ঘামায়নি, কিন্তু দেশের আচারকে বা দেশের প্রথাকে শাক্ত বৈষ্ণব নির্বিশেষে মেনেছে। এখনও কি নিরাকারবাদী ব্রাহ্ম-আর্য-খ্রিস্টান-মুসলমান ভারতীয়রা সাকারবাদী শাক্ত বৈষ্ণবদের মতো একান্নবর্তী পরিবার ও তার অনিবার্য পরিণাম বাল্যবিবাহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত? একান্নবর্তী পরিবারের সঙ্গে বাল্যবিবাহ উঠে যাচ্ছে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের ফলে। এর সঙ্গে ধর্মমতের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নেই, কিন্তু ধর্মমত নির্বিশেষে অখন্ড হিন্দুসমাজের ঐতিহাসিক সম্বন্ধ ছিল। একটু খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে খ্রিস্টান-মুসলমান-বৈষ্ণব-শাক্ত সকল ভারতীয়ের মধ্যে একই সংস্কার বিদ্যমান। তবু কয়েকটা ধর্মমতকে হিন্দু নাম দিয়ে অন্যগুলিকে অহিন্দু নাম দেওয়া হচ্ছে ধর্মমতকে ধর্ম বলে ভুল করে।

চার্চ বা সংঘ হচ্ছে একটা ধর্মমতের বা রিলিজিয়নের দ্বারা পরিচালিত সমাজ, জাতীয় প্রকৃতি বা জাতীয় ধর্মের সঙ্গে তার রক্ত-সম্পর্ক নেই। চার্চ অনায়াসেই আন্তর্জাতিক হতে পারে। রোমান চার্চ একদিন সমস্ত ইউরোপকে আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক উভয়ভাবেই শাসন করছিল। ক্রমশ আধিভৌতিক দিকটাকে নিয়ে আধুনিক ধরনের স্টেট গড়ে ওঠে, চার্চের কাজ লাঘব হয়। তারপর নানা দেশে স্টেটের সঙ্গে চার্চের নানা বিচ্ছেদ দেখা দেয়। কোথাও স্টেট চার্চকে গ্রাস করে, কোথাও স্টেট চার্চকে ভাতে মারে, কোথাও স্টেট চার্চকে কোনোমতে টিকে থাকবার অনুমতি দেয়। ইংল্যাণ্ডে কিন্তু স্টেট ও চার্চ বেশ বনিবনা করে চলছে, চার্চ অবশ্য এখন স্ত্রৈণ স্বামীর মতো স্টেটের বিশেষ অনুগত, নইলে রাশিয়ার চার্চের মতো তাকেও ভিটে ছাড়া হয়ে বনে পালাতে হত। কিন্তু অত্যাধুনিক স্ত্রীদের খোশমেজাজের ওপর অতটা ভরসা রাখা স্বামী মাত্রেরই পক্ষে ভয়াবহ। ইংল্যাণ্ডের চার্চও কবে disestablished হয়ে মনের দুঃখে বনে যাবে বলা যায় না, স্টেটের জুলুম দিন দিন বাড়ছে।

খ্রিস্টীয় আদর্শের যাঁরা সমর্থক তাঁদের অনেকে বলছেন, Christianity never had a trial, খ্রিস্টীয় আদর্শকে আমরা গ্রহণই করিনি এতদিন, আমরা গ্রহণ করেছি চার্চের কর্মকান্ড, আমরা শরণ করেছি সংঘকে। চার্চের দ্বারা খ্রিস্টের ব্যক্তিত্ব এতকাল ঢাকা পড়ে এসেছে, খ্রিস্টের সরল উক্তিগুলিকে চার্চের মহামহোপাধ্যায়রা টীকাভাষ্যের দ্বারা জটিল করে কুটিল করে ব্যাখ্যা করেছেন। ওল্ড টেস্টামেন্টের সৃষ্টিতত্ত্ব ও নিউ টেস্টামেন্টের ত্রাণতত্ত্বকে গোড়াতে স্বীকার না করেও খ্রিস্টের অনুজ্ঞা পালন করা সম্ভব, খ্রিস্টকে অনুসরণ করা সম্ভব। খ্রিস্টের জন্মঘটিত রহস্যগুলো সম্বন্ধে খ্রিস্ট স্বয়ং কিছু বলেননি, চার্চই যা-খুশি বানিয়েছে। নিজের প্রতিপত্তির জন্যে চার্চ খ্রিস্টকে এক্সপ্লয়েট করেছে, খ্রিস্টকে ইচ্ছামতো ভেঙে গড়েছে। আমরা সত্যিকার খ্রিস্টকেই চাই, আমরা চার্চের হস্তক্ষেপ সহ্য করব না। আমরা খ্রিস্টের সৃষ্ট খ্রিস্টিয়ানিটিকেই চাই। আমরা চার্চের বানানো খ্রিস্টিয়ানিটি বর্জন করব। চার্চের হাত থেকে রিলিজিয়নকে উদ্ধার করে তাকে ব্যক্তির ক্ষুধা-তৃষ্ণার বিষয় করবার দিকে অনেকেরই দৃষ্টি পড়েছে, কিন্তু এতকালের চার্চকে এককথায় বিদায় দেওয়া যায় না, তুলে দেওয়া যায় না। তা ছাড়া সংঘের মধ্যেও একটা সত্য আছে, সংঘবদ্ধ সাধনার একটা মূল্য আছে, ব্যক্তি ও সমাজের মাঝখানে হয়তো চিরকাল একটা মধ্যস্থ থেকে যাবেই, সেটার নাম গ্রুপ বা পার্টি বা সম্প্রদায় যা-ই হোক-না কেন। নির্জলা ব্যক্তিতন্ত্রবাদ বা নির্জলা সমাজতন্ত্রবাদ সফল হতে না জানি কত কাল লাগবে। হিন্দুসমাজের পেশাগত জাতি একদিন জন্মগত জাতি হয়ে না দাঁড়িয়ে থাকলে হিন্দুসমাজই জগৎকে একটা মস্ত সমস্যার সমাধান দিয়ে থাকত।

রিলিজিয়নের ক্ষেত্রে পূর্ব দেশের কাছ থেকে কোনোরকম দিশা পাওয়া যায় কি না এই নিয়ে অনেক তত্ত্বপিপাসু ব্যক্তি গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন, বুদ্ধকেও নিয়ে নাড়াচাড়া

করা হয়েছে। প্রায় দু-হাজার বছর রিলিজিয়ন বলতে কেবল খ্রিস্টিয়ানিটিই যাঁরা বুঝেছেন তাঁদেরও মুখ বদলাবার পক্ষে পৃথিবীর অপরাপর রিলিজিয়নগুলোর মূল্য থাকতে পারে, কিন্তু সত্যি সত্যিই যে তাঁরা স্থায়ীভাবে এগুলিকে গ্রহণ করবেন এমন ভাবা ভুল। কারণ ওসব রিলিজিয়ন খ্রিস্টিয়ানিটিরই মতো অন্য মাটির গাছ; ইউরোপের মাটিতে রোপণ করলে ওদের বৃদ্ধি তো হবেই না, ইউরোপের নিজের ফসল ফলাবার জন্যে যথেষ্ট জায়গাও থাকবে না। ইউরোপের ধর্মের সঙ্গে বাইরের ধর্মমতের নাড়ির বাঁধন নেই, তেলে-জলে মিশ খাবার নয়। ইউরোপের প্রকৃতি নিজের ফুল নিজে ফোটাতে পারে তো নিজেই একদিন ফোটাবে; অন্যের ফুল আদর করে দেখতে পারে, পরতে পারে, কিন্তু বাঁচিয়ে রাখতে, তাজা রাখতে পারবে না। ইউরোপের আপনার জিনিস তার ফিলজফি, তার বিজ্ঞান। পরের কাছে ধার-করা থিয়োলজিকে সে এখনও আপনার করতে পারলে না, দর্শন-বিজ্ঞানের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারল না। আবার যদি ধার করতে যায় তো দর্শন-বিজ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়ে ধার করবে, নিজের ধাতের ভিত্তির ওপরে পরের মতের সৌধপ্রতিষ্ঠা করবে; ভূমিকম্পে হয় তো ভিত্তি টলবে না, সৌধ ধসে পড়বে। ইউরোপের হাড়ে হাড়ে পুরুষকার, আমাদের হাড়ে হাড়ে দৈব। ইউরোপের হাড়ে হাড়ে দ্বন্দ্বভাব শত্রুভাবের সাধনায় সত্যের উপলব্ধি, আমাদের হাড়ে হাড়ে সন্ধিভাব মিত্রভাবের সাধনায় সত্যের উপলব্ধি। ইউরোপ অর্জন করে উড়িয়ে দেয়, আমরা অমনি ভিতর থেকে পাই, সঞ্চয় করি। আমাদের উপলব্ধি ইউরোপ যদি নেয় তো নিজের মনের মতো করে নেবে, খ্রিস্টিয়ানিটির আত্মাটুকু বাদ দিয়ে যেমন ধড়টাকে চার্চে ঝুলিয়ে রাখল এবং নিজের যুদ্ধপ্রিয়তাকে তার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে তাকে বেতাল করে তুলল, আমাদের বেদান্ত বা বৈষ্ণব তত্ত্ব সম্বন্ধেও তাই করবে, এবং নিজের বিজ্ঞানদর্শনের দ্বারা ডিস্টিল করে ধোঁয়া ছাড়া আর কিছুই তার গ্রহণ করবে না। সেইজন্যেই আমার মনে হয় ইউরোপকে আমরা মুরুব্বির মতো শিক্ষা দিতে পারব না, কেবল বন্ধুর মতো সাহায্য করতে পারব। আমাদের সাহায্যে ইউরোপ যদি নিজের রিলিজিয়ন নিজে সৃষ্টি করে, আর ইউরোপের সাহায্যে আমরা যদি আমাদের রিলিজিয়নগুলোকে বিজ্ঞান শোধিত করে নিই, তবে অতি দূর ভবিষ্যতে দুই মহাদেশের আত্মার মিলন হবে নিবিড়তম; দুটিতে হবে হরিহরাত্মা। তার পরে যখন আরও দূর ভবিষ্যতে দুই মহাদেশের প্রকৃতি এক হয়ে আসবে, ধর্ম এক হয়ে আসবে, তখন দুটিতে হবে এক দেহ-মন, একাত্ম।

এই মুহূর্তে রিলিজিয়ন সম্বন্ধে ছোটো-বড়ো ইতর-ভদ্র সকলেই কিছু কিছু ভাবছে; কিন্তু এখনও সে-ভাবনা তেমন ঐকান্তিক হয়নি, যেমন হলে নতুন একটা রিলিজিয়নের জন্মলক্ষণ দেখা যেত। মাত্র দেড়শো বৎসরের বিজ্ঞানচর্চা জীবনকে এখনও যথেষ্ট উদ্ভ্রান্ত করেনি, দেড়শো বছর আগের গোরু-ঘোড়ার গাড়ি থেকে মাত্র এরোপ্লেন অবধি উঠেছে, এখনও অসংখ্য উদ্ভাবন বাকি। আগামী দেড়শো বছরে হয়তো আকাশে বাড়ি তৈরি করে, বাগান তৈরি করে ফুল ফুটিয়ে দেবে। জীবন যতই জটিল হয় রিলিজিয়নকে ততই দরকার হয় —রিলিজিয়ন খুলে দেয় গ্রন্থি, রিলিজিয়ন করে তোলে সরল। সরলীকরণের আকাঙ্ক্ষা এখনও তীব্র হয়নি বটে, তবু সরলীকরণ যে দরকার সে জ্ঞান সকলেরই কতকটা হয়েছে। ভারতবর্ষে গান্ধীর জন্ম, তিনি যন্ত্রের প্রতাপ সামান্যই দেখেছেন। তাঁর বিশ্বাস যন্ত্রকে না হলেও মানুষের চলে। তিনি জীবন থেকে যন্ত্রকে ছেঁটে ফেললেই সরলীকরণের সাক্ষাৎ পান। কিন্তু ইউরোপে যেসব মনীষীর জন্ম তাঁরা যন্ত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিত, তাঁদের জন্মের বহু পূর্ব হতেই যন্ত্র ও জীবন এক হয়ে গেছে, যন্ত্রকে ছেঁটে ফেলা ও শরীরের চর্ম তুলে ফেলা তাঁদের পক্ষে একই কথা। সরলীকরণের জন্যে তাঁরা যন্ত্রকে ছেড়ে যন্ত্রীর দিকেই দৃষ্টি দিচ্ছেন, যন্ত্রকে রেখেও জীবনকে কতখানি সরল করা যায় এই হচ্ছে তাঁদের প্রশ্ন।

সেইজন্যে দেখা যায় ধনীদের ঘরেও আসবাবের বাহুল্য কমছে, সুন্দর দেখে অল্প কয়েকটি আসবাব রাখা হচ্ছে। মেয়েদের পোশাকের ওজন কমছে, বহর কমছে; সুরুচিকর দেখে অল্প কয়েকখানা কাপড় পরা হচ্ছে। খোলা আকাশ, খোলা হাওয়া, খোলা মাঠের টানে ছেলেরা পায়ে হেঁটে পৃথিবীময় ঘুরছে। অল্প কাপড়, সাদাসিধে খাবার, প্রচুর শারীরিক শ্রম, খোলা জায়গায় নিদ্রা—এইসব হল ইয়ুথ মুভমেন্টের মূলসূত্র। জার্মানি অঞ্চলে কাপড় জিনিসটাকে যথাসম্ভব বাদ দেওয়ার চেষ্টা চলেছে; অথচ ওই ভয়ানক শীতে উলঙ্গ ব্যায়াম,

উলঙ্গ সাঁতার, অর্ধোলঙ্গ নাচ ক্রমেই চলতি হচ্ছে। খাদ্যগুলো ক্রমেই কাঁচার দিকে যাচ্ছে। বাসগৃহগুলোর জানালাগুলো বড়ো হতে হতে এত বড়ো হয়ে উঠছে যে ঘরে থেকেও বাইরে থাকা যাচ্ছে। বৈঠকখানায় বরফ বিছিয়ে স্কেট করা হচ্ছে। দারুণ শীতেও বরফের মতো ঠাণ্ডা জলে স্নান করে উঠে অল্পসংখ্যক পাতলা কাপড় পরা হচ্ছে। এককথায় দেহটাকে লোহার মতো মজবুত করে গড়া হচ্ছে। গ্রিক মূর্তির মতো সবল সুষম সুন্দর দেহ এখনকার আদর্শ। নর-নারী উভয়েই এ আদর্শ গ্রহণ করছে। খ্রিস্টিয়ানিটি দেহকে তাচ্ছিল্য করে ইন্দ্রিয়কে রিপু বলে উপবাসকে শ্রেয় বলে আত্মনিগ্রহকে ধর্ম বলে চালিয়েছিল, কিন্তুএ ধর্ম ইউরোপের প্রকৃতিগত নয়। সেইজন্যে এর বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিক্রিয়া চলেছে। সেক্সকে খ্রিস্টিয়ানিটি এত ঘৃণা করেছিল বলেই সেক্সকে হঠাৎ এত শ্রদ্ধা করা হচ্ছে। প্রতিক্রিয়ার সময় কোন জিনিসের যে কত দাম তা স্থির করা শক্ত হয়। মানুষের মধ্যে যে-ভাগটা পশু সে-ভাগটাকে অযথা নিন্দা করে অযথা নির্যাতন করা হয়েছে; পরিণামে আজ সেই ভাগটাই সবচেয়ে বড়ো ভাগ, হয়তো সেইটেই সব এমন কথাও শুনতে হচ্ছে। গ্রিককে অক্ষুণ্ণ রেখে তার ওপরে খ্রিস্টানকে ঢেলে সাজালেই হয়তো সোনায় সোহাগা হয়, কিন্তু কোনো পক্ষের গোঁড়ারা সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমি ছাড়বেন না।

সরলীকরণ বলতে যারা পেগানিজম বুঝে দেহের বোঝা লাঘব করছে, তারাই রিলিজিয়নের মোহ এড়াতে না পেরে গির্জায় যাচ্ছে, ধর্মগ্রন্থ পড়ছে, ধর্মালোচনা করছে, ঘরে বসে রেডিয়োতে ধর্মকথা শুনছে। শ্যাম ও কুল দুই-ই রাখছে, কিন্তু দুয়ের সমন্বয় করতে পারছে না। দু-হাজার বছরের অভ্যাস বড়ো সহজ কথা নয়, বাঘকে আফিম অভ্যাস করালে বাঘও হাই তোলে। আফিমের বদলে কোকেন ধরিয়ে লাভ নেই, প্রাচ্য রিলিজিয়ন মাত্রেই ইউরোপের পক্ষে পরধর্ম। তার যখন ক্ষুধা প্রবল হবে সে তখন নেশার বদলে খাদ্য খুঁজে নিলেই সবদিক থেকে ভালো। সে-খাদ্য তার নিজের ভাঁড়ারঘরে মালমশলা আকারে পড়ে রয়েছে, নিজের রান্নাঘরে নিয়ে পাক করে নিলে পরে পরিপাকযোগ্য হবে। ইউরোপের রিলিজিয়ন ইউরোপের লাইব্রেরি-ল্যাবরেটরি-স্টুডিয়ো-স্টেডিয়াম থেকেই ভূমিষ্ঠ হবে, গির্জা-মসজিদ-মন্দির থেকে নয়।

পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচন অবশ্য বছরে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন হয় না, কিন্তু এক নির্বাচনের পর থেকে আরেক নির্বাচন অবধি প্রত্যেকটি দিন সমস্ত দেশটাই নির্বাচনের মালা জপতে থাকে। এ দৃশ্য সহজে চোখে পড়ে না কেননা চোখ কাড়বার মতো দৃশ্য এটি নয়, ইংল্যাণ্ডের মতো দেশে দুটি চোখ নিয়ে বাস করা এক ঝকমারি। সম্প্রতি এখানে বৈশাখ মাসের গরম, ষোলো-সতেরো ঘণ্টা সূর্যালোক, তাই মাস চার-পাঁচ আগে যে-সময় ঘুমুতে যেতুম, সেই সময় বেড়াতে বেরিয়ে দেখি রাত্রের আহার শেষ করে লোকে সূর্যের আলোয় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুনছে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে এক-একজন বক্তা এক-একখানা টুল বা চেয়ার বা ভাঙা বাক্স বা কোনোরকম একটা উঁচু আসন জোগাড় করে তার উপরে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন। দেখামাত্র আমাদের দেশের সঙ্গে দুটো তফাত ধরতে পারি। প্রথমত, বক্তা যে-দলেরই হন তিনি যুক্তি দেখান—দেখাতে বাধ্য হন। প্রশ্নের চোটে তাঁকে নাকাল করবার মতো শ্রোতার অভাব হয় না। নানা দলের লেখা বক্তৃতা পড়ে শুনে প্রত্যেকেরই চোখ-কান এতটা সজাগ হয়েছে যে, কারুর চোখে ধুলো দেওয়া বা কানে মন্তর দেওয়া সোজা নয়। ভাবপ্রবণতা এ জাতটার ধাতে নেই, গোলদিঘির বক্তাদের হাইড পার্কে দাঁড় করিয়ে দিলে শ্রোতা নয় দর্শক যদি-বা জোটে তবে তাদের এক জনেরও চোখের পাতা ভিজবে না, কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হবে না, শিরায় বিদ্যুৎ খেলবে না। সুতরাং বক্তারা শ্রোতাদের অন্যরকম দুর্বলতার সুযোগ নেন। ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণ হয় বোঝে যুক্তি-তথ্য, নয় বোঝে মদ। সেকালে মদ খাইয়ে ভোট আদায় করা হত, একালে ওসব উঠে গেছে, তাই যুক্তি-তথ্যকে এমন কৌশলে পরিবেশন করতে হয় যাতে শ্রোতার বা পাঠকের নেশা ধরবে। Statistics-এর মারপ্যাঁচে মিথ্যাকে সত্য ও সত্যকে মিথ্যা করতে না জানলে ইংল্যাণ্ডের ভবিকে ভোলানো যায় না। তাকে ভয় পাওয়ানোর চেষ্টা বৃথা, কান্না পাওয়ানোর চেষ্টা হাস্যকর। বক্তারা তর্জন-গর্জন বা বিলাপ প্রলাপের দিক দিয়েও যান না, তাঁরা নিপুণ ক্যানভাসারের মতো বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি ঘুলিয়ে দেন।

দ্বিতীয়ত, বক্তারা অত্যন্ত আন্তরিকতাসম্পন্ন নাছোড়বান্দা প্রকৃতির লোক। গালাগালি সহ্য করা তো তুচ্ছ কথা, কোনোমতেই তাঁরা মেজাজ হারাবেন না, বেফাঁস কথা বলে বসবেন না, তাঁদের ব্যক্তিগত মান-অপমানের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবেন না; তাঁদের একমাত্র ভাবনা তাঁদের দল কেমন করে পুরু হবে। অথচ তাঁরা ভাড়াটে বক্তা নন; হয়তো পেশাদার বক্তাও নন; কেউ দুপুর বেলা মাটি কেটে এসেছেন, কেউ গাড়োয়ানি করে এসেছেন, এখন চান দলের লোকের সাহায্য করতে। রাজনৈতিক দলাদলির ঠিক নীচে ধর্মনৈতিক দলাদলি। কিন্তু সব দলেই অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবক অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবিকা আছে—তারা দলের জন্যে আর কিছু ত্যাগ করুক না করুক অন্তত অসহিষ্ণুতাটুকু ত্যাগ করেছে। তাদের দলের তালিকায় যদি একটাও নাম বাড়ে তবে বোধ করি তারা জুতোর মারও সহ্য করবে। মিশনারিরা পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে, এমন গ্রাম নেই যেখানে তারা ধর্মপ্রচার করেনি, এমন ভাষা নেই যে-ভাষার বর্ণমালা না থাকলেও সে-ভাষায় তারা বাইবেল ছাপায়নি। এই অসাধারণ উদ্যোগিতা এদের জাতিগত। ভোট দেওয়ার অধিকার লাভ করবার জন্যে এদের মেয়েরা পঞ্চাশ বছর ধরে কী অসীম ধৈর্যের সঙ্গে, কী অসীম নিষ্ঠার সঙ্গে দিনের পর দিন খেটে এসেছে। জন কয়েকের প্রচেষ্টা ক্রমশ লক্ষ লক্ষ জনের হল, তারপরে জয়। কিন্তু ওইটুকুতে তারা সন্তুষ্ট হয়নি, তারা স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সব বিষয়ে সমান অধিকারী করবে, তার আগে থামবে না। এখন তাদের যুদ্ধ চলেছে স্ত্রী-পুরুষকে সমান খাটুনির বিনিময়ে সমান মজুরি দেওয়া নিয়ে; বিবাহিতা নারীকে বিবাহিত পুরুষের মতো চাকরি করতে দেওয়া নিয়ে; সবরকম জীবিকায় স্ত্রী-পুরুষকে সমান শর্তে স্থান দেওয়া নিয়ে। এদের শ্রমিকরাও এমনই নাছোড়বান্দা প্রকৃতির যোদ্ধা। নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্যে তারা সর্বক্ষণ সচেষ্ট। আমাদের শ্রমিকদের এখন যে-অবস্থা, এদের শ্রমিকদেরও এক শতাব্দী আগে সেই অবস্থা ছিল। কিন্তু তারা গ্রামে ফিরে গিয়ে সামান্য জমিজমাকে শত ভাগ করে মান্ধাতার আমলের চরকাখানাকে শত বার ঘুরিয়ে ফল পেলে না, কলকারখানার কাছে *slum* তৈরি করে ওইখানেই জেদ করে পড়ে রইল, এবং জেদের সঙ্গে লড়াই করতে লাগল। এখনও তাদের অবস্থার যেটুকু উন্নতি হয়েছে সেটুকু

তাদের মনঃপূত নয়, তাই তাদের লড়াই থামছে না, তারা সব বিষয়ে ধনিকদের মতো না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চালাবেই। ধনিকরাও চুপ করে বসে থাকেনি, এরা ডালে ডালে চলে তো ওরা পাতায় পাতায় চলে, সুতরাং লড়াই কোনো কালে থামবার নয়।

লড়াই যারা করে তারা প্রাণের দায়ে করে। তাই বক্তারা প্রাণপণে বক্তৃতা দেয়। সেটা তাদের শৌখিন বাচালতা নয়, সেজন্য তারা কারুর হাততালির আশা রাখে না। কেউ না শুনলেও তারা রণে ভঙ্গ দেয় না, যে-পর্যন্ত একটিও শ্রোতা থাকে সে-পর্যন্ত তাদের বক্তৃতা চলতে থাকে, বরং তখনই তাদের বক্তৃতা জোরালো হয়। আমাদের দেশে মাত্র দুটি শ্রেণির লোককে আমি এমন নাছোড়বান্দা হতে দেখেছি—পান্ডা আর ঘটক। অভিমান কাকে বলে কেবল এই দুই শ্রেণির লোক জানে না; বাকি সকলেই অল্পবিস্তর অভিমানী। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে পরের উপর মান করলে ঘরের উনুনে হাঁড়ি চড়ে না। তাই অভিমান কথাটা ইংরেজি ভাষায় নেই। এতে ইংরেজি ভাষার ক্ষতি হয়েছে কি না জানিনে, কিন্তু ইংরেজ জাতটার বৃদ্ধি হয়েছে। দুনিয়ার সর্বত্র জাহাজ না-পাঠালে ইংল্যাণ্ডকে প্রায়োপবেশনে মরতে হয়, সুতরাং ইংল্যাণ্ডকে দুনিয়ার সকলের দ্বারে ধাক্কা দিতেই হয়—'Knock and it shall be opened unto you.' এমনি করে ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকার বন্ধ দুয়ার খুললে, ভারতবর্ষকেও ঘুমাতে দিলে না।

যে-কারণে ইংল্যাণ্ডকে বাইরে ধাক্কা দিয়ে ফিরতে হয় সেই কারণে ইংল্যাণ্ডের লোককে ঘরের ভান্ডারে ভাগ বসাবার চেষ্টা করতে হয়। পার্লামেন্টের হাতে ভান্ডারের চাবি। চাবিটার জন্যে দিনরাত লড়াই। এক মুহূর্ত ঢিলে দিলে সর্বনাশ। চাবিটা যাদের হাতে আছে তাদের যেমন ভাবনা, চাবিটা যাদের হাতে নেই তাদেরও তেমনি ভাবনা। আমাদের দেশে রাজনীতিকে লোকে জীবন-মরণের ব্যাপার বলে ভাবতে শেখেনি। আমাদের কাজের লোকেদের শেষজীবন কাটে কাশীতে, বৃন্দাবনে। রাজনীতি চর্চাটা এখনও আমাদের চোখে দেশের প্রতি একটা অনুগ্রহ; সে-অনুগ্রহটুকু যাঁরা করেন তাঁরা একলম্ফে দেশপূজ্য। এদেশে কিন্তু ওটা ধর্মচর্চার মতো অবশ্যকরণীয় ব্যাপার; যাঁরা করেন তাঁরা নিজের বা নিজের দলের বা নিজের দেশের গরজে করেন; সেজন্যে বাহবা পাওয়ার কথাই ওঠে না; দেশপূজ্য হওয়া দূরে থাক দেশের কাজে লাঞ্ছনা পাওয়াটাই ঘটে। লয়েড জর্জ কাশী-বৃন্দাবনে না গিয়ে পার্লামেন্টে যান, সেজন্য তাঁকে ছেড়ে কথা কইতে হবে কেন? তাঁর পুণ্যার্জনের লোভ আছে তাই তিনি ভারতবর্ষ হলে কাশী যেতেন, ইংল্যাণ্ড বলে পার্লামেন্টে গেলেন। লোকে যেমন কাশীবাসীকে ছেড়ে কথা কয় না, পার্লামেন্টবাসীকেও ছেড়ে কথা কয় না। বলডুইন দেশের জন্যে ত্যাগ বড়ো কম করেননি, ইংল্যাণ্ডের আদর্শে সে-ত্যাগ চিত্তরঞ্জনের ত্যাগের চেয়ে ছোটো নয়। তবু তাঁকে তাচ্ছিল্য করতে রাস্তার টম ডিকও পশ্চাৎপদ নয়। লয়েড জর্জ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দুর্দিনে তাকে রক্ষা করলেন অথচ তাঁকে ঠাট্টা করা ও খ্যাপানো এখানকার একটা ফ্যাশন।

ইংল্যাণ্ড দিন-কে-দিন যতই গণতান্ত্রিক হচ্ছে ততই তার মহাপুরুষভীতি বাড়ছে। মাঝারি মানুষ ছাড়া অন্য কোনো মানুষ ক্রমশই ইংল্যাণ্ডের মাটিতে অসম্ভব হয়ে আসছে। একজন ক্রমওয়েলকে বা একজন মুসোলিনিকে ইংল্যাণ্ড দু-চক্ষে দেখতে পারবে না; এমনকী একজন পিলকে বা গ্ল্যাডস্টোনকেও না। ইংল্যাণ্ডের মতো অতি স্বাধীন দেশে কোনো মানুষই যথেষ্ট স্বাধীন নয়। হাজারো আইনকানুন ও সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের দশজনের একটা mass suggestion-ও আছে, সমাজের দশজন চায় না যে তাদের মধ্যে কোনো একজন সর্বেসর্বা হোক কিংবা বাকি ন-জনের চেয়ে মাথায় উঁচু হোক। গণতন্ত্রের আন্তরিক ইচ্ছা—কেউ বামন হবে না, কেউ দৈত্য হবে না, সবাই প্রমাণ সাইজ হবে। তাই ইংল্যাণ্ডের মহাপুরুষরা কেবল রাজনীতিতে নয়, কোনো বিষয়েই আকাশস্পর্শী হচ্ছেন না। সাহিত্যক্ষেত্রে গত শতাব্দীর ব্রাউনিং, টেনিসন, কার্লাইল, ডিকেনসের দোসর দেখা যাচ্ছে না, বিজ্ঞানেও কোনো একজন লোক ডারুইনের মতো অতি অসাধারণ নন। অথচ মাঝারি সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিক ও রাজনীতিজ্ঞেরা গত শতাব্দীর চেয়ে এ শতাব্দীতে সংখ্যায় অধিক ও উৎকর্ষে বড়ো। তাঁরা লোকের নিন্দা প্রশংসা পাচ্ছেন, কিন্তু বিশেষ শ্রদ্ধা বা বিশেষ অশ্রদ্ধা পাওয়ার মতো মহান তাঁরা নন। তাঁদের নিয়ে এক-একটা school দাঁড়িয়ে যাচ্ছে বা অন্যান্য school-এর

সঙ্গে মাথা ফাটাফাটি বাঁধছে এমন নয়। গণতন্ত্রের দেশের জনসাধারণ কোনো একজনকে অসাধারণ হতে দেয় না। আমেরিকা, ফ্রান্স ও রাশিয়ার চেয়েও ইংল্যাণ্ডের গণতন্ত্র খাঁটি। সেইজন্যে ইংল্যাণ্ডে একটি ফোর্ড বা আনাতোল ফ্রাঁস বা লেনিন সম্ভব হয় না।

তবে এটা কেবল ইংল্যাণ্ডের নয়, এ যুগের সব দেশেরই অবশ্যম্ভাবী দুর্ভাগ্য। গণতন্ত্রের সঙ্গে মহাপুরুষের খাপ খায় না। গণতন্ত্রের সব সুখ, কেবল ওই একটি দুঃখ। গণতন্ত্র সকলকে সমান করতে চায়, কাউকে অসমান করতে চায় না। আগে ছিল ভোটের সাম্য, এখন আসছে মজুরির সাম্য, তারপর আসবে মাথার সাম্য। স্কুলমাস্টারের সাহায্যে সকলের মাথাকে সমান শক্তিবিশিষ্ট না করলে বুদ্ধির জোরে গোটা কয়েক লোক বাকি সকলের চেয়ে সুবিধা করে নিতে পারে। এখন থেকেই কোনো কোনো লোক সোশ্যালিজমের বিরুদ্ধে এই বলে আপত্তি করছে যে, সকলকে যদি সব বিষয়ে সমান সুযোগ দেওয়া হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা ইহুদি বংশীয় তারাই বুদ্ধির জোরে বড়ো বড়ো পদগুলো দখল করবে বা বাকি সকলের ওপরে সর্দারি করবে। সব সইতে রাজি আছি, কিন্তু ইহুদির কর্তৃত্ব...। কিন্তু ইহুদিকে কোনো বিষয়ে কোনো সুযোগ না দিলেও কি তাকে দাবিয়ে রাখা যায়? ইহুদি যে শোলার মতো, তাকে সমুদ্রের তলে পাথরচাপা দিলেও সে ভাসবেই। ইউরোপ আমেরিকার এমন কোন দেশ আছে যেখানে ইহুদিকে হাজার দাবিয়ে রাখলেও সে উপরে ওঠেনি? ভাবী কালের গণতন্ত্রে রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, মুড়ি-মিছরি সকলেরই একদর হবে, কিন্তু কতগুলো লোক যদি বেশি বুদ্ধিমান হয় তারা তো বেশি সুবিধা করে নেবেই—তারা ইহুদি বা আর যা-ই হোক-না কেন। শেষকালে তাদের বংশবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, বংশধরদের মাথা সমান করতে হবে। রাশিয়ার মানুষের মাথাকে বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা করে তার উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা হচ্ছে, কিন্তু উৎকর্ষের তারতম্য থেকে গেলে তম-প্রত্যয়ান্ত মাথাগুলো তর-প্রত্যয়ান্তদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙতে চাইবে না কি?

এমন কথাও আজকাল শুনতে হয় যে, আর্টকে সকলের হাতে পৌঁছে দিতে হবে, দর্শনকে সর্বজনবোধ্য করতে হবে, সব শাস্ত্রের অ-আ-ক-খ সকলের জানা চাই, সকলেই একখানা করে মোটর গাড়ি পাবে, সকলের মাথায় bowler hat না থাকলে সর্বমানবের ঐক্যবোধ হবে না, সকলের গায়ে কটিবস্ত্র না থাকলে ভারতবর্ষের মধ্যে ধনী-দরিদ্র ভেদ থেকে যাবে। গণতন্ত্রের যুগের যতগুলি প্রোফেট সকলেই সাম্যবাদী এবং সাম্য বললে এ যুগে বোঝায় বহিঃসাম্য। গান্ধী, লেনিন, ফোর্ড, বার্নার্ড শ প্রত্যেকেই নিজ নিজ ইউটোপিয়ায় সব মানুষকে সমান বানাতে চান। কিন্তু সব মানুষ কি আত্মায় সমান নয়, কোনোদিন সমান ছিল না? সব মানুষ কি দেহে মনে সমান হতে পারে, কোনোদিন সমান হবে? অতীতে আমরা অধিকারী ভেদের উপরে বড়ো বেশি জোর দিয়েছিলুম, বর্তমানে আমরা অধিকারী সাম্যের উপরে বড়ো বেশি জোর দিচ্ছি। সেইজন্যে আমাদের মধ্যে যাঁরা আর্টিস্ট তাঁরা ভাবছেন যে-আর্ট জন কয়েক সমঝদারের মধ্যে নিবদ্ধ, সে-আর্ট একটা মহার্ঘ বিলাসিতা। আর্টকে জনসাধারণের যোগ্য করতে গিয়ে দুধের সঙ্গে জল মেশাতে হবে। যাঁরা উদ্ভাবক তাঁরা এমন মোটর গাড়ি উদ্ভাবন করতেই ব্যস্ত যে মোটর গাড়ি সবচেয়ে সস্তার মধ্যে সবচেয়ে ভালো হবে, তা নইলে বেশি লোকে মোটর কেনবার সুখ থেকে বঞ্চিত হবে। যাঁরা শিক্ষাতত্ত্বজ্ঞ তাঁদের ইচ্ছা শিক্ষাকে এমন সুকর করা যাতে বহুসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী স্বল্পতম সময়ে বহু বিষয়ে শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারবে। ইংল্যাণ্ডে দেখছি ছেলে-মেয়েদের মধ্যে এক শ্রেণির বই বাজার ছেয়ে ফেলেছে। 'Children, do you know?' এই হল প্রশ্ন। এর উত্তর বইয়ের পাতায়। কে সর্বপ্রথম কিলিমাঞ্জারো পাহাড়ের চূড়ায় হাতি দেখেছিল, কোথায় গাছের ডালে বিছানা পেতে মানুষেরা শোয়, কোন তারাটার আলো পৃথিবীতে পৌঁছোতে ঠিক বারো বছর এগারো মাস উনত্রিশ দিন তেইশ ঘণ্টা লাগে—এমনই সব উদ্ভট প্রশ্নের উত্তর না জেনে রাখলে ভদ্রসমাজে বেচারা শিশু পন্ডিত বলে মুখ দেখাতে পারবে না, প্রতি প্রশ্নে অপদস্থ হবে।

সব জিনিস যে সকলকে জানতেই হবে পেতেই হবে করতেই হবে এইটে আমাদের যুগের কুসংস্কার। এরই উৎপাতে আমরা গভীরতার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে প্রসারের দিকেই দৃষ্টি দিচ্ছি বেশি। একটা তাজমহল সৃষ্টি না করে এক লাখ বাসগৃহ তৈরি করছি। একটি যিশুর জন্যে প্রস্তুত না হয়ে সহস্র সহস্র পাদরি প্রস্তুত

করছি। Mass production-এর পেছনেও এই মনোভাব। দু-একজন কোটিপতির ভোগের জন্যে নির্মিত একটি ময়ূর সিংহাসন এ যুগে অসম্ভব, এ যুগের শিল্পীদের চোখ public-এর ভোগযোগ্য একরাশ এক প্যাটার্নে তৈরি লোহার বেঞ্চির উপরে, যে-বেঞ্চিতে বসে একজন কয়লা ফেরিওয়ালা এক পেনি দামের Daily Mail পড়তে পড়তে বিশ্রাম করবে। রাশিয়ার রাজপ্রাসাদগুলো এখন নাকি গুদামঘরে পরিণত হয়েছে, Versailles-এর রাজনগর এখন একটা চিত্র প্রদর্শনী। আভিজাত্যের ভাবটা পর্যন্ত লোপ পেয়ে যাচ্ছে। যারা লোপ পেতে দিচ্ছে তারা আর কেউ নয়, অভিজাতেরা স্বয়ং। রুমানিয়ার রানি এক পেনি দামের খবরের কাগজের জন্যে নিজের ঘরোয়া সুখ-দুঃখের কাহিনি লিখে প্রচুর টাকা পান, তবে তাঁর ঠাট বজায় রয়! লর্ডেরাও কেউ মদ বিক্রি করে লাখপতি হবার পরে লর্ড পদবি পেয়েছেন। কেউ জাহাজের খালাসিগিরি করবার পরে ওকালতিতে উন্নতি করে লর্ড পদবি পেয়েছেন। ইংল্যাণ্ডে তবু নামমাত্র একটা লর্ড শ্রেণি আছে; ফ্রান্স জার্মানি প্রভৃতি দেশে বুর্জোয়ারাই সর্বোচ্চ শ্রেণি এবং রাশিয়াতে সে-শ্রেণিও নেই।

একদিন মানুষ প্রাণপণে যা চায় আরেক দিন যখন হাতের মুঠোয় তা পায় তখন ভাববার সময় আসে যা পেলুম সত্যিই কি তা এতই ভালো যে এরজন্যে যা হাতে ছিল তাকে ছাড়লুম! ইউরোপের কেউ কেউ এখন ভাবতে আরম্ভ করেছেন, গণতন্ত্র কি অভিজাততন্ত্রের চেয়ে সত্যিই ভালো? লাখ লাখ মাঝারি মানুষ কি এক-আধ জন মহাপুরুষের চেয়ে সত্যিই কাম্য? The greatest good of the greatest number কি প্রতি মানুষকে একটি করে ভোট ও একশো টাকা করে মাইনে দিলে হয়? খাওয়া পরার কষ্ট ও পরাধীনতার কষ্ট অতি অসহ্য কষ্ট, কিন্তু এ কষ্ট দূর করলেও কি সবচেয়ে বড়ো কষ্টটা থাকবে না? সবচেয়ে বড়ো কষ্ট কোয়ালিটির অভাব। দু-একটি মানুষ যদি বাকি সকলের চেয়ে অত্যন্ত বেশি বড়ো হয় তবে সেই অত্যন্ত বেশি বড়ো হওয়াটা কি বাকি সকলের পক্ষে greatest good নয়? ক্যাপিটালিজমের পেছনেও একপ্রকার আভিজাত্য ছিল। এক এক জন ক্যাপিটালিস্ট যখন পৃথিবীব্যাপী ব্যবসা ফাঁদেন, প্রকাণ্ড একটা combine-এর কর্তা হন, তখন তাঁর সেই শ্রেষ্ঠতা কি মানবজাতির শ্রেষ্ঠতা নয়? কিন্তু ইংল্যাণ্ডের মতো দেশে ক্যাপিটালিজমের দৌড় সীমাবদ্ধ হয়ে এসেছে, আমেরিকাতেও হয়ে আসবে। ক্যাপিটালিজম থামবেই, কিন্তু যে-বুদ্ধিবলের আভিজাত্য ক্যাপিটালিজমের পেছনে, সেই আভিজাত্যও যদি সেইসঙ্গে থামে তবে তাতে মানুষের লাভ বেশি না ক্ষতি বেশি?

আমেরিকার স্বাধীনতা, ফ্রান্সের বিপ্লব ও ইংল্যাণ্ডের যান্ত্রিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যে-সাম্যবাদ জড়িত ছিল সে-সাম্যবাদ সমস্ত পৃথিবীকে সমতল না করে ছাড়বে না। এই দেড় শতাব্দীর মধ্যে সে ইউরোপ আমেরিকাকে একাকার করে তুলেছে। এখন এক স্থানে বসেই দেশভ্রমণের ফল পাওয়া যায়। ইতর ভদ্র শূদ্র ব্রাহ্মণ শ্রমিক ধনিক প্রজা রাজা নারী নর তরুণ প্রবীণ সকলকেই এক নেশায় পেয়েছে—পরস্পরের সমান হতে হবে। এ যুগের একমাত্র বিরোধী সুর কেবল নিটশে। কিন্তু তাঁর চেলারা তাঁর পরুষকণ্ঠকে যথেষ্ট ললিত করতে লেগেছেন, তা নইলে ডেমোক্রেসির কর্ণপটহে ব্যথা লাগবে। আসল কথা বৈষম্যবাদের সবে শুরু হচ্ছে। অসম পুরুষকে ঠিকমতো কল্পনা করতে পারা যাচ্ছে না। কল্পনা করেও কোনো ফল নেই। তিনি যখন আসবেন তখন আপনি আসবেন, তাঁকে বানাবার ভার যে-বামনরা নিতে চায় তাদের সব কল্পনার চেয়ে তিনি বড়ো। তিনি এলে তাঁর সমাজের যে কেমন চেহারা হবে তার নকশা তৈরি করা এইচ জি ওয়েলসেরও অসাধ্য।

সম্প্রতি এখানে air raid হয়ে গেল। একদল লোক এরোপ্লেনে লণ্ডন আক্রমণ করলে, আরেক দল লোক লণ্ডন রক্ষা করলে। যুদ্ধটা এমন নিঃশব্দে হল যে খবরের কাগজ ছাড়া কোথাও রেশ রেখে গেল না। নিন্দুকেরা বলছে আসল যুদ্ধ এত সহজ ব্যাপার নয় এবং যারা সত্যিই লণ্ডন আক্রমণ করবে তারা এই যাত্রার দলের যোদ্ধাদের রিহার্সালের সুযোগ দেবে না।

ইংল্যাণ্ডের মতো দেশে যুদ্ধ একটা নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম। যারা পেশাদার সৈনিক তারা ভাবী যুদ্ধের জন্যে প্রতিদিন প্রস্তুত রয়েছে, যারা অব্যবসায়ী তারাও 'দরকার পড়লে সৈনিক হব' এই মনোভাব নিয়ে খাটছে ও খেলছে। এক্ষেত্রে বড়োলোক ছোটোলোক নেই, সব শ্রেণির সব অবস্থার লোকের পক্ষে এটা সন্ধ্যাহ্নিকের মতো আচরণীয়। পাঁচ বছরের ছেলের দলও মার্চ করে বাজনা বাজিয়ে শোভাযাত্রায় চলে, বড়োদের তো কথাই নেই। মেয়েরা তাদের নকল করে উৎসাহ দেয় এবং নিজেরা দল করে যুদ্ধের আনুষঙ্গিক ক্রিয়াগুলোর জন্যে তৈরি হয়। আহতদের শুশ্রূষার ভার তো মেয়েদেরই উপরে। আকাশ-যোদ্ধাদের মধ্যে মেয়েও আছে।

সামরিক সংস্কার এদের আবালবৃদ্ধবনিতার মজ্জাগত। পরিবারে দুটি-একটি ছেলে যুদ্ধকে তাদের জীবিকা করবেই, একথা প্রত্যেক পিতা-মাতা একরকম ধরেই রাখেন এবং পরিবারের দুটি-একটি মেয়ে সৈনিককে বিবাহ করে বিধবা হলেও হতে পারে, এও পিতা-মাতার দূরদৃষ্টির বাইরে নয়। একান্নবর্তী পরিবার এদেশে নেই, ছেলে বড়ো হলে ঘর ছেড়ে যায়, তার উপরে বাপ-মায়ের দাবি নগণ্য। সুতরাং ছেলে যদি যুদ্ধে প্রাণ হারায় তবে বাপ-মায়ের শোক যত বড়োই হোক অসুবিধা অপ্রত্যাশিত হয় না। একান্নবর্তী পরিবার প্রথা না থাকায় এদেশের যুবকদের পক্ষে দুঃসাহসিক কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া আমাদের তুলনায় সহজ। বিধবাবিবাহও এদেশে নিষিদ্ধ নয়, সুতরাং স্বামী যুদ্ধে প্রাণ দিলে স্ত্রীর শোক যত বড়োই হোক আশার ক্ষীণ রশ্মি থাকে। সেইজন্যে হয় প্রাণ দিতে নয় যশস্বী হতে এদের স্ত্রীরা যেমন এদের যুদ্ধে ঠেলে, আমাদের স্ত্রীরা তেমনি আমাদের যুদ্ধে দূরের কথা—বিদেশে যেতেও ঠেলে না, অধিকন্তু বাধা দেয়! যখন সহমরণ প্রথা ছিল তখন স্ত্রীর আনুকূল্য পাওয়া দুষ্কর ছিল না, কেননা বৈধব্যের যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতির উপায় ছিল; এবং পুনর্মিলনের আশাও ছিল নিকট।

আমাদের স্ত্রীলোকদের মতো প্রচ্ছন্ন শত্রু আমাদের আর নেই। তারা যে এদের স্ত্রীলোকদের চেয়ে স্নেহময়ী এমন মনে করলে দেশকাল-নিরপেক্ষ নারীপ্রকৃতির প্রতি অবিচার করা হয়। কিন্তু তারা এদের স্ত্রীলোকদের তুলনায় স্নেহান্ধ, তারা আমাদের 'রেখেছে বাঙালি করে, মানুষ করেনি।' কোনো দুঃসাহসিক ব্রতে তারা আমাদের নিষ্ঠুর আনুকূল্য করে না, তাই সে হতভাগিনীদের আমরা 'পথি বিবর্জিতা' করে সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়াটাকেই মনে করি চরম দুঃসাহসিকতা। এবং যখন সন্ন্যাসী হয়ে যাই, তখন কুলবনিতায় বারবনিতায় ভেদ রাখিনে, এক নিশ্বাসে বলে যাই নারী কালভুজঙ্গিনি, কামিনীকাঞ্চনের সঙ্গে তার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। ইউরোপের উপরে যে-খ্রিস্টিয়ানিটি নামক সন্ন্যাসীশাসিত ধর্মমতটি চাপানো হয়েছে সেটিও সম্ভবত বৃহৎ পরিবার-কণ্টকিত কাঁটা গাছের ফল। কিন্তু খ্রিস্টিয়ানিটি তো ইউরোপের সত্যিকার ধর্ম নয়, সরকারি ধর্ম। তাই চার্চের কর্তারাও স্টেটের কর্তাদের মতো যুদ্ধবিগ্রহে পান্ডার কাজ করে থাকেন। এমনকী ফরাসি যাজকরা উঁচু দরের ডিপ্লোম্যাট ও পোর্তুগিজ যাজকরা উঁচু দরের ব্যবসাদারও হয়ে থাকেন। এই যে এখন যুদ্ধ নিবারণের প্রচেষ্টা চলেছে, এতে চার্চের নেতৃত্ব নেই, এবং যেটুকু যোগ আছে সেটুকু চার্চভুক্ত জন কয়েক ব্যক্তি-বিশেষের।

ইংল্যাণ্ডে যুদ্ধবিরোধী শান্তিবাদীর সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু যে-কারণে বাড়ছে সে-কারণটা ইংল্যাণ্ডের বার্ধক্যের লক্ষণ কি না বলা যায় না। শান্তিবাদীদের দলে যাঁদের নাম দেখি তাঁরা সাধারণত বর্ষীয়ান এবং তাঁদের ভাবনা এই যে, আধুনিক যুদ্ধপ্রক্রিয়াকে যদি একটুও প্রশ্রয় দেওয়া যায় তবে ভাবী যুদ্ধে সমস্ত পৃথিবী ছারখার হয়ে যাবে। এরোপ্লেন থেকে বোমা ছুড়ে এক শতাব্দীর এত বড়ো লণ্ডন শহরটাকে এক দিনেই শ্মশান করে দেওয়া সম্ভব। মানুষ যত সহজে ধ্বংস করতে শিখেছে তত সহজে নির্মাণ করতে শেখেনি।

একটা যুদ্ধের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে কত বৎসর চলে যায়। আধুনিক যুদ্ধ প্রক্রিয়া এমন মারাত্মক যে, যেসব দেশ যুদ্ধে যোগ দেবে না সেসব দেশেও মহামারি পৌঁছোতে পারবে। এবং এক দেশের বিষে সব দেশ জর্জর হতে পারবে। এক জাতির ক্ষতিতে সব জাতির ক্ষয়, এটা যে কত বড়ো সত্য তা মানুষ এতকাল বুঝত না, এখন বুঝছে। কিন্তু বুঝলে কী হয়, বুদ্ধি তো মানুষের সব নয়, প্রবৃত্তি যে তার বুদ্ধির অবাধ্য। 'জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।' গত মহাযুদ্ধে যে-শিক্ষাটা হল, সে-শিক্ষা ইতিমধ্যেই বাসি হয়ে গেছে। আর কয়েক বছরেই নতুন জেনারেশন রাজত্ব করবে; নবীন চিরদিনই বেপরোয়া; শৈশবের যুদ্ধস্মৃতি যৌবনে মিলিয়ে যাবে; তখন চলবে নতুন যুদ্ধে নতুন কীর্তির আয়োজন। সে-আয়োজনে তরুণকে প্রেরণা দেবে তরুণী; সে তার কানে কানে বলবে, 'None but the brave deserves the fair'; অর্জুনের রথে সারথি হবে সুভদ্রা। তারপরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। তারপরে পতি-পুত্রহীনাদের নারীপর্ব; তারপরে আবার নতুন বংশ, নতুন পুরুষ, নতুন সৃষ্টি।

বেঁচে থেকে মানুষ করবে কী? মানুষ যে কঠিন কিছু না করতে পারলে জড় হয়ে যায়, ভীরু হয়ে যায়। যুদ্ধ মানুষ হাজার হাজার বছর করে আসছে শুধু কঠিন কিছু না করে তার শান্তি নেই বলে। যুদ্ধহীন জগতের শান্তির মতো অশান্তি তার পক্ষে আর নেই। মানুষ যে মানুষকে হিংসাই করে এটা মিথ্যা, সুতরাং 'অহিংসা পরমো ধর্মঃ' মানুষের পরম ধর্ম নয়। মানুষ আঘাত করতে ও আঘাত পেতে ভালোবাসে, কারণ মানুষ প্রেমিক। তার প্রেমে আঘাত আছে, অবহেলা নেই। অহিংসা তো অবহেলারই নামান্তর। আমি তোমাকে অহিংসা করি বললে তোমার প্রতি কিছুই করা হয় না, না ভালো না মন্দ। অহিংসা হচ্ছে একলা মানুষের নিষ্ক্রিয় মানুষের ধর্ম, সে-মানুষ অসহযোগীই বটে। তেমন মানুষের সমাজে বাস করে আনন্দ নেই। আমরা চাই দুটো মারতে দুটো মার খেতে, আমরা রাগীও বটে অনুরাগীও বটে, কিন্তু রক্ষা করো, আমরা বৈরাগী নই।

আধুনিক যুদ্ধ প্রক্রিয়ায় মানুষকে কি মানুষের নিকট করে তোলেনি? মানুষের সঙ্গে মানুষকে মেলায়নি? অধিকাংশ মানুষ দেশের বাইরে যাওয়ার সুযোগ পায় না প্রধানত আর্থিক কারণে। যুদ্ধের সময় সৈন্যদলে যোগ দিয়ে তারা যখন বিদেশ অভিযান করে তখন বিদেশকে জানবার সুযোগ পায়, বিদেশিকেও জানে। গত মহাযুদ্ধে দ্বীপবদ্ধ ইংরেজ প্রথম বার জার্মান সংস্পর্শে এসে জার্মান জাতিকে জানল, তার ফলে এখন জার্মানির প্রতি শ্রদ্ধা তাদের কত! গত মহাযুদ্ধে ফ্রান্স থেকে যাঁরা যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন তাঁদের কারো কারো লেখায় পড়লুম, জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণেই দুই যোদ্ধা বোঝে যে তারা দুজনেই মানুষ, তাদের দুজনের কিছুমাত্র বিরোধ নেই। কীসের এক অবোধ্য প্রেরণায় তাদের একক্ষেত্রে মিলিয়েছে; অমূল্য এ মিলন, কিন্তু এর মূল্য দিতে হবে জীবনদান করে। মিলন মাত্রেই বিয়োগান্ত!

ভাবী যুদ্ধের বিশ্বব্যাপী মহামারিতে মানুষকে আরেকটুখানি মিলাবে। অকথ্য লোকসান দিয়ে মানুষ জানবে যে, সকলেরই স্থান এক নৌকায়। ভারতবর্ষের লোক ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে এসে দেখে গেছে পৃথিবীটা নেহাত ছোটো, ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগে মেনে নিয়েছে পৃথিবীর এক কোণের ছোঁয়াচ আরেক কোণে পৌঁছায়। গত মহাযুদ্ধের পর সকলেই অল্পাধিক বুঝেছে যে, জেলায় জেলায় যুদ্ধ যেমন জ্ঞাতিবিরোধ, দেশে দেশে যুদ্ধও তেমনি জ্ঞাতিবিরোধ। সেদিন এক গির্জার দ্বারে লিখেছে :

> Duelling is illegal. War is the duel between nations. Why not make it illegal by taking your national quarrel to an international court of justice?

এদেশের 'লিগ অব নেশনস ইউনিয়ন' যুদ্ধনিবারণের জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে। নানা দেশের নানা জাতির মানুষের যাতে দেখাশুনো আলাপ পরিচয় হয় সে-চেষ্টারও বিরাম নেই। ভাবী যুদ্ধ যদি নিকট ভবিষ্যতে ঘটে তবে ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণ আত্মরক্ষারগুরুতর কারণ না দেখলে যুদ্ধে নামতে চাইবে কি না সন্দেহ। যদি সুদূর ভবিষ্যতে ঘটে তবে বুদ্ধির চেয়ে প্রবৃত্তিই প্রবল হবে বোধ হয়। পৃথিবীকে এক রাষ্ট্রে পরিণত না করা অবধি যুদ্ধের ক্ষান্তি নেই। শুধু এক রাষ্ট্র নয়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। শুধু গণতান্ত্রিক নয়, ধনসাম্যমূলক। রেল স্টিমার

যেমন কলকাতা, বম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লিকে পরস্পরের পক্ষে নিকটতর করে ভারতবর্ষকে এক রাষ্ট্র করেছে, এরোপ্লেন তেমনি নিউ ইয়র্ক, লণ্ডন, কায়রো, সিঙ্গাপুর, টোকিওকে পরস্পরের পক্ষে নিকটতর না করা অবধি পৃথিবীব্যাপী এক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশা নেই। তবে ইউরোপ যে তাড়াতাড়ি এক রাষ্ট্র হয়ে উঠছে এর সন্দেহ নেই। 'United States of Europe' আর বেশি দিন নয়, পঞ্চাশ বছর।

যুদ্ধ যদি উঠে যায় তবে যুদ্ধেরই মতো কঠিন কিছু উদ্ভাবন করতে হবে। নতুবা মৃত্যুসংখ্যা কমাবার জন্যেই যদি যুদ্ধ তুলে দিতে হয় তবে বৃদ্ধের সংখ্যা বেড়ে যাবে; সমগ্র পৃথিবীটাই একটা ভারতবর্ষ হয়ে উঠবে, যেখানে যযাতির রাজত্ব হাজার কয়েক বছর থেকে চলে আসছে। তখন পৃথিবীময় 'পিতা স্বর্গ' ও 'জননী স্বর্গাদপি'র জ্বালায় মাথাটা ভক্তিতে এমন নুয়ে আসবে যে মেরুদন্ড যাবে বেঁকে, এবং পিঠের উপর চেপে বসবেন পতিব্রতার দল। ইউরোপেরও যদি এহেন অবস্থা হয়, তবে পৃথিবীর কোথাও বাস করে শান্তি থাকবে না, সর্বত্রই এত শান্তি! যুদ্ধ যদি উঠে যায় তবে যৌবনের পক্ষে সে বড়ো দুর্দিন। ভাবুকরা বলছেন প্রচুর খেলাধুলার ব্যবস্থা করা যাবে, ভয় নেই। এই যেমন Olympic games। কিন্তু এও যথেষ্ট নয়। এমন কিছু চাই যা আরও বিপজ্জনক, আরও প্রাণান্তক। সমাজকে অতীত কালের মতো ভাবীকালেও প্রচুর প্রাণক্ষয় করে প্রচন্ড প্রাণশক্তির পরিচয় পেতে হবে, সমাজের বাজেটে লোকসানের ঘরের অঙ্ক চিরকাল সমান বিপুল হওয়া চাই। ইতিহাসে এই দেখা গেছে যে, কোটি প্রাণীর তপস্যায় কয়েকটি প্রাণী সিদ্ধিলাভ করেছে, অভিব্যক্তির ইতিহাসে যোগ্যতমেরই উদবর্তন। যে-মানুষ সাহসে উদ্যমে উদ্যোগে বিক্রমে যোগ্যতম, সে-মানুষকে সহজ পথ দেখিয়ে মানবজাতি লাভবান হবে না।

যুদ্ধকে অনাবশ্যক বলে যদি তুলে দেওয়া হয় তো ভালোই, কিন্তু ক্ষতিকর বলে যদি তুলে দেওয়া হয় তবে বুঝতে হবে ক্ষতি স্বীকার করবার মতো ক্ষমতা মানবজাতির নেই। সে ক্ষমতা বর্বরের ছিল, কেননা বর্বরের প্রাণশক্তি ছিল প্রভূত। সভ্যতা যদি মানবের প্রাণশক্তি হরণ করে থাকে তবে সভ্যতার পক্ষে সেটা ভয়ের কথা। বর্বরতার শক্ত বনিয়াদের উপরে প্রতিষ্ঠিত না-হলে সভ্যতার পাকা দালানে ফাটল দেখা দেয়। মানবের মধ্যে যে-পশু আছে তাকে দুর্বল করলে মানব দুর্বলই হয়। বহুকাল মানবকে মনে করা হয়েছে পশু থেকে স্বতন্ত্র একটা সৃষ্টি, একেবারে ভুঁইফোঁড়। সভ্য মানবকে মনে করা হয়েছে বর্বর থেকে স্বতন্ত্র একটা জাতি, পূর্বপুরুষহীন। কৌলীন্যের পেছনে যেন সাংকর্য নেই, আভিজাত্যের পেছনে যেন জারজতা নেই, পদ্মের পেছনে যেন পাঁক নেই! আসলে কিন্তু পাঁকই হচ্ছে সার, সে না থাকলে জলের পদ্ম হত কাগজের পদ্ম। বহুকাল থেকে আমরা বর্বরতার তেজ হারিয়ে সভ্যতার আলো নিয়ে খেলা করে এসেছি, তৈমুরের ভোঁতা তরোয়ালে শান দিয়ে তাকে দাড়ি চাঁচবার ক্ষুর বানিয়েছি, জীবনের মোটা কথাগুলোর সূত্র হারিয়ে সূক্ষ্ম তত্ত্বের জট পাকিয়েছি।

সেইজন্যে দেখি আমাদের যুগে আদিম যুগের সঙ্গে অন্বয়রক্ষার চেষ্টা; কেউ বলছে 'back to the village'; কেউ বলছে 'back to the forest'; কেউ বলছে বর্বরের মতো দিগম্বর হও; কেউ বলছে পশুর মতো আকাশের তলে ঘাসের উপরে খাও-শোও। এসবের তাৎপর্য এই যে, আমরা আদিম প্রাণীর জোর হারিয়েছি, আপনার গাঁথা জালে জড়িয়েছি। অতিবুদ্ধির নাকে দড়ি; সেই হয়েছে সভ্যমানবের দশা। যুদ্ধ দোষের নয়, দোষের হচ্ছে কূটনীতি, গুপ্তচরবৃত্তি, বিষবায়ু প্রয়োগ, ব্যাধিবীজ বিক্ষেপ ইত্যাদি কৌরবসুলভ কুকার্য। মানুষ ধর্মযুদ্ধ ভালোবাসে, সে-যুদ্ধে তার গুণাগুণের পরিচয় দিয়ে সে তৃপ্তি পায় মরণেও। কিন্তু আধুনিক যুদ্ধের বারো আনাই যে মিথ্যাপ্রচার, কাগজে কাগজে যুদ্ধ। অসির চেয়ে মসির উপদ্রব বেশি। আধুনিক যুদ্ধে যত মানুষ প্রাণে মরে তার বেশি মানুষ আত্মায় মরে; এইখানেই অধর্ম—যুদ্ধে অধর্ম নেই।

যুদ্ধ একটা উপলক্ষ্য মাত্র, লক্ষ্য হচ্ছে ক্ষমতার পরীক্ষা। যুদ্ধের চেয়ে সহজ উপলক্ষ্য চাইনে, যুদ্ধের পরিবর্তে অন্যবিধ উপলক্ষ্যে আপত্তি নেই। কিন্তু সে-উপলক্ষ্য যেন আবালবৃদ্ধবনিতাকে যেকোনো মুহূর্তে প্রাণ দিয়ে দিতে প্রস্তুত রাখে, সাহসে উদ্যমে উদ্যোগে বিক্রমে প্রত্যেককে ভরে দেয়। যুদ্ধনিবারণী প্রচেষ্টার যাঁরা নায়ক তাঁরা যুদ্ধের বদলে করবার কী আছে তা বলেননি, শুধু বলেছেন, 'যুদ্ধ কোরো না'; হাঁ-মন্ত্র না

দিয়ে দিচ্ছেন না-মন্ত্র; 'Thou shalt' না বলে বলছেন 'Thou shalt not'। যুবকের প্রাণ ভাবের বদলে অভাবে ভরে ওঠে না, যুবক চায় positive commandment। যুদ্ধের বদলে সালিশি করা তরুণের কাজ নয় এবং যুদ্ধের বদলে পুলিশি করেও তরুণের তৃপ্তি নেই। তাই শান্তিবাদীদের আবেদন তরুণের বুক দোলায় না। এখন যদি কেউ এসে বলতেন 'তোমরা প্রেমের অভিযানে জগতের হৃদয় জিনে নাও' তবে সেও হত একরকম যুদ্ধ, তাতে দুঃখ কিছুমাত্র কম হত না, মরণাধিক বেদনা থাকত। সে-যুদ্ধে স্বার্থপরতার গ্লানি ও মিথ্যাভাষণের পাপ চাপা পড়ত এবং ভীরুতার স্থান থাকত না। সে-যুদ্ধে বর্বরকে ঘৃণা করে তার অবদান হতে সভ্যতাকে বঞ্চিত করা হত না; পশুকে অবহেলা করে তার সংস্পর্শ হতে মানুষকে দূরে রাখা হত না। যে-ডাক শুচি-বাতিকগ্রস্তের নয়, নীতি-বাতিকগ্রস্তের নয়, অহিংসা-বাতিকগ্রস্তের নয়, প্রেমিকের—সেই মারাত্মক ডাকের প্রতীক্ষায় আমাদের যুগ পদচারণ করছে।

বসন্ত যখন আসে তখন এমনি করেই আসে। তখন ফুল যত ফোটে কুঁড়ি ঝরে যায় তার বেশি, যত ফুল সফল হয় তার বেশি ফুল হয় নিষ্ফল। 'বসন্ত কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে? দেখিস নে কি শুকনো পাতা ঝরা ফুলের খেলা রে।' লাভের চেয়ে লোকসানই বেশি; তবু অপরিসীম লাভ, সেই অপরিসীমতাকে বলি বসন্ত। জীবনের চেয়ে জরা-ব্যাধি-মৃত্যুই বেশি; তবু অপরিসীম জীবন, সেই অপরিসীমতাকে বলি যৌবন।

জার্মানিতে এসে দেখতে পাচ্ছি জাতির জীবনে বসন্ত এসেছে। জার্মানদের দেখে বিশ্বাস হয় না যে, কিছুদিন আগে এরা যুদ্ধে হেরে সর্বস্বান্ত হয়েছে এবং এখনও এরা অংশত পরাধীন ও অত্যন্ত ঋণগ্রস্ত। মুখে হাসি নেই এমন মানুষ আছে কি না খোঁজ নিতে হয়, এবং সকলেরই স্বাস্থ্য অনবদ্য। অথচ যুদ্ধে এরা প্রত্যেকেই ধন জন হারিয়েছে এবং মার্ক মুদ্রার পতনকালে এদের অধিকাংশের সর্বস্ব গেছে। কিন্তু সর্বস্ব গেলেও যদি যৌবন থাকে তবে সর্বস্ব ফিরে আসতে বিলম্ব হয় না। জার্মানির লোক ধন দিয়েছে, প্রাণ দিয়েছে, কিন্তু যৌবন দেয়নি। তাই এমন অবিশ্রান্ত যৌবনচর্চা চলেছে ক্ষতিকে পুষিয়ে নিতে। যারা গেছে তাদের স্থান পূরণ করছে যারা এসেছে তারা, শিল্প বিজ্ঞানে ক্রীড়ায় কৌতুকে নবীন জার্মানির পরাক্রম দেখে মনে হয় না যে প্রবীণ জার্মানি বেঁচে থাকলে এর বেশি পরাক্রমী হতে পারত।

বসন্তকে যেমন কুঁড়ি ঝরাতে হয় লাখে লাখে, সমাজকে তেমনি মানুষ খোয়াতে হয় লাখে লাখে। প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের শর্ত এই যে, প্রকৃতি আমাদের যা দেবে তা আমরা পালা করে ভোগ করব। আমাদের এক দলকে মরতে হবে আরেক দলকে বাঁচতে দেবার জন্যে। মৃত্যুর মধ্যে যে-তত্ত্ব আছে সে আর কিছু নয়, সে এই—যারা জন্মায়নি তাদেরকে স্থান ছেড়ে দেবার জন্যে যারা জন্মিয়েছে তারা মরবে। সমাজকে তাই হয় দুর্ভিক্ষের জন্যে নয় যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত থাকতে হয়—দুর্ভিক্ষের মরা তিলে তিলে, যুদ্ধের মরা এক নিমেষে। * দুর্ভিক্ষে যারা মরে তারা আগে থাকতে দুর্বল, তারা সাধারণত বৃদ্ধ কিংবা শিশু কিংবা স্ত্রীলোক। আর যুদ্ধে যারা মরে তারা যুবা, সবচেয়ে বলবান, সবচেয়ে স্বাস্থ্যবান পুরুষ। যে-সমাজের যৌবন অফুরন্ত সে-সমাজ যুবাকেই মরতে পাঠায় যুবাকে স্থান ছেড়ে দেওয়ার জন্যে, সে-সমাজ কোনোদিন যুবার অভাববোধ করে না। আর সে-সমাজের যৌবন অল্প তার ব্যবস্থা অন্যরকম, যে-সমাজের যৌবন শুকিয়ে শুকিয়ে লোলচর্ম হলে পরে যখন তার মৃত্যু আসে তখন এক স্থবিরের স্থান পূরণ করতে থুড়থুড় করে অগ্রসর হয় আরেক স্থবির —ঠাকুরদা মশায়ের পরে জ্যাঠামশায়, তাঁর পরে বাবামশায়, তাঁর পরে কাকামশায়, তাঁর পরে দাদা, তার পরে আমি। চুল না পাকলে রাজত্ব করবার অধিকার কারুর নেই। সুতরাং বাল্যকাল থেকেই বার্ধক্যচর্চা করতে হয়।

কিন্তু ইউরোপে দেখছি বিপরীত ব্যাপার। যৌবনরক্ষা করবার জন্যে মহাস্থবিরেরা monkey gland-এর শরণ নিচ্ছেন, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়ারা বালক-বালিকার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খালি গায়ে খোলা জায়গায় সাঁতার কাটছেন, নৌকা চালাচ্ছেন, কঠিন কাঠের তক্তারউপরে পড়ে পড়ে মধ্যাহ্নসূর্যের কিরণে সিদ্ধ হচ্ছেন। এটাও একটা ফ্যাশন, কিন্তু ফ্যাশন তো weather cock-এর মতো দেখিয়ে দেয় বাতাস কোন দিক থেকে বইছে। যুদ্ধের আগে জার্মানিতে প্রত্যেক পুরুষকেই রণশিক্ষা করতে হত। এখন তার উপায় নেই, কিন্তু সংস্কার যায় কোথায়? জার্মানদের বহুকালাগত আদর্শ—মানুষকে হতে হবে 'blood and iron.' পুরুষদের সঙ্গে এখন মেয়েরাও যোগ দিয়েছে, জাতীয় দুর্দশা স্মরণ করে কেউ তাদের বাধা দিতেও পারছে না। চার্চ একটু খুঁতখুঁত করেছিল। ওরা বললে, অমন করলে চার্চ মানব না। তখন চার্চ হাল ছেড়ে দিলে। জার্মানদের মতো গোঁড়া খ্রিস্টান জাতি নিতান্ত দায়ে না ঠেকলে এ অনাচার সহ্য করত না।

যারা যুদ্ধে প্রাণ দেয় তারা দেশের সবচেয়ে প্রাণবান পুরুষ। যারা বেঁচে থাকে তারা বালবৃদ্ধবনিতা। তবু তাদেরই ভিতর থেকে নতুন সৃষ্টির উদগম যখন হয় তখন অবাক হয়ে দেখি এ সৃষ্টিও আগেরই মতো পরাক্রান্ত। তখন মনে হয় একে পরাক্রান্ত হওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্যেই আগের সৃষ্টিকে ধ্বংস হতে হল।

জীবনকে আমরা বলে থাকি লীলা, এরা বলে থাকে সংগ্রাম। একই কথা। কেননা লীলা যেমন নবনবোন্মেষ, সংগ্রামও তেমনি নূতন সৃষ্টির জন্যে পুরাতনের ধ্বংস। বহু শতাব্দী ধরে দেখা যাচ্ছে প্রতি জেনারেশনে ফ্রান্স একবার করে নিঃক্ষত্রিয় হয়, তার বলবান পুরুষেরা প্রাণ দেয়, তার সুন্দরী নারীরা nun হয়ে যায়। তবু ভস্মের ভিতর থেকে আগুন জ্বলে ওঠে, নতুন ফ্রান্সের কীর্তি পুরাতন ফ্রান্সের গৌরব ম্লান করে দেয়। 'হইলে হইতে পারিত' কথাটা অক্ষম দেশের পক্ষে প্রযোজ্য, ফ্রান্সের পক্ষে নয়। ফ্রান্স যা হয়েছে তা-ই এত আশ্চর্য যে, এই হওয়াটার খাতিরে তার 'হইলে হইতে পারা'টা চিরকালের মতো না হওয়া থেকে গেল। যা হতে পারতুম তা-ই যদি হতুম, তবে যা হয়েছি তা হতে পারতুম না। বাস্তবটা এমন শোচনীয় নয় যে সম্ভাব্যতার জন্য হাহুতাশ করব। স্বর্গ থাকলে মর্ত যদি না থাকে তবে চাইনে স্বর্গ।

মহাযুদ্ধের অশেষ ক্ষতিকে স্বপ্ন করে দিয়ে জার্মানি নতুন দিনের আলোয় নতুন করে বাঁচছে। তার ধনবল নেই, সৈন্যবল নেই, কিন্তু তার লক্ষ লক্ষ বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া যেরূপ উৎসাহ আগ্রহ ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে যৌবনচর্চা করছে তা দেখে মনে হয় ভাবীকালের জার্মান জাতিকে নিয়ে আবার বিপদ বাঁধবে। জার্মানি যা করছে তার কোথাও কিছু কাঁচা রাখছে না। পৃথিবীর যেখানে যে-বিষয়ে যে-বই প্রকাশিত হয় জার্মানি তার অনুবাদ করে পড়ে, ক্ষুদ্র শহরের ক্ষুদ্র দোকানেও আমি ভারতীয় আর্টের উপরে লেখা বৃহৎ বই এবং মহাত্মা গান্ধীর *Young India*-র অনুবাদ দেখলুম! তা বলে ভারতবর্ষের প্রতি জার্মানির পক্ষপাত নেই, Sigrid Undset-এর নূতনতম বইয়ের অনুবাদও সে-দোকানে ছিল এবং যে-বই অল্পদিন আগে লণ্ডনে প্রকাশিত হয়েছে সে-বই অনুবাদ করতে জার্মানির বিলম্ব হয়নি। জার্মানির ছোটো ছোটো শহরেও যেসব মিউজিয়াম আছে সেগুলিতে পৃথিবীর কোনো দেশ বাদ পড়েনি। জার্মানির শিক্ষাপ্রণালীর গুণে দেশের ইতরসাধারণ ও পৃথিবীর কোন দেশে কোন বিষয়ে কতটা উন্নতি হয়েছে সে-খবর রাখে। ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণ এমন সর্বজ্ঞ নয়।

কিন্তু আমাকে সবচেয়ে চমৎকৃত করেছে দুটি বিষয়। প্রথমত, জার্মানির যে ক-টি ছোটো ও বড়ো গ্রাম ও শহর দেখলুম সে ক-টিতে Slum নেই, বরং মজুরদের বাড়িগুলি আমাদের মধ্যবিত্তদের বাড়ির তুলনায় অনেক উপভোগ্য। জার্মানির গরিব লোকদের অবস্থা ইংল্যাণ্ডের গরিব লোকদের চেয়ে অনেক ভালো। জার্মানির জাতীয় দুর্দশার দিনে তার শক্তিকে অপচয় থেকে রক্ষা করেছে তার অন্তর্বিবাদের স্বল্পতা। তা ছাড়া জার্মানি প্রমাণ করে দিচ্ছে যে যন্ত্রসভ্যতার সঙ্গে Slum-এর কিছু সোদর সম্বন্ধ নেই। দ্বিতীয়ত, জার্মানির শ্লীলতাবোধ এমন বনেদি যে, কলকারখানার সঙ্গে কদর্যতাকে সে প্রশ্রয় দেয়নি। ফ্যাক্টরিগুলো যথাসম্ভব গ্রাম বা শহরের বাইরে। তাদের ছোঁয়াচ বাঁচাবার জন্যে গ্রাম ও শহরের চতুঃসীমায় বাগান করে দেওয়া হয়েছে কিংবা বাড়ির সঙ্গে একটি বাগান করতে দেওয়া হয়েছে। শ্রমিকরা যেসব বাড়িতে থাকে সেসব বাড়িরও সুন্দর গড়ন সুন্দর রং; কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য প্রত্যেকেরই আছে। হোটেল বা রেস্তরাঁর দেওয়ালেও ওয়ালপেপারের বদলে একপ্রকার আলপনা। স্টেট থেকে অপেরা হাউস ও থিয়েটার বানিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রত্যেক শহরে। গান-বাজনার একটি আবহাওয়া সর্বত্র বোধ করা যায়। ইংল্যাণ্ডের সাধারণ লোক বোবা-কালা, এবং সিনেমা দেখে দেখে তাদের চোখও গেছে। কিন্তু জার্মানির সকলেই গান-বাজনায় যোগ দেয়। আর জার্মানিতে ছবি আঁকার ঝোঁক নিয়ে যত লোক বেড়ায়, ফোটো তোলার বাতিক নিয়ে তত লোক বেড়ায় না।

বেড়ানোর নেশা পৃথিবীর দুটি জাতির আছে, আমেরিকান আর জার্মান। কিন্তু আমেরিকান যখন বেড়ায় তখন ভেসে ভেসে বেড়ায়; দিনের দু-চার ঘণ্টায় দুশো মাইল দেখে নিয়ে বাকি সময়টায় বার বার খায়-দায় নাচে খেলে। তারজন্যে সবচেয়ে দামি রেল, জাহাজ, সবচেয়ে আরামের মোটর কোচ, সবচেয়ে বড়ো হোটেল। ভ্রমণ করবার সময় যাতে সে বিশ্রামসুখ পায় সেই দিকেই তার দৃষ্টি। কিন্তু জার্মান যখন বেড়ায় তখন পায়ে হেঁটে বেড়ায়, ফোর্থ ক্লাস রেলগাড়িতে চড়ে, নিজের পিঠে বাঁধা 'ruck sack' থেকে কিছু 'wurst' বার করে খায়, সস্তা সরাইতে গিয়ে পেট ভরে এক ঘড়া সস্তা beer পান করে, বিশ্রাম করতে করতে

ছবি আঁকে আর চলতে চলতে প্রাণ খুলে গান গায়। জার্মানি দেশটি আমাদের যেকোনো প্রদেশের চেয়ে বড়ো। তার উত্তরটা প্রোটেস্টান্টপ্রধান, দক্ষিণটা ক্যাথলিকপ্রধান। তার প্রত্যেক জেলার নিজস্ব ইতিহাস আছে, প্রত্যেক জেলাই ছিল স্বতন্ত্র। জার্মানিকে একটি ছোটো স্কেলের ভারতবর্ষ বলতে পারা যায়, তেমনি বহুধাবিভক্ত। তাই জার্মানরা চায় নিজেদের দেশেরও অলিতে-গলিতে ঘুরে নিজের দেশকে সমগ্রভাবে জানতে। তাদের বেড়ানোর নেশার পেছনে তাদের এই উদ্দেশ্যটি আছে। যুদ্ধে হেরে জার্মানি এক হয়েছে। আগে ছিল প্রাশিয়ার একাধিপত্য। তবু প্রাদেশিকতা সম্পূর্ণ মরেনি এবং প্রোটেস্টান্টে-ক্যাথলিকে বিরোধ আছে।

জার্মানরা ইংরেজদের মতো প্রধানত প্রোটেস্টান্ট বা ফরাসিদের মতো প্রধানত ক্যাথলিক নয়। এদের দুই সম্প্রদায়ই সমান প্রবল। রাইনল্যাণ্ড ও ব্যাভেরিয়ার সর্বত্র ক্যাথলিক প্রভাব লক্ষ করছি। গির্জার যেমন সংখ্যা নেই, তেমনি গির্জার বাইরে ও ভিতরে মূর্তি ও চিত্রেরও সংখ্যা নেই। এখনও লোকে সেসব প্রতিমার কাছে দীপ জ্বালে, ফুল রাখে, হাঁটু গাড়ে, মাথা নোয়ায়, মনস্কামনা জানায়। খ্রিস্টিয়ানিটি বহুদূর থেকে এলেও ইউরোপের হৃদয় অধিকার করেছে।

মূর্তি ও চিত্রগুলি সচরাচর ক্রুশবিদ্ধ যিশুর কিংবা যিশুজননী মেরির। যিশুর পবিত্র জন্ম ও করুণ মৃত্যু—এই দুটি বিষয় নিয়ে অসংখ্য চিত্রকর চিত্র এঁকেছেন, অসংখ্য ভাস্কর মূর্তি গড়েছেন এবং অসংখ্য সংগীতকার গান রচনা করেছেন। মধ্যযুগের ইউরোপীয় আর্ট প্রধানত এই দুটি বিষয়কে অবলম্বন করে আত্মপ্রকাশ করেছিল। রেনেসাঁসের পরে ইউরোপ নিজেকে চিনল, বিষয়ে দারিদ্র্য রইল না এবং ইউরোপীয় আর্ট গির্জার আঁচল ছাড়ল। খ্রিস্টিয়ানিটি যে ইউরোপের অন্তরের অন্তঃস্থলে পৌঁছায়নি তার প্রমাণ খ্রিস্টিয়ানিটিকে ইউরোপ আপন ইচ্ছামতো ভাঙতে-গড়তে পারেনি, যেমনটি পেয়েছিল তেমনটি রাখতে চেষ্টা করেছে। সুন্দর সামগ্রী উপহাররূপে পেলে লোকে সাজিয়ে রাখতেই ব্যস্ত হয়।

খ্রিস্টিয়ানিটিকে তার বাড়ির পাশের আরব পারস্যের লোক গ্রহণ করলে না; এমনকী তার বাড়ির লোক ইহুদিরা পর্যন্ত অসম্মান করলে, কিন্তু দূর থেকে ইউরোপ ডেকে নিয়ে মান দিল। কেন এমন ঘটল? সম্ভবত ইউরোপের পরিপূরকরূপে এশিয়াকে দরকার ছিল। কিংবা ইউরোপীয় চরিত্রের পরিপূরকরূপে যিশুর আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তটির প্রয়োজন ছিল। জার্মানির যেখানে যাই সেখানে দেখি যিশুর ক্রুশবিদ্ধ করুণ মূর্তিটি বাণবিদ্ধ পাখির মতো দুটি ডানা এলিয়ে মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়েছে, যেন বিনা কথায় বলতে চায়, ‘আমার দুঃখ দেখে কি তোমাদের মায়া হয় না? তোমরা এখনও পাপ করছ?’ ভোগলোলুপ ইউরোপকে ত্যাগের কথা মনে করিয়ে দেওয়ার দরকার ছিল। শুধু কথায় তার মন ভিজত না। দৃষ্টান্ত তাকে মুগ্ধ করলে। আমার কিন্তু এ দৃশ্য ভালো লাগে না। কসাইয়ের দোকানে গোরু-ভেড়ার ধড় ঝুলছে, তার ঠিক সামনে গির্জার দেওয়ালে যিশুর শবমূর্তি ঝুলছে, এ যেন যিশুকে বিদ্রূপ করা। মনে হয় যেন ইউরোপের লোক পরস্পরকে যিশুর দোহাই দিতে চায় এইজন্যে যে, তাদের কারুর পক্ষে যিশুর আদর্শ অন্তরের দিক থেকে সত্য নয়, অথচ বাইরের দিক থেকে সে-আদর্শের প্রয়োজন আছে।

চোখে দেখতে জার্মান ও ইংরেজ একইরকম, ফরাসিও ভিন্ন নয়। ইউরোপের সব জায়গায় একই পোশাক, একই খানা, একই আদবকায়দা; সব জাতির বহিরঙ্গ একই। স্থান ও পাত্র ভেদে যেটুকু ব্যতিক্রম দেখা যায় সেটুকু ধর্তব্য নয়। জার্মানদের ধারণা তারা ভয়ানক কেজো মানুষ। তাই তারা মাথা মুড়ায়, plus fours কিংবা breeches পরে সাধারণত। তাদের মেয়েদেরও মোটা কাপড়ের প্রতি টান—খদ্দরপরা মেয়ে অহরহ দেখছি। জার্মান মেয়েরা কায়িক শ্রমসাধ্য কাজে পুরুষের দোসর। তারা গোরু-ঘোড়ার গাড়ি হাঁকায় ও পিঠে বোঝা বেঁধে হাঁটে। ফরাসি মেয়েদের দেখলে যেমন মনে হয় সারাক্ষণ পুষিমেনির মতো শরীরটিকে ঘষে-মেজে সাজিয়ে রেখেছে, জার্মান মেয়েদের দেখলে তেমন মনে হয় না। আবার ইংরেজ পুরুষদের দেখলে যেমন মনে হয় মাথার চুল থেকে পায়ের জুতো অবধি ফিটফাট, জার্মান পুরুষদের দেখলে তেমন মনে হয় না। জার্মানরা কেজো মানুষ, স্মার্ট হওয়ার মতো শৌখিনতা তাদের সাজে না; সাজসজ্জায় তারা ভোলানাথ।

তালি-দেওয়া চামড়ার হাফপ্যান্ট পরে পা দেখিয়ে রাস্তায় বার হলে লণ্ডনে ভিড় জমে যেত, মিউনিখে কেউ কিছু ভাবে না।

১৩

অস্ট্রিয়ায় যাওয়ার আগে বড়ো ভাবনা ছিল কী আর দেখব! গত মহাযুদ্ধে অস্ট্রিয়ায় যে-সর্বনাশ ঘটে গেল, কোন দেশের তেমন ঘটেছে! কত শতাব্দীর কত বড়ো সাম্রাজ্য, চারটি বছরের যুদ্ধে তার চৌচির অবস্থা! কোথায় গেল হাঙ্গেরি, কোথায় ট্রানসিলভানিয়া, কোথায় গেল ক্রাকাউ, কোথায় বোহেমিয়া, কোথায় গেল ক্রোয়েশিয়া, ড্যালমেশিয়া, বসনিয়া। চারটি বছরে চার শত বছরের কীর্তি নিঃশব্দে ভেঙে পড়ল, যেন একটা তাসের কেল্লা—একটি আঙুলের একটু ছোঁয়া সইতে পারলে না। সাম্রাজ্য যদিও চার শতাব্দীর, রাজবংশ প্রায় আট শতাব্দীর। যেন আলাউদ্দিন খিলজি থেকে পঞ্চম জর্জ পর্যন্ত একটি রাজবংশ দিল্লির সিংহাসনে বসে রাজ্যবিস্তার করে আসছিলেন, ভেবেছিলেন চন্দ্র-সূর্য যতদিনের তাঁরাও ততদিনের। ভালোই হল যে সাম্রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে সম্রাটও গেলেন, নইলে এখনকার ওইটুকু অস্ট্রিয়ায় অত বড়ো বনেদি রাজবংশকে মানাত না।

বড়ো ভাবনা ছিল ভিয়েনায় গিয়ে কী আর দেখব; সুন্দরী ভিয়েনার বিধবার সাজ কি আমার ভালো লাগবে! ভিয়েনাকে রানির বেশে সাজাবার সামর্থ্য অস্ট্রিয়ার নেই, অস্ট্রিয়ার না-আছে বন্দর, না-আছে খনি, অস্ট্রিয়ার লোকসংখ্যা এখন এত অল্প যে ভিয়েনার মতো বৃহৎ নগরীর নাগরিক হওয়ার জন্যে আমেরিকানদের সাধাসাধি করতে হয়। আর কিছুদিন পরে ভিয়েনাটাকেও তারা প্যারিস করে ছাড়বে—প্যারিসেরই মতো আমেরিকান উপনিবেশ।

ভিয়েনার সঙ্গে তার আশপাশের সংগতি নেই। একটা কৃষিপ্রধান দেশের এক প্রান্তে এত বড়ো একটা শিল্পপ্রধান শহর, যার ত্রিসীমানায় বন্দর বা খনি নেই। বন্দর যদি-বা ছিল অনেক দূরে, তাও কেড়ে নিয়েছে ইটালি। আর খনি যদি-বা ছিল অনেক দূরে, তাও পড়ল চেকোশ্লোভাকিয়ার ভাগে। কেবল টুরিস্ট নিয়ে তো একটা বড়ো শহর বাঁচতে পারে না। ভিয়েনার লোকসংখ্যা কমেছে। বাদশাহি জাঁকজমক আর নেই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ভিয়েনা অতুলনীয় সুন্দরী। তার প্রায় চারদিকে পাহাড়, কাছেই ড্যানিউব নদী, ভিতরে নদীর খাল। ‘Ring’ নামক রাজপথটি ভিয়েনারই বিশেষত্ব। বার্লিন দেখিনি, কিন্তু লণ্ডন-প্যারিসের চেয়েও ভিয়েনা দুটি কারণে সুন্দর। প্রথমত, ভিয়েনার পথঘাট প্যারিসের চেয়ে তো নিশ্চয়ই—লণ্ডনের চেয়েও পরিষ্কার। দ্বিতীয়ত, ভিয়েনার সৌধগুলি লণ্ডনের চেয়ে তো নিশ্চয়ই—প্যারিসের চেয়েও সুধা-ধবল। ধোঁয়া আর ফগের ভয়েই বোধ হয় লণ্ডনের বাড়িগুলো চুন মাখতে চায় না। কিন্তু আকাশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মাটিও যদি অন্ধকার হয় তো মনের ওপরে তার প্রতিক্রিয়া হয় সাংঘাতিক। ভিয়েনায় এ আপদ নেই, তাই সেখানে নয়ন দুটি মেলিলে পরে পরান হয় খুশি।

কিন্তু ভিয়েনার নির্জনতা লণ্ডন-প্যারিসের মনকে ঘুম পাড়াতে চায়। মধ্যাহ্নকে মনে হয় মাঝরাত। কত বড়ো বড়ো বাড়ি, কত বড়ো বড়ো রাস্তা—কিন্তু এত জনবিরল যে ঘুমন্তপুরীর মতো লাগে। বৃহৎ রেস্তরাঁ, ঢুকে দেখা গেল লোক নেই, অথচ অমন রান্না সারা ইউরোপ ঢুঁড়লেও পাওয়া যায় না, অপিচ অত সস্তায়। প্যারিসে লোক কিলবিল করছে, মানুষ যত নেই মোটর আছে তত; আর সেসব মোটর যারা হাঁকায় তারা বিদ্যুতের সঙ্গে টক্কর দেবার স্পর্ধা রাখে। প্যারিস থেকে ভিয়েনায় গেলে বড়ো নিঃসঙ্গ বোধ হয়। অথচ ভিয়েনা চিরদিন এমন ছিল না। এই বিগতযৌবনা রূপসি একদিন ইউরোপের রানি ছিল। তখন কত ডিপ্লোম্যাট, কত বণিক, কত গুণী ও কত পর্যটক সোনা দিয়ে তার মুখ দেখতে আসত। সংগীতে ভিয়েনার সমান ছিল না। ভিয়েনার অপেরা এখনও তার পূর্বগৌরব হারায়নি। কিন্তু মহাকাব্যের মতো অপেরারও দিন যায় যায়। এমনই আমাদের দুর্ভাগ্য যে শিকাগোর অপেরা লণ্ডনে বসে দেখবার শোনবার উপায় হয়েছে ও হচ্ছে কিন্তু নতুন একখানা অপেরা লেখবার মতো প্রতিভা একমাত্র Strauss-এর আছে এবং সম্ভবত তাঁর সঙ্গেই লোপ পাবে। থিয়েটারে সাজসজ্জার যে উন্নতি হয়েছে তা শেক্সপিয়ারের পক্ষে কল্পনাতীত, কিন্তু শেক্সপিয়ারের পায়ের ধুলো নেবার উপযুক্ত নাট্যকার একটিও জন্মাচ্ছে না। এবং রবীন্দ্রনাথই বোধ হয় জগতের শেষ মহাকবি।

ঠাট বজায় রাখতে ভিয়েনার লোক অদ্বিতীয়। অত বড়ো সাম্রাজ্য হারাবার পরে সোশ্যালিস্ট হওয়া সত্ত্বেও তারা আগের মতোই কায়দাদুরস্ত আছে। রেস্তরাঁয় লোকই আসে না, তবু ওয়েটার বাবাজিদের দরবারি পোশাকটি অপরিহার্য। পাহারাওয়ালা অন্য সব দেশে কেবল পাহারাই দেয়, তার হাতে একটা বেটন থাকলেই যথেষ্ট, কিন্তু ভিয়েনার পাহারাওয়ালার গায়ে সৈনিকের সাজ ও কোমরে সুখচিত তরবারি। ভিয়েনার লোক কিছুতেই ভুলতে পারছে না যে তাদের সম্রাট ও তাঁর সভাসদেরা ছিলেন ইউরোপের মধ্যে অভিজাততম, যদিও এখন তারা ইউরোপের দরিদ্রতম জাতি বললে হয় এবং খেতে পায় না বলে লিগ অব নেশনসের মধ্যস্থতায় টাকা ধার নিয়েছে। অস্ট্রিয়াকে সম্ভবত একদিন বাধ্য হয়ে জার্মানির অন্তর্গত হতেই হবে, কিন্তু ভিয়েনা কেমন করে ভুলবে যে সে-ই ছিল জার্মানির তথা ইউরোপের দীর্ঘকালের রাজধানী! সেদিনকার বার্লিনের কাছে ভিয়েনা কেমন করে হাতজোড় করে দাঁড়াবে! যে-প্রাশিয়া একদিন তার ভৃত্যের মতো ছিল তার কাছে অস্ট্রিয়া হবে ছোটো! কিন্তু গরজ বড়ো বালাই। কত বড়ো বড়ো উঁচু মাথাকে সে ধুলোয় মিশিয়েছে। যে-কারণে এখন ছোটো ছোটো কারবার টিকতে পারছে না, পৃথিবীব্যাপী combine গড়ে উঠছে, ঠিক সেই কারণে এখন ছোটো ছোটো রাষ্ট্র টিকতে পারবে না, মহাদেশব্যাপী মহারাষ্ট্র গড়ে তুলতেই হবে।

অস্ট্রিয়ানদের দরিদ্র বললুম বলে যেন না মনে করেন ওরা আমাদের মতো দরিদ্র। ভিয়েনার পশ্চিম দিকে যাকে দারিদ্র্য বলা হয়, ভিয়েনার পূর্ব দিকে তার নাম সচ্ছলতা। অর্থাৎ ইউরোপের দরিদ্ররা এশিয়ার মধ্যবিত্ত। ইংল্যাণ্ডে যাকে slum বলে সেটা আমাদের উত্তর কলকাতার চেয়ে কুৎসিত নয়। ইউরোপের পারিয়াদের দাবির ফিরিস্তি আমাদের মধ্যবিত্তদের তাক লাগিয়ে দেয়—চড়া হারের মজুরি, বিনা পয়সায় চিকিৎসা, সস্তায় আমোদ-প্রমোদের টিকিট, ঘন ঘন ছুটি, প্রচুর পেনশন, আপদে-বিপদে জীবনবিমা। আরও কত কী! জীবনের কাছে আমাদের দাবি কোনোমতে বংশরক্ষা করা ও মরে গেলে পিণ্ডিটুকু পাওয়া। এদের দাবি হয় রাজসিক জীবন নয় রাজসিক মৃত্যু। সামান্য কারণে এরা বিদ্রোহ করে বসে, যত সহজে মরে তত সহজে মারে। জীবনের মূল্য যত, প্রাণের মূল্য তত নয়। স্বল্পতম ভার সইতে পারে না বলে এদের সমাজ লোকসংখ্যা বাড়লেই যুদ্ধের অছিলা খোঁজে। এদের সমাজকে পাতাবাহারের গাছের মতো মাঝে মাঝে ছাঁটলে তবে তার স্বাস্থ্য থাকে। নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের আদর্শটি এদের কাছে এত মূল্যবান যে, এইজন্যে যুদ্ধের আর বিরাম নেই। এইজন্যে এরা পিণ্ডাধিকারী না রেখে চিরকুমার অবস্থায় মরাটাকে অধর্ম জ্ঞান করে না, বেশি বয়সে বিয়ে করার আনুষঙ্গিক অন্যায়—হয় আত্মনিগ্রহ নয় অপকীর্তি—তো করেই, বিয়ের পরেও যেকোনো মতে জন্মশাসন করে। এত বড়ো ইউরোপে কোথাও একটি পশু-পাখি-সাপ-ব্যাং-মশা-মাছি দেখতে পাওয়া শক্ত, অন্নের ভাগ দিতে পারবে না বলে অভক্ষ্য প্রাণীকে এরা মেরে সাবাড় করেছে ও ভক্ষ্য প্রাণীকে অন্নে পরিণত করেছে। একটা পোষা প্রাণীর যদি স্বাস্থ্য গেল তো তাকে এরা তখুনি গুলি করে ভাবলে দু-পক্ষের আপদ চুকল। অপরপক্ষে কিন্তু পোষা প্রাণীকে এরা রুগণ হতেই দেয় না, এত যত্নে রাখে। পীড়িত পশুকে দিয়ে গাড়ি টানালে কঠিন সাজা। হত্যা ব্যাপারটা যাতে এক মুহূর্তে সমাপ্ত হয়, পশুর পক্ষে যন্ত্রণাকর না-হয়, সেজন্যে কসাইদের পিস্তল ব্যবহার করতে বাধ্য করা হচ্ছে। একটা মুমূর্ষু প্রাণী দশ দিন ধরে—না দশ ঘণ্টা ধরে—একটু একটু করে মরছে ও অসহ্য যন্ত্রণা পাচ্ছে এ দৃশ্য ইউরোপে দেখবার জো নেই। নিজে যন্ত্রণা পেতে ভালোবাসে না বলে এরা যন্ত্রণা দিতে ভালোবাসে না। Vivisection-এর বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চলছে। ইউরোপের সব দেশেই এখন নিরামিষাশী সংখ্যা বাড়ছে এবং প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ হয়েছে অনেকেই।

অনাবশ্যককে ইউরোপ নির্মমভাবে ছেঁটেছে। বুড়ো-বুড়িকেও না খাটিয়ে খেতে দেয় না। ‘Dying in harness’ তার জীবনের আদর্শ। সঙ্গে সঙ্গে আবশ্যকের বহরকেও সে বাড়াতে লেগেছে। যৌবন আগে ছিল গোটা কয়েক বছরের। এখন চাই শতবর্ষের যৌবন। এরজন্যে কত প্রাণী হত্যা করতে হবে, কত মানুষকে যুদ্ধে মারতে হবে, কত লোককে আর্থিক প্রতিযোগিতায় পরাস্ত করতে হবে, কত অজাত শিশুকে জন্মাতে

দেওয়া যাবে না, কত শিশুকে প্রকারান্তরে হত্যা করতে হবে। এত কান্ড করলে তবে হবে জন কয়েকের দীর্ঘ যৌবন, নিখুঁত স্বাচ্ছন্দ্য। দুর্ভিক্ষের চেয়ে, আত্মনিগ্রহের চেয়ে, শিশুমৃত্যুর চেয়ে, চির রুগণতার চেয়ে এ ভালো না মন্দ?

দূর থেকে শুনতুম অস্ট্রিয়ানদের মরো-মরো অবস্থা, তারা বুঝি আর বাঁচে না! দেখলুম তারা দিব্যি আছে, আমাদের চেয়ে সচ্ছলভাবে। বুঝলুম ইউরোপের লোক সামান্য অসুবিধাকেও বাড়িয়ে দেখে, চার বেলার এক বেলা না খেতে পেলে বলে, দুর্ভিক্ষে মরে গেলুম। লণ্ডনে সেদিন দশ-বারোটা লোক নাকি অনশনে মরেছিল, তাই নিয়ে মন্ত্রীমন্ডলীর আসন টলে উঠল। অথচ ওরা যদি যুদ্ধে মরত তবে কেউ ওদের কথা ভুলেও ভাবত না। ইংল্যাণ্ডের শ্রমিকদের দুর্ভাবনা এই যে তাদের স্ত্রীরা পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে অনবদ্য স্বাস্থ্য অটুট রাখতে পারে না, তাদের স্বামীদের মজুরি এত কম! আর আমাদের বড়োলোকের মেয়েরাও কুড়িতে বুড়ি হন। দূর থেকে আমাদের দেশটাকে মাঝে মাঝে মনে হয় একটা বিরাট Slow suicide club—এত আমাদের সহিষ্ণুতা, অল্পে সন্তোষ, আত্মনিগ্রহ, চক্ষুলজ্জা। আমরা বলি, নিজের ছাড়া বাকি সকলের উপকার করো। এরা বলে, 'Help yourself', কেননা 'God helps those who help themselves', অর্থাৎ নিজের মাথায় যদি তেল ঢালো তো ভগবান তোমার তেলা মাথায় তেল ঢালবেন। বেকারসমস্যা নিয়ে ইংল্যাণ্ড বড়ো বিব্রত। অথচ ইংল্যাণ্ডের ধনীরা যদি একখানা করে রুটি দেয় তবে ইংল্যাণ্ডের যত বেকার আছে প্রত্যেকেই এক-একজন মোহান্ত মহারাজের মতো বৈষ্ণবী নিয়ে পরম আহ্লাদে মালা জপতে পারে। শুধু তাই নয়, ইংল্যাণ্ডের ধনীরা ইচ্ছা করলেই বিশ-ত্রিশ কোটি ইঁদুর বাঁদর প্রভৃতি কেষ্টর জীবের জন্য একটা দেশব্যাপী চিড়িয়াখানাও স্থাপন করতে পারে। কিন্তু ভিক্ষা দিয়ে অপরের উপকার করা এদেশের প্রকৃতিবিরুদ্ধ—যোগ্যতা না দেখলে, বাধ্য না-হলে কেউ দেয় না। ধনী-দরিদ্রের মধ্যে এমন মনকষাকষি আমাদের দেশে নেই, এত দলাদলিও আমাদের দেশে নেই। তবে সন্ধি করবার কায়দাও এরা জানে। সময় বুঝে সন্ধি না করলে দু-পক্ষের একপক্ষ অবশিষ্ট থাকবে না, এক হাতে তালি বাজবে না। যুদ্ধটা হচ্ছে সহিংস সহযোগ, ও-ব্যাপার একা একা হয় না। ভবিষ্যতে আবার লড়বে বলে শত্রুকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়, কেননা শত্রুই হচ্ছে যুদ্ধের সহযোগী। যে-জন্তুকে এরা শিকার করবে সে-জন্তুকেও এরা বনজঙ্গলে পালন করে। খাবার জন্যেই এরা গোরু শূকরকে খাইয়ে মোটা করে।

ইউরোপের বহিঃপ্রকৃতি তার অন্তঃপ্রকৃতিকে কী পরিমাণ নিষ্করুণ করেছে তার একটা নিদর্শন ইউরোপের যে-দেশে যাই সেদেশে দেখি। আমাদের যেমন চালের দোকান এদের তেমনি মাংসের দোকান; প্রায় প্রত্যেক গলিতে গলিতে আছেই, কষ্ট করে খুঁজতে হয় না, আপনি খোঁচা দেয়। বেচারা মুসলমানেরা ক-টাই বা গোরু খায়? যদি-বা খায় তবে ক-টা গোরুর ছাল ছাড়া ধড় রাস্তায় রাস্তায় দোকানে দোকানে সাজিয়ে ঝুলিয়ে রাখে? খদ্দের এলে করাত দিয়ে নির্দিষ্ট স্থানের মাংস কেটে ওজন করে প্যাক করে বিক্রি করে। একসঙ্গে একশোটা মরা পাখি পাকা কলার মতো ঝুলছে কিংবা একশোটা মরা খরগোশ। সাজিয়ে রাখাটাকে এরা একটা আর্ট করে তুলেছে বলে বীভৎস ঠেকে না, ক্রমে ক্রমে কলা-মুলো-কপি-কুমড়োর মতো লাগে, আমিষ-নিরামিষের পার্থক্যবোধ লোপ পায়। রাগ করবার উপায়ও নাই, কেননা মাছকেও তো আমরা কলা-মুলোর সামিল মনে করে থাকি, বিশেষ করে বাঙালির চোখে মাছ একটা প্রাণীই নয়। প্রাণ সম্বন্ধে ওই অসাড়তাটাকে আরেকটু প্রশ্রয় দিলে আমরাও ইউরোপীয় হয়ে পড়তুম, ঝুলন্ত হ্যাম দেখে—চোখে নয়—জিভে জল এসে পড়ত।

দোকান সাজানোতে ইংরেজ-জার্মান-অস্ট্রিয়ান-সুইসরা ওস্তাদ। ফরাসিরা আমাদের মতো এলোমেলো! শুধু দোকান নয়, রেল স্টিমার হোটেল রেস্তরাঁ পথঘাট প্রদর্শনী সর্বত্র একটি শৃঙ্খলা ও পারিপাট্য উত্তর ইউরোপের বিশেষত্ব বলেই মনে হয়। ভিয়েনা ও প্যারিস এই দুটি শহরের মধ্যে ভিয়েনা অনেক বেশি সৌষ্ঠবসম্পন্ন, যদিও এলোথেলো সৌন্দর্য প্যারিসেরই বেশি। ভিয়েনায় তো সেন নদীর মতো আঁকাবাঁকা নদী নেই, তার কূলে বসে মাছধরা নেই, তার কূলে দাঁড়িয়ে ছবি আঁকা নেই, তার বাঁধে পুরোনো বইয়ের

দোকানে ঝুঁকেপড়া বইপাগলা বুড়ো নেই, তার আশেপাশের রাস্তায় রঙিন কার্পেট কাঁধে নিয়ে পায়চারি করতে থাকা ইজিপশিয়ান ফেরিওয়ালা নেই। এতরকম রাস্তার দৃশ্য (street sights) প্যারিসের মতো আর কোথায় আছে? সারাক্ষণ যেন অভিনয় চলছে প্রতি রাস্তায়। অথচ নোংরা রাস্তা, মোড়ে জল জমেছে, ফুটপাথে দোকানের নীচে দোকান, তাতে একসঙ্গে একশোরকম জিনিস জট পাকিয়েছে, তরমুজ আর বাঁধাকপির সঙ্গে খরগোশ আর মাছ এবং গেঞ্জি আর পুলোভার। দোকানের গায়ে গায়ে একটা কাফে আর মদের দোকান—সেও অকথ্য নোংরা অগোছালো। এসব অনাচার ভিয়েনায় কিংবা লণ্ডনে নেই, কোলোনে কিংবা মিউনিখে নেই, বার্নে কিংবা লুসার্নে নেই। মার্সেলসে আছে, ভার্সেলসে আছে এবং সম্ভবত সমস্ত ফ্রান্সে আছে। এবং সম্ভবত সমস্ত দক্ষিণ ইউরোপে। প্রদীপের নীচে অন্ধকারের মতো ফরাসিদের নিখুঁত বাস্তুকলার সঙ্গে প্রচুর ধুলো কাদা যোগ দিয়েছে। ভিয়েনা চিত্রে-ভাস্কর্যে-বাস্তুকলায় প্যারিসের নকল, কিন্তু শৃঙ্খলায় ও পারিপাট্যে প্যারিসের বাড়া। অবস্থা বিপর্যয় সত্ত্বেও তার এই গুণগুলি যায়নি, তার সোশ্যালিস্ট মিউনিসিপ্যালিটির মেজাজটা বোধ হয় বাদশাহি।

বাদশাহের প্রাসাদগুলি অবশ্য এখন মিউজিয়ামে পরিণত হয়েছে। দশ বছর আগে যে-বাগানে বাদশাজাদিরা হাওয়া খেতেন এখন সেখানে গরিবের মেয়েরা খেলা করতে যায়। দশ বছর আগে যেসব ঘরে বাদশাহ শয়ন, বিশ্রাম, ভোজন করতেন, যেসব ঘরে বেগম সখীদের সঙ্গে গল্প করতেন বা অতিথিচর্চা করতেন, বা নাচের মজলিশ ডাকতেন, সেসব ঘর এখন সামান্য কিছু দর্শনি দিলে কিছুক্ষণের জন্য রাস্তার লোকের সম্পত্তি। দশ বছর আগে সাধারণের চোখে যা আলাদিনের প্রদীপের মতো ছিল তাই এখন ধুলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছে। সাধারণ মানুষ তারই মতো সাধারণ মানুষকে বাদশাহ পদবি দিয়ে তারই গৃহের মতো সাধারণ গৃহকে অমরাবতী কল্পনা করেছিল এবং সমস্ত ব্যাপারটির গায়ে পুরাণ ইতিহাসে রূপকথার সোনার কাঠি ছুঁইয়ে সেটিকে নিজের প্রতিদিনের জীবন থেকে লক্ষ যোজন দূরে রেখেছিল। ঈশ্বরভক্তির মতো রাজভক্তিও মানুষের নিজের তৃপ্তির জন্য; এবং একটা কাল্পনিক দূরত্বই তার প্রাণ। আজ সে-দূরত্ব ঘুচে গেছে; প্রকাশ হয়ে পড়েছে যে রাজপ্রাসাদটা বাহির থেকে হাঁ করে দেখবার মতো এমন কিছু মায়াপুরী নয়, বারো আনা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলে নিতান্তই রক্ত-মাংসের মানুষের আহার-নিদ্রার স্থান এবং ছোটো ছোটো মান-অভিমান পরশ্রীকাতরতার দাগে দাগি। মানুষে মানুষে যে কাল্পনিক ব্যবধান এতকাল এত কাব্য ও এত কলহ উদ্রেক করেছিল, আজ মনে হচ্ছে সব মিথ্যা, সব স্বপ্ন। এবার মানুষ যে নতুন জগতের দ্বারে দাঁড়িয়েছে সে-জগৎ দিনের আলোর জগৎ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বারা তার নাড়িনক্ষত্র জানা, কোথাও একটু কল্পনার অবকাশ নেই, নিদারুণ মোহভঙ্গের মধ্যে তার পথ। কোন রাজপ্রাসাদকে দেখে স্বর্গ কল্পনা করবে? কোন রাজাকে দেখে দেবতা? কোন রাজপুত্রকে নিয়ে উপকথা রচনা করবে? কোন রাজবংশকে নিয়ে কাব্য? তাই শেক্সপিয়ারও আর হয় না, রবীন্দ্রনাথও আর হবে না।

যতগুলো রাজপ্রাসাদ দেখলুম তাদের কোনোটাই মনে ধরল না, কেননা কোনোটাই যথেষ্ট আড়ম্বরপূর্ণ নয়। পোশাকে প্রাসাদে যানে-বাহনে বেগমে-গোলামে আমাদের রাজরাজড়ারাই দুনিয়ার সেরা। আগ্রা, দিল্লি, লখনউ, বেনারসের সঙ্গে ভার্সেলস, ভিয়েনা, মিউনিখ বুডাপেস্টের এইখানেই হার যে রাজাতে-প্রজাতে ভারতবর্ষে যেমন আসমান-জমিন ফরক সম্ভবত এক রাশিয়া ছাড়া ইউরোপের আর কোথাও তেমন ছিল না। আমরা ধাতে এক্সট্রিমিস্ট। আমরা রাজা-বাদশা ও ভিখারি ফকির ছাড়া কারুকে সম্মান করিনে। তাই আমাদের দেশে ভোগের নামে লোকে মূর্ছা যায়, ভাবে না-জানি কোন রাজারাজড়ার মতো ভোগ করতে গিয়ে ভিখারিতে সমাজ ভরিয়ে দেবে। আর ত্যাগের নাম করলে ধড়ে প্রাণ আসে—হ্যাঁ, সমাজের পাঁচজনের ওপরে লোকটার দরদ আছে বটে। দেখছ না আমাদেরই জন্যে উনি কৌপীন ধরলেন।

ভোগের আড়ম্বর ও ত্যাগের আড়ম্বর বোধ হয় কেবল ভারতবর্ষের নয়, প্রখর সূর্যালোকিত দেশগুলির দুর্ভাগ্য। ইজিপ্টে ও গ্রিসে সমাজের একটা ভাগ দাসত্ব করেছে, অপর ভাগ সেই দাসত্বের ওপরে পিরামিড খাড়া করেছে। অতটা এক্সট্রিমিজম প্রকৃতির সহ্য হয় না, ইজিপ্ট ও গ্রিস টলে পড়েছে। দাসও মরেছে, দাসের রাজাও। ভারতবর্ষেও কোনো একটা রাজবংশ দু-চার পুরুষের বেশি টেকেনি, যত বিজেতা এসেছে সবাই দু-চার পুরুষ পরে বিজিত হয়েছে। ইংরেজের বেলা এর ব্যতিক্রম হল, কেননা ইংরেজ ভারতবর্ষের জল-হাওয়া কিংবা ধাত কোনোটাকেই স্বীকার করেনি, ইংরেজ দূর থেকে শাসন করে এবং ঘরের প্রভাববশত মনেপ্রাণে নাতিশীতোষ্ণ থাকে। ইংরেজের temper গরমও নয়, নরমও নয়; অসহিষ্ণুও নয়, সহিষ্ণুও নয়। ইংরেজ আশ্চর্যরকম মধ্যপন্থী। তবে এও ঠিক যে ইংরেজ অত্যন্ত বেশি মাঝারি। এই মাঝারিত্বকে লোকে গালাগাল দিয়ে বলে conservatism; আসলে কিন্তু ইংরেজের conservatism স্থাণুত্ব নয়, ধীরে-সুস্থে চলা, slow but sure—কচ্ছপ-গতি। সূর্যের আলোর মদে মাতাল ফরাসিরা কতকটা আমাদেরই মতো এক্সট্রিমিস্ট, তাই তারা সুদীর্ঘকাল মহাশয়ের মতো যা-ই সওয়াবে তা-ই সয়, অবশেষে একদিন এটনা আগ্নেয়গিরির মতো অগ্নিবৃষ্টি করে আবার চুপচাপ বসে মদে চুমুক দেয়। তার ফলে খরগোশকে ছাড়িয়ে কচ্ছপ এগিয়ে যায়।

তবে ফরাসি বলো জার্মান বলো ইংরেজ বলো কেউ আমাদের মতো ছোটোতে-বড়োতে আসমান-জমিন ব্যবধান ঘটতে দেয় না, সময় থাকতে প্রতিকার করে। এই যে সোশ্যালিস্ট মুভমেন্ট এটার মতো মুভমেন্ট প্রতি শতাব্দীতে ইউরোপের প্রতি দেশে দেখা দিয়েছে। আজ যদি এ মুভমেন্ট অতি বৃহৎ হয়ে থাকে তবে যার বিরুদ্ধে এ মুভমেন্ট সেও আজ অতি বৃহৎ হয়ে উঠেছে। সমাজের একটা পা আজ বিপর্যয় লাফ দিয়ে এগিয়ে গেছে বলেই অপর পা-টা বিপর্যয় লাফ দিয়ে সঙ্গ রাখতে ব্যগ্র। ইউরোপের ধনীরা আজকের এই উন্মুক্ত পৃথিবী থেকে যে প্রচুর ধন আহরণ করে ঘরে আনছে ইউরোপের শ্রমিকরা সেই প্রচুর ধনেরই একটা সমানুপাত বণ্টন চায়।

এক হাজার বছর আগেও আমাদের দেশে বৈরাগ্যাভিমানী ছিল বিস্তর, এরা সমাজের সেই ভাগটা, যে-ভাগ বৃহৎ ব্যবধান সইতে না-পেরে সুতোছেঁড়া ঘুড়ির মতো আকাশে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। এরা ধনীলোকের ধনভার লাঘব করে দরিদ্রের দারিদ্র্যভার লাঘব করেনি, কেননা সেজন্যে অনেক দুঃখ ভুগতে হয় এবং কোনোদিন সে-ভোগের শেষ নেই। প্রকৃতির অনাদ্যন্ত এই যে সাধনা এই ভারসাম্যের সাধনায় প্রকৃতির সঙ্গে সন্ন্যাসী যোগ দেয় না, সে চিরকালের মতো সিদ্ধি চায়। যে-জগতে প্রতিদিন বড়ো বড়ো গ্রহ-নক্ষত্র ভাঙছে, মহাশূন্যের গর্ভে বড়ো বড়ো নৌকাডুবি ঘটছে, প্রতিদিন ছোটো ছোটো অণু-পরমাণু থেকে সব নব নব গ্রহ-নক্ষত্র গড়ে উঠছে, ছোটো ছোটো প্রবালকীট মিলে অপূর্ব প্রবালদ্বীপ গেঁথে তুলছে—এই প্রতিদিনের খেলাঘরে সন্ন্যাসীকে কেউ পাবে না। সে তার কাঁথা-কম্বল-ছাল-বল্কল আঁকড়ে ধরে বিবাগি হয়ে গেছে। এদিকে মহারাজের অন্তঃপুরে রানিমক্ষিকার সংখ্যা বাড়ছে এবং দাসমক্ষিকাদের ক্রন্দনগুঞ্জনে সংসারচক্র মুখর হল। প্রাসাদে আর কুটিরে ভারতবর্ষের মাটি আর মর্ত নয়, একাধারে স্বর্গ—পাতাল। আল্পস পর্বত ও

ভূমধ্যসাগর সহ্য হয়, কেননা উঁচু-নীচু হলেও তাদের ব্যবধান দুরতিক্রম্য নয়, কিন্তু হিমালয় পর্বত ও ভারতসাগর সহ্য হয় না। উপরে ত্রিশ হাজার ফিট ও নীচে বিশ হাজার ফিট—পঞ্চাশ হাজার ফিটের ব্যবধান দুরতিক্রম্য। ভারতবর্ষের রাজা-মহারাজারা যে-চালে থাকেন ইউরোপের সম্রাটদের পক্ষেও তা স্বপ্ন এবং ভারতবর্ষের চাষি-মজুররা যে-চালে থাকে ইউরোপের ভিখারিদের পক্ষেও তা দুঃস্বপ্ন। এবং এই ব্যাপার খুবসম্ভব হাজার হাজার বছর থেকে চলে আসছে। কেননা আমরা চিরকাল Intemperate Zone-এর লোক। আর আমাদের দেশটাও চিরকাল এত বেশি উঁচু-নীচু যে আমাদের চোখে জীবনের বিশ্রীরকম উঁচু-নীচুও একটা সহজ উপমার মতো স্বাভাবিক ঠেকে।

রাজপ্রাসাদগুলি পরিদর্শন করবার সময় লক্ষ করেছি সেগুলি কেবল রাজপ্রাসাদ নয়, সেগুলির প্রত্যেকটি একটি পুরুষ ও একটি নারীর দুঃখ-সুখের নীড়—এক-একটি 'home'। ইংরেজি home কথাটির ভারতীয় প্রতিশব্দ নেই, কেননা home কেবল গৃহ নয়, একটি নারীর ও একটি পুরুষের কাঠ-পাথরে রূপান্তরিত প্রেম। ইংরেজ যুবক যখন বিবাহ করে তখন তার স্ত্রী তার কাছে এমন একটি গুহা প্রত্যাশা করে যেখানে সে সিংহীর মতো স্বাধীন, যেখানে তার স্বামী পর্যন্ত তার অতিথি; শাশুড়ি, শ্বশুর, জা, দেবর তার পক্ষে ততখানি দূর, শাশুড়ি, শ্বশুর, শ্যালক, শ্যালিকা তার স্বামীর পক্ষে যতখানি। গুহার বাইরে তার স্বামীর এলাকা, গুহার ভিতরে তার নিজের; কেউ কারুর এলাকায় অনধিকার প্রবেশ করতে পারে না। বাড়িতে একটা চাকর বহাল করবার অধিকারও স্বামীর নেই, কিংবা চাকরকে জবাব দেওয়ার। বাজার করাটাও স্ত্রীর এলাকা, কেবল দাম দেওয়ার বেলা স্বামীকে ডাক পড়ে। এক অফিসে এবং ক্লাবে ছাড়া স্বামীকে কেউ চেনে না, আসবাবের দোকানে, গহনার দোকানে, পোশাকের দোকানে, ধোপার বাড়িতে, ছেলে-মেয়েদের স্কুলে, বাড়িওয়ালার কাছে নিমন্ত্রণে-আমন্ত্রণে, পার্টিতে, নাচে, সর্বত্র স্ত্রীর বৈজয়ন্তী। এ সমস্তই home-এর এলাকায় পড়ে। অতএব home-কে আপনারা কেউ চারখানা দেওয়াল ও একখানা ছাদ ঠাওরাবেন না। ছেলের দোলনা থেকে ছেলের বাপের খাবার টেবিল পর্যন্ত যাঁর রানিত্ব নয় তিনি সুগৃহিণী নন, সমাজে তাঁর নিন্দা, তিনি কুনো। গির্জায়, charity bazaar-এ, সমাজসেবার সব আয়োজনে যাঁর হাত (বা হস্তক্ষেপ) তিনিই সুগৃহিণী।

এত যদি স্ত্রীর অধিকার তবে feminism-এর ঝড় উঠল কেন? কারণ industrial revolution-এর ফলে সমাজে একটা ভূমিকম্প ঘটে গেছে, ছেলেরা সারাজীবন দেশ-দেশান্তরে ঘুরছে, মেয়েরা home করবে কাকে নিয়ে? Home-এর মধ্যে একটা স্থায়িত্বের ভাব আছে, স্থানিক স্থায়িত্ব না হোক, সাময়িক স্থায়িত্ব। প্রেম স্থায়ী না হলে home হয় না। স্বামী-স্ত্রী ঠাঁই ঠাঁই হলেও ভাবনা ছিল না, দুজনের হৃদয়ও যে ঠাঁই ঠাঁই হতে আরম্ভ করেছে। আমরা হলে বলতুম দুয়ো-সুয়ো চলুক-না? অন্তত সদর মফসসল? মুশকিল এই যে, এতটা পতিব্রতা হতে এদেশের মেয়েরা এখনও শিখল না। সুয়োকে কোথায় বোন বলে আপনার করে নেবে ও স্বামীর শয্যায় পাঠিয়ে দেবার পার্ট প্লে করবে—আরে ছি ছি, রাম রাম, স্বামীদেবতাকে বিগ্যামির অপরাধে পুলিশে দেয়! আর মফস্‌সলের খবর পেলে একেবারে ডিভোর্স কোর্ট—ধিক! এরই নাম সভ্যতা!

ইংরেজ, জার্মান, স্কান্ডিনেভিয়ান মেয়েরা নিজের পাওনাগন্ডাটি চিরকাল বুঝে নিয়েছে। অতীত কালে এরা স্বামীকে বলেছে তোমাকেই আমি চিনি, তোমার মা-বাবাকে না। তাই এদের স্বামীরা পিতৃপিতামহের সনাতন ট্রাইব ছেড়ে স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে ফ্যামিলি সৃষ্টি করেছে। ফ্যামিলি ও পরিবার এককথা নয়, যেমন home ও গৃহ এককথা নয়। এ মজ্জাগত পাওনাগন্ডা বুঝে নেওয়ার স্বভাব থেকেই বর্তমান কালে feminism-এর উৎপত্তি। এর মূল সুরটি এই যে, home-এর দায়িত্ব যখন তোমরা স্বীকার করছ না তখন আমরাও স্বীকার করব না, তোমরা মুক্ত হও তো আমরাও মুক্ত হই। আপনারা বলবেন, সহিষ্ণুতাই নারীর ধর্ম, মা বসুমতী কত সইছেন! কিন্তু ম্লেচ্ছ মেয়েরা এত বড়ো তত্ত্বকথাটা বোঝে না, তাই তাদের স্বামীদের পদভারে মা বসুমতী টলমল এবং তাদের পদভারে তাদের স্বামীরা শিবের মতো চিতপাত।

ভিয়েনার রাজপ্রাসাদগুলিতে রানি মারিয়া থেরেসার ব্যক্তিত্বের ছাপ সুস্পষ্ট। রানি বলতে অসপত্ন রানি বুঝতে হবে—জা-শাশুড়িহীন, এবং সামাজিক প্রাণী। দিল্লি, আগ্রা, ফতেপুর সিক্রিতে বেগমের ব্যক্তিত্বের

চিহ্ন-বিশেষ যদি-বা দেখা যায় তবু ওসব রাজপ্রাসাদকে home মনে করতে পারিনে। এবং সামাজিক প্রাণী হিসেবে বেগমের অস্তিত্ব ছিল না। সমাজের পাঁচজন পুরুষ তাঁদের চোখে দেখেননি, তাঁদের আতিথ্য পাননি; রাজন্যশ্রেণির পাঁচজন পুরুষ তাঁদের সঙ্গে দু-দন্ড আলাপ করতে পারেননি, দু-দন্ড নাচবার আস্পর্ধা রাখেননি। বাঁদি ও বান্দায় ভরা বিশাল বেগমমহলে বাদশা মাসে এক বার পূর্ণচন্দ্রের মতো উদয় হন, পুত্র-কন্যারা মা-বাবার সঙ্গে দু-বেলা আহার করবার সৌভাগ্য না পেয়ে দাস-দাসীর প্রভাবে বাড়েন। এমন গৃহকে গৃহিণীর সৃষ্টি বলতে প্রবৃত্তি হয় না। তাই প্রাচ্য রাজপ্রাসাদ আড়ম্বরে অপ্সরাপুরীর মতো হয়েও দুঃখে-সুখে নীড়ের মতো নয়। এখানে বলে রাখা ভালো যে লুই রাজার বা নেপোলিয়নেরও মফসসল ছিল, কিন্তু সেটা নিপাতন ও সমাজের স্বীকৃতি পায়নি। বস্তুত প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে রাজার সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ এক নয়। আমাদের রাজারা সমাজের আইনকানুনের উপরে; তাঁরা সমাজহীন। এদের রাজারা সামাজিক মানুষ, কিছুদিন আগে পর্যন্ত পোপের নির্দেশ অনুসারে রাজা ও প্রজা উভয়েই চালিত হত। ইংল্যাণ্ডের রাজা চার্চ অব ইংল্যাণ্ড ও পার্লামেন্টের কাছে এতটা দায়ী যে তাঁর বিবাহ ও বিবাহচ্ছেদ পর্যন্ত সমাজের এই দুটি হাতে। রাশিয়ার অত বড়ো স্বেচ্ছাচারী জারও স্ত্রী বিদ্যমানে পুনর্বার বিবাহ করতে পারতেন না কিংবা সুয়োরানির ছেলেকে রাজ্যাধিকার দিয়ে যেতে পারতেন না। সেক্ষেত্রে তিনি গ্রিক চার্চের নির্দেশ-সাপেক্ষ। তবে এও অস্বীকার করছিনে যে, পোপ বা প্যাট্রিয়ার্করা মাঝে মাঝে ঘুস খেয়ে ছাড়পত্র লিখে দিতেন। কিন্তু সেটা নিপাতন ও তার বিরুদ্ধে সমাজের বিবেক চিরদিন বিদ্রোহ করেছে। প্রোটেস্টান্টিজম তো এই জাতীয় একটা বিদ্রোহ! ওটাও আধুনিক সোশ্যালিস্ট মুভমেন্ট বা এর আগের গণতান্ত্রিক আন্দোলনেরই মতো মানুষে মানুষে দুরতিক্রম ব্যবধানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

আসবাব-শিল্পের জন্যে ভিয়েনার খ্যাতি আছে। এই মুহূর্তে ইউরোপের সর্বত্র আসবাব-শিল্পের বিপ্লব চলেছে। কোলোনে, মিউনিখে ও ভিয়েনায় নতুন ধরনের ঘর ও নতুন ধরনের আসবাবের কতরকম নমুনা দেখা গেল। গত মহাযুদ্ধের পর ইউরোপের অধিকাংশ দেশেই এখন দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের মাঝখানের আর্থিক ব্যবধান ঘুচে গেছে। চাষি-মজুরদের অবস্থার যতটা উন্নতি হয়েছে মধ্যবিত্তদের অবস্থার ততটা উন্নতি হয়নি। কাজেই দুই শ্রেণির জন্যে অল্প দামের মধ্যে মজবুত অথচ বৈশিষ্ট্যসূচক বাড়ি ও আসবাব দরকার হয়েছে লাখে লাখে। যার যে-নমুনা পছন্দ হয় সে অবিলম্বে সেরকম জিনিসটি পায়। Large scale production-এর নীতি অনুসারে খরচ বেশি পড়ে না, হাঙ্গামাও নেই, পছন্দ করবার পক্ষে নমুনাও যথেষ্ট। মনে রাখতে হবে যে, ঘরের সাইজ ও রং ইত্যাদি অনুসারে আসবাবের সাইজ, রং, রেখা ও গড়ন। দুই দিকেই বিপ্লব ঘটেছে—বাড়ি ও আসবাব দুই দিকের দুই বিপ্লব পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেছে। দুই-ই সরল, লঘুভার, নাতিবৃহৎ, বাতালোকপূর্ণ, বিরলবসতি, নিরলংকার। মানুষের রুচি এখন সভ্যতার অতিবৃদ্ধিকে ছেড়ে প্রকৃতির উদার উন্মুক্ত বলকারক সত্যগুলির দ্বারস্থ হয়েছে। সেইজন্যে নতুন ধরনের চেয়ার, টেবিল, খাট বা দেরাজের উপরে পাগলামির ছাপ যদি-বা দেখতে পাওয়া যায়, চালাকির মারপ্যাঁচ বা বড়োমানুষির চোখে-আঙুল-দেওয়া ভাব একরকম অদৃশ্য। এর একটা কারণ, আগে যে-শ্রেণির লোক *slum*-এ থাকত তাদেরও চাহিদা অনুসারে এসবের জোগান এবং তাদের রুচি অতি সূক্ষ্ম ও অতি খুঁতখুঁতে নয় বলে তাদের সঙ্গে তাদের নামমাত্র উপরিতন মধ্যবিত্ত শ্রেণিকেও রুচি মেলাতে হচ্ছে। Mass production-এর মজা এই যে, চাষি-মজুরের সিকিটা-দুয়ানিটার জন্যে যে সিনেমার ফিলম, তার রুচির সঙ্গে কলেজের ছাত্রের রুচি না মেলে তো কলেজের ছাত্র নাচার। সিকি-দুয়ানির দিক থেকে কলেজের ছাত্র ও চাষি-মজুর দু-পক্ষই সমস্কন্ধ, অগত্যা রুচির দিক থেকেও দু-পক্ষকে সাম্যবাদী হতে হবে।

ইংল্যাণ্ড দেশটা যে কী সাংঘাতিক ছোটো, একটু ঘুরে-ফিরে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। ছোটো তো আমাদের এক-একটা প্রদেশও, কিন্তু তাদের ছোটোত্ব মানুষের হাতে-গড়া। আর ইংল্যাণ্ডের ছোটোত্ব নৈসর্গিক। এর সর্বাঙ্গ ঘিরেছে আঁটো পোশাকের মতো সমুদ্র, এর মাথার উপরে চাপ দিয়েছে টুপির মতো আকাশ। আকাশ? না, আকাশ বলতে আমরা যা বুঝি তা এদেশে নেই। সেইজন্যেই তো দেশটাকে অস্বাভাবিক ছোটো বোধ হয়—একটা অন্ধকূপ বিশেষ। এর ভিতরে যারা থাকে তারা পরস্পরের বড্ড কাছাকাছি থাকে, পরস্পরের নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পায়, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন গোনে। ইংল্যাণ্ডে যখনই যে এসেছে সে বেমালুম ইংরেজ হয়ে গেছে। এর উদরের জারক রস এতই প্রবল যে আমিষ ও নিরামিষ, দুধ ও তামাক যখন যাই পেয়েছে তখন তা-ই পরিপাক করে এক রক্ত-মাংসে পরিণত করেছে। ইংল্যাণ্ডের আশ্চর্য একতার কারণ ইংল্যাণ্ড দেশটা দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে ও উচ্চতায় অত্যন্ত আঁটোসাটো ও ছোটো।

ভারতবর্ষে যখন সারাদিনের খাটুনির শেষে তারা-ভরা আকাশের তলে বসে নিশ্বাস ছাড়ি তখন সে-নিশ্বাস লক্ষ যোজন দূরে নিঃসীম শূন্যে মিলিয়ে যায়, মনে হয় না যে ভারতবর্ষ আমাদের বেঁধে রেখেছে। আমাদের বিশাল দেশ, বিরাট আকাশ; আমরা কোটি তারকার সঙ্গ পেয়ে ধন্য, মানবসংসারের প্রাত্যহিক তুচ্ছতাকে আমরা তুচ্ছ বলেই জানি। আর এরা? এদের কী-বা রাত্রি কী-বা দিন—সমস্ত জীবনটাই একটা non-stop dance কিংবা non-stop flight। ছন্দহীন-যতিহীন-বেতালা জীবন, জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি অশ্রান্ত বন্যাবেগ, এক মুহূর্ত বিশ্রাম করতে বসলে প্রতিযোগীরা লাথি মেরে এগিয়ে যায়, বৃদ্ধ বয়সেও অন্নচিন্তায় অস্থির করে রাখে। দিনের পরে কখন রাত আসে, রাতের শেষ কোনো দিন হয় কি না ঠিক নেই। এদেশের সূর্য সাম্রাজ্য পাহারা দিতে বেরিয়ে স্বরাজ্যে হাজিরা দেওয়ার সময় পায় না। মাটি ও আকাশের মাঝখানে মেঘ ও কুয়াশার প্রাচীর। মানুষের প্রাণের কথা তারালোকে পৌঁছায় না, ঘরের কোণের ছোটো ছোটো দুঃখ-সুখকে মহাজগতের বড়ো বড়ো দুঃখ-সুখের সঙ্গে মিলিয়ে ধরবার সুযোগ মেলে না, ‘the world is too much with us!’

তারপরে এদের আকাশের আঁধার এদের মনকেও আঁধার করেছে, হাতড়াতে হাতড়াতে যখন যেটুকু সত্য পায় তখন সেইটুকু এদের কাছে সব। এরা কত বড়ো একটা সাম্রাজ্য চালায় নিজেরাই জানে না, সাম্রাজ্য এরা গড়েছে অন্যমনস্কভাবে। খাঁটি প্রাদেশিকতা যাকে বলে তা দ্বীপবাসীতেই সম্ভব এবং আকাশহীন দ্বীপবাসীতে। এরা তিন dimension-এর দ্বীপবাসী। ইংল্যাণ্ডে দলাদলির অন্ত নেই, কিন্তু প্রত্যেক দলই স্বভাবে ইংরেজ অর্থাৎ আকাশহীন দ্বীপবাসী। কোনো একটা আন্তর্জাতিক আন্দোলন ইংল্যাণ্ডে টিকবে না—খ্রিস্টধর্ম টিকল না, সোশ্যালিজম টিকছে না। একদিন যেমন চার্চ অব ইংল্যাণ্ড নিজস্ব খ্রিস্টধর্ম সৃষ্টি করল আজ তেমনি লেবার-পার্টি নিজস্ব সোশ্যালিজম সৃষ্টি করছে। নির্জলা ন্যাশনালিজম ইংল্যাণ্ডেই প্রথম সম্ভব হয়, ইংল্যাণ্ডেই শেষপর্যন্ত স্থায়ী হবে। এর কারণ নৈসর্গিক। তবে নিসর্গের উপরে খোদকারি করছে মানুষ। জাহাজের যা সাধ্যাতীত ছিল এরোপ্লেন তাকে সাধ্যায়ত্ত করছে, channel tunnel হয়তো অসাধ্যসাধন করবে, ইংল্যাণ্ড আর দ্বীপ থাকবে না। কিন্তু মেঘের প্রাচীর?

দক্ষিণ ইংল্যাণ্ডের নানা স্থানে ঘুরে-ফিরে দেখা গেল। নিসর্গ ও মানুষ মিলে অঞ্চলটাকে সর্বতোভাবে একাকার করে দিয়েছে। একইরকম অগুনতি ছোটো শহর, প্রত্যেকটাতে একই হোটেলের শাখা-হোটেল ও একই দোকানের শাখা-দোকান। স্থানীয় সংবাদপত্র ও থিয়েটারও বহুদূর থেকে চালিত। রেল ও বাস যদিও অগুনতি তবু একই কোম্পানির। একই আবহাওয়া, একইরকম ছিচকাঁদুনে আকাশ, অসমতল ভূমি। মানুষও বাইরে থেকে একইরকম—পোশাকে-চলনে-বুলিতে-আদবকায়দায়; সামান্য যা ইতরবিশেষ তা বিদেশির চোখে স্পষ্ট নয়। ঘন ঘন স্থান পরিবর্তনের ফলে প্রত্যেকটি মানুষ ইংরেজ হয়ে গেছে, প্লিমাথওয়ালা বা টরকিওয়ালা বলে কেউ নেই। অধিকাংশ বাড়িই এখন বাসা, পূর্বপুরুষের ভিটা মাটির মর্যাদা যদি থাকে তো পূর্বপুরুষের গোরস্থান। বাড়ির মালিকরা হয় বাড়িতে থাকেন না, নয় বাড়িতে বোর্ডিং হাউস খোলেন। এইসব

শহরের সর্বপ্রধান ব্যবসায় অতিথিচর্যা। অতিথিরা হয় ছুটিতে বেড়াতে আসে, নয় বাণিজ্য সংক্রান্ত কাজে আসে। যারা স্থায়ীভাবে বসবাস করে তাদেরও দু-ভাগে বিভক্ত করা যায়, তারা হয় দূরস্থিত পিতা-মাতার বোর্ডিং স্কুলে পড়তে-থাকা সন্তান নয় প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের পেনশনপ্রাপ্ত পিতা-মাতা। ছোটোদের জন্যে বোর্ডিং স্কুল ও বুড়োদের জন্যে নার্সিং হোম সমুদ্রতীরবর্তী বহু শত শহরে ও গ্রামে বহুলপরিমাণে বিদ্যমান।

ইংল্যাণ্ড যে দিন দিন socialised হয়ে উঠেছে, এর প্রমাণ ইংল্যাণ্ডের এইসব বোর্ডিং স্কুল, নার্সিং হোম, হাসপাতাল, পাবলিক লাইব্রেরি ইত্যাদি। এসব অনুষ্ঠান জনসাধারণের চাঁদায় চলছে, এসব অনুষ্ঠানে যারা থাকে তারা অনেকসময় জনসাধারণের চাঁদায় থাকে, এসব অনুষ্ঠানের শিক্ষায় বা চিকিৎসায় কোনো একজনের প্রতি পক্ষপাত নেই। গভর্নমেন্টের খরচে চললেও এগুলি এমনিভাবেই চলত। যে-দেশে জনসাধারণ যা গভর্নমেন্টও তাই সেদেশে জনসাধারণের চাঁদায় চালিত বেসরকারি হাসপাতাল ও জনসাধারণের খাজনায় চালিত সরকারি হাসপাতালে তফাত কতটুকু? ইংল্যাণ্ডের অসচ্ছলরা চার্চ প্রভৃতির মধ্যস্থতায় সচ্ছলদের কাছ থেকে যে চাঁদা পায় গভর্নমেন্টের মধ্যস্থতায় সচ্ছলদের কাছ থেকে সেই চাঁদাই পেতে চায়, যদিও তার নাম চাঁদা হবে না, হবে পাওনা। কিন্তু সেই পাওনা ও এই পাওনা তলে তলে একই জিনিস—এমনই বোর্ডিং স্কুলের অপক্ষপাত শিক্ষা, হাসপাতালের অপক্ষপাত চিকিৎসা, নার্সিং হোমের অপক্ষপাত সেবা। এতে আত্মীয়স্বজনের হাত নেই, হৃদয় নেই; এর উপরে সমাজের ফরমাশ প্রবল, ব্যক্তির রুচি-অরুচি ক্ষীণ। সমাজের অলিখিত হুকুমে মা তার কোলের ছেলেকে বোর্ডিং স্কুলে দেয়, রুগণ ছেলেকে হাসপাতালে রাখে। নিজের হৃদয়ের দাবিকে সমাজের দশজনের মতো নিজেও সেন্টিমেন্টাল বলে উড়িয়ে দেয়।

এইসব হোটেল, বোর্ডিং হাউস, স্কুল ও নার্সিং হোম সাধারণত মেয়েদের হাতে। দুধের সাধ ঘোলে মেটাবার মতো এরা home-এর সাধ হোটেলে ও আত্মীয়স্বজনের সাধ অতিথি দিয়ে মেটায়। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে একই আদর্শই উদযাপিত হতে চলল। নাম নিয়ে মারামারি করে ফল নেই, এও একরকম সোশ্যালিজম। তলিয়ে দেখলে সোশ্যালিজমের আদত কথাটা কি এই নয় যে, সমাজ ও ব্যক্তির মাঝখানে মধ্যস্থ থাকবে না, সম্পর্কে ও সম্পত্তিতে 'private' অঙ্কিত বেড়া থাকবে না? যে-জননী জন্মের পরমুহূর্তে সন্তানকে Dr. Barnardo's Home-এ ত্যাগ করে ও যে-জননী জন্মের অল্পকাল পরে সন্তানকে বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়ে দেয় তাদের একজনের সন্তানের খরচা বহন করে বদান্য জনসাধারণ, অপর জনের সন্তানের খরচা বহন করে দূরস্থিত পিতা-মাতা; শিক্ষা উভয়েই পায় আত্মীয়দের অপক্ষপাত তত্ত্বাবধানে, পক্ষপাতী পিতা-মাতার সান্নিধ্য কেউই পায় না অধিকাংশ স্থলে। এদের আর্থিক অবস্থার উনিশ-বিশ থাকলেও এরা সোজাসুজি সমাজের হাতে-গড়া।

প্রবীণাদের মুখে-চোখে কথাবার্তায় এমন একটি স্নিগ্ধতা ও শান্তি লক্ষ করা গেল যা কোনো দেশ-বিশেষের বিশেষত্ব নয়, যুগ-বিশেষের বিশেষত্ব। অস্তগামী চন্দ্রের স্নিগ্ধতার মতো ঊনবিংশ শতাব্দীর স্ত্রী-মুখের স্নিগ্ধতারও দিন শেষ হয়ে এল। এরপরে বিংশ শতাব্দীর স্বতন্ত্রা নারীর প্রখর জ্বালা, লাবণ্যহীন পিপাসাময় দুঃসাহসিক অরুণরাগ। ভারতের কল্যাণী নারীকে ভিক্টোরীয় ইংরেজ নারীতে কত স্থলে প্রত্যক্ষ করেছি, বহু-সহোদরবিশিষ্ট প্রশস্ত গৃহাঙ্গনে এঁদের বাল্যকাল কেটেছে, যন্ত্রমুখর জীবনসংগ্রামে জীবিকার জন্যে এঁরা প্রাণপণ করেননি, পাঁচজনকে খাইয়ে খুশি করেই এঁদের তৃপ্তি, জগতের সামান্যই এঁরা জানেন ও একটি কোণেই এঁদের স্থিতি, উদ্যানলতার ভঙ্গি এঁদের স্বভাবে ও উদ্যানপুষ্পের সুরভি এঁদের আচরণে। অনূঢ়া হলেও এঁরা গৃহিণী নারী, এঁরা স্বতন্ত্রা নারী নন। আর এঁদের পরবর্তিনীরা ফ্ল্যাটে বা বোর্ডিং হাউসে থাকা সাবধানি পিতা-মাতার স্বল্প সহোদরবিশিষ্ট সন্তান। প্রিয়জনের সঙ্গে প্রাত্যহিক দান-প্রতিদান, কলহ-মিলনে যে-শিক্ষা হয়, সে-শিক্ষা অল্পবয়স থেকে বোর্ডিং স্কুলে বাস করে হয়নি। তারপরে জীবিকার দায়িত্ব মাথায় নিয়ে আধুনিক সভ্যতার বেড়াজালে এঁরা যখন হরিণীর মতো ছটফট করেন তখন স্বভাবে আসে বন্যতা, আচরণে আসে ব্যস্ততা এবং বিবাহের সৌভাগ্য ঘটলেও নীরব নিভৃত জীবনে মন বসে না, মন চায় অভ্যস্ত

মত্ততা, আগের মতো খাটুনি, আগের মতো নাচ, আগের মতো সন্তানঘটিত দুশ্চিন্তার প্রতি বিতৃষ্ণা, স্বামীঘটিত তন্ময়তার প্রতি অনিচ্ছা। এ নারী গৃহিণী নারী নয়, স্বতন্ত্রা নারী। সমাজের কাজে এর অতুল উৎসাহ, প্রভূত যোগ্যতা—নার্স হিসেবে, শিক্ষয়িত্রী হিসেবে, হোটেলের ম্যানেজারেস হিসেবে, আপিসের সুপারিনটেণ্ডেন্ট হিসেবে এ নারী নিখুঁত। সচিব, সখি ও শিষ্যরূপে এ নারী পুরুষের শ্রদ্ধা জিনে নিয়েছে, আধুনিক সভ্যতার সর্বঘটে বিদ্যমান দেখি যাকে সে-নারী এই স্বতন্ত্রা নারী—গৃহহীন, পক্ষপাতহীন, জনহিতপরায়ণ, সামাজিক কর্তব্যে অটল। এ নারী সব পুরুষের সহকর্মিণী, কোনো একজনের রানি ও দাসী নয়, সকলের সম্মানের পাত্রী, কোনো একজনের প্রেম ও ঘৃণার পাত্রী নয়। কথাটা অবিশ্বাস্য শোনালেও বলতে হবে যে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ধারায় socialisation of women চলেছে, ভারতবর্ষও বাদ যায়নি। এর ফলে কাব্যলোক থেকে প্রেয়সী নারী অন্তর্হিত হল, তার স্থান নিল সঙ্গিনী নারী, passion-এর স্থানে এল understanding।

যুগলক্ষণ থেকে বিচ্ছিন্ন করলে ইংরেজ নারীর কতক বিশেষত্ব আছে—প্রবীণা ও নবীনা এক্ষেত্রে সমান। প্রথমত, ইংরেজ নারী চিরদিনই স্বাধীনমনস্ক, শক্তমনস্ক। ইংরেজ পুরুষও তাই। গুরুজনের ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছা মিলিয়ে দেওয়া তার দ্বারা কোনো যুগে হয়নি। সে নিজের ইচ্ছাকে নিজের হাতে রেখে স্বেচ্ছায় সমাজের বাঁধন স্বীকার করেছে, সামাজিক ডিসিপ্লিন মেনেছে। এইজন্যেই বিবাহটা দুজন স্বাধীন মানুষের contract; এতে গুরুজনের হাত পরোক্ষ। দ্বিতীয়ত, নারীত্বের কোনো ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক আদর্শএদেশের নারীর সামনে তেমন করে ধরা হয়নি যেমন আমাদের সীতা-সাবিত্রীর আদর্শ। এর ফলে এদেশের নারী প্রত্যেকেই এক-একটি আদর্শ, কোনো দুজন ইংরেজ নারী কেবল ব্যক্তিহিসেবে নয়, type হিসেবেও এক নয়। সীতা-সাবিত্রীর ছাঁচে ঢালতে গিয়ে আমাদের নারীজাতিকে আমরা সীতা-সাবিত্রী জাতি বানিয়েছি, তাদের মধ্যে নারীত্বের অল্পই অবশিষ্ট আছে। তাই তাদের নিয়ে আরেকখানা রামায়ণ কিংবা মহাভারত লেখা হল না। অথচ হেলেন ও পেনেলোপির পরবর্তিনীদের নিয়ে আজ পর্যন্ত কত কাব্যই লেখা হয়ে গেল, কত ছবিই আঁকা হয়ে গেল। তৃতীয়ত, ইংরেজ নারীর বেশভূষার প্রতি তেমন মনোযোগ নেই যেমন মনোযোগ গৃহসজ্জার প্রতি, শিশুচর্যা বা পশুচর্যার প্রতি। অধিকাংশ ইংরেজ নারীর সাজসজ্জা রূপকথার Cinderella-র মতো। কতকটা এই কারণে, কতকটা অন্য কোনো কারণে অধিকাংশ ইংরেজ নারীরই বাইরের charm নেই। পুরুষের প্রেমের চেয়ে পুরুষের শ্রদ্ধাই এদের কাম্য, সহযোগিতার চেয়ে প্রতিযোগিতার কামনা তীব্র।

আবহতত্ত্ববিদদের মুখে ছাই দিয়ে আজ আবার সোনার সূর্য উঠেছে, দশ দিক সোনা হয়ে গেছে।

কিছুদিন থেকে এমনই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য প্রতিদিন আমাদের চমক লাগিয়ে দিচ্ছে, এ যেন একটা প্রাত্যহিক miracle। আকাশ উজ্জ্বল নীল, পৃথিবী উজ্জ্বল শ্যাম, গাছেরা এখনও পাতা ফিরে পায়নি কিন্তু ফুলের ভারে ভেঙে পড়ছে, মেঠো ফুলের রঙের বাহার দেখে মনে হয় যেন ফুলের আয়নায় সূর্যের আলোর সব ক-টি রং বিশ্লেষিত হয়েছে। পাখিরাও বসন্তের সঙ্গে দক্ষিণ দেশ থেকে ফিরল, তাদের নহবত আর থামেইনা।

এমনই miracle-এর উপর আস্থা রেখে আমরা মাঝে মাঝে লণ্ডন ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি, যেদিকে চোখ যায় সেইদিকে চরণ যায়, আহার-নিদ্রার ভাবনাটা একাদশ ঘটিকার আগে হাজির হয় না, এবং ভাবনা যদি-বা হাজির হয় আহার-নিদ্রাকে হাজির করানো সেও এক প্রাত্যহিক miracle। মোটের ওপর একটা-কিছু হয়ে ওঠেই ওঠে।

অথচ ওইটুকু অস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে তাল কাটতেও পারিনে। এত বড়ো উৎসব সভায় পান পায়নি বলে খুঁতখুঁত করবে কোন বেরসিক? একসঙ্গে এতগুলো আনন্দ মিলে আক্রমণ করেছে, রং-রূপ-গান-সৌন্দর্যের বাণ সর্বাঙ্গ বিঁধে শরশয্যা রচনা করল। মুখ ফুটে ধন্যবাদ জানাবার ভাষা নেই, এত অসহায়। স্তবের মতো দেহ-মন লুটিয়ে পড়ে। পরস্পরকে অকারণে ভালোবাসি, অপরিচিতকে হারানো বন্ধুর মতো বুকে টানি। কুয়াশার মতো সংশয়ও উধাও হয়ে গেছে, ফেরার! আকাশব্যাপী আলোর মতো হৃদয়ব্যাপী প্রত্যয় দিবসে সূর্যের মতো, নিশীথে চন্দ্রের মতো জাগরূক। জগতের পূর্ণতা জীবনের অপূর্ণতাকে সমুদ্রের কোলে স্পঞ্জের মতো ওতপ্রোত করেছে। ধন্য আমরা। সৌন্দর্যসায়রের কোটি তরঙ্গাঘাত সইতে সইতে আমরা আছি, আমাদের দুঃখগুলি আনন্দসায়রের বীচিবিভঙ্গ। অভাব? এমন দিনে অভাবের নাম কে মুখে আনবে? আমাদের একমাত্র অভাব বাণীর অভাব—তৃপ্তি জানাবার বাণীর। আদিম মানবেরই মতো অন্তিম মানবও বাণীর কাঙাল থেকে যাবে, কৃতজ্ঞতা জানাবার বাণীর। সেইজন্যেই তো মানুষের মধ্যে কবি সকলের বড়ো —ঋষির চেয়েও, বীরের চেয়েও, ব্যবস্থাপকের চেয়েও, ক্ষুধা নিবারকের চেয়েও, লজ্জা নিবারকের চেয়েও। কবিকে বাদ দিলে সুন্দরের সভায় মানুষ বোবা, কবিকে কাছে রাখলে তার কথা ধার নিয়ে মানুষের মান থাকে। নইলে ঋষি থেকে ক্ষুধা নিবারক পর্যন্ত কেউ একটা পাখির সম্মানও পেতেন না।

শরৎকালে সেকালের রাজারা দিগবিজয়ে যেতেন, বসন্তকালে একালের আমরাও দিগবিজয়ে যাই। আমরা যাই কোনদিকে কোন আপনার লোক অচেনার মতোআত্মগোপন করে রয়েছে তাদের মুখোশ খসাতে। এমন দিনে কি কেউ কারুর পরহতে পারে? এ কি কুয়াশা-কালো দিন যে শত হস্ত দূরের মানুষকে শৃঙ্গী বলে ভ্রম হবে? নিজের দুধের বাটিতে মুখ ঢেকে ভাবব পৃথিবীসুদ্ধ লোক আমাকে দেখে হিংসায় জ্বলেপুড়ে মরছে? না, বসন্তকালে আমাদেরও মুকুল খোলে, আমরা ভালোবাসার সীমা খুঁজতে ফুলের গন্ধের মতো দিশাহারা হই, কোনো শহর থেকে কোনো গ্রামে পৌঁছাই, কোনো তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে কোনো বেড়া টপকাই, কোনো গাছের তলায় শুয়ে কোনো কোকিলের গলা শুনি, কোনো চেরির গুচ্ছ চুরি করে কোনো প্রিয়জনকে সাজাই, অতি অপরিচিত শিশুর গায়ে চকোলেটের ঢিল ছুড়ে ভাব করি। এটা আমাদের দোষ নয়, ঋতুর দোষ। নইলে আমাদের মতো কাজের লোকেরা কি টাইপরাইটারের খটখটানি ফেলে মোরগের কুক-রু-কু-উ শুনতে যায়, না রাজারা রংমহল ছেড়ে রণক্ষেত্রে রং মাখতে যায়?

শীতকালের ইংল্যাণ্ড যদি নরকের মতো, গ্রীষ্মকালের ইংল্যাণ্ড স্বর্গের মতো। প্রতিদিন হয়তো সূর্য ওঠে না, উঠলেও প্রতি ঘণ্টায় থাকে না, কিন্তু তাতে কী? ফুলের মধ্যে তার রং, পাতার মধ্যে তার আলো, পাখির গলায় তার ভাব জমা থাকে; মেঘলা দিনে ওই সঞ্চয় ভেঙে খরচ করতে হয়। ইংল্যাণ্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রথম কথা তার গড়ন। ইংল্যাণ্ড বন্ধুরগাত্রী। যেকোনো একটা ছোটো গ্রামে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকালে কী দেখি? দেখি যেন একখানা concave আয়না। রেখার উপরে রেখা হুড়মুড় করে পড়েছে।

অসমতল বললে ঠিক পরিচয়টি দেওয়া হয় না। বলতে পারি অযুত সমতল। সমতলের সঙ্গে সমতল মিলে অযুত কোণ রচনা করেছে, এবং এক কাঠা জমিকেও সমতল রাখেনি। যেটুকু সমতল দেখা যায় সেটুকু মানুষের কুকীর্তি। সুখের বিষয় ইংল্যাণ্ডের সমাজের মতো ইংল্যাণ্ডের মাটিকেও মানুষ সরলরেখা দিয়ে সরল করেনি। এই এক কারণে শীতকালেও ইংল্যাণ্ড অসুন্দর বা অস্বাস্থ্যকর হয় না, হয় কেবল অন্ধকার। শীত-গ্রীষ্ম সব ঋতুতেই ইংল্যাণ্ডে বর্ষা। কিন্তু বর্ষার জল দাঁড়াবার মতো একটু সমতল খুঁজে পায় না।

দেশের মাটির সঙ্গে মানুষের মনের যোগাযোগ বোধ হয় কথার কথা নয়। প্রাণী সৃষ্টির একটা স্তরে মানুষ ও উদ্ভিদ একই পর্যায়ভুক্ত নয় কি? আমার মনে হয় ইংরেজের মন যে law and order-এর জন্যে এত ব্যাকুল, এর কারণ তলে তলে সে তার মাটির মতো law and order-হীন, অযুত সমতল। ইংল্যাণ্ডের মাটির উপরকার জল যেমন অহরহ সমতল পাওয়ার চেষ্টা করছে—পাচ্ছে না; ইংরেজের সমাজও তেমনি যুগে যুগে সাম্যের চেষ্টা করে এসেছে—পায়নি। Snobbery ইংরেজ সমাজের মজ্জাগত, উপরতল না হলে তার সামাজিক রথ গড়িয়ে গড়িয়ে চলতে পারে না। অথচ সাম্যকেও তার মন চায়; নইলে চেষ্টা থাকে না, সবই আপনা-আপনি ঘটতে থাকে, উপরের জল চোখ বুজে নীচে যায়, নীচের ধোঁয়া চোখ বুজে উপরে ওঠে। এমনই নিশ্চেষ্টতা আমাদের স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে আমাদের সামাজিক রথ কোনোমতে চলছে ও কোনোমতে থামবারও নয়। হিন্দুর মরণ নেই, সে হিন্দু বিধবার মতো টিকে থাকবেই।

ইংরেজের মনের ভিত্তি অস্থির, সে যেন পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত পৌঁছেছে। সেখানে সবই বিশৃঙ্খল, সবই আগুন! অবচেতনভাবে সে ঝড়ঝঞ্ঝাকে ভালোই বাসে, সমস্যার অভাব সইতে পারে না। কিছু না হোক একটা crossword puzzle তার চাই-ই, কোনোরকম একটা যুদ্ধ—হোক-না-কেন 'যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'—না থাকলে সে বেকার। 'হরি হে, কবে শান্তি ও শৃঙ্খলা পাব', এটা তার চেতনার কথা। তার অবচেতনার কথা কিন্তু 'শান্তি ও শৃঙ্খলাকে পাওয়ার চেষ্টা যেন কোনো দিন ক্ষান্ত না হয়, এমনি চলতে থাকে।' ইংল্যাণ্ডের একটা হাত সমস্যার সৃষ্টি করে, আরেকটা হাত সমস্যার ধ্বংস করে, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে উভয়ের মধ্যে ষড়যন্ত্র না থাকলেও অন্তরালে দুই হাতের একই স্বার্থ—তারা পরস্পরের অন্তর টিপুনি অনুসারে সমস্যার বাড়তি-কমতি ঘটায়, মীমাংসা কাঁচা-পাকা রাখে। আফিসের দুই চালাক কর্মচারী তারা, অদরকারি বলে কোনো দিন তারা বেকারের দলে পড়ল না। ইংল্যাণ্ডকে দেখলেই মনে হয়, শাবাশ, খুব খাটছে বটে, কী ব্যস্ত! কিন্তু তদারক করলে ধরা পড়ে যায়, সমস্যা ও মীমাংসার উপরে যে একটা স্তর আছে সে-স্তরে কি এদেশ কোনো দিন উঠবে! সাত্বিকতার শিবনেত্র কি কখনো এর ললাটে জ্বলবে! এ যে সব পর্যবেক্ষণ করে, কিছুই দেখে না; সব জ্ঞাত হয়, কিছুই জানে না; সব বোঝে, কিছুই উপলব্ধি করে না। এর জীবন যেন জীবনব্যাপী ছেলেমানুষি। সাড়ে তিন থেকে সাড়ে তিন কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত লাট্টুর সঙ্গে লাট্টুর মতোই ঘুরছে!

প্রকৃতি যখন উৎসবময়ী সাজে, মানুষ তখন তার সাজ দেখবার জন্যে কাজকর্ম ফেলে রাখে; এইজন্যে আমাদের বারো মাসে তেরো পার্বণ। ইংল্যাণ্ডেও নাকি এককালে মাসে মাসে দোল-দুর্গোৎসব ছিল, কিন্তু তে হি নো দিবসাঃ গতাঃ। এখন প্রতিরাত্রে পার্বণ চলে নাচঘরে ও সিনেমায়, প্রতিদিন খেলার মাঠে। বড়োদিন বা ইস্টার এখন নামরক্ষায় পর্যবসিত। ভারতবর্ষের লোকের কাছে এই হিসেবে ইংল্যাণ্ড অত্যন্ত নিরানন্দ দেশ। এদেশে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ পূজ্যের সঙ্গে পূজারির সম্বন্ধ থেকে কখন নেমে এসে শিকারের সঙ্গে শিকারির সম্বন্ধে দাঁড়িয়েছে। এখনকার আমোদপ্রমোদগুলো যেন যুদ্ধে জিতে শত্রুর মৃতদেহের উপরে মাতলামি করা। এখন আমাদের শিরায় শিরায় ভয়, মৃত্যুভয়-দারিদ্র্যভয়-ব্যাধিভয়। প্রকৃতির প্রতিশোধগুলোর নামে মানুষ বিবর্ণ হয়ে যায়। প্রকৃতি যে কতরকমে প্রতিশোধ নিতে আরম্ভ করেছে হিসাব হয় না। একটা মস্ত প্রতিশোধ হচ্ছে যুদ্ধ। আধুনিক কালে আমরা অধিকাংশই রুটিন দেখে স্কুলে পড়ি, অফিসে কাজ করি, খেলতে যাই ও তামাশা দেখি। প্রত্যেক দেশেই এখন হাজার হাজার স্কুল-কলেজ, লাখে লাখে অফিস, কারখানা, সংখ্যাতীত সিনেমা, নাচঘর। প্রত্যেকটি মানুষ হয় সরকারি নয় বেসরকারি ব্যুরোক্রাট—সরকারি

ডাকঘরের মেয়ে কেরানি থেকে Lyons-এর চায়ের দোকানগুলোর কর্মচারিণী পর্যন্ত কেউ বাদ যায়নি। এই কোটি কোটি মৌমাছির চিত্তবিনোদনের জন্যে একই অভিনেতা-অভিনেত্রী একাদিক্রমে তিনশো রাত একখানি নাটক অভিনয় করে যান। তিনশো বার বাজালে একখানা গ্রামোফোনের রেকর্ডেরও ইজ্জত থাকে না, কিন্তু ধন্য এদের গলা!

এর পরিণাম জীবনে বিরক্তি। ছুটির দিন সস্তা টিকিট কিনে ট্রেন বোঝাই করে একই স্থানের পাশাপাশি হোটেলে যখন হাজার হাজার জন অভ্যাগত টমাস কুকের তর্জনী সংকেতে পরিচালিত হন ও charabanc-এর পিঠে চড়ে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করতে যান তখন অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতি দুজনেই ত্রাহি ত্রাহি করে ওঠেন। তাঁরা বলেন, 'রুটিনের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করো, মানচিত্রের হাত থেকে, এস্টিমেটের হাত থেকে।' তখন এমন কোথাও যাওয়ার জন্যে মানুষ ছটফট করে যেখানে টমাস কুক নেই, পাকা সড়ক নেই, শোবার ঘরওয়ালা মোটর কোচ নেই—এককথায় আমাদের শিশুবর্জিত পশুঅলংকৃত সর্বস্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত ফ্ল্যাটের আরাম নেই। সমস্ত পৃথিবীটা যেমন শনৈঃ শনৈঃ একইরকম হয়ে উঠছে, দেখে মনে হয় টমাস কুক গ্রামে গ্রামে দোকান খুলবে, কাউকে প্রাণ হাতে করে বেহিসেবিভাবে অজানা পথে বিবাগি হতে দেবে না। তখন মানুষের একমাত্র আশা-ভরসার স্থল হবে যুদ্ধক্ষেত্র। সত্যিকারের ছুটি পাওয়া যাবে ঠিক সেইখানেই, সেখানকার কিছুই আগে থেকে জেনে রাখা যাবে না, প্রতি পদেই অকস্মাতের সঙ্গে দেখা।

গত মহাযুদ্ধে যে-ক্ষতি হয়েছে তারই পূরণের জন্যে প্রকৃতি অপেক্ষা করছে; তাই এখনও আমরা যুদ্ধের নামে জিভ কাটছি, মেয়েরা আগামী পার্লামেন্টটাকে Parliament of Peacemakers করবার জন্যে চেষ্টা করছে। কিন্তু যে-শিশুরা গোড়া থেকেই মোহমুক্ত হয়ে বাড়ছে, যাদের কল্পনাকে খোরাক দেবার জন্যে দ্যুলোকে ও ভূলোকেএকটিও অপরিচিত প্রাণী, একটাও অপরিচিত স্থান নেই, সেইসব বাস্তববাদী যখন বড়ো হয়ে দলে দলে সরকারি-বেসরকারি ব্যুরোক্রেসির অন্তর্ভুক্ত হয়ে রুটিন সামনে রেখেকাজ করবে তখন তাদের প্রত্যেকের চোখের সম্মুখে না-হয় ঝুলিয়ে রাখা গেল 'There is no fun like work' এবং সোশ্যালিস্টদের দয়ায় তাদের কর্মকাল নাহয় করে দেওয়া গেল দিনে পাঁচ ঘণ্টা, তবু তারা সেই সোনার খাঁচা থেকে উড়ে গিয়ে মরতে চাইবে না কি? অত্যন্ত বেশি সংঘবদ্ধ হওয়ার পরিণাম চিরকাল যা হয়েছে তাই হবে, প্রকৃতি কোনো সংঘকেই টিকতে দেয়নি—না বৌদ্ধ সংঘকে, না খ্রিস্টান সংঘকে। এবং অন্নবস্ত্রের জন্যে যে নতুন সংঘটা প্রতি দেশেই নানা নাম নিয়ে শশীকলার মতো বাড়ছে—সোশ্যালিজম তার শেষ অধ্যায় বটে, কিন্তু তার পরেও উপসংহার আছে এবং সে-উপসংহার তেমন মুখোরোচক নয়।

প্রকৃতির প্রতি ইংরেজের দরদ এখনও লোপ পায়নি, ওয়ার্ডসওয়ার্থের নাতি-নাতনিকে এখনও দেখতে পাওয়া যায়। রাস্তার দু-ধারে গাছ রুইবার জন্যে সমিতি হয়েছে, উদ্যান-নগর বা উদ্যান-নগরোপান্ত (Garden Suburb) রচিত হচ্ছে, পল্লির সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রাখবার আন্দোলন তো কবে থেকে চলে আসছে, কিন্তু রেলগাড়িওয়ালা, মোটরগাড়িওয়ালা ও নতুন বাড়িওয়ালাদের লুব্ধদৃষ্টির উপরে ঘোমটা টেনে-দেওয়া পল্লিসুন্দরীর ক্ষমতার বাইরে।* দু-পাঁচজন অসমসাহসিক স্বপ্নদ্রষ্টা পল্লির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে দেশের নব সভ্যতাকে আবাহন করতে ব্যগ্র, কিন্তু হাটের কোলাহলে তাঁদের কণ্ঠস্বর বড়োই ক্ষীণ। পলিটিশিয়ানদের কাছে তাঁরা আমল পান না, কেননা পলিটিশিয়ানরা হয় বড়ো বড়ো কলকারখানাওয়ালাদের তাঁবেদার, নয় কলকারখানার শ্রমিকদের সর্দার। দুই দলের স্বার্থই আরও অধিকসংখ্যক কলকারখানা, পাকা সড়ক, নতুন বাড়ি ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত। বেকারসমস্যা দূর করবার জন্যে এরা যা হাতের কাছে পাচ্ছে তা-ই করতে উদগ্রীব, দশ বছর পরে তার ফলে দেশের চেহারাটা কেমন হবে তা ভাবতে গেলে ভোট পাওয়া যায় না, ক্ষুধিতের ক্ষুধাও বাড়তে থাকে। এমনিই তো দেশটাতে জমি যত আছে রাস্তা তার বেশি, রাস্তা যত আছে বাড়ি তার বহুগুণ; আরও দশ বছর পরে দেখা যাবে যে সারা ইংল্যাণ্ডটা একটা বিরাট শহর, এবং এই শহরের লোক নিজেদের খাদ্য নিজেরা একেবারেই উৎপাদন করে না। বলা বাহুল্য সোশ্যালিস্টরা শহুরে শ্রমিকদের ভোটের উপর নির্ভর করে; গ্রাম্য কৃষকদের জন্যে তাদের মাথাব্যথা নেই। কৃষকদের ভোট

পাওয়ার জন্যে অন্যান্য দলের এক-একটা কৃষি-পলিসি আছে বটে, কিন্তু পলিটিশিয়ান-জাতীয় প্রাণীদের কাছে দূরদর্শিতা প্রত্যাশা করা বৃথা, তারা তুবড়ির মতো হঠাৎ জ্বলে হঠাৎ নেভে, তাদের জীবদ্দশা বড়োজোর বছর পাঁচেক। সমগ্র দেশের নব সভ্যতার আবাহন করা তাদের কাজও নয়; তাদের সাজেও না। তাদের একদল আরেক দলের জন্যে বসবার জায়গা রেখে যেতেই জানে, সমস্ত জাতিটার চলার ভাবনা তাদের অতি সূক্ষ্ম মস্তিষ্কে প্রবেশপথ পায় না।

এখনকার ইংল্যাণ্ডকে দেখে দুঃখিত হবার কারণ আছে। সে-কারণ এ নয় যে, ইংল্যাণ্ডের নৌবহরকে আমেরিকার নৌবহর ছাড়িয়ে উঠছে, ইংল্যাণ্ডের উপনিবেশরা পর হয়ে যাচ্ছে, ইংল্যাণ্ডের অধীন দেশগুলি স্বাধীন হয়ে উঠছে, ইংল্যাণ্ডের অন্তর্বিবাদে তার ধনবৃদ্ধি বাধা পাচ্ছে। আসলে সাম্রাজ্যের জন্যে ইংল্যাণ্ড কোনোদিন কেয়ার করেনি, যেমন ঐশ্বর্যের জন্যে চিত্তরঞ্জন দাশ কোনোদিন কেয়ার করেননি। ইংল্যাণ্ড এক হাতে অর্জন করেছে অন্য হাতে উড়িয়ে দিয়েছে, একদিন যাদের ক্রীতদাস করেছে অন্যদিন তাদের মুক্ত করে দিয়েছে, যেদিন আমেরিকা হারিয়েছে সেইদিন ভারতবর্ষ পেয়েছে। পুরুষস্য ভাগ্যম। আধিভৌতিক লাভ-ক্ষতির কথা ইংল্যাণ্ড এতদিন ভাবেনি, এইবার ভাবতে শুরু করেছে; দেখে মনে হয় এবার আর তার সেই পুরাতন অন্যমনস্কতা নেই, এবার সে অক্ষমের মতো নিজের অক্ষমতার কথাই ভাবছে। ব্যাপার এই যে ইতিমধ্যে কবে একদিন—ঊনবিংশ শতাব্দীতেই বোধ হয়—ইংল্যাণ্ডের আত্মা অন্তর্হিত হয়েছে কিংবা জীবন্মৃত হয়েছে। শেক্সপিয়ার থেকে ব্রাউনিং পর্যন্ত এসে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। যে-ইংরেজের প্রাণ ছিল adventure বা বিপদবরণ, সে এখন মন্ত্র নিয়েছে 'Safety first'। যা-কিছু এককালে অর্জন করেছে তাই এখন সে নিরাপদে ভোগ করতে চায়। কিন্তু সংসারের নিয়ম এই যে, বীর ছাড়া অন্য কেউ বসুন্ধরাকে ভোগ করতে পারবে না, অর্থাৎ অর্জন করা ও ভোগ করা একসঙ্গে চলা চাই। বস্তুত অর্জন করাটাই ভোগ করা। অর্জিত ধনকে রয়ে-বসে ভোগ করা হচ্ছে সংসারের আইনে চুরি করা। এ আলস্যকে সংসার কিছুতেই প্রশ্রয় দেবে না। যার মাইট নেই তার রাইট তামাদি হয়ে গেছে, যার হজম করবার ক্ষমতা নেই সে খেতে পাবে না।

কিছুকাল থেকে আধিভৌতিক ঐশ্বর্যের ওপরে মন দেওয়া ছাড়া ইংল্যাণ্ডের গত্যন্তর থাকেনি, কেননা মন দেবার মতো আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য তার কখন ফসকে গেছে। এখন আধিভৌতিক ঐশ্বর্যও যায়-যায় দেখে তার মেজাজ বিগড়ে যাচ্ছে। ধনকে যে-মানুষ পরমকাম্য মনে করে কোটিপতি হল, সে যখন দেখে যে আরেক জন কেমন করে দ্বি-কোটিপতি হয়েছে তখন সে চোখে আঁধার দেখে, তার পা টলতে থাকে। ভদ্রলোকের ছেলে যখন ইতর লোকের ছেলের সঙ্গে কথাকাটাকাটি করতে যায় ও একটি অশ্লীল কথা বলতে গিয়ে দশটি শুনে আসে, তখন তার যে-অবস্থা হয় ইংল্যাণ্ডের অনেকটা সেই অবস্থা। ধনবলকে সে সকলের থেকে শ্রেয় মনে করেছিল, আজ ধনবলে সে প্রথম থাকতে পারছে না। আমেরিকা তার চেয়ে বড়ো Power হয়ে 'জগৎ গ্রাসীতে করেছে আশয়'। ইংল্যাণ্ডের এই অপমান এখনও তার মর্মে বেঁধেনি, কিন্তু চামড়ায় বিঁধছে। বেশ একটু inferiority complex তার মধ্যেও লক্ষ করছি। ভারতবর্ষের মতো সেও বলতে আরম্ভ করেছে, 'আমি বড়ো গরিব, আমি গোবেচারা', কিন্তু সংসারের আইনে গরিব হওয়া হচ্ছে ফাঁসির আসামি হওয়া। হয় আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যে ধনী হতে হবে, নয় আধিভৌতিক ঐশ্বর্যে ধনী হতে হবে, অস্তিত্বের মূল্য দেওয়ার জন্যে ধনী না হলে চলে না।

কেবলমাত্র সূর্যের আলোর দ্বারা একটা দেশের কতটা পরিবর্তন ঘটতে পারে তার সাক্ষী গ্রীষ্ম কালের ইংল্যাণ্ড। মাটি তেমনি আছে, মানুষ তেমনি আছে, সভ্যতার জগন্নাথের রথ তেমনি উদ্ভ্রান্ত গতিতে চলেছে; কিন্তু মেঘ-কুয়াশার কপাট যেই খুলল অমনি দেখা দিল সূর্যলোক-চন্দ্রলোক-নক্ষত্রলোক। ইংল্যাণ্ড ছাড়াও যে দেশ আছে, সমুদ্রের নজরবন্দি হয়ে মেঘ-কুয়াশার কারাগারে সেকথা আমরা জানতুম না; এখন দেখা গেল আকাশজোড়া অমরাবতী। স্বর্গ আমাদের এত কাছে যে হাত বাড়ালে হাতে ঠেকে, কেবল হাত বাড়ানোটাই শক্ত, কেননা হাত দিয়ে যে আমরা মাটি আঁকড়ে থাকতেই ব্যস্ত।

এমনই মধুর গ্রীষ্মকালে কেমন করে মানুষের যুদ্ধে মতি হয় অনেকসময় আশ্চর্য হয়ে ভাবি। শীতের অন্ধকারে শরীরটাকে গরম রাখবার জন্যে পরস্পরের শরীরেবেয়নেটের চিমটিকাটা ও পরস্পরের মুখ দেখবার জন্যে বারুদে আগুন-ধরানো, এর অর্থ বুঝতে পারি। কিন্তু বসন্ত কালে, গ্রীষ্ম কালে, শরৎ কালেও অরসিকের মতো যুদ্ধ করতে কেমন করে ইউরোপের লোকের প্রবৃত্তি হল? আকাশের দিকে নির্নিমেষ চেয়ে দিনের পর দিন যায়, তবু তার রহস্যের কূল পাওয়া যায় না। সে আমাদের নিত্যবিস্ময়।পাখিগুলো যে কেন সারাবেলা গান গেয়ে মরে, এত ফুল যে কোন আনন্দে ফোটে, বন ও মাঠ দখল করেও রাজপথের বক্ষ ভেদ করে ঘাস মাথা তোলে কেন, মোটরের দাপাদাপিকে অগ্রাহ্য করে শামুক তার অবসরমতো ঘণ্টায় দশ ইঞ্চি অগ্রসর হয় কেন, এই অপরূপ শহরটাকে কেন এমন অপূর্ব দেখায়, কলকারখানার কলঙ্ক নিয়েও কেন ইংল্যাণ্ড এখনও অম্লানযৌবনা—এসব ধাঁধার একমাত্র জবাব সূর্যের করুণা।

সূর্য অভয় দিয়ে বলছে, পৃথিবীকে তোমরা যত খুশি কুৎসিত, যত খুশি দুঃখময়, যত খুশি বিশৃঙ্খল করো-না কেন আমি আছি তার সুখ-সৌন্দর্য-শৃঙ্খলার কুবের-ভান্ডারী, আমি তাকে সোনা করে দেব।

সূর্য আমাদের বিনা মূল্যের বিমা কোম্পানি। যখন যা হারায় তা গড়িয়ে দেয়। জীবন হারালেও জীবন ফিরিয়ে দেয়। সূর্যের assurance শুনলে তাই ফুল-পাখি-ঘাস-শামুকের মতো আমাদেরও প্রাণে ভরসা আসে, আমরা জীবনকে একটা কানাকড়ির চেয়ে মূল্যবান মনে করিনে, আমরা ওদেরই মতো নিরুদবেগে দিন কাটাই, অকারণে খুশি হই। ওই যে সাদা প্রজাপতিটি, ওর জীবন একটা দিনের—কোথায় ওর মৃত্যুভয়, কোথায় ওর জীবনের মূল্য, কোথায় ওর অপ্রিয় কর্তব্য? খোলা আকাশের জানলা দিয়ে সভ্য মানুষের অর্থহীন হট্টগোল ও আর্তনাদ সুতো-ছেঁড়া ফানুসের মতো কোথায় উড়ে গেল।

এমন দিনে চোখ-কান-মন খোলা রেখে বেড়াতে বেরিয়ে সুখ আছে। যা-ই দেখি তা-ই নতুন মনে হয়, আশ্চর্য মনে হয়। রাস্তার এক কোণে দুই বুড়ি বসে ফুল বেচছে। অত ফুল তারা পেল কোথায়? সব ফুলের কি তারা নাম জানে, মর্ম বোঝে, যত্ন জানে? শাকসবজির হাট; নানা দেশের ফল-পাতা জাহাজে করে গাড়িতে করে এসেছে। গাড়ি সেই মান্ধাতার আমলের টাট্টুঘোড়ার গাড়ি, গাধার গাড়ি। মোটরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তার গাড়োয়ান দুরুচ্চার শব্দ করে চলেছে, তার হাঁটু থেকে পা অবধি একটা পাটের থলে কম্বলের কাজ করছে, তার অলক্ষিতে কখন একটা ছোঁড়া গাড়ির পেছন ধরে ঝুলে পড়েছে। হাটের কাছে অপেরা হাউস, রাত্রে Chaliapine অপেরায় নামবেন, সকাল থেকে লোক জমে গেছে; একখানা ক্যাম্বিসের চেয়ার ভাড়া করে এক-একজন বসে গেছে সন্ধ্যা বেলা কখন টিকিটঘর খুলবে তারই প্রতীক্ষায়; কেউ সংগীতের স্বরলিপি নকল করছে; কেউ বই পড়ছে; কেউ গল্প করছে; কেউ-বা চেয়ারের উপর নিজের নামের কার্ড এঁটে দিয়ে অফিসে গেছে কিংবা বেড়াতে গেছে। কাছেই ড্রুরি লেনের থিয়েটার—কবেকার থিয়েটার—গ্যারিক ও সেরা সিডন্স একশো-দেড়শো বছর আগের মানুষ। ইংল্যাণ্ডের থিয়েটারগুলোর অধিকাংশই অত পুরোনো নয়, কিন্তু প্রত্যেকের পিছনে বহু শতাব্দীর রুচি ও সাধনা রয়েছে—এক অভিনেতার থেকে আরেক অভিনেতায় সংক্রামিত, লুপ্ত থিয়েটার থেকে চলিত থিয়েটারে হস্তান্তরিত। সেইজন্যে ইংল্যাণ্ডের থিয়েটার এক-একটা যুগে খুব উঁচু দরের না হলেও কোনো যুগেই নীচু দরের হতে পারে না, আগের যুগের আদর্শ তাকে পাঁক থেকে টেনে তোলে। ফ্রান্সের থিয়েটার আরও পুরাতন, ফ্রান্স যতদিনের থিয়েটার ততদিনের। সে

যেন জাতির ধমনি। তার স্বাস্থ্যনাশ জাতির স্বাস্থ্যনাশের শামিল। ঘোরতর রাষ্ট্রবিপ্লবের দিনে, মহাযুদ্ধের দিনেও ফ্রান্সের থিয়েটারে লোকারণ্য। ইংল্যাণ্ডের থিয়েটার তার অতখানি নয়—ইংল্যাণ্ডের ধমনি তার ক্রিকেট খেলার মাঠ, তার ঘোড়দৌড়ের মাঠ।

কাছেই হাই কোর্ট। হাই কোর্টটি যেকোনো ভারতবর্ষীয় হাই কোর্টের চেয়ে ছোটো ও জনবিরল। ইংরেজের দেশে স্পেকটাকুলার কিছুই নেই, এক যুদ্ধজাহাজ ছাড়া। তাই ভারতবর্ষের লোক লণ্ডনে এসে বিষম খেপে যায়—এই তো দেশ, এই তো মানুষ, এই তো দৃশ্য, এই তো খাদ্য, এই দেখতে এতদূর আসা! লণ্ডনের অর্ধেকের বেশি লোক অকথ্য বস্তির বাসিন্দা, মেফেয়ারের অদূরেই ওয়েস্টমিনস্টারের বস্তি, পার্লামেন্টের প্রদীপ যেখানে জ্বলছে সেইখানেই আঁধার। মেফেয়ারও এমন-কিছু আহামরি নয়, আমাদের মালাবার হিল ওর থেকে ঢের বিলাসযোগ্য। বিলেত দেশটা মাটির বলে মাটির! ব্যাঙ্ক পাড়াতে বেড়াতে যাও—কলকাতার ক্লাইভ স্ট্রিটের দোসর। টেমস নদীর চেহারা তো জানই—সিন্ধুপ্রদেশে বোধ করি ওর থেকে বড়ো বড়ো নালা আছে। লণ্ডনের বাগানগুলো দেখে একজন লাহোরবাসীর নাক-সিঁটকানো দেখবার মতো। উত্তর ভারতের যেকোনো তৃতীয় শ্রেণির মসজিদ ও দক্ষিণ ভারতের যেকোনো তৃতীয় শ্রেণির মন্দির ইংল্যাণ্ডের ক্যাথিড্রালগুলোকে হার মানায়। রাজবাড়ির তুলনা ভারতবর্ষে অন্তত ছশো বার মিলবে, কেননা ভারতবর্ষের সামন্ত রাজারা ক্ষমতায় যা-ই হন, জাঁকজমকে এক-একটি চতুর্দশ লুই। পঞ্চম জর্জ তো তাঁদের তুলনায় একটি অধ্যাপক ব্রাহ্মণ।

ভারতবর্ষের লোক সাইটসিইয়ার হিসেবে ইংল্যাণ্ডে এলে ঠকে যাবে। সিনেমা দেখাই যদি অভিপ্রায় হয় তবে দেশে সিনেমা স্থাপন করতে তো বেশি খরচ লাগে না। বিদ্যালাভের জন্যে যদি আসতে হয় তবে এত দেশ থাকতে কেবল ইংল্যাণ্ডে কেন? হ্যাঁ, ব্যবসা করতে আসা একটা কাজের কথা বটে। কিন্তু তা করতেও গোটা দুনিয়া পড়ে আছে।

তবু ভারতবর্ষের লোকের সব দেশের চেয়ে বেশি করে ইংল্যাণ্ডেই আসা উচিত, এবং সব দেশের লোকের চেয়ে ভারতবর্ষের লোকেরই ইংল্যাণ্ডে আসা বেশি দরকার। ভারতবর্ষ ও ইংল্যাণ্ড চরিত্রের জগতে antipodes। ইংল্যাণ্ডের যে-গুণগুলি আছে ভারতবর্ষের সেই গুণগুলি নেই, এবং ভারতবর্ষের যে-গুণগুলি আছে ইংল্যাণ্ডের সেই গুণগুলি নেই। এই একই কারণে এত দেশ থাকতে ইংল্যাণ্ডে ও ভারতবর্ষে যোগাযোগ ঘটল। এবং এই এক কারণে স্বাধীন ভারতবর্ষকেও সাম্রাজ্যহীন ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ রক্ষা করতে হবে। ফ্রান্স-জার্মানি-রাশিয়া কম-বেশি ভারতবর্ষেরই মতো। তাদের কাছ থেকে ভারতবর্ষের শেখবার আছে অনেক কিন্তু তাদের চরিত্র ভারতবর্ষের চরিত্রের সঙ্গে এত মিলে যায় যে তাদের চরিত্র থেকে ভারতবর্ষের আয়ত্ত করবার আছে অল্পই। অন্য কথায় তারা ভারতবর্ষের সগোত্র, তাদের সঙ্গে বিবাহ বড়ো বেশি ফল দেবে না। ইংল্যাণ্ডের গোত্র আলাদা। ভারতবর্ষ সবাইকে ঘরে টানে, ইংল্যাণ্ড সবাইকে পথে বার করে। ইংল্যাণ্ড খোঁজায়, ভারতবর্ষ খোঁজার শেষ বলে দেয়। ইংল্যাণ্ড প্রশ্ন, ভারতবর্ষ উত্তর। ব্রিটানিয়া নিষ্ঠুরা স্বামিনী—তাকে খুশি করবার জন্যে প্রাণ হাতে করে জাহাজ ভাসাতে হয়, হয় রত্ন নিয়ে ফিরে আসা, নয় প্রাণ হারিয়ে দেওয়া, নয় উপনিবেশ গড়ে ফিরে আসবার নাম না করা। ভারতবর্ষ করুণাময় ঋষি গৃহস্থ—ক্রৌঞ্চ পাখিকে সান্ত্বনা দেয়, স্বামীবর্জিতাকে আশ্রয় দেয়, যে আসে সে-ই তার স্নেহের অতিথি। একের চরিত্রের চিরবিপদবরণস্পৃহা অপরের চরিত্রের সহজ শান্তির সঙ্গে সমন্বিত হবে, এই অভিপ্রায় উভয়ের বিধাতার মনে ছিল। ইতিহাস তো একরাশ আকস্মিকতা নয়। আকাশের এক কোণে বাতাসের অভাব ঘটলে অন্য কোণ থেকে যেমন বাতাস ছুটে যায়, ভারতবর্ষকে পরিপূর্ণতা দিতে ইংল্যাণ্ড তেমনি ছুটে গেছে। অন্য দেশ যায়নি, কারণ অন্য দেশ ভারতবর্ষেরই মতো। অন্য দেশ গিয়ে ফিরে এসেছে, কারণ অন্য দেশকে ভারতবর্ষের দরকার ছিল না।

একথা ঠিক যে ফ্রান্স যদি ভারতবর্ষের হাত ধরত তবে ভারতবর্ষের সঙ্গে তার মনের অমিল ঘটত না, যেমন ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ঘটেছে। কিন্তু তা হলে ভারতবর্ষের চরিত্র কোনোদিন পূর্ণতা পাওয়ার সুযোগ পেত

না। ফ্রান্স যে-দেশে গেছে সেদেশকে ফ্রান্সে পরিণত করেছে, সেদেশকে বলেছে—তোমরাও ফরাসি, তোমরাও স্বাধীন। এ বাণীর সম্মোহন কোনো দেশ এড়াতে পারেনি। ফ্রান্সের দখলে থাকলে আমরা কেউ কেউ ফ্রান্সের সেনাপতি হয়ে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট বা সম্রাটও হতে পারতুম, যেমন কর্সিকাবাসী ইটালিয়ানবংশীয় নেপোলিয়ন একদিন হয়েছিলেন। কেবল নিজেকে ফরাসি বলে ঘোষণা করতে হত, এই যা কষ্ট। ফরাসিরা অনেকটা মুসলমানদের মতো ডেমোক্র্যাটিক; তাদের দলে ভরতি হওয়া খুব সোজা এবং ভরতি হলে আর পালাতে ইচ্ছে করে না। ভারতবর্ষের মুসলমান আরব দেশের মুসলমানের কাছ থেকে কীই-বা পেয়েছে শুধু নামটা ছাড়া! তবু সেই নামটাকে পাসপোর্ট করে সে পৃথিবীর সব দেশে সমনামাদের প্রীতি পায়। ফরাসি নামটারও তেমনি মহিমা। এই নাম নিয়ে আমরা এত দিনে ভারতবর্ষের মানচিত্রের উপরে লিখতুম 'ফ্রেঞ্চ রিপাবলিকের কয়েকটা জেলা'—যেমন আলসাস বা লোরেন তেমনি বাংলা বা অসম।

সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা সবই আমরা পেতুম, ফ্রান্স থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা স্বপ্নেও ভাবতুম না। কিন্তু আমাদের কোনো বৈশিষ্ট্যকেই ফ্রান্স আমল দিত না, ফ্রান্সের লজিকপ্রিয় মগজ অসংগতি সহ্য করতে পারে না। সম্ভবত ফরাসিরা আমাদের দেশে একটিও দেশীয় রাজ্য থাকতে দিত না, ভারতবর্ষের মানচিত্রখানা আঁকবার পক্ষে সোজা হত। হিন্দু-মুসলমান আইনের বদলে চালাত কোড নেপোলিয়ন। এককথায় আমাদের ভারতীয়ত্বটুকু কেড়ে নিয়ে আমাদের দিত তার চেয়ে অনেক সুবিধাজনক ফরাসিত্ব।

কিন্তু গোড়ায় গলদ, ফ্রান্স কোনোদিন ভারতবর্ষ নিতেই পারত না। কেননা ফ্রান্সের চারিত্রিক দোষ-গুণ মোটের উপর আমাদের কাছাকাছি। ফরাসিরা গৃহপ্রিয়, দেশ ছেড়ে বেরুতেই চায় না, বড়োজোর খিড়কির কাছে আফ্রিকা পর্যন্ত ওদের গতিবিধি। ইন্দোচীন প্রভৃতি খুচরো উপনিবেশগুলোকে ধর্তব্য মনে করলে ফিজি প্রভৃতি জায়গায় আমাদের উপনিবেশকেও ধরতে হয়। গৃহপ্রিয় মানুষের স্বভাব ঘরের লোকের সঙ্গে দু-বেলা ঝগড়া করা, চক্রান্ত করা, সন্ধি করা ও পাশাপাশি থাকা। ফ্রান্সের প্রতিনিধিসভায় যতগুলো চেয়ার ততগুলো দল। ফ্রান্সের সাহিত্যরাজ্যেও যতগুলি লেখক ততগুলি পত্রিকা, যতগুলি পত্রিকা ততগুলি দল। কোনো একটা দলের সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকলে লেখককে লোকে অজ্ঞাতকুলশীল ভেবে খাতিরই করতে চায় না। ফ্রান্স পরিবারপ্রধান দেশ। পরিবারের সঙ্গে জড়িত না হলে, পরিবারের ভার মাথায় না নিলে, ব্যক্তিকে সে ব্যক্তিই মনে করে না। ইংল্যাণ্ড ব্যক্তিকে চরে বেড়াবার পক্ষে যথেষ্ট মুক্তি দিয়েছে, John Bull ষাঁড়ই বটে, তার পারিবারিক দায়িত্ব সামান্য। তাই ইংরেজের ব্যক্তিত্ব একলা মানুষের ব্যক্তিত্ব। কিন্তু ষাঁড়েরও গোষ্ঠ থাকে, বৃহৎ গোষ্ঠ। ইংরেজের বৃহৎ ক্লাব বৃহৎ পার্টি। বৃহৎ পার্টির একজন না-হলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব এদেশে নগণ্য এবং তার ব্যক্তিত্বের প্রভাব অক্রিয়। এদেশের মাটিতে আকাশকুসুম যদি-বা জন্মায় তবে সে নেহাত আগাছা, তাকে উপড়ে ফেলবার আগেই সে মানে মানে সরে পড়ে। Shelley ইটালি প্রয়াণ করলেন। Bertrand Russel আমেরিকা প্রয়াণ।

ইংল্যাণ্ডের চরিত্রের আরেকটা গুণ, তার চরিত্র মুহুর্মুহু বদলায়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশের ইংরেজ বিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশের ইংরেজকে দেখলে প্রপৌত্র বলে চিনতে পারবে না। এরা আরেক জাতি। তিন পুরুষের ব্যবধানে সমাজে ও রাষ্ট্রে বিপ্লব ঘটে গেছে। কিন্তু চাকার তলার দিকটা কখন উপরের দিক হয় চাকা তা জানে না, চাকা ঘুরতেই ব্যাপৃত। প্রতিদিন একটু একটু করে বিপ্লব চলেছে; চোখে পড়ে না এইজন্যে যে চোখও বিপ্লবের অঙ্গ।Galsworthy-র নতুন নাটক Exiled-এ নীচের ধাপের লোক উপরের ধাপে উঠল, Galsworthy-একে ঠাট্টা করে বললেন, evolutionary process, এবং যারা নবাগতের ধাক্কা খেয়ে উপরের ধাপ থেকে পা পিছলে পড়ল তাদের জন্যে দুঃখ করলেন। কিন্তু তারাও তো evolutionary process-এরই কল্যাণে ভুঁই ফুঁড়ে উপরে উঠেছিল। এখনকার ভুঁইফোঁড়রাও পঞ্চাশ বছর পরে উপরের ধাপ থেকে exiled হবে। তা বলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না, ইংল্যাণ্ড যতই বদলাক ইংল্যাণ্ডই থাকবে, চাকা যতই ঘুরুক চাকাই থাকবে। পুরাতনকে ইংল্যাণ্ড সমীহ করে, কিন্তু নির্বাসিতও করে, অ্যারিস্টোক্র্যাটের প্রতি তার পরম শ্রদ্ধা, কিন্তু পালা করে সবাইকে সে একই গদিতে বসাবে বলে কাউকেই দীর্ঘকাল গদিয়ান হতে

দেয় না। পর্বতের চূড়ায় যে-ই ওঠে সে-ই টাল সামলাতে না পেরে আছাড় খায়, অথচ যে-দেশের সমাজের গড়ন পার্বত্য সেদেশে কতকগুলো লোককে চূড়ায় চড়ে চূড়াচ্যুত হতেই হবে। অধিকাংশ অ্যারিস্টোক্র্যাটেরই বংশলোপ হয়, সুতরাং কষ্ট করে তাদের মাথা কাটতে হয় না। স্বাচ্ছন্দ্যের আদর্শ বাড়াতে গিয়ে অতিমাত্রায় জন্মশাসন, তার ফলে বংশলোপ। উচ্চতর মধ্যবিত্তরাও জন্মশাসনপূর্বক নিজেদের সংখ্যা কমাতে লেগেছে, তার ফলে নিম্নতর মধ্যবিত্তরা উচ্চতর মধ্যবিত্ত হয়ে উঠছে। নিম্নতর মধ্যবিত্তদের সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা। নিম্নতর মধ্যবিত্তদের পরিবারে আজকাল তিন-চারটির বেশি সন্তান দেখতে পাওয়া ভার। অতএব শ্রমিক শ্রেণির লোক ক্রমশ নিম্নতর মধ্যবিত্ত হয়ে উঠছে। এই হল evolutionary process, এটা ইংল্যাণ্ডের একটা মস্ত উদ্ভাবন। এতে শ্রেণি বিশেষের লাভ-লোকসান হতে পারে, সমস্ত দেশটার লাভ-লোকসান কিছুমাত্র নেই। পরিবর্তন বিনা কোনো জীবন্ত দেশের জীবন থাকে না, অতএব দু-তিন পুরুষ অন্তর মাথা কাটাকাটি না করে প্রতি পুরুষেই একের নির্বাসন ও অপরের রাজ্যপ্রাপ্তি ভালো না মন্দ? এতে জাতির চরিত্রটাতেও মরচে ধরে না, নতুন গুণাবলি পুরানো গুণাবলিকে মুছে সাফ করে দেয়। পুরোনো অ্যারিস্টোক্রেসির সঙ্গে তুলনা করলে নতুন অ্যারিস্টোক্রেসির কোনো গুণ দেখতে পাও না কি? ভুঁইফোঁড় বলে ঠাট্টা যদি কর, তবে ভুঁইফোঁড়ের ভিতরকার সত্যকে হারাবে। দুটোকে যে একসঙ্গে বহাল করেনি এর কারণ ইংল্যাণ্ড একসঙ্গে দুটো সত্যকে সইতে পারে না। ইংল্যাণ্ডের পাকশাস্ত্রে পাঁচমিশেলি নেই। মাছ-মাংসের সঙ্গে আমরা আলু-কপি মিশিয়ে রাঁধি, একথা শুনে একজন থ হয়ে গেলেন। 'তাহলে তোমরা মাছের কিংবা মাংসের কিংবা আলুর কিংবা কপির বিশেষ স্বাদটি পাও কী করে?' এর জবাব—'তা পাইনে। কিন্তু সমস্তটার সমন্বয়ের স্বাদটি পাই।'

বিপ্লবকে ইংল্যাণ্ড ঠেকিয়ে রাখে প্রতিদিন একটু একটু করে ঘটতে দিয়ে। সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর রেভলিউশন যেমন প্রতিদিনের ব্যাপার অথচ কোনোদিন আমরা খবর পাইনে যে আমরাও সেই রেভলিউশনের ব্যাপারী, ইংল্যাণ্ডেও তেমনি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক রেভলিউশন নিত্যকারের ঘটনা বলে কোনো ইংরেজ টের পায় না কত বড়ো ঘটনায় সে লিপ্ত। টের পেলে সে ঘটতে দেবে না, সেইজন্যে বিপ্লবটাকে কিস্তিবন্দিভাবে ঘটাতে হয়। অ্যারিস্টোক্র্যাটের হাত থেকে শ্রমিকের হাতে শাসনভার আসতে দুশো বছর লেগেছে; স্ত্রীস্বাধীনতার আন্দোলন অন্তত একশো বছরের; দেড়শো বছর ধরে আক্রমণ করেও টাট্টুঘোড়ার গাড়িকে এখনও ঘায়েল করতে পারা যায়নি; চরকা এখনও কোনো কোনো ঘরে ঘরঘর করছে; এবং এমন লোক এখনও অনেক যারা immaculate conception প্রভৃতি খ্রিস্টীয় তত্ত্বে বিশ্বাস হারায়নি। তথাচ ইংল্যাণ্ড কোনোদিন চুপ করে বসে নেই, সে প্রতিদিন ঘর ঝাঁট দিচ্ছে, প্রতিদিন পুরোনো গহনাকে ভেঙে নতুন ফ্যাশনে গড়িয়ে নিচ্ছে। ইংল্যাণ্ডের মন সংস্কারকের মন। পলিটিকসের মতো সব বিষয়েই ইংল্যাণ্ডে একটা চিরস্থায়ী প্রতিপক্ষ (permanent opposition) আছে—ইংরেজ মাত্রেই কোনো-না-কোনো বিষয়ে একজন বিদ্রোহী। আবহমান কাল ইংরেজ মাত্রেই বলে আসছে—'This state of things must not continue.' আমাদের বুলির সঙ্গে এ বুলির কত-না তফাত। আরও ভাববার কথা, এ বুলি আবহমান কালের ও প্রতিজনের। 'Something must be done'—এই হল এ বুলির উপসংহার। একটা নমুনা দিই। সার্কাস ইংল্যাণ্ডে নেই বললেও হয়। তবু সার্কাসে বাঘ-হাতি প্রভৃতি বন্যজীবকে নাচানো অনেকের চোখে নিষ্ঠুর ঠেকে। এখনও ইংল্যাণ্ডের কোনো কোনো জায়গায় খরগোশ শিকার, পাখি শিকার চলে, সেটাও নিষ্ঠুর কাজ। খুনিকে প্রাণদন্ড দেওয়া তো রীতিমতো বর্বরতা। এইসব বন্ধ করবার জন্য পার্লামেন্টকে আবেদন করা চলেছে। এই ধরনের আবেদন প্রতিবছর পার্লামেন্টে পৌঁছায়। Vivisection-এর বিরুদ্ধে লোকমত গড়া বহুকাল থেকে চলে আসছে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, এইসব ছোটোখাটো সংস্কার অত্যন্ত সাধারণ মানুষের অবসর সময়ের উদ্যোগের ফল, মহাত্মা গান্ধীর মতো অসাধারণ লোকের সারা সময়ের কাজ নয়। সমাজ-রাষ্ট্রের এক-একটা চক্রাংশ যদি প্রত্যেকে ঘোরায় তবে সমস্ত চাকাটা বোঁ বোঁ করে ঘোরে, সমাজ-রাষ্ট্র দেখতে দেখতে বদলে যায়, অধ্যবসায়ীর পক্ষে জীবিতকালেই চক্রপরিবর্তন প্রত্যক্ষ

করা শক্ত হয় না। প্রত্যেক ইংরেজ মরণকালে এই ভেবে সান্ত্বনা পায় যে, আমিও কিছু-না-কিছু ঘটিয়েছি। অবশ্য খুব বেশি নয়, খুব অসাধারণ নয়, তবু কিছু! আমাদের দেশেও যদি সবাই সামান্য করেও কিছু করত —প্রতিদিন করত—তবে আমাদের অসাধারণ মানুষগুলিকে অহরহ চরকার মতো ঘুরতে হত না, চরকাও ঘোরাতে হত না এবং আমাদের সাধারণ মানুষগুলি করবার মতো কত কাজ পড়ে রয়েছে দেখে 'কোনটা করি, কোনটা করি' ভাবতে ভাবতে জীবন ভোর করে দিত না, কিংবা একসঙ্গে সব ক-টাতে হাত দিয়ে সব ক-টা মাটি করত না, কিংবা হাজার বছরের আলস্যের হাজারটা নোঙরকে এক বিপ্লবের ঝড়ে বিপর্যস্ত করবার দিবাস্বপ্ন দেখত না। Eternal vigilance-এর বদলে দুটো দিনের খুনোখুনি খুব স্পেকটাকুলার বটে, কিন্তু দুটো দিনই তার পরমায়ু।

সেদিন যে জেনারেল ইলেকশন হয়ে গেল সেটা সম্ভবত ইতিহাসের বিষয়; কিন্তু এত নিঃশব্দে ঘটল যে আমাদের কারুর বিয়েতেও ওর বেশি ধুমধাম হয়। শুনলুম লণ্ডনে না হলেও মফস্সলে বেশ ধুমধাম হয়েছিল। আমাদের নিজস্ব সংবাদদাত্রীর পত্রের কিয়দংশ অনুবাদ করে দিই—'আমি লেবারকেই ভোট দিলুম, কারণ প্রথমত আমি সোশ্যালিস্ট, দ্বিতীয়ত আমাদের এ অঞ্চলে নির্বাচনটা যাদের নিয়ে তাদের একজনের ছিল যৌবন, মগজ ও উৎসাহ, অন্যজনের জরা, জেদ ও অসামর্থ্য। তবু কিন্তু খুবই আশ্চর্য হলুম শুনে যে, H নির্বাচিত হয়েছেন; কেননা এই অঞ্চলটা সেই থেকেই কনজারভেটিভদের একচেটে হয়ে এসেছে যেদিন নোআ তাঁর আর্ক থেকে বেরিয়ে আসেন। মাত্র গোটা কয়েক ভোটের আধিক্যে H জিতে গেলেন। আমার ঘরের কাছেই একটা নির্বাচনস্থলী। শুক্রবারের রাত্রি পৌনে তিনটের সময় আমার ঘুম ভেঙে যায় যারা ফলাফল জানবার জন্যে অপেক্ষা করছিল তাদের অতি উদ্দাম আনন্দধ্বনি শুনে। যেই আমার চেতনা ফিরল চটি পায়ে দিলুম ও ড্রেসিং গাউন গায়ে দিলুম, আর দৌড়ে গিয়ে ঢুকলুম মায়ের ঘরে—সেখান থেকে রাস্তা দেখা যায়। মাকে বিরক্ত করে জানলা খুললুম, মাথা বাড়িয়ে দিলুম, একজন অচেনা পথিককে জিজ্ঞাসা করলুম, 'কে জিতল? খবরটা শুনে পরম উল্লাসে নিজের ঘরে ফিরে এলুম।'*

মোটের উপর ব্যাপারটা স্বপ্নের মতো লাগল। মাস খানেক আগে এখানে-ওখানে বক্তৃতা চলছিল, ঘরে ঘরে নির্বাচন প্রার্থীদের বিজ্ঞাপন ঝুলছিল এবং কাগজে-কলমে খুবই বাণ বর্ষণ হচ্ছিল। কার কোন পক্ষে ভোট তা একরকম জানাই ছিল, এক ফ্ল্যাপারদের ছাড়া। যে-ই মন্ত্রীদল গঠন করুক জনসাধারণের বড়ো বেশি আসে-যায় না, রাষ্ট্র যেমন চলছিল তেমনি চলে। দোকান-বাজার-থিয়েটার-সিনেমা-ডাকঘর-রেল কোথাও কোনো পরিবর্তন সুস্পষ্ট নয়। আমার ঘরের কাছে যেসব মজুর কাজ করছে তাদের একজন গান ধরেছে। কাবুলিতে গান গায় ('শ্রীকান্ত') সেও যেমন অবিশ্বাস্য, ইংরেজেতে গান গায় এও তেমনি অপূর্ব। আমরাই এবার দেশের হর্তাকর্তা, আমাদের র‍্যামজে সর্দারকে রাজা দেশের সর্দার করেছেন, এই ভেবে তার যদি গান পেয়ে থাকে তবে ধন্য বলতে হবে। নইলে এমন সুন্দর মেঘ ও রৌদ্রের খেলার দিনটাতে কি কেবল পাখিই গান গাইত, মানুষ তার পালটা গাইত না?

ইংরেজ মজুর শ্রেণির লোকেরা খুব শিষ্ট, তারা হল্লা করতে দাঙ্গা করতে শান্তিভঙ্গ করতে জানে না। তবে চিরদিন যে তারা এত সুবোধ বালক ছিল ইতিহাসে কিংবা জনশ্রুতিতে ও-কথা বলে না। ক্রমে ক্রমে ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতির দ্বারা সংঘবদ্ধ হওয়ার পর থেকে ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব স্বীকার করবার পর থেকে তারাই হয়েছে দেশের সবচেয়ে আইন-মানা সম্প্রদায়। আইনের প্রতি অনাস্থা যদি কেউ দেখায় তো সে বড়োলোক, মোটরওয়ালা কিংবা নাইটক্লাবওয়ালি। মোটের উপর ইংরেজ মাত্রেই অত্যন্ত আইন-বশ। পুলিশকে বাধা দেবার কথা তো কেউ ভাবতেই পারে না, পুলিশকে সাহায্য করবার জন্যে সবাই এগিয়ে আসে। এদিকে পুলিশের উপরে খবরের কাগজওয়ালাদের কড়া নজর থাকায় পুলিশও যারপরনাই ভদ্র হয়ে উঠেছে। আগে এতটা ছিল না, তার প্রমাণ আছে। লণ্ডনে গুণ্ডা নেই। ইংল্যাণ্ড দেশটি ছোটো ও সব ক-টি ইংরেজ রক্ত সম্বন্ধে এক হওয়ায় আইন অমান্য করতেও মানুষের সহজে প্রবৃত্তি হয় না, হলেও তেমন মানুষের সঙ্গী জোটে না, ধরা পড়াও তার পক্ষে সোজা। আমার যতদূর অভিজ্ঞতা ইংল্যাণ্ডে ক্রাইম কমে আসছে। দ্বি-বিবাহ ও ভিক্ষুকতা—এ দুটোকে আমাদের দেশে ক্রাইম বলে না, এ দুটোর বিচার করতে এদের আদালতের অনেক সময় যায়। দ্বি-বিবাহ বেশ বাড়ছে বলেই মনে হয়। এ সম্বন্ধে লোকমত হু-হু করে বদলাচ্ছে বলতে হবে। কেননা দ্বি-বিবাহকারীকে বিচারক নামমাত্র সাজা দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছেন এই শর্তে যে, প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ থাকবে না ও প্রথম স্ত্রী পুনরায় বিবাহ করতে পারবে। যে-দেশে স্ত্রীসংখ্যা পুরুষসংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি সেদেশে এই ব্যবস্থাই সবচেয়ে ভালো। দুয়ো-সুয়ো দুটিকে নিয়ে একসঙ্গে ঘর করাটা নিতান্ত প্রাচ্য প্রথা, তাতে পাশ্চাত্যদের সংস্কারে বাধে।

ইংরেজদের সমাজে আইন যা আমাদের সমাজে আচার তা-ই। অথচ আইন সম্বন্ধে ইংরেজরা প্রতিদিনই বলাবলি করছে যে, 'অমুক আইনটা এত অযৌক্তিক যে সবাই ওই আইন ভাঙছে, আর পুলিশ নিজেও যখন বোঝে ওটা অযৌক্তিক তখন অপরাধটা দেখেও দেখছে না। এমনি করে একটা আইন ভাঙতে ভাঙতে সব আইন ভাঙতে মানুষ প্রশ্রয় পাচ্ছে। অতএব অমুক আইনটা বদলানো দরকার, তুলে দেওয়া দরকার।' আচার সম্বন্ধে আমরাও যদি প্রতিদিন এমনই বলাবলি করতুম তবে আচার মাত্রের প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একান্ত ঔদাস্য এবং অশিক্ষিত সাধারণের একান্ত আসক্তি দেখা যেত না। ইংরেজ সমাজের মাথা হচ্ছে ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্ট।* নিকটে যে আমাদের দেশে পার্লামেন্ট-জাতীয় কিছু গড়ে উঠবে ও আমাদের অন্নপ্রাশন থেকে শ্রাদ্ধ পর্যন্ত শাসন করবে এমন আশা করা শক্ত। হিন্দুসভা যদি রাজনৈতিক না হয়ে সামাজিক হয়ে থাকত তবে হয়তো রবীন্দ্রনাথের স্বদেশি সমাজের পরিকল্পনা তারই মধ্যে মূর্তি পেত। আগে যেমন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি প্রত্যেক জাতের নিজস্ব আচার নিয়ামক সভা ছিল এখন সমগ্র হিন্দুসমাজের তেমনি কোনো সভা কেন হয় না, যে-সভায় প্রত্যেক জাতের প্রতিনিধি বসে সকল জাতের সাধারণ আচার নির্দেশ করবেন? এই সভার অধীনে সামাজিক আদালত থাকে না কেন, যে-আদালতে অনাচারের প্রতিকার হয়? গ্রাম্য স্থবিরদের অত্যাচার থেকে সমাজকে উদ্ধার করে ন্যায়সঙ্গত আচারের প্রতি মানুষকে সশ্রদ্ধ করতে হলে এ ছাড়া অন্য উপায় কী?

ভারতীয় চরিত্রের মূল কথা যেমন সমন্বয়, ইংরেজ চরিত্রের মূল কথা বিনিময়।ইংরেজ কঞ্জুস নয় কিন্তু হিসাবি, একটা পেনিরও হিসাব রাখে; নিজের স্ত্রীর কাছ থেকে নিলে নিজের স্ত্রীকে ফেরত দেয়। আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ হওয়া ইংরেজের পক্ষে অসম্ভব, তার খাদ্য আনতে হয় বিদেশ থেকে, বিদেশকে দিয়ে আসতে হয় পরিধেয় বা অন্য কিছু। এমনি করে তার বিনিময়বোধ পাকা হয়েছে, বণিকসুলভ বৃত্তিগুলি পোক্ত হয়েছে। ফরাসি দোকানদার ও ইংরেজ দোকানদার দুইয়ের তুলনা করলে দেখা যায় ইংরেজ দোকানদার কঞ্জুস নয়, ঠকায়ও না, ভদ্রও; কিন্তু দোকানদারের বেশি নয়, মানুষ নয়। ফরাসি দোকানদার দোষে-গুণে উলটো। ইংরেজকে নেপোলিয়ন দোকানদার বলে সেই যে প্রশংসাপত্রটা দিয়েছিলেন সেটার মর্ম এমন নয় যে ইংরেজ ঠকায়, সেটার মর্ম ইংরেজ বিনিময়শীল। গ্রাহককে খুশি করতে ইংরেজ দোকানদার প্রাণপণ করে, কিন্তু দেনা-পাওনা ভোলে না, আত্মীয়তা করে না। আত্মীয়তার জন্যে ক্লাব আছে, খেলা ক্ষেত্র আছে। দোকানে শুধু প্রয়োজন বিনিময়। আমার ঘরের অনতিদূরে স্বামী-স্ত্রীর দুটো আলাদা দোকান, দুই আলাদা তহবিল, একজনের কাছে আরেক জন সওদা করলে তক্ষুনি বিল লিখে দেয়। এদের দেশে একান্নবর্তী পরিবার কেন গড়ে উঠল না? পরিবারও কেন ভেঙে গেল? যে-কারণে বার্টার থেকে আধুনিক এক্সচেঞ্জ অভিব্যক্ত হয়েছে, সেই কারণে স্বামী-স্ত্রীর দুই উপার্জন দুই তহবিল হয়েছে। সন্তানের জন্যে দু-পক্ষ চাঁদা দেবে, কথা চলছে। তারপর সন্তানরা ঘরকন্নার কাজে সাহায্য করলে মা-বাবার কাছ থেকে মাইনে পাবে এমন কথাও শোনা যায়। এককথায়, যার যতটুকু যোগ্যতা সেটা টাকা দিয়ে পরিমাপ করতে হবে এবং দু-পক্ষের যোগ্যতার ভগ্নাংশ টাকার মধ্যস্থতায় বিনিময় করতে হবে; আমরা ওটা হৃদয়ের মধ্যস্থতায় করে থাকি বলে আমরা এখনও বার্টারের যুগে আছি, আমরা 'সভ্য' হয়ে উঠিনি; সভ্যতার লক্ষণ ভগ্নাংশ-ভাগ চুলচেরা বিচার। অতি সূক্ষ্ম ন্যায়। এদেশের ভিক্ষুক যে দেশলাই বেচবার ভান করে পয়সা চায় এও বিনিময়শীলতার বিকার। কিছু না দিয়ে শুধু নিলে পুলিশে ধরে নিয়ে যায়; ওটা একটা ক্রাইম। আইনের চোখে ভিখারি হচ্ছে আসামি!

জগতের অন্তত একটা জাতির এই গুণটি চরিত্রগত হওয়ায় জগতের অনেক ক্ষতি সত্ত্বেও কত লাভ হয়েছে ভাবীকাল তা খতিয়ে দেখবেই। ইংরেজ যতগুলো দেশকে শোষণ ও শাসন করেছে ততগুলো দেশকে এক সূত্রেও বেঁধেছে, ঐক্য দিয়েছে। মৌমাছি যেমন ফুলদের মধু নেয় তেমনি মিলন ঘটায়। মধুটা ঘটকালির মজুরি। তা ছাড়া, মৌমাছিরও তো অন্নদায় আছে। ফুলেরা চাঁদা করে তাকে না খেতে দিলে সে বাঁচে কী করে?

নানা কারণে ইংরেজ এখনও বহুকাল বাঁচবে। প্রথমত, মৌমাছির কাজ এখনও শেষ হয়নি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য একপ্রকার লিগ অব নেশনসই বটে। নতুন লিগ অব নেশনস যতদিন-না শৈশব অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক ঘটকালির দায়িত্ব নেয় ততদিন সে-দায়িত্ব ব্রিটিশ, ফ্রেঞ্চ ও ডাচ লিগ অব নেশনসগুলোরই থাকবে। দ্বিতীয়ত, ইংরেজি ভাষা ক্রমশ সার্বভৌম ভাষা হয়ে ওঠায় পৃথিবীর সবাইকেই ইংল্যাণ্ডে এসে ও-ভাষায় নিপুণতা লাভ করে যেতে হবে কিংবা ইংল্যাণ্ড থেকে লোক নিয়ে নিজের দেশে ও-ভাষায় নিপুণতা লাভ করতে হবে। কিছুকাল আগে যখন ফরাসি ছিল বিশ্বভাষা তখন বিশ্ব ছিল ইউরোপ খণ্ডের অন্তর্গত। এখন বিশ্বের সীমানা বেড়েছে, এখন কাফ্রির সঙ্গে কাশ্মীরিকে কথা কইতে হবে ইংরেজিতে। Talkies-এর দৌরাত্ম্যে ইংরেজি ভাষার ছিরি যেমনই হোক, প্রচার বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বের ভাষা শিক্ষা-রাজধানী প্যারিস থেকে উঠে এসে লণ্ডনে ও লণ্ডনের চতুষ্পার্শ্বে প্রতিষ্ঠিত হল বলে। এদিকে কিন্তু বিশ্বের বাণিজ্য-রাজধানী নিউ ইয়র্কে পাড়ি দিল ও যন্ত্রশিল্প-রাজধানী বার্লিন। বার্লিন এখন পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম নগর। তার লোকসংখ্যা বিয়াল্লিশ লাখ। একা বার্লিন শহরেই একশো তেরোটা মাটির উপরের রেলস্টেশন ও একাত্তরটা মাটির নীচের রেলস্টেশন আছে।* এরোপ্লেনের রাস্তা আছে আঠারোটা (গ্রীষ্মকালে), ও সাতটা (শীতকালে)। এখন থেকে প্যারিস হবে কেবলমাত্র আমোদপ্রমোদ রাজধানী এবং জেনেভা রাজনীতি-রাজধানী।

বৃহৎ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পৃথিবীর সর্বত্র ছড়ানো। এক দেশের অভিজ্ঞতা আরেক দেশে পৌঁছে দেওয়া ব্রিটিশ শাসক সম্প্রদায়ের কাজ। সেই সূত্রে অস্ট্রেলিয়ার অভিজ্ঞতা ভারতবর্ষের কাজে লাগে, ভারতবর্ষের অভিজ্ঞতা ইজিপ্টের। ইংরেজ জাতিকে বিধাতা ঘরছাড়া করে সৃষ্টি করেছেন, এরা চরে বেড়ায়, খুঁটিতে বাঁধা থেকে জাবর কাটতে জানে না। এই কারণে ইংরেজের সেইসব কোমল বৃত্তিগুলি নেই যা আমাদের আছে, (অনেকটা) ফরাসিদের আছে। কোলের ছেলেকে ভারতবর্ষ থেকে কিংবা হংকং থেকে বিলেতে পাঠিয়ে দেয়। বয়স্ক ছেলের বিয়ের পরে এক শহরে থেকেও কদাচ দেখতে আসে এমন মা-বাবা একমাত্র ইংল্যাণ্ডেই সম্ভব। আমাদের যেমন মামা-মামি মাসি-মেসো কাকা-কাকি ও পিসে-পিসিতে ঘরসংসার জমজমাট, এদের তেমন নয়; গার্হস্থ্য বৃত্তিগুলি এদের ভোঁতা। হৃদয়কে চরিতার্থতা দিলে কাজ নষ্ট হয় যে! বিউটির চেয়ে ডিউটিকে ইংরেজ বড়ো বলে মানে।

অথচ আশ্চর্যের বিষয় প্রেমের কবিতা ইংরেজি ভাষায় যত ও যতরকম এবং যত গভীর অন্য কোনো ভাষায় তত নয়। এক চণ্ডীদাস ছাড়া কোনো বাঙালি কবি কোনো দিন সর্বস্ব পণ করে ভালোও বাসেননি, ভালোবাসার কবিতাও লেখেননি। গদ্যকবিদের মধ্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ইংরেজিতে প্রেমিক কবির সংখ্যা হয় না। দ্বিতীয়ত, love কথাটার সংজ্ঞা কী তা কোনো ইংরেজ জানে না, তবু বিবাহ করবার আগে love করতে হবে একথা অন্য কোনো সমাজ এতটা জোরের সঙ্গে বলেছে বলে আমার মনে হয় না। আমাদের সমাজে ওটা স্পষ্ট ভাষায় নিষিদ্ধ, আমাদের বিবাহ ব্রহ্মচর্যেরপরে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করবার তোরণ। ধর্মের পরে কাম, তার আগে নয়। ফরাসিরা যদিও প্রেমের নামে গদগদ হয়ে ওঠে ও আমাদের বৈষ্ণব ঠাকুরদের মতো সহস্রবিধ প্রেমের লক্ষণ আওড়ায়, তবু ও-প্রেম মস্তিষ্কজাত (cerebrale) ও বচনবহুল। ওরা মাথা দিয়ে অনুভব করে ও কথা দিয়ে তন্নতন্ন করে; কিন্তু বাণবিদ্ধ কুরঙ্গের বোবা আকুতি ইংরেজরাই বোঝে। Love making ও love এক জিনিস নয়। প্রথমটার চর্চা প্যারিসের একচেটে হতে পারে, কেননা প্যারিসের লোকের হাতে কাজ নেই; দ্বিতীয়টা ইংরেজের মতো অত্যন্ত প্র্যাকটিক্যাল প্রকৃতি কাজের মানুষদের জীবনে অপ্রত্যাশিতরূপে এসে বহু বৎসরের কাজ একদিনে নষ্ট করে দিয়ে যায়।

১৯

ইউরোপের শরৎকাল। পাতাঝরা শুরু হয়ে গেছে। এই তো সেদিন বসন্ত এল সবুজ পাতার পোশাক পরে, যেন কোনো ফ্যান্সি ড্রেসপরা নাচের অতিথি। এরই মধ্যে রঙ্গ শেষ হয়ে এল, বাতি নিবু নিবু, সভা ভাঙে ভাঙে এর পরে পোশাক খুলে ফেলে বিছানায় গা মেলে দিতে হবে। এও এক উদ্যোগপর্ব।

আমাদের দেশে শীতের জন্যে প্রস্তুত হবার কাল হেমন্ত। শরৎ আমাদের দেশে শীতের অগ্রদূত নয়, আমাদের শরৎ স্বাধীন। আমরা শরতের মুখ চেয়ে দিন গুনি; শরৎ আসছে শুনে তার আগমনি গাই; শরৎ চলে গেলে কাঁদি ও কাঁপি। কিন্তু এদের শরৎ যৌবনের শেষের দিকে প্রথম পাকা চুলটির মতো অনাহূত আগন্তুক; আনন্দের নয়, আতঙ্কের পাত্র। এর পিঠ পিঠ শীত আসবেন। তিনি যেমন-তেমন অতিথি নন, স্বয়ং দুর্বাসা। তাঁর অভিশাপে গুটি কয়েক evergreen জাতীয় তরু ছাড়া সকল তরু তরুণীর পত্রসজ্জা নিঃশেষে খসে পড়বে; তারা লজ্জায় কাঠ হয়ে রইবে।

ইংল্যাণ্ড থেকে থুরিঙ্গিয়ায় এসেছি; গ্যেটে শিলার বাখ-এর থুরিঙ্গিয়া, বনরাজিনীলা। অঞ্চলটি বিরলবসতি নয়, গ্রামে গ্রামে কারখানার চিমনি কর্মব্যস্ততার প্রমাণ দিচ্ছে। তবু অঞ্চলটির হাতে অফুরন্ত ছুটি। এতে যেন আকাশের অংশ আছে, আকাশের ব্যাপ্তি। প্রাচীন তপোবন সম্বন্ধে আমার যে-ধারণা আছে তার সঙ্গে থুরিঙ্গিয়ার এই মাটির আকাশটিকে বেশ মানায়। বনের দ্বারা আকাশ ঢাকা পড়বে না, যদি পড়ে তো তপোবনে ও রাজনগরীতে প্রভেদ কোথায়? মানবাত্মার সহজ মুক্তিটিকে রাত্রিদিন উপলব্ধি করবার জন্যেই তপোবন। তপোবনের অত্যাবশ্যক অঙ্গ দশ দিকব্যাপী স্পেস।

থুরিঙ্গিয়ার হাওয়া সমুদ্রবক্ষের হাওয়ার মতো মুক্ত এবং মুক্তির স্বাদে স্বাদু। ইচ্ছা করে সমস্তটা এক নিশ্বাসে শোষণ করি। শহরে থেকে বাতাস আমরা আধপেটা খাই, আমাদের নাসার ক্ষুধা মেটে না। লণ্ডনের মতো শহরে নাক বুজেই থাকতে হয়, অভ্যাসের দোষে পার্কের বাতাসও গ্রহণ করতে প্রবৃত্তি হয় না। স্বয়ং পঞ্চম জর্জেরও সাধ্য নাই যে লণ্ডনের জল হাওয়া বৃষ্টি কুয়াশার অতীত হন। অথচ থুরিঙ্গিয়ার চাষিরাও তাঁর তুলনায় ভাগ্যবান।

গ্যেটের যুগে থুরিঙ্গিয়া আরও বন্য আরও বিজন ছিল সন্দেহ নেই। তাঁর কর্মস্থল ভাইমার এত ছোটো যে প্রায় পল্লিবিশেষ, তখনকার দিনে নিশ্চয়ই ছিল অরণ্যপল্লি। একটি ক্ষীণকায়া স্রোতস্বিনীও আছে তাতে। গ্যেটের দরবারি মনকে অরণ্য সর্বদাই ডাক দিত, তাঁর বাগানবাড়িটি অরণ্যেরই অন্তর্গত একটি কুটির। দরবার থেকে ছুটি নিয়ে সেইখানে তিনি প্রস্থান করতেন। সংসারের প্রাত্যহিক তুচ্ছতার অসংখ্য বন্ধন স্বীকার করেও যে তিনি মুক্তপুরুষ ছিলেন, অন্তত মুমুক্ষু পুরুষ ছিলেন, তার কারণ তিনি কেবল নাগরিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন আরণ্যকও। গ্যেটের মধ্যে আমরা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের যে-সমন্বয়, অন্তত যে-সমন্বয়প্রয়াস দেখি, সে এমনি করেই সম্ভব হয়েছিল। তিনি অ্যারিস্টোক্র্যাট তো ছিলেনই অধিকন্তু প্রকৃতির খুব কাছে কাছে ছিলেন, অন্তত থাকবার জন্যে প্রাণপণ করেছিলেন।* আমি এত বার 'অন্তত' কথাটা ব্যবহার করলুম, তার কারণ সকলের মতো আমার ধারণা গ্যেটের ভিতরটায় দু-বেলা কুরুক্ষেত্র চলত—সত্য অসত্যে অষ্টপ্রহর সংগ্রাম। তবু আমার বিশ্বাস তাঁর মধ্যে একটি সহজ সর্বজ্ঞতাও ছিল। তিনি ছিলেন অন্তরে-ঘটতে-থাকা দ্বন্দ্বের অতীত (above the battle)। মহামানবের মতো মহামানবের এই কবিও ছিলেন স্রষ্টাও না বিদ্রোহীও না, নিছক দ্রষ্টা—বিশ্বরূপদ্রষ্টা। গ্যেটের যতগুলি প্রতিকৃতি আমি দেখেছি সেগুলিতে তাঁর চক্ষু আমাকে আকৃষ্ট করেছে তাঁর সকল কিছুর চেয়ে। তাঁর দৃঢ়নিবদ্ধ ওষ্ঠযুগল তাঁর চক্ষুরই বাহন; তাঁর চক্ষুরই সংকল্প তাঁর ওষ্ঠে ব্যক্ত হয়েছে।

'স্রষ্টাও না বিদ্রোহীও না'—অর্থাৎ তাঁর সত্যকারের যে তিনি, তিনি স্রষ্টাও না বিদ্রোহীও না। তা বলে তাঁর মধ্যে স্রষ্টা ছিল না বিদ্রোহী ছিল না এমন কদাচ নয়। বিশুদ্ধ বিদ্রোহের সুর তো তাঁর সৃষ্টির মর্ম ভেদ করে উঠছে 'I am the spirit that denies!' এ বিদ্রোহ অন্নবস্ত্রের জন্যে নয় সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে নয়, এমনকী মুক্তির জন্যেও নয়। বিদ্রোহের জন্যে বিদ্রোহ। উদ্দেশ্য তার সে নিজেই। যেমন, নটরাজের নৃত্য। সাধারণত

বিদ্রোহ বলতে আমরা বুঝি সশস্ত্র ভিক্ষুকতা। ভিক্ষা পেলেই বিদ্রোহের ক্ষান্তি। কিন্তু Mephistopheles বলে —

> I am the spirit
> That evermore deny—and in denying
> Everymore am I right—'No!' say I, 'No!'
> To all projected or produced—whate'er
> Comes into being merits nothing but
> Perdition—better then that nothing were
> Brought into being—what you men call sin—
> Destruction—in short, evil—is my province,
> My proper element.

মানুষের মধ্যে এক জন দায়িত্ববান বিধাতা আছেন। আর আছে একজন দায়িত্বহীন অবাধ্য। এই দুজনকে নিয়েই এবং দুজনের অতীত হয়েই মানুষ। এই মানুষের মহানাটক লিখেছেন এমনি মানুষ গ্যেটে।

বিশুদ্ধ দৃষ্টির তপস্যা ভারতবর্ষের পরে এক জার্মানিই করে এসেছে, তাই জার্মানির উপর ভারতবাসীর এত পক্ষপাত। ভারতবর্ষের বাইরে মাত্র একটি ভারতবর্ষ আছে, যেখানে মানুষ ইংরেজের মতো নাগরিক মুক্তিকে কাম্য করেনি, একমনে কামনা করেছে আত্মার মুক্তি। তাই ইংরেজ ফরাসিরা যখন বড়ো বড়ো সাম্রাজ্যের মালিক হল, জার্মানরা তখনও দার্শনিক তর্কে মশগুল এবং সংগীতের সম্মোহনে আবিষ্ট। হোহেনজোলার্নরা জোর করে এদের ধ্যান ভাঙিয়ে দেয়, বিসমার্ক এদের অত্যন্ত কেজো করে তোলেন। আধ্যাত্মিক একাগ্রতাকে বৈষয়িক স্বার্থসিদ্ধির জন্যে প্রয়োগ করে এরা অচিরাৎ এক বিভীষিকা হয়ে উঠল, যেন নৈমিষ্যারণ্যের যোগীরা হঠাৎ ধনুর্বিদ্যা আয়ত্ত করে মৃগয়ায় বাহির হল। গত যুদ্ধে জার্মানির পরাজয় তার মনে লাগেনি, কেননা আসলে ওটা হোহেনজোলার্নদেরই পরাজয়। জার্মানরা স্বভাবত যোদ্ধা নয়, বোদ্ধা। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর বিচিত্র দাবি প্রত্যেক জাতিকেই কতকটা স্বভাবভ্রষ্ট হতে বাধ্য করছে—জার্মানিকেও। তাই জার্মানির অতিকৃষ্ট মন যন্ত্রশিল্পের দিকে ধাবিত হয়েছে। যন্ত্রশিল্পে জার্মানির উন্নতি যেমন অদ্ভুত তেমনি কিম্ভূত। ব্রাহ্মণ পন্ডিতের ছেলে গোয়েন্দা পুলিশ হলে যেমন দুর্ধর্ষ হয়ে ওঠে এও তেমনি। এর দয়ামায়া নেই, রুচি-নীতি নেই। বার্লিন শহরটার মতো রাক্ষুসে শহর আমি দেখিনি। মানুষের একটা হাত যদি বাঘের একটা থাবা হয়ে ওঠে তবে ওটাকে ক্রমবিকাশ বলা চলে না। বার্লিনের প্রাণ আছে হৃদয় নেই, রুচি নেই, মাত্রাজ্ঞান নেই।

বার্লিনের পেছনে দীর্ঘকালের ইতিহাস না থাকায় শহরটা কলকাতার মতো অনভিজাত। লণ্ডন-প্যারিস-রোম-ভিয়েনা এমনকী মিউনিখ-ফ্রাঙ্কফুর্ট-ড্রেসডেন-কোলোনের সঙ্গে ওর নাম করতে প্রবৃত্তি হয় না। দ্বিতীয়ত, ওর সঙ্গে মানুষের মহত্বের স্মৃতি জড়িয়ে নেই, জড়িয়ে রয়েছে মানুষের দস্যুতার স্মৃতি। হোহেনজোলার্নরা বুক ফুলিয়ে ডাকাতি করছেন ও তাঁদের শহরটাকে তাঁদের সৈন্যদলের মতো পিটিয়ে মজবুত করছেন। লণ্ডনের নগরবৃদ্ধেরা রাজাদের কাছ থেকে ক্রমাগত নতুন অধিকার আদায় করছেন, ইংল্যাণ্ডের অন্য সর্বত্র যখন যথেচ্ছাচার চলিত ছিল একমাত্র লণ্ডন তখন নিজের নিয়মে নিজে চালিত। প্যারিসও স্বায়ত্তশাসনের দাবি কোনোদিন ছাড়েনি, যদিও সে-দাবি পূর্ণ হয়েছে কদাচিৎ। জার্মানির 'স্বাধীন নগরগুলো' লণ্ডন-প্যারিসের মতো বৃহৎ না হলেও মহৎ। কিন্তু বার্লিন ছিল হোহেনজোলার্নদের খাস সম্পত্তি, সবে সেদিন স্বাধীন হয়েই তার একমাত্র অভিলাষ দাঁড়িয়েছে আমেরিকান হয়ে ওঠা।

প্রাশিয়ানদের দেহের মতো মনও বোধ হয় অত্যন্ত ভারী। বার্লিন যেন একখানা রান্নাঘরের শিল, মাটির উপরে এমন চেপে বসেছে যে ভূমিকম্প হয়ে গেলেও নড়বে না। খুব পরিচ্ছন্ন, সুসজ্জিতও বটে, কিন্তু জলদগম্ভীর। বার্লিন থেকে লাইপজিগে এলে মনটা প্রজাপতির মতো লঘুভার হয়ে উড়তে চায়। সংগীতের

রাজধানী—সুপ্রাচীন, সুপরিকল্পিত, নাতিবৃহৎ। আধুনিকতার দাবি লাইপজিগও মেনেছে, কিন্তু ইহকালের জন্যেও পূর্বকাল খোয়ায়নি। লাইপজিগ ছাপাখানার রাজধানীও বটে, কিন্তু ছাপাখানার নিনাদ সংগীতকে ও ছাপাখানার কালি নগরসৌষ্ঠবকে ছাপাতে পারেনি।

ড্রেসডেনকে সুন্দর না বলে সুশ্রী বলা ভালো। আমাদের লখনউ-এর সগোত্র। ওর বাস্তুকলায় তেজ নেই, অলংকার আছে। গির্জে এমন হওয়া উচিত যাতে প্রবেশ করামাত্র মন ভক্তিতে ভরে উঠে, অহংকার চোখের জলে গলে যায়, মেরির মাতৃমূর্তি ও যিশুর ক্রুশবিদ্ধ মূর্তি জীবনকে বিষাদমধুর করে। ড্রেসডেনের ফ্রাউয়েন কিরখে তেমন গির্জে নয়। মূর্তি আছে বটে, কিন্তু তাতে মূর্ত হয়েছে শিল্পীর কিংবা শিল্পী যাদের ভৃত্য তাদের বাবুয়ানা। গির্জেতে মানুষের হাঁটু পাতবার কথা, কিন্তু থিয়েটারের মতো আয়েশ করে বসবার আয়োজন করা হয়েছে উপরে-নীচে। ড্রেসডেন কতকটা ভিয়েনার মতো। লাবণ্যকে এরা করে তুলেছে লালিত্য। পথে-ঘাটে ভাস্কর্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, কিন্তু এমনই তার আড়ম্বরপ্রিয়তা যে, কোনো কোনো স্থলে পাথরের উপর সোনার গিলটি করা। ভঙ্গিতেও সরলতার বদলে সর্পিলতা। কিন্তু সর্বত্র একটি লঘুতা সুপরিলক্ষ। প্রাশিয়ার বিপরীত। পাথরের মূর্তি যেন মোমের মূর্তির মতো।

বার্লিন আমাকে হতাশ করেছিল, ড্রেসডেনও করল; ভ্রমণের খাতিরে ভ্রমণ করাতে মোহভঙ্গ নেই, কিন্তু মরীচিকার সন্ধানে ভ্রমণ করা বিড়ম্বনা! কল্পনার আকাশে যা ফোটে মাটির কুসুমে তার আদল কোথায়? মানুষের কল্পনগরী কল্পনাতেই থাকে। তবু কোনো কোনো স্থান আমাকে কল্পনাতীত আনন্দ দিয়েছে। যেমন—প্যারিস, থুরিঙ্গিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া। কল্পনাকে যথাসম্ভব ফাঁকা রেখে বেড়ানো ভালো। তাহলে স্বপ্ন ছুটবে না, স্বপ্ন জুটবে।

কেন ড্রেসডেনকে সুন্দর বলে কল্পনা করেছিলুম? সেখানকার চিত্রশালায় রক্ষিত Sistine Madonna-র প্রতিলিপি দেখে। ফুল সুন্দর হলে ফুলদানিও সুন্দর হবে এমন প্রত্যাশা স্বাভাবিক; নইলে যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যের যোজনা হয় না—বাস্তবে যা-ই হোক আদর্শে অসংগতি আসে। ভেবেছিলুম ওই একখানি ছবি যে-সৌন্দর্য বিকীরণ করছে তাই দিয়ে ড্রেসডেন সুন্দর হয়ে গেছে। তা হয়নি। তবু সুখদৃশ্য হয়েছে, সেই অনেক।

Sistine Madonna-কে প্রত্যক্ষ করে ধন্য হয়েছি। বুঝেছি, মানুষ বংশানুক্রমে মরবে, কিন্তু এমন আনন্দকে মরতে দেবে না। রাজা গেছেন রিপাবলিক এসেছে, সেও যাবে, কমিউন আসবে। কিন্তু যৌতুকরূপে যে নিধি একদিন ইটালি থেকে ড্রেসডেনে এসেছিল, পৃথিবীসুদ্ধ মানুষ তাকে বাঁচিয়ে রাখবেই। রাফেল মানুষের দেশে সাঁইত্রিশ বছর মাত্র ছিলেন। তাঁর চেয়ে দীর্ঘজীবী লক্ষ লক্ষ ছিল ও আছে, কিন্তু সকলে যাকে মরলেও মরতে দেয় না সেই ভাগ্যবান অমর।

তুলি ও রং দিয়ে পটের উপর রক্ত-মাংসের মানুষ সৃষ্টি করতে বিধাতাও পারতেন না। গতিহিল্লোলময়ী ম্যাডোনার বসনের খস খস শুনতে পেলুম। শিশু যিশুর সর্বাঙ্গের চপলতা চাউনিতে একীকৃত হয়েছে। তরুণী মা তাঁর দুরন্ত শিশুকে কোল থেকে নামতে দিচ্ছেন না, তাঁর চাউনিতে ভয়। দেবতা এখানে প্রিয় হয়েছেন, মানুষ হয়েছেন।

ড্রেসডেন থেকে এলবে নদী ধরে প্রাগ যাবার পথটি অতুলনীয়। নদীর বাঁধ যেন উঁচু হতে হতে পাহাড় হয়ে গেছে, তাও দেওয়ালের মতো খাড়া। চেকোস্লোভাকিয়া ওরফে বোহেমিয়া পর্বত-বন্ধুর, যদিও প্রাগ অঞ্চলটি সমতল। প্রাগ নিজে বন্ধুর ও পাষাণ-পিহিত। প্রাগের বিশেষত্ব, প্রাগ প্রাচীন অথচ অত্যন্ত নবীন। কলকারখানাতে ও সুপরিপাটি বস্তিতে এর প্রাচীন অংশটি ঢাকা পড়ে গেছে। রাজপথের ভিড় ঠেলে (প্রাগের লোকসংখ্যা বহুগুণ বেড়ে গেছে স্বাধীনতার পর থেকে) পুরাতন শহরের খানিকটা দেখা যায়, কিন্তু প্রাগ যেমন কালের সঙ্গে তাল রেখে ছুটেছে মনে হয় অচিরেই আমেরিকান কলেবর ধারণ করবে।

চেকরা দীর্ঘকাল নাবালক থাকার পর এই সেদিন আত্মপ্রকাশের অবকাশ পেয়েছে, উৎসাহ তাদের তরুণ বয়সের অরুণ আভার মতো দিগদিগন্ত উৎসর্পী। অন্যান্য দেশের কোনোটাতে জেতার মোহভঙ্গ, কোনোটাতে

পরাজিতের গ্লানি, কিন্তু চেকোস্লোভাকিয়ায় ঊর্ধ্বপ্লাবী নির্ঝরের মতো আকাশের সঙ্গে কুস্তি করবার আগ্রহ। (চেকদের এরোপ্লেন সংখ্যা অনুপাত-অতিরিক্ত)। বোহেমিয়া দেশটি পুরাতন হলেও চেকরা নতুন জাতি, তাদের অতীত বড়ো নয় বলে তাদের ভবিষ্যতের উপর মন। এই কয়েক বছরে তারা বৈষয়িক উন্নতি তো করেছেই, শিক্ষাদীক্ষায় ইউরোপকে নতুন আদর্শ দিয়েছে, নতুন সম্ভাবনা দেখিয়েছে এবং সংগীতে তাদের এত একাগ্রতা দেখে মনে হয় নিকট ভবিষ্যতে তাদের ভিতর থেকেই ইউরোপের গুণীদের আবির্ভাব হবে।

চেকদের রক্ত নতুন, সেটা তাদের প্রথম সুবিধা। চেকদের মনের জমিতে অস্ট্রিয়ান-জার্মানরা ভাবের পলিমাটি বিছিয়ে দিয়ে গেছে, সেটা তাদের পরম সুবিধা। আমরা ইংরেজদের কাছ থেকে দ্বিতীয়টা পেয়েছি, অথচ নিজেদের কাছ থেকে প্রথমটা পাইনি বলেই ভাবনা। এর প্রতিকার বর্ণ-সাংকর্যের দ্বারা রক্তকে নতুন করা। সভ্যতার প্রাচীনতা ভালো জিনিস, কিন্তু রক্তের প্রাচীনতা মারাত্মক। রক্তকৌলীন্যের মোহে যে জাত মজেছে, তার সভ্যতাও মিউজিয়ামের মমি হয়ে গেছে। ভারতের স্বাধীনতার চেয়ে ভারতের নবীনতা আরও জরুরি। আমাদের অতীতের চেয়ে আমাদের ভবিষ্যৎকে যেদিন দীর্ঘতর বোধ হবে সেইদিন আমাদের নিশান্ত হবে, আমরা প্রভাতের চাঞ্চল্য সর্বাঙ্গে অনুভব করব। স্বাধীনতার বিপুল দায়িত্ব বইবার প্রসন্ন ধৈর্য সেই চাঞ্চল্যের আনুষঙ্গিক।

নুর্নবার্গ সুন্দর। কিন্তু নুর্নবার্গ একটি নয়, নুর্নবার্গ দুটি। পুরাতন নুর্নবার্গের সীমানার বাইরে নতুন নুর্নবার্গ তার অসংখ্য কারখানায় স্টিম ইঞ্জিন, মোটর গাড়ি, খেলার পুতুল তৈরি করছে। পুরাতন নুর্নবার্গ তার স্বকীয়তা রক্ষা করে পৃথিবীর চারুশিল্পমোদীদের তীর্থস্থলী হয়েছে। প্রাচীন রীতির বাস্তুগুলি তেমনি আছে। ভ্রম হয় এ কোন শতাব্দীতে এসে পড়লুম! দুর্গপ্রাচীর, তোরণ, গম্বুজ, পরিখা বিংশ শতাব্দীর বাস্তবের মাঝখানে মধ্যযুগের স্বপ্নকে ধরে রেখেছে, মধ্যরাত্রির স্বপ্নের জের মধ্য দিবায় চলেছে।

নুর্নবার্গ যেদিক দিয়ে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে সেটা চারুশিল্পের নয়, যন্ত্রশিল্পের দিক। জার্মানিতে দেখা গেল যন্ত্রের সঙ্গে মানুষের কেবল যে প্রয়োজনসিদ্ধির সম্বন্ধ আছে সেকথা সত্য নয়, যন্ত্রের প্রতি মানুষের গভীর মমতা আছে। জার্মানিতে যন্ত্রকে মানুষ ততখানি ভালোবেসে সেবা করে ইংল্যাণ্ডে ঘোড়াকে যতখানি, কিংবা ভারতবর্ষে গোরুকে যতখানি। বার্লিনের লোক যেন যন্ত্রের আত্মাকে দেখতে পেয়েছে, যন্ত্র যেন তাদের কাছে যন্ত্র নয়, আত্মীয়। আধুনিক যুগে যন্ত্র যেসব সমস্যার সূত্রপাত করেছে তাতে যন্ত্রের প্রতি রাগ হবারই কথা। কিন্তু ও যে মানুষের আত্মজ। পুত্র কি পিতা-মাতাকে কম জ্বালাতন করে?

হল্যাণ্ড আমাকে অবাক করেছে। দেশটি আমাদের যে কোনো একটা বড়ো জেলার চেয়ে বড়ো নয়। তবু তার সাম্রাজ্য আছে তার থেকে বহু সহস্র ক্রোশ দূরে। তার চেয়েও যা বড়ো কৃতিত্ব—হল্যাণ্ড সমুদ্রকে পিছু হটাতে লেগেছে। সমুদ্র হল্যাণ্ডের বেগার খেটে দিয়ে আসছে কবে থেকে। তার খালে জল ভরে দেয়, খেতে জলসেচ করে, তার অসংখ্য জাহাজকে পান্ডার মতো পৃথিবী পরিক্রমায় নিয়ে যায়। ইংরেজ সমুদ্রের কাছ থেকে সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমি আদায় করতে পারেনি, ওলন্দাজ তার বেশিরভাগ ভূমি সমুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করে কেড়ে নিয়েছে।

হল্যাণ্ড এখন বিশ্বজনের শান্তিপঞ্চায়েতকে চন্ডীমন্ডপ ছেড়ে দিয়েছে। The Hague শুধু হল্যাণ্ডের রাজধানী নয়, আন্তর্জাতিক রাজধানীগুলোর অন্যতম। আমি যে-সময় জেগে ছিলুম সে-সময় ফরাসি-ইটালিয়ান-বেলজিয়ান প্রতিনিধিদের সঙ্গে ফিলিপ স্নোডেনের বচসা চলছিল। হোটেলগুলোতে নানা নেশনের পতাকা উড়ছিল, সমুদ্রের কূলে লোকারণ্য। কত দেশের লোক! সমুদ্রকূলে স্ত্রীস্বাধীনতার মাত্রাটা কিছু বেশি হয়েই থাকে।

বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস যেন প্যারিসের শহরতলি। ব্রাসেলসের যেটুকু প্রাচীন সেইটুকু তার বিশেষত্ব। যেমন তার গির্জে এবং টাউন হল (Hotel de ville) প্রাচীন জার্মানিতে প্রতি নগরেই রাট হাউস ছিল, এগুলি সার্বজনীন ক্রিয়াকর্ম আমোদ-আহ্লাদ আহার-বিহারের কেন্দ্র। ইংল্যাণ্ডের টাউন হলগুলিতে নাচ-গান হয়। আমরা টাউন হল করেছি, কিন্তু বক্তৃতার জন্যে। আমাদের নগরগুলি কেন্দ্রহীন।

অক্টোবর মাসের প্রারম্ভে যখন ইংল্যাণ্ডের আকাশে বাতি নিবিয়ে দিয়েছে, অষ্টপ্রহর বৃষ্টি ও বৃষ্টির আনুষঙ্গিক শীত, তখনও ইটালির অকাশ নীল নির্মেঘ সূর্যকরোজ্জ্বল। বনে বনে তখনও পাতাঝরার দেরি। ছায়াতরুতলে রৌদ্র সন্ত্রস্তা ধরণীকে তখনও আশ্রয়ভিক্ষা করতে হয়।

ইটালি যেন আমাদের দেশ। সূর্য যে যে দেশের প্রতি সদয় তাদের মধ্যে আকৃতি ও প্রকৃতিগত মিল আছে। গাছপালার মতো মানুষও বেঁটেখাটো এবং প্রভূতসংখ্যক। নারীর মুখে সুকুমার কমনীয়তা এবং বেশে ও কেশে সেকেলে রীতি। ভিক্ষুক ও সন্ন্যাসী ভগবানের মতো সর্বত্র অবস্থিত। চর ও চোর পবনের মতো অদৃশ্যবিহারী। মানুষের মতো ও মদের মতো মাটিও রঙিন মেঘও রঙিন। কোথাও স্রোতোবেগহীন নীল সলিল হ্রদের অঙ্কে সৌধশোভিত বিলাসদ্বীপ, হ্রদকে প্রায় বেষ্টন করেছে আল্পস পর্বতের শাখাপ্রশাখা। কোথাও দিগন্তপ্রসারী সমতল শস্যক্ষেত্র, তিন হাজার বছরের পুরাতন জমি, তার উপর দিয়ে কত যুগ-যুগান্তরের সৈনিক জয়যাত্রায় গেছে ও তার নীচে কত নগরী প্রোথিত হয়েছে। কোথাও ভগ্ন ক্রীড়াস্থলী, ভগ্নবিশিষ্ট স্নানাগার, ভাঙা মঠ, ভাঙা গির্জা। রাশি রাশি স্মৃতিচিহ্ন স্মৃতিকে ভারাক্রান্ত করছে! মানুষ তিন হাজার বছরের পাষাণময় চিৎকারে কর্ণক্ষেপ না করে একটা দু-দিনের পুরোনো হালকা সুর ভাঁজতে ভাঁজতে কাজ করছে। লক্ষ লক্ষ প্রস্তরমূর্তি দেশটাকে যেন মিউজিয়ামে পরিণত করতে চায়, কিন্তু দেশ তাদের প্রতি দৃকপাত করছে না, বিদেশিরা করছে।

ভারতবর্ষের সঙ্গে ইটালির ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক সাদৃশ্য সকলেই লক্ষ করেছেন। আজকের ইটালি দেখলে কালকের ভারতবর্ষ দেখা হয়। ইটালি যথাসম্ভব তার স্বধর্মের অনুসরণ করছে। সে যে ইংল্যাণ্ড নয় ইটালি একথা যদি পদে পদে মনে রাখি তবে ইংরেজের চোখে ইটালি দেখার মতো ভুল দেখা ও ইংরেজের অভিজ্ঞতা দিয়ে ইটালিকে বিচার করার মতো ভুল বিচার ঘটে না। ফ্যাসিস্ট সংঘ রোমান ক্যাথলিক চার্চের বংশে জন্মেছে এবং রোমান ক্যাথলিক চার্চ রোমক সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী। একচ্ছত্র অধিনায়কের আজ্ঞাধীন অক্ষৌহিণী ইটালিতে নূতন নয়। সমষ্টির মধ্যে ব্যষ্টিকে বিলীন করা ইটালীয়-র চিরাভ্যাস। চার্চ যদি বহির্মুখীন না হত তবে ইটালি গত সহস্র বৎসরে বহুধাবিভক্ত হত না এবং আজ তার বিলম্বিত প্রতিকারস্বরূপ ফ্যাসিস্ট সংঘ প্রতিষ্ঠা করত না।

তা করুক, কিন্তু নিজের ঘরের বাইরে পরের ঘরে পদক্ষেপ করতে চায় কেন? বিশ্বসুদ্ধ সবাই ফ্যাসিস্ট হতে যাবে কোন দুঃখে?

এর উত্তর, ইটালীয় চরিত্র বাঙালি চরিত্রের মতো কল্পনাকে খাটো করলে বল পায় না। মারি তো গন্ডার, লুটি তো ভান্ডার। কিন্তু বাঙালি চরিত্রে যা নেই কিংবা অল্প আছে, ইটালীয় চরিত্রে সেই অভিনয়শীলতা বিদ্যমান। ইটালীয়রা অভিনয়ের পোশাক পরে অভিনয়ের ভঙ্গিতে কথা বলতে ভালোবাসে। তাদের চুল ছাঁটা ও টেরি কাটা, তাদের জুলপি ও ভুরু অভিনয়ের মেক আপ। তাদের মুখের মাত্রাহীন অত্যুক্তি তাদের নিজেদের কানে সুধাবর্ষণ ও প্রাণে আত্মপ্রসাদ বিতরণ করে। সত্যিই তারা জগৎ গ্রাসিতে আশয় করেনি, যদি-বা করে থাকে তবে ও-জিনিস তাদের ক্ষমতায় কুলাবে না এ তারা মর্মে মর্মে জানে। তবুও কথা থিয়েটারি ঢঙে না বলতে পারলে তারা নিজেদেরকে কাপুরুষ জ্ঞান করে।

বাষ্প থেকে জল হয়, জল থেকে হয় বরফ। বরফের অবয়বে বাষ্পের আদল খুঁজলে নিরাশ হতে হয়। তেমনি আধুনিক ইটালীয়ের চরিত্রে রোমক চরিত্রের আদল। সে-ওজস নেই, সে-ঋজুতা শুধু ইটালীয় চরিত্র থেকে কেন, সভ্য মানবচরিত্র থেকে গেছে, এবং সেই শাসনকৌশল ইংরেজ চরিত্র আশ্রয় করেছে। কিন্তু ততঃ কিম? মাতসিনি, গ্যারিবল্ডি, ক্রোচে ও দুজে (Duse)-র জাতিও নানা গুণে ভূষিত। একটি বৃহৎ আদর্শবাদ ইটালীয় চরিত্রের কোথাও উহ্য আছে। তারই বলে ধীরে ধীরে ইটালি জগৎসভায় আসন করে নিচ্ছে, কিন্তু এতটা ঢক্কানিনাদ সহকারে যে কান জানে ঢক্কাই সত্য।

যে-ইটালি পৃথিবীর সকল দেশের মধ্যে সৌন্দর্যস্রষ্টারূপে শ্রেষ্ঠ এবং অমর, সে-ইটালি রোমক যুগের নয় আধুনিক যুগের নয়; সে-ইটালি দান্তে পেত্রার্কা লেওনার্দো মিকেলাঞ্জেলোর মায়াময় যুগের, যে-যুগে রোমান্স ছিল মানুষের জীবনবস্তু। শেক্সপিয়ারের নাটকে ও ব্রাউনিঙের কাব্যে আমরা তার আলেখ্য দেখছি। একই মানুষ পাথর কেটে মূর্তি গড়ছে, প্রাচীরগাত্রে ছবি আঁকছে, শব ব্যবচ্ছেদ করে শরীরতত্ত্ব চর্চা করছে, নগররক্ষী সৈন্যের নায়ক হচ্ছে, নির্বাসিত হয়ে নানা সংকটের আবর্তে পড়ছে। 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন।' এদের প্রেমকাহিনি যেমন বিচিত্র তেমনি বীরত্বপূর্ণ তথা করুণ। আমাদের যুগে সৌন্দর্যসৃষ্টির স্রোত আবর্জনায় মন্থর, নানা কুটিল থিয়োরির কচকচি শিল্পীর স্বতঃস্ফূর্তিকে ব্যাহত করছে। মধ্যযুগের সহৃদয়তার পরিবর্তে আধুনিক যুগের সমস্তিষ্কতা হয়েছে শিল্পসৃষ্টির কষ্টিপাথর। মধ্যযুগে সর্বাঙ্গীণ ব্যক্তিত্ব ছিল শিল্পী মাত্রের কাম্য, আমাদের যুগের শিল্পী কেবলমাত্র শিল্পী হয়েই ক্ষান্ত। সেইজন্যে শিল্পে জীবনের সবটার ছাপ পড়ছে না, জীবনের সুগোল সুডৌল রূপটি শিল্পের খর্বক্ষীণ আলিঙ্গনে আঁটছে না।

মধ্যযুগের ইটালি ধর্মপ্রাণও ছিল। তার সাক্ষী ভারতবর্ষের মতো ইটালির সর্বঘটে। কিন্তু এই ধর্মপ্রাণতা কেমন সংকীর্ণ ছিল তার একটি নমুনা রোমে পাওয়া যায়। রোমক যুগের সরল উন্নত নিরীশ্বর মন্দিরগুলিকে ভেঙে তাদের থেকে পাথর খুলে নিয়ে ক্যাথিড্রাল নির্মাণ করা হয়। সেসব ক্যাথিড্রাল যদি সুন্দর হত তবে এই অপরাধের মার্জনা থাকত, কিন্তু রোমের দুটি-একটিকে বাদ দিলে বাকি সমস্ত গির্জা জাঁকজমকের জোরে দর্শককে পীড়ন করে এবং লক্ষ লক্ষ ধর্মভীরু তীর্থযাত্রীর মনে সম্ভ্রম জাগায়। ফ্লোরেন্সের ক্যাথিড্রাল তস্করের নয়, শিল্পীর কীর্তি। মিলানের ক্যাথিড্রাল বিরাট গম্ভীর বহু শীর্ষ বহু মুখ। ভেনিসের ক্যাথিড্রাল সাড়ম্বর প্রাচ্য প্রভাবসম্পন্ন।

ভেনিসের গৌরবের দিনে ভেনিস ভাবীকালের জন্যে এমন কিছু রেখে যায়নি যার জন্যে ভাবীকাল তার প্রতি সশ্রদ্ধ হতে পারে। তবে ভেনিস নিজেকে দিয়ে গেছে, সে-দান সামান্য নয়। সমুদ্রের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে সেই মাটির উপর ভেনিসের প্রতিষ্ঠা, তার পিছনে সাধনা ছিল এবং সাধনার সম্মান করতে হয়। চন্দ্রালোকিত ভেনিসের খালে খালে গন্দোলায় আন্দোলিত হয়ে আনন্দ আছে, কিন্তু দুর্গন্ধের ভয়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে। ভেনিসের যৌবনকালে ভেনিস কেমন রঙ্গিণী ছিল অনুমান করতে পারি সুসজ্জিত গন্দোলায় নৃত্যগীতের আয়োজন থেকে ও গন্দোলার সঙ্গে গন্দোলার গতি প্রতিযোগিতা থেকে। গন্দোলায় করে এক বাড়ির থেকে আরেক বাড়িতে ও এক পাড়া থেকে আরেক পাড়ায় যাওয়ার মোহ উপেক্ষা করা যায় না। কিন্তু সম্প্রতি কলের গন্দোলা দেখা দিয়েছে। সে-গন্দোলার চলায় ছন্দ নেই, ধীরতা নেই, গাম্ভীর্য নেই। ভেনিসের গন্দোলিয়েরেরা খাসা মানুষ। তাদের পেশা ও প্রকৃতি বদলালে ভেনিসের অঙ্গহানি ঘটবে। কিন্তু যে-নগরী মৃতা তার অঙ্গহানি ঘটলেই-বা কী, না ঘটলেই-বা কী!

ফ্লোরেন্স এখনও বেঁচে। এখনও সেখানে ও তার অনতিদূরে জীবন্ত শিল্পীরা বাস করে; কিন্তু মৃত শিল্পীদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় কি? কতকটা তাদের নকল ও বাকিটা তাদের শ্রাদ্ধ করে। ফ্লোরেন্সের মাটির উপরে সৌন্দর্যের খনি। এককালে এ নগরী কেমন 'পুষ্পিতা' ছিল, কল্পনা করেও আনন্দ, আবার তার এত কিছু স্মারক রয়েছে যে প্রত্যক্ষ করেও আনন্দ। পাছে জার্মানরা লুঠ করে নিয়ে যায় সেই ভয়ে মহাযুদ্ধের সময় ফরাসিরা প্যারিস থেকে মোনালিসা ও ভিনাস ডি মাইলোকে দক্ষিণ ফ্রান্সে সরিয়ে ফেলে। কিন্তু শত্রু যদি ফ্লোরেন্স আক্রমণ করে তবে তার আগে ফ্লোরেন্সের কয় সহস্র শিল্পসৃষ্টি সরানো সম্ভব হবে? বোধ করি তাই ভেবে সেকালের শিল্পীরা ফ্লোরেন্স রক্ষার জন্যে অস্ত্রহস্তে দুর্গপ্রাচীরে দাঁড়াত।

রোমকে কেন Eternal City বলে তার অর্থ বুঝি যখন জানি কুলাম পাহাড়ের পিঠে দাঁড়িয়ে রোমের ভিতর ও বাহির পরিক্রমা করি। অনেকগুলি পাহাড় পাহারা দিচ্ছে। কম নয়, তিন হাজার বছরব্যাপী পাহারা। কত দিগবিজয়ের সংবাদ নিয়ে দূত এসেছে, তার পরে বীর এসেছে, নগরী উৎসব-প্রমত্তা ও বিনিদ্রা হয়ে তার পায়ে লুটিয়ে পড়েছে, এই প্রহরীদের স্মরণে সেসব যেন সেদিনের কথা। একদিন বিজেতারা কতগুলি খ্রিস্টান দাস নিয়ে এল। দাসদের ধর্মকে উপহাস করল। বাঘ-সিংহদের সামনে দাসদের ছেড়ে দিয়ে তাদের মরণ-

তামাশা দেখল। ক্রমে একদিন সম্রাট হলেন খ্রিস্টান, রাষ্ট্র হল খ্রিস্টান, রাজগুরুই হলেন রোমের মালিক। রোমকে কেন্দ্র করে তাঁর দূতেরা ইউরোপের সকল রাজ্যে চারিয়ে গেল, প্রথমে রাজন্যদের ও পরে প্রজাদের দীক্ষা দিল। এবার রোমের পর্বত প্রহরীরা দেখল আরেকরকম দিগবিজয়ের উৎসব। রোমের পোপ হলেন খ্রিস্টীয় জগতের পিতা। এককালে যেমন উচ্চাভিলাষীরা সিজার হওয়ার জন্যে তপস্যা ও চক্রান্ত করত, আরেক কালে তেমনি পোপ হওয়ার জন্যে উঠেপড়ে লাগল। ইউরোপ উজাড় করে যাত্রীরা চলল রোমের অভিমুখে। তাদের জন্যে ক্যাথিড্রাল খাড়া হল, সহস্র সহস্র যুবক সন্ন্যাসী হয়ে গেল। তাদের জন্যে মঠ তৈরি হল। দাসদের যাজক প্রাসাদবাসী হয়ে বিস্তীর্ণ জমিদারির ওপর রাজাগিরিও করলেন। ভাটিকানো অলংকরণ করতে বড়ো বড়ো শিল্পীরা নিমন্ত্রিত হয়ে এল। রোমের প্রহরীরা আরেকরকম দিগবিজয়ীর সাক্ষাৎ পেয়ে ধন্যহল।

পোপ যখন থেকে কেবলমাত্র ইটালির না হয়ে খ্রিস্টীয় জগতের হলেন তখন থেকে ইটালির আত্মা প্রতিভূ হারিয়ে রোমের বাইরে ছোটো ছোটো নগরে ও প্রদেশে প্রতিনিধি খুঁজতে ও পেতে থাকল। যে ইটালি ধ্যানী ও প্রেমিকদের মনে আইডিয়ারূপে ছিল, নেপোলিয়নের নিষ্ঠুর হস্ত ও কাভুরের চতুর মস্তিষ্ক তাকে মূর্তিমতী করল। মুসোলিনির কান্ড দেখে সন্দেহ হচ্ছে সে-মূর্তি শিবানী না বানরী, কিন্তু মাতসিনির মানসী চিরকাল ভাবলোকে থাকবেন না, ভাবীকালের আদর্শবাদী এই অসম্পূর্ণ মূর্তিকে নিজের হাতের বাটালি দিয়ে কুঁদে তার মধ্যে সেই মানসীকে অবতরণ করাবে।

২১

ইউরোপ থেকে বিদায়ের দিন নিকট হয়ে এল। দীর্ঘ দুই বছর পরে আমার বিরহী বন্ধুটি তার সুখনীড়ে ফিরছে। ইউরোপ ছিল তার নির্বাসনভূমি। তাই বিদায় দিনটি তার মুক্তির দিন। কিন্তু আমার?

ইউরোপকে আমি না দেখেই ভালোবেসেছিলুম, দেখেও ভালোবাসলুম। ইউরোপ আমাকে চিরকাল আকর্ষণ করে এসেছে—অন্য কথায়, চিরকাল ভালোবেসে এসেছে। ইউরোপ থেকে বিদায় আমার পক্ষে বিরহের শেষ নয়, শুরু।

তাই কখনো চোখের পাতা আদ্র হয়, কখনো বুকের কাঁপন তীব্র হয়। মনটা বিশ্বাস করতে চায় না যে বিদায়ের দিন সত্যিই আসবে—'একদিন এই দেখা হয়ে যাবে শেষ।' বিদায়ের ভাবনা যথাসাধ্য ভুলে থাকলুম। তবু যখনই মনে পড়ে যায় তখনই আমার ইটালিবিহার করুণ হয়ে ওঠে। আহা, আবার কবে দেখব—যদি বেঁচে থাকি, যদি পাথেয় জোটে, যদি এই ভালোবাসা এমনই থাকে! এতগুলো যদির উপর হাত চলে না গো ইউরোপা। মানুষের সঙ্গে ভালোবাসা ও দেশের সঙ্গে ভালোবাসা এ দুইয়ের মধ্যে একটু তফাত আছে। তুমি যেখানে থাকলে সেইখানেই থাকলে। মানবী হলে নিশ্চয়ই আমার দেশে আমার সঙ্গে দেখা করতে যেতে। তা যখন তুমি পারবে না তখন আমাকেই আসতে হয়। অন্তত বলতে হয় যে আবার আসব।

বললুম, আবার আসব, ভয় কী? কতই-বা দূর! জলপথে পনেরো দিন, স্থলপথে বারো দিন, আকাশপথে সাত দিন মাত্র। কিছু না হোক, মনের পথে একমুহূর্ত।

বললুম ও-কথা। তবু জানতুম ও-কথা মিথ্যা। জীবনে ফিরে আসা যায় না। এক বার মাত্র আসা যায় এবং সেই আসাই শেষ আসা। আবার যদি আসি তবে দেখব সে-ইউরোপ নেই। সেই পুরাতন পদচিহ্ন ধরে মার্সেলস থেকে প্যারিস, প্যারিস থেকে লণ্ডন যাব। লণ্ডনের গলিতে গলিতে বেড়াব। ইংল্যাণ্ড থেকে ফ্রান্সে ও সুইটজারল্যাণ্ডে, জার্মানিতে ও অস্ট্রিয়ায়, হাঙ্গেরিতে ও চেকোস্লোভাকিয়ায় স্মৃতির দাগে দাগা বুলাব। ইটালি প্রদক্ষিণ করে চেনা জিনিসগুলিকে খুঁজে বের করব। দুটি বছর কাটবে দুটি বছরের পুনরাবৃত্তি করতে। চাইনে নতুন দেখতে, নতুন করে দেখতে। আমার তেইশ-চব্বিশ বছর বয়সের এই আমি আমার শ্রেষ্ঠ আমি। এই দুটি বছরে যা পেলুম তার বেশি এ জীবনে পাওয়া যাবে না। এই-বা কজন পায়? এত জ্ঞান, এত মান, এত প্রীতি, এত মমতা! চক্ষু যত দেখল লেখনী তার ভাষা পায়নি, আভাস দেবার সাধনা করেছে। শ্রবণ যত শুনল স্মরণ রাখতে পারল না।

স্মৃতির দাগ আপনি মুছে যায়। স্মৃতির পথ বেয়ে কত পথিকের আনাগোনা, তাদের চরণতল মৃত্যুর মতো নির্দয়। তবু যদি স্মৃতির দাগ ধরে যাওয়া সম্ভব হয় তবে কোন ইউরোপকে দেখব? ইউরোপ তো শুধু স্থান নয়, দৃশ্য নয়, সে মানুষ—ইউরোপের মানুষ। সেই মানুষগুলি কি আমার অপেক্ষায় অপরিবর্তিত রূপ নিয়ে অচঞ্চলভাবে আমার স্মৃতিনির্দিষ্ট স্থানে কেউ-বা বসে, কেউ-বা দাঁড়িয়ে, কেউ-বা টমটম হাঁকিয়ে, কেউ-বা ঠেলাগাড়ি ঠেলে, কেউ-বা বইয়ের উপর ঝুঁকে রয়েছে?

পদে পদে পরিবর্তনশীল ইউরোপ। ততোধিক পরিবর্তনশীল মানুষের জীবন-যৌবন জীবিকা ও প্রেম। স্মৃতিতে যাদের যে-সময়ের যে-অবস্থার ফোটো রইল তারা যদি-বা জীবিত থাকে তবু তাদের সে-বয়স আর থাকবে না। তাদের মধ্যে যারা আকস্মিকভাবে আমার দৃষ্টিপথে পড়েছিল, তাদের নাম ঠিকানা আমি হাজার মাথা খুঁড়লেও পাব না। রাইন নদী চিরকাল থাকবে, স্টিমারও তাতে চলতে থাকবে। কিন্তু সেই যে মেয়েটি তরুণী ও সুন্দরী হয়েও মুখে রং মেখেছিল তাকে তার প্রেমিকের স্কন্ধলগ্নরূপে আর একটিবার দেখতে পাব কি? না যদি পাই তবে রাইনের উভয়তটের গিরিদুর্গ তেমন সুদৃশ্য বোধ হবে না। লোরলাইয়ের মায়া সংগীত শুনে নাবিকরা যেখানে প্রাণ দিত সেখানে আমার বুকের স্পন্দন হঠাৎ স্থির ও তার পরে প্রবল হয়ে উঠবে না।

এমনি কত দৃশ্য অঙ্গহীন মনে হবে। সেই জন্যে কি মার্সেল প্রুস্ত বহির্জগতের প্রতি অন্ধ ও বধির হয়ে ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে স্বেচ্ছা বন্দিরূপে অবস্থান করতেন? আমাকেও তাহলে শপথ করতে হয় যে আর ইউরোপে আসব না, পাছে প্রিয়ববরাকে অঙ্গহীনা দেখি, পাছে পরিচিতাকে অপরিচিতা বলে ভুল হয়। সে ভুলের সংশোধন নেই। বিরহের পরে প্রত্যেক প্রেমিককে ভয়ে ভয়ে প্রিয়ার দিকে চাইতে হয়—সে মোটা বা রোগা হয়ে যায়নি তো; অপরে তার মন চুরি করেনি তো? নানা অভিজ্ঞতার চাপে পূর্বস্মৃতি কি তার মনে কিছুমাত্র অবশিষ্ট আছে?

একদিন ঘুম থেকে জেগে দেখলুম চারিদিকে সমুদ্র। সমুদ্রের একটিমাত্র পরিচয় সে সমুদ্র। সে যে ভূমধ্যসাগর, ও কথা তার গায়ে লেখা নেই। চীনের সাগরও হতে পারে, অস্ট্রেলিয়ার সাগরও হতে পারে।

মাটি যে আমাদের কত বড়ো আশ্রয়স্থল সমুদ্রের উপর অসহায়ভাবে ভাসমান না হলে হৃদয়ংগম হয় না। সমুদ্রের কূলে বসে সমুদ্রকে দেখে এক মহান ভাবে আপ্লুত হই, কিন্তু দিনের পর দিন যখন দশদিকের নয়দিকে কেবল সমুদ্রই দেখি আর দশম দিকে দেখি সমুদ্র-দিগ্বলয়িত আকাশ তখন ভয়ে প্রাণ উড়ে যায়। তবু সঙ্গে লোকজন থাকে বলে ভরসা থাকে। বাইরে যত বড়ো বিপদ হাঁ করে থাকুক না কেনভিতরে তাস খেলার বিরাম নেই, কখনো নাচ চলেছে কখনো বাজি রেখে নকল ঘোড়দৌড়। ঠিক যেন কোনো একটা হোটেলে বাস করছি, পরস্পরের অতি কাছাকাছি, অথচ কারও সঙ্গে কারও গভীর সম্বন্ধ নেই। খাচ্ছি-দাচ্ছি গল্প করছি হাসি তামাশায় যোগ দিচ্ছি চটছি ও মনখারাপ করছি—তবু জানি এ দু'দিনের খেলা। একটা কৃত্রিম অবস্থার চক্রান্ত। ভূপৃষ্ঠে কেউ সমস্তক্ষণ হোটেলেও থাকে না, একাদিক্রমে এত রকম মানুষের সংস্রবেও আসে না, এদের সঙ্গে জীবনের অভিনয়ও করে না। ভূপৃষ্ঠে যা বৃহৎ জনসমষ্টির মধ্যে অথচ অল্প সংখ্যক প্রকৃত বন্ধু বা সহকর্মীর সঙ্গে সত্য, জাহাজে তা সত্যের নকল। তাই জাহাজী সামাজিকতার কথা মনে পড়লে হাসি পায়, ও সম্বন্ধে অত সিরিয়াস না হলেই ঠিক হত।

ইউরোপের অধিকার যখন ভূমধ্যসাগরের সঙ্গে শেষ হল তখন ক্রমাগত মনে উঠতে লাগল ভারতবর্ষের কথা। ভারতবর্ষের স্মৃতি সযত্নে ভুলেছিলুম, পাছে পুরাতনের মায়ায় নূতনকে অবহেলা করি, অতীতের রোমন্থন করতে বর্তমানের স্বাদ না নিই। এখন তো ইউরোপ হল অতীতের এবং বর্তমানের জাহাজী জীবন বিস্বাদ লাগছে—এখন ভারতবর্ষ আমার সোনার ভবিষ্যৎ, আমি তারই ধ্যান করব।

ভারতবর্ষের এমন একটি মূর্তি দেখতে পেলুম যা একমাত্র আমার মতো মানুষই দেখতে পায়—আমার মতো যে মানুষ ভারতবর্ষকে জন্মসূত্রে ও ইউরোপকে প্রেমসূত্রে চিনেছে, যে মানুষের মন উভয়ের সাক্ষাৎ পরিচয় পেয়ে উভয়ের যথার্থ পরিমাণ জেনেছে। সকল কলহ কোলাহলের ঊর্ধ্বে ভারতবর্ষ তাঁর যোগাসনে বসে আছেন, তাঁর নিমীল নেত্রে হাসির দ্যুতি, প্রাপ্তির আনন্দ তাঁর পার্থিব অভাবকে তুচ্ছ করেছে। সুন্দরী ইউরোপা তার যৌবনের ঐশ্বর্য নিয়ে তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে নূপুর বাজাচ্ছে, তাঁর মন পাচ্ছে না। পাবে, যদি পার্বতীর মতো তপশ্চারিণী হয়। ইউরোপকে ভারতবর্ষের যোগ্য হতে হবে। নইলে সে কেবল ভারতবর্ষকে বাইরে থেকে বাঁধতে ও বিচার করতে থাকবে এবং সেই কল্পিত আত্মপ্রসাদে স্ফীত হতে থাকবে।

বম্বেতে যখন নামলুম তখন ভারি মিষ্টি লাগল মরাঠি কুলিদের কর্মকালীন গোলযোগ। যা-ই দেখি তা-ই মিষ্টি লাগে। গাছতলায় মানুষে-গোরুতে-ছাগলে মিলে শুয়ে আছে। হিন্দু নাপিত মাটিতে বসে মুসলমানকে ক্ষৌরি করে দিচ্ছে! কাছা-দেওয়া মরাঠি মেয়ে মাথায় বিরাট বোঝা ও বগলে শিশু নিয়ে দৃপ্ত ব্যস্ততার সঙ্গে পথ চলছে। গুজরাতি মেয়ে ব্রীড়ায় ললিতগতি। ভারতবর্ষের সব প্রদেশের পুরুষ বম্বের রাজপথে প্রতিনিধি পাঠিয়েছে। সকলে সমান গম্ভীর, শান্ত, আত্মস্থ। ভারতবর্ষ এ কী নূতন রূপে দেখা দিল!

ভারতবর্ষে ফিরলুম, কিন্তু এ কোন ভারতবর্ষ! যাকে রেখে গেছলুম সে নেই। নবীন ভারতবর্ষ আমাকে না-দেখে, না-জেনে আমার অভাব বোধ না করে কোন ফাঁকে জন্মেছে ও বেড়েছে। না সে আমাকে চেনে, না আমি তাকে চিনি। তার সঙ্গে মিতালি পাতাতে হবে, সতর্ক থাকতে হবে, পাছে তার আত্মাভিমানে ঘা দিয়ে

ফেলি। তার কঠিন কথা শুনে মর্মাহত হলে চলবে না। ঘরে তোলার আগে আমাকে পরখ করার অধিকার তার আছে। আমি আগন্তুক। সে গৃহস্বামী।

পুরাতন বন্ধুরা বলে, 'কই, কিছুমাত্র পরিবর্তন দেখছি না তো! যেমনটি ছিলে তেমনিটি আছ।' যেন মস্ত একটা পরিবর্তন ওরা আমার আকৃতিতে ও আচরণে প্রত্যাশা করছিল; নিরাশ হল। আমি বলি, 'তা হলে তো আমাকে গ্রহণ করা তোমাদের পক্ষে সহজ। আমি ভেবে মরছি কী করলে তোমাদের মন পাব।'

কিন্তু সত্যিই সহজ নয়। আমি তো জানি আমি সেই আমি নই। দুটি বছরে প্রত্যেক মানুষের জীবন এক থেকে আরেক হয়ে ওঠে, প্রতিদিন দেখি বলে কোনোদিন লক্ষ করিনে। আমার সম্বন্ধে ওদের এবং ওদের সম্বন্ধে আমার ওই প্রতিদিন দেখাটুকু ঘটেনি বলে অন্তরে অন্তরে আমরা পর হয়ে পড়েছি। দুটো মহাদেশের ব্যবধান সেই বিচ্ছেদকে ঘোরালো করেছে। দু-বছর চোখের আড়ালে বেড়েছি, এইটে প্রধান। দু-বছর বিলেতে থেকেছি, এটা অপ্রধান। কিন্তু ফট করে ওরা বলে বসে, 'একেবারে আহেল বিলেতি হয়ে ফিরেছ! আমাদের সঙ্গে মিলবে কেন?'

বিলেত ফেরতারা যে নিজেদের মধ্যে একটা সমাজ কিংবা সম্প্রদায় কিংবা আড্ডা রচনা করে সেটা এই দুঃখে। এরাও ভুলতে পারে না ওরাও ভুলতে পারে না—কয়েক বছর ও কয়েক হাজার মাইলের ব্যবধান। তার উপর বিলেত ফেরতারা সাধারণত ধনী কিংবা উচ্চপদস্থ হয়ে থাকে, অবস্থার ব্যবধান মানুষ চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে ভালোবাসে। বিলেতের সমাজেও ভারত ফেরতাদের এককালে 'নবাব' বলা হত। ইদানীং তাদের অবস্থার বিপর্যয় হয়েছে বলে তাদের অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বলে পরিহাস করা হয়। ক্রমশ ইঙ্গবঙ্গদের কপালেও পরিহাস জুটছে।

কোথায় ভারতবর্ষ, কোথায় ইউরোপ। মাঝখানে আরব, তুর্কি, পারস্য, আফগানিস্তান ইত্যাদি কত দেশ পড়ে রইল। বিধাতা কার সঙ্গে কাকে বেঁধে দিলেন। পরিহাসই করো আর নেতৃত্বই দাও—আমাদের সংখ্যা ও প্রভাব বাড়তেই থাকবে। ভাবী ভারত ইউরোপে আমেরিকায় লক্ষ লক্ষ যুবক পাঠাবে ও তারা ফিরলে তাদেরকে ঘরে তুলবে। আমরাই ভারতবর্ষের ভবিষ্যতের পূর্বপুরুষ। সেইজন্যে আমাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে আমরা সচেতন থাকব। শুধু দু-তিন বছর ইউরোপে গিয়ে ফুর্তি করে ফেরা নয়। আমাদের কাজ ইউরোপে ভারতবর্ষকে ও ভারতবর্ষে ইউরোপকে প্রকৃত ও প্রকৃষ্টরূপে পরিচিত করা। আমরা দুই মহাদেশের নুন খেয়েছি। দুই মহাদেশের কত লোক আমাদের প্রাণরক্ষা করেছে, আমাদের সেবা করে মূল্য গ্রহণ করেনি, আমাদের পরমাত্মীয় হয়ে দান-প্রতিদানের ঊর্ধ্বে উঠে গেছে। আমরাও যেন নিন্দা-বিদ্বেষ ঘৃণা-অবজ্ঞার ঊর্ধ্বে উঠে উভয় মহাদেশকে নিকট থেকে নিকটতর করে বিধাতার অভিপ্রায়কে সফল করে তুলি।

যেদিন আমি বিদেশযাত্রা করেছিলুম সেদিন শুধু দেশ দেখতে যাইনি। গেছলুম মানুষকেও দেখতে, মানুষের সঙ্গে মিশতে, মানুষের সঙ্গে নানা সম্বন্ধ পাতাতে। দেশের প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট সৌন্দর্যের চেয়ে দেশের মানুষ সুন্দর। মানুষের অন্তর সুন্দর, বাহির সুন্দর, ভাষা সুন্দর, ভূষা সুন্দর। দেশ দেখতে ভালো লাগে না যদি দেশের মানুষকে ভালো না লাগে। কে যেন বলেছেন, 'এদেশের সব সুন্দর, কেবল মানুষ কুৎসিত।' তিনি দূর থেকে মানুষকে দেখে ও-কথা বলেছেন, কাছে গিয়ে দেখেননি। যে-দেশে যাও সেদেশে দেখবে মানুষের চেয়ে সুন্দর কিছু নেই, মানুষের সৌন্দর্যের ছোঁয়া লেগে বুঝি বাকি সব সুন্দর হয়েছে! প্রকৃতি মানুষের হাতে-গড়া প্রতিমা না হোক মানুষের প্রাণের রসে রসায়িত এবং ধ্যানের দ্বারা প্রভাবিত। প্রকৃতি তো মানুষেরই প্রতিকৃতি; বিশেষ করে ইউরোপে।

ভারতবর্ষকে রবীন্দ্রনাথ মহামানবের সাগরতীর বলেছেন। ইউরোপকে আমি বলব মহামানবের মানস সরোবর। সাগরে যেমন সকল প্রবাহিণী মিলিত হয়, মানস সরোবর থেকে তেমনি সকল প্রবাহিণী নির্গত হয়। ইউরোপের মানস থেকে যুগে যুগে কত ভাবধারা নিঃসৃত হয়ে পৃথিবীকে ভাবোর্বরা করেছে। পৃথিবী নিজেই তো পৃথিবীর প্রতি ইউরোপের দান, কারণ পৃথিবী ইউরোপের আবিষ্কার। কেই-বা জেনেছিল আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকার অস্তিত্ব? পৃথিবীর আকার, আকৃতি, গতি ও অবস্থান ইউরোপই আমাদের

জানাল। আমরা পরলোকের নাড়িনক্ষত্র জানতুম কিন্তু যে-লোকে জন্মেছি তার সম্বন্ধে বড়োজোর এই জানতুম যে, সেটাকে একটা সাপ নিজের ফণার উপরে অতি যত্নে ব্যালান্স করে একটা হাতির পিঠের উপর অতি কষ্টে টাল সামলাচ্ছে।

সত্যের একটি বিন্দুও নষ্ট হবার নয়। ইউরোপের সত্য ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতেই হবে, ভারতবর্ষের সত্য ইউরোপকে। দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে মহামিলনের লগ্ন আসবেই। কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ। আজ যা আসেনি কোনো একদিন তা আসবে বলেই আজ আসেনি। কিন্তু সে আমাদের সকলের ভাবনা, সকলের স্বপ্ন; আমার একার নয়। আমি ভাবি আবার কবে ইউরোপের সঙ্গে মিলিত হব, কথা রাখব!

দিনের পর দিন যায়। ইউরোপের স্মৃতি অস্পষ্ট হতে থাকে। সত্যি কি কোনোকালে ইউরোপে ছিলুম!

---

* ফ্রান্সের গভর্নমেন্টে একজন মিনিস্টার অব ফাইন আর্টস থাকেন, ইংল্যাণ্ডে সেরূপ নেই, ইংরেজরা সব বিষয়ের মতো এ বিষয়েও প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজের পক্ষপাতী।

* যে সমাজ দুর্ভিক্ষও চায় না যুদ্ধও চায় না সে সমাজের তৃতীয় পন্থা জন্মশাসন। গান্ধীমার্কা জন্মশাসনে দুর্ভিক্ষের ভাব আছে— অজাত প্রাণীর পক্ষে তা সম্ভাব্যতার মৃত্যু। স্টোপসমার্কা জন্মশাসনে যুদ্ধের ভাব আছে—অজাত প্রাণীর পক্ষে তা সম্ভাব্যতার হত্যা। কিন্তু যে সমাজ না চায় দুর্ভিক্ষ না চায় যুদ্ধ না চায় কোনো প্রকার জন্মশাসন, সে সমাজের আবদার প্রকৃতির অসহ্য।

* একটি সমিতির সেক্রেটারি লিখছেন, ‘আপনি কি জানেন যে আমাদের বনফুলগুলি একে একে লোপ পেয়ে যাচ্ছে? তাদের বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে এই সমিতির প্রয়াস ও উপায় উদ্ভাবনে আপনি যোগ দেবেন?’

* H টি হচ্ছে আর্থার খুড়োর এক ছেলে। খুড়োর আরেক ছেলে আরেক জায়গায় জিতেছেন। খুড়োর নাম তো জানে বিশ্বের সব জনে, আমাদের সেই তাহার নামটি বলব না।

* কেউ তার শ্যালিকাকে বিবাহ করতে পারবে কি না, শ্যালিকাকন্যাকে বিবাহ করতে পারবে কি না পার্লামেন্ট এ সম্বন্ধে বিধান দেয়। আগে ছিল চার্চের এলাকা, এখন চার্চের অধীনে আদালত নেই।

* এ ছাড়া আধা উপরে আধা নীচের রেলস্টেশন উনচল্লিশটা।

* তাঁর অসংখ্য সুপাত্রীর কারুকে বিবাহ না করে অ্যারিস্টোক্র্যাট তিনি বিবাহ করলেন কিনা এক চাষানিকে, তাও বহুকাল একসঙ্গে বাস করবার পরে। এর অর্থ কি এই নয় যে তিনি চীনেমাটির পুতুলের কাছে যা পেতেন তার বেশি পেয়েছিলেন মাটির মেয়ের কাছে? প্রকৃতির হাতে-গড়া প্রাণময়ী নারীর কাছেই মনোময় পুরুষের পরিপূরকতা।

নির্বাচিত প্রবন্ধ

সৃষ্টির দিশা

আমাদের একাধিক এক সহস্র সমস্যার কেন্দ্রগত সমস্যা তো এই। আমাদের যৌবন-প্রবাহ এত মন্থর যে প্রায় বন্ধ। সেইজন্যে যেটুকু আবিলতা ভরা গঙ্গাকে বৈচিত্র্য দেয় সেটুকু আবিলতা গঙ্গাজলের বোতলটাকে দূষিত করছে। অতি প্রাচীন সাহিত্যে যখন সীতা-সাবিত্রীর সঙ্গে অহল্যা-দ্রৌপদীও ঠাঁই পেয়েছিলেন সে সাহিত্যে তখন আদর্শবৈচিত্র্য কেন, আদর্শবিরোধও ছিল। সত্যিকার আর্ট সম্বন্ধে নীতি-দুর্নীতির প্রশ্নই ওঠে না, সে-সম্বন্ধে একমাত্র প্রশ্ন সে আর্ট কি না। গঙ্গানদীতে পাঁক আছে না পদ্ম আছে এ প্রশ্ন অবান্তর, আসল কথা ওটা নদী কি না। ওটা যদি distilled water-এর কাচে ঘেরা চৌবাচ্চা হয় তবে ওতে স্নান করে শুচি হওয়াও চলবে না, ওতে সাঁতার দিয়ে ওর বেগ সর্বাঙ্গে অনুভব করাও চলবে না, ওর স্বাদ নিয়ে তৃপ্ত হওয়াটাও অসম্ভব হবে। কেবল ওর চারদিকে পাহারা দিয়ে ফেরা ছাড়া অন্য কোনো চরিতার্থতা থাকবে না। বলা বাহুল্য, কোটালের চরিতার্থতা কোটালের পক্ষে যতই উপাদেয় হোক, তস্করবহুল রাজ্যেও এমন লক্ষ লক্ষ লোক আছে যারা লক্ষবিধ চরিতার্থতা চায়, তাদের ঘরে পাছে কেউ আগুন লাগায় এই ভয়ে তারা ঘরে বসে থাকবে না, বাইরে তাদের বড়ো দরকার।

যে সমুদ্রে অমৃত থাকে সেই সমুদ্রে গরলও থাকে। সেজন্যে দেবতারা একটুও চিন্তিত হয় না; তাদের মধ্যে এমন প্রাণবান পুরুষের অভাব হয় না যিনি গরলটাকে কণ্ঠে ধারণ করতে প্রস্তুত। তেমন পুরুষ না থাকলে ভাবনার কারণ ঘটত সন্দেহ নেই। তখন গরলের ভয় অমৃতের আকাঙ্ক্ষাকে দাবিয়ে রাখত। নিরাপদপন্থীরা পরামর্শ দিতেন, 'অমৃতে কাজ কী বাপু? যেমন আছ তেমনি থাকা শ্রেয়।' কিন্তু তেমন থাকাটা যে ভয়ে ভয়ে থাকা, ভয় যে মরণেরও অধিক, 'কিমহং তেন কুর্যাম?'

জরাগ্রস্ত অস্তিত্বের মহৎ ভয় থেকে আমাদের ত্রাণ করতে পারে একমাত্র যৌবন-ধর্ম। সে ধর্ম যদি স্বল্পমাত্রও হয় তবু সে অমৃত, সে অজর করে। তার আস্বাদ যদি পাই তো ঔষধ-পথ্য মুখে রুচবে না, মাদুলি কবচ ছুড়ে ফেলে দেব, ডাক্তার কবিরাজকে দূর থেকে নমস্কার জানাব। ভিতর থেকে আমরা এত আনন্দ পাব যে সেই আনন্দে আমাদের ব্যাধি তো যাবে সেরে, আমরা আনন্দ বিচ্ছুরিত করব, জগৎকে আনন্দময় করব। আমরা কৃপণের মতো আপনাতে নিবদ্ধ থাকব না, আমরা বিশ্বসংসারের সঙ্গে যোগ দিয়ে সকলের ভার ভাগ করে নেব। কঠোরতম তপস্যাকেই তো আমরা ভালোবাসি, সহজকে আমাদের একটুও ভালো লাগে না, সমস্ত জীবনটাই যদি একটা অসাধ্যসাধন না হয় তবে জীবনকে আমাদের কীসের দরকার? সুলভ সিদ্ধিকে ধিক থাক, দুর্লভ সিদ্ধিকেও আমরা চাইনে, সুসাধ্য নয় দুঃসাধ্য নয় অসাধ্যেরই উপরে আমাদের লোভ, সিদ্ধিমাত্রেই আমাদের অলভ্য। যে পথের শেষ আছে সে-পথ আমাদের নয়, আমরা তো লক্ষ্য মানিনে, আমরা মানি অক্লান্ত চলার আনন্দ। আমরা যুবা, যতক্ষণ আমরা দুঃখের আগুন নিয়ে খেলা করি ততক্ষণ আমরা সুখে থাকি, আরাম আমাদের উষ্ণ রক্তকে শীতল করে দেয়। যতক্ষণ জ্যোতি ততক্ষণ জ্যোতিষ্ক, জ্বালা নিবে গেলে গ্রহ। তখন তার মাথায় দেখা দেয় পাকাচুলের মতো সাদা বরফ, সে-বরফ তার একার নয়, সমগ্র সৌরজগতের আতঙ্ক। সে তো আভান্বিত করে না, কম্পান্বিত করে; নিজে তো জরেই, সকলকে জরায়।

নিজেদের যৌবনের ওপরে যদি অটল বিশ্বাস রাখি তো যৌবনই আমাদের পথ দেখাবে, সে আমাদের যে পথে নিয়ে যাবে সেই আমাদের পথ, 'স এব পন্থাঃ'। আমাদের পথ আমাদের চলবার আগে তৈরি হয়ে রয়নি যে পথনির্মাতার সাহায্য না নিলে পথ হারাব, যা তৈরি হয়ে রয়েছে তা পূর্বপুরুষের পথ, সে-পথ হারানোটাই ভাগ্য। সত্যের কোনো বাঁধা পথ নেই, যে পথ আমরা চলতে চলতে বাঁধি সেই আমাদের

সত্যের পথ, পূর্বযাত্রীদের পথের সঙ্গে তার কোথাও যোগ কোথাও বিয়োগ; যোগ দুজন স্বনিষ্ঠ পুরুষের হাত ধরাধরি, বিয়োগ দুজন স্বনিষ্ঠ পুরুষের হাত ছাড়াছাড়ি। পূর্বপুরুষ উত্তরপুরুষকে দেয় আপন সত্যের স্মৃতি, উত্তরপুরুষ পূর্বপুরুষকে দেয় আপন সত্যের আভাস, কিন্তু সত্যকে কেউ কারুকে দিতে পারে না, সত্যকে আপনি উপলব্ধি করতে হয়। Self-education ছাড়া education নেই, education-এর নামে যা চলছে তা আমাদের ভাবতে দেওয়া নয়, আমাদের জন্যে ভেবে রাখা, আমাদের চলতে দেওয়া নয়, আমাদের চালানো। তার দ্বারা আমাদের উপকার হতে পারে, স্বপ্রকাশ হয় না। ইউরোপের আধুনিকতম স্কুলেরও উদ্দেশ্য শিশুকে গড়ে তোলা, মানুষ করা, তাকে একটা বিশেষ প্রভাবের মধ্যে বাড়তে দেওয়া। কিন্তু প্রতিভা যে আগুনের মতো, উৎকৃষ্টতম স্কুলও তার পক্ষে কাচের ঝাড়ের মতো কৃত্রিম, সে যখন দিব্য তেজে জ্বলে তখন কাচকে ফাটিয়ে খানখান করে। যে মানুষ হয় সে আপনি মানুষ হয়, সে নিজেই নিজেকে গড়ে, সে সব প্রভাব অতিক্রম করে। যাকে মানুষ করা হয়, গড়ে তোলা হয়, স্পষ্ট প্রভাবিত করা হয় সে একটি পোষা বাঘের মতো স্বভাবভ্রষ্ট, সে একটি breeding farm-এর ফসল, তাকে দিয়ে সমাজের শান্তিরক্ষা হয় কিন্তু সৃষ্টিরক্ষা হয় না, সৃষ্টি যে কেবলই আঘাত খেয়ে কেবলই চেতনালাভ, কেবলই অপ্রত্যাশিতের সাক্ষাৎ, কেবলই প্রত্যাশিতের গাফিলি। যারা বলে ভাবী বংশধরদের আমরা উন্নত করব তাদের শুভাকাঙ্ক্ষার তারিফ করতে হয়, কিন্তু তাদের সত্যিকার কর্তব্য নিজেদেরই উন্নত করা। ভাবী বংশধরেরা নিজেদের ভার নিজেরা নিতে পারবে এটুকু শ্রদ্ধা তাদের উপরে থাক। সত্যকে পথের শেষে পাবার নয় যে বয়েসের যারা শেষ অবধি গেছে তারাই পেয়েছে। পথের শেষ নেই, বয়সের শেষ নেই, সত্যকে পদে পদে পাবার, দিনে দিনে পাবার। শিশুর কাছে শিশুর অভিজ্ঞতাই সত্য, যতদিন-না সে বৃদ্ধ হয়েছে ততদিন তার পক্ষে বৃদ্ধের অভিজ্ঞতা হচ্ছে অকালবৃদ্ধতা।

কিন্তু শিশু যখন নিজের পায়ে চলতে গিয়ে পড়ে তখন সেই পতন কি তার পক্ষে ভয়াবহ নয়? নিশ্চয়। কিন্তু ততোধিক ভয়াবহ হিতৈষীর কাঁধ। নিধনে আর কিছু না বাঁচুক স্বধর্ম তো বাঁচে। ভ্রান্তি থেকে আর কিছু না পাওয়া যাক সত্যকে তো পাওয়া যায়। মানুষের ছ-টা রিপু ছাড়া আর একটা রিপু আছে, সপ্তম রিপু, সে-রিপুর নাম ভয়। আশ্চর্য এই যে, ছয় রিপুর বিরুদ্ধে আমাদের দেশে অনুশাসনের অন্ত নেই, কোন আদিকাল থেকে আমরা এদেরই সঙ্গে বজ্র আঁটুনি এঁটে আসছি, অথচ এদের প্রত্যেকের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ও সকলকে জড়িয়ে বিরাট যে ভয়রিপু তাকে আমরা ধর্তব্যের মধ্যে আনিনি।

আমরা ভীরু নই, আমরা প্রেমিক, আমাদের যৌবনধর্ম আমাদের অন্তরের ধন, আমাদের প্রাণের চেয়ে প্রিয়। মুক্তি যদি ভয়ের থেকে মুক্তি না হয় তবে মুক্তি আমরা চাইনে, আমাদের একমাত্র মুক্তি জন্ম থেকে মুক্তি নয়, মৃত্যু থেকে মুক্তি নয়, ভয় থেকে মুক্তি—জরা থেকে মুক্তি। কামক্রোধাদি রিপু এর তুলনায় নগণ্য; ভয়কে যদি জয় করতে পারি তো তাদের পায়ে দলতে পারব। ভয়ই তো শয়তান, স্রষ্টার শত্রু, সৃষ্টির পতনকামী, পাপের মন্ত্রদাতা। আমরা যৌবনের প্রতি একনিষ্ঠ থেকে ভয়ঞ্জয় হব, আমরা দিগন্তগ্রাসী তামসিকতার মাঝখানে আলোকনিষ্ঠ প্রদীপের মতো জ্বলব। অপরিমেয় শূন্যের মাঝখানে সূর্য যেমন যুগযুগান্তকাল জ্যোতি বিকিরণ করছে, সে জ্যোতি কত সামান্য দূর পৌঁছোয় মনেও আনছে না, চির সমস্যাময় দেশে আমরাও তেমনি চিরজীবনকাল আভা বিকিরণ করব, সে আভায় কোন সমস্যা কতটুকু ঘুচল হিসাব করব না। সমস্যা প্রতি দেশে ও প্রতি যুগে আছে এবং সমস্যা সর্বত্র ও সর্বক্ষণ এক সহস্র এক। সুদূরতম ভবিষ্যতেও এর অন্যথা হবার নয়। লক্ষ বর্ষ পরেও এ পৃথিবী (যদি থাকে তো) এমনই সমস্যাময় থাকবে, সেকালের মানুষের সেকেলে মন একে এমনই অমনোমতো ভাববে, সেকালের আদর্শবাদীদের কাছে এর অপূর্ণতা এমনই অসহনীয় বোধ হবে। সমস্যা দূর করবার জন্যে মানুষ নয়, সমস্যাকে ছাড়িয়ে ওঠবার জন্যেই মানুষ। সমস্যা সত্ত্বেও কী করে উঠতে পারি, কী হয়ে উঠতে পারি এই আমাদের ভাবনা। সমুদ্রকে সেচে ফেলার চেষ্টা বৃথা, সমুদ্রের উপরে ভেসে চলতে পারি কি না দেখতে হবে।

সমস্যা আছে বলেই ভাবিনে। ভাবি সমস্যার দ্বারা যাতে অভিভূত না হই। দুঃখ আছে বলে দুঃখ নেই। দুঃখ, পাছে শেষ পর্যন্ত খাড়া না রই। বাইরের প্রতিকূলতাকে ভয় করিনে, ভয় করি আপন অন্তরের ভীরুতাকে। ভূতের ভয়ে মানুষ ভগবানকে ভক্তি করে, আপনার ভয়ে আমরা আপনাকেই ভক্তি করব। আত্ম-অবিশ্বাস মানে আত্মঘাত। যৌবনের পদে পদে বিপদ, সারাটা পথ অনিশ্চিত। প্রতিদিন পরীক্ষা, চিরকাল হতাশা। অপরিসীম কষ্টস্বীকার, অপরিসীম ধৈর্যধারণ, অপরিসীম উৎসাহরক্ষা। অবিশ্রাম গতিবেগ, অবিরাম পরিবর্তন, অনাসক্ত ত্যাগভোগ। যৌবন যে সৃষ্টিকাল, সৃষ্টি যে চির প্রসববেদনা, সেই বেদনায় যাকে টানল তার কেন শান্তি-স্বস্তির প্রত্যাশা? সেই বেদনাই তার সৌভাগ্য।

তারজন্যে দুঃখের শেষে সুখ নেই, কেননা দুঃখের শেষ নেই। মর্তের শেষে স্বর্গ নেই, কেননা মর্তের শেষ নেই। তপস্যার শেষে বর নেই, কেন না তপস্যার শেষ নেই। চলতে চলতে যখন যা আসে তা-ই তার সুখ, কাঁটায় কাদায় ধুলোয় ভরা চলার পথই তাঁর স্বর্গ আর চলতে পারাটাই তার বর। যৌবনকে যে অন্তরে ধারণ করলে সে-ই তো ব্রহ্মচারী, তার ব্রহ্ম যৌবনময় ব্রহ্ম। তার সন্ন্যাস বড়ো কঠিন সন্ন্যাস, কেননা মোক্ষ তার নেই। যে বেদনায় সূর্য তারাকে অবিশ্রান্ত ঘোরাচ্ছে, সেই বেদনা তাকে অবিশ্রান্ত পথে চলায়, জীবন থেকে জীবনে নিয়ে চলে, অস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে। নির্বাণ? জ্যোতির্লোকের কি নির্বাণ আছে? নিজেকে নির্বাপিত করে সে-লোক থেকে যে দূরে সরে গেল সেই বিগতজ্যোতি চন্দ্রকেও ঘুরে মরতে হচ্ছে। সেই নির্বাণ কি কারুর কাম্য? মুক্তি? যতদিন না জগতের কণামাত্র বস্তু সৃষ্টিচক্র থেকে মুক্তি পায় ততদিন মহামানবেরও মুক্তি নেই, যে বাঁধনে পরমাণুকে বেঁধেছে সেই বাঁধনে তিনিও বদ্ধ। শেষ দিন কোনোদিন আসবার নয়, সৃষ্টির শেষ নেই। নিজেরও শেষ খুঁজে পাবার নয়, শেষ পেয়েছি ভাবলেও পাওয়াটা সত্য নয়, ভাবনাটাই মিথ্যা। আত্মঘাতী যখন জীবনকে শেষ করেছি ভাবে তখনও সে বেঁচে। মরণ কেবল এক জীবন থেকে মুক্তি, আরেক জীবনে বাঁধাপড়া। বিশ্বসংসার থেকে পালাবার পথ যখন নেই তখন মানবসংসার থেকে পালাবার প্রয়াস কেন? এ সংসারে যদি আনন্দ না থাকে তো কোন সংসারেই-বা আছে?

নির্বাণের তপস্যা আত্মহত্যার তপস্যা, মুক্তির তপস্যা পলায়নের। আমাদের তপস্যা সৃষ্টির তপস্যা, আমরা বিশ্বস্রষ্টার সহস্রষ্টা, তাঁর সঙ্গে আমাদের সাদৃশ্য সাহচর্য। আমাদের পদে পদে মোহভঙ্গ, তবু আমরা চিরপদাতিক। আমাদের চোখে নিদ্রা থাকবে না, তবু আমরা খোলা চোখের স্বপ্ন দেখব। আমাদের বাহু নেতিয়ে পড়বে, তবু আমরা আনন্দলোক সৃষ্টি করতে থাকব। ভারতবর্ষের তরুণ তাপসের কত দায়িত্ব। যে সৃষ্টি তার জন্যে অপেক্ষা করছে সে কি সামান্য সৃষ্টি! সে কী এত তুচ্ছ যে একটু-আধটু জোড়াতালির সাপেক্ষ! দু-দশটা সংস্কার বিপ্লবের ব্যাপার! কঠিনতম বলেই তো তার দ্বারা পৌরুষের আত্মপরীক্ষা, প্রতিভার নব নবোন্মেষ, প্রেমের দেশব্যাপী প্লাবন। লক্ষ বর্ষ পরেও সাধের ভারতবর্ষ সৃষ্টি হতে থাকবে, সৃষ্ট হয়ে উঠবে না, উত্তরোত্তর পুরুষের পৌরুষকে প্রতিভাকে প্রেমকে এমনই সৃষ্টিতৎপর রাখবে, ছুটি দিয়ে বন্ধ্যা করবে না। আমাদের কয়েক সহস্র বর্ষের ইতিহাস তো ইতিহাসের ভূমিকা, এখনও আমাদের সকল হওয়াই বাকি, আমাদের হয়ে-ওঠা অনন্তকাল চলবে। ভারতবর্ষের তরুণ তাপসকে প্রতিমুহূর্ত সতর্ক থাকতে হবে, পাছে কখন মার এসে বলে, 'আমি ভানুমতীর ম্যাজিক জানি, চোখের সামনে ফল ফলিয়ে দেব, আমাদের scheme সদ্যফলপ্রদ।' যা-কিছু তপস্যাকে সরল সংক্ষিপ্ত করে দেয় তাই তপস্বীর প্রলোভন। তপস্যার অন্তক তপস্বীরও অন্তক। সফলতা যার কাম্য নয় তাকে ফলের লোভ যে দেখায় সে-ই তো কাম, তাকে ভস্ম করতে হবে। ফল আপন সময়ে আপনি আসে, তার জন্যে উদগ্রীব আগ্রহে ফুল-ফোটানো ফেলে রাখব না, ফুলের ঋতুতে ফুটে উঠে ফলের ঋতুতে ফলব। একটি ঋতুকে বাদ দিলে কোনোটিরই স্বাদ পাইনে। দশ মাস গর্ভে না ধরে যাকে পাওয়া যায় তাকে পাওয়ার চেয়ে মৃতবৎসা হওয়া বরং আনন্দের। জীবনের কোনো অনুভূতিকেই পরবর্তী অনুভূতির খাতিরে লাফ দিয়ে অতিক্রম করা চলে না, পরিপূর্ণ দাম্পত্যের পরে পরিপূর্ণ বাৎসল্য।

সংস্কার ও বিপ্লব বাইরের জিনিস, সুস্থ সমাজে ও দুটো আপনা-আপনি হতে থাকে, সুস্থ দেহে যেমন ত্বক বদলায়। ওদের চেয়ে বড়োকথা সমাজের স্বাস্থ্যবিধান, রক্তের জোর অটুট রাখা, হৃৎপিন্ডের ক্রিয়া অবিকল রাখা। এরজন্যে চাই অন্তরের উদ্বোধন, অন্তরের দিক থেকে বাইরে সৃজন। এ ক্রিয়া যখন পূর্ণ তেজে চলে তখন ভাত কাপড়ের ভার নিতে একটুও বাজে না, বরং সে-ভার বইবার আনন্দ হয় স্বতঃস্ফূর্ত। অন্তর যখন প্রাণোচ্ছল হয় তখন দেহধারণের অসীম আনন্দ মানুষকে জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর সীমা ভুলিয়ে দেয়, মানুষ কঠিন কিছু করতে পেলে বেঁচে যায়, সাধ্যসাধনা তাকে পীড়িত করে, হাতে হাতে ফললাভ তার পক্ষে demoralisation—চরিত্রভ্রংশ। সেইজন্যে তরুণ ভারতকে নিতে হবে অন্তরের দিক থেকে সৃষ্টি করবার ব্রত। বাইরের দিক থেকে বদলে যাওয়া তা হলে আপনা-আপনি হতে থাকবে, দম দিলে ঘড়ির কাঁটা আপনা-আপনি চলে, সারাক্ষণ হাতে ধরে চালিয়ে দিতে হয় না। আমাদের সবচেয়ে বেশি দরকারি অন্তরের মধ্যে যৌবনকে অনুভব করা। দেহ-মনের স্তর ভেদ করে আত্মা থেকে যৌবনরস উৎসারিত করতে হবে, যেমন মাটি-পাথরের স্তর ভেদ করে artesian well থেকে জল উদ্ধার করা হয়। এই খননকার্যে শ্রান্তি নেই, ক্ষান্তি নেই, শেষ নেই। সেইজন্যে এই কার্যই তরুণ ভারতের আত্মসম্মানের উপযুক্ত। এরচেয়ে সহজ কাজ তার পক্ষে অপমানকর। সে তো ফাঁকি দিতে চায় না, সে কাজই দিতে চায়। কিন্তু সে-কাজ যদি কঠিনতম না হয় তবে তার পৌরুষ লজ্জা পায়, তার অন্তর সায় দেয় না, সে বেগার খাটতে খুঁতখুঁত করে ও প্রেরণার অভাবে বেকার বসে রয়। স্বতঃস্ফূর্তির কাজ তো কেবল কাজ নয়, সে খেলা। খেলার আনন্দ যখন কাজের আনন্দের সঙ্গে মিতালি পাতায় তখন বেদনার থেকে ভার চলে যায়, দুঃখের থেকে হুল চলে যায়, কাজও হয় অকাজের বহুগুণ। তখন একে একে দেশের সবই হয় এবং যা সকলের কল্পনারও অতীত তাও কেমন করে হয়ে উঠে আশ্চর্য করে দেয়।

ঘর ছেড়ে যদি বাহির হই তো আমরা সুলভ অভিসারে বাহির হব না, আমরা তারই অভিসারে বাহির হব যাকে সর্বস্ব দিয়েও কেউ কোনোদিন পায়নি ও পাবে না, আমরা চাই পূর্ণ পূর্ণতম অমৃতঘন চির কৈশোরকে। Rolland-এর এই মন্ত্রটি যেন আমাদের মন্ত্রণা দেয়—'Always to seek, always to strlve, NEVER to find, never to yield'.

তারুণ্য ধর্ম

রোজ সকালে উঠে আমাদের এই অতি পুরাতন প্রকৃতি সুন্দরীর সজ্জাটা যখন দেখি তখন এক বারও কি মনে হয় ইনি আমাদের বড়ো প্রাচীনা বড়ো প্রবীণা বড়ো মাননীয়া ঠাকুমাটি? চুপি চুপি বলছি, বরং মনে হয় ইনি ঠাকুমার নাতবউ বুঝি-বা! এই প্রথম এঁর সঙ্গে শুভদৃষ্টি ঘটল, শ্রীঅঙ্গে এঁর নববধূর সাজ।

আজকের এই ষোড়শী প্রকৃতির দিকে চেয়ে চোখে আর পলক পড়ে না। চোখের অপরাধ কী বলো? চোখ তো নিত্যনূতনের প্রেমিক। যে তার প্রেমের মূল্য বোঝে সে আপনাকে নিত্যনূতন করে দেখায়। আমাদের এই প্রকৃতি ঠাকুরুন সেই সংকেতটি জানেন বলে এঁর কোটি মন্বন্তরের বয়সটাকে এমন বেমালুম কাঁচাতে পারেন যে আমাদের তো কিছুতেই বিশ্বাস হয় না ইনি আমাদের চেয়ে একটা দিনেরও বড়ো। এই চিরযৌবনা উর্বশী একদিন বিক্রমের সমবয়সিনি ছিল, আজ অর্জুনের সমবয়সিনি। এর কাছে পূর্বপুরুষ উত্তরপুরুষ সমানই, চিরকাল এ পুরুষের প্রেয়সী।

যা সনাতন তা যুগে যুগে নূতন। পুরাতনত্বের জাঁক সে করে না। তার বয়স কত সে-পরিচয় তার মুখে লেখা নেই; সে-পরিচয়ের জন্যে মাটি খুঁড়তে হয়, পাথর মাপতে হয়, ভূতত্ত্ব খ-তত্ত্বের পাঁজি পুরাণ ঘাঁটতে হয়। এত করেও প্রমাণ হয় না এই অনাদিকালের অসীমা প্রকৃতির বয়স কত, যার বয়সের হিসাব চলে সে এর এক এক প্রস্থ সাজ, এক-একটা দিনের বহির্বাস। কোটি গ্রহ-তারার কোটি বৎসর পরমায়ু অখন্ড সৃষ্টির অনাদ্যন্ত আয়ুর তুলনায় তুচ্ছ।

যা সনাতন তা নূতনের মধ্যে ফিরে ফিরে সত্য, ফিরে ফিরে স্বপ্রকাশ। মিথ্যা কেবল ওই পুরাতনটা, ওই ছাড়া শাড়িখানা, ওই ঝরাপাতা মরা পাতার রাশ। ও যখন নূতন ছিল তখন সত্য ছিল, তখন সনাতন ছিল। ওর দিন ও নিঃশেষে ভোগ করেছে, ওর জীবনের একটাও দিন ও বাদ দেয়নি। এখন তবে ও কীসের অধিকারে ভূত হয়ে চেপে বসতে চায়, চিরদিনের হতে চায়? যে বারে বারে নূতন হয়, জন্মে জন্মে বাঁচে সে তো পুরাতন পাতা নয়, সনাতন সজ্জা, সে তো যৌবনান্তিম জরা নয়, যৌবনায়মান প্রাণ। প্রকৃতিরই ষোড়শী হবার অধিকার আছে, আমাদের ঠাকুমার নেই। তবু যখন ঠাকুমা অবুঝের মতন আবদার ধরেন, 'নাতির মধ্যে আমি বাঁচব', তখন সে-আবদারকে আমরা অধিকার বলিনে, সে অনধিকারচর্চাকে আমরা উৎপাত বলি। আমরা বলি, 'বড়ো দুঃখিত হলুম ঠাকুমা। কিন্তু নিজেদের জীবনটাকে আমরা নিজেরাই বাঁচাব ঠিক করেছি। আমরা চিরপুরুষের নব অবতার, আমরা পূর্বপুরুষের পুনর্মুদ্রণ নই ঠাকুমা।'

অনাদি অনন্তকালের শাখায় যে পাতাগুলি এক বসন্তে ধরেছিল তারা যখন বলে, 'আর বসন্তের পাতাগুলোর আমরা পূর্বপুরুষ, তাদের মধ্যে আমরা নিজেদের দেখব; ''ন হি পুত্রস্য কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্তু কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি;'' তাদের আর কোনো কর্ম নেই; কেবল আমাদেরই প্রীত্যর্থে প্রাণধারণ; তাদের আর কোনো ধর্ম নেই, কেবল পিতা স্বর্গঃ আর জননী স্বর্গাদপি' তখন নূতন পাতাদের হাসি পায়। তারা বলে, 'তোমাদের সঙ্গে আমাদের কীসের সম্বন্ধ? শুধু পরম্পরাগত সম্বন্ধ বই তো নয়! তোমরা আগে বেঁচেছ, আমরা পরে বাঁচছি। অনাদিকালের অনুপাতে আগে বাঁচার মূল্য যা অনন্তকালের অনুপাতে পরে বাঁচার মূল্য তাই। তোমাদের মধ্যে যদি আমরা না বেঁচে থাকি তো আমাদের মধ্যে কেন তোমরা বাঁচবে? আমাদের ফরমাশ যদি তোমরা না খেটে থাক, আমাদের প্রত্যাশা যদি তোমরা না পুরিয়ে থাক, আমাদের সাধ যদি তোমরা না মিটিয়ে থাক তবে তোমাদের ফরমাশ কেন আমরা খাটতে যাব, তোমাদের প্রত্যাশা কেন আমরা পুরাতে যাব, তোমাদের সাধ কেন আমরা মেটাতে যাব? আমাদের হাতে মাত্র একটি বসন্ত, একটু বর্তমান। এটুকু জীবনক্ষণ আমরা নিজেদেরই ইচ্ছামতো নিজেদেরই সাধ্যমতো

বাঁচতে চাই, আমরাই আমাদের কাছে সকলের চেয়ে সত্য। যা যায় তা পুরাতন, তা প্রাণ-নিঃস্ব। যা রয় তা সনাতন, তা চিরপ্রাণ। আমাদের মধ্যে পূর্বপুরুষের কিছুই রইলো না, চিরপুরুষের সকলই রইলো।'

'কিন্তু আমরা যে তোমাদের প্রাণ দিয়েছি, জ্ঞান দিয়েছি, সমাজে স্থান দিয়েছি!—'

'দিয়ে দেবার আনন্দ উপলব্ধি করছ। পিতা হবার, গুরু হবার, সমাজসেবী হবার সুযোগ সৌভাগ্য লাভ করছ। সে-উপলব্ধি ও সে-লাভ আমাদের কাছ থেকে লব্ধ। ঋণগ্রহণ করেই আমরা ঋণশোধ করেছি, পিতৃঋণ ঋষিঋণ দেবঋণ থেকে আমরা মুক্ত।'

'তোমাদের যে আমরা ভালোবাসি, সে ঋণ থেকে!'

'সে-ঋণ দুই তরফা। তা বলে ভালোবাসার নামে অনধিকারচর্চা চলবে না। আগে স্বাধীনতা, তারপরে প্রেম।'

নূতন পাতারা বলে বটে একথা, কিন্তু বৎসর না ঘুরতেই ভুলে যায়। পরের বসন্তে তাদেরও মুখে সেই প্রাচীনতম বুলি। এমনি করে যুগের পর যুগ যায়, যুগের আগে যুগ আসে। কিন্তু জরা-যৌবনের সেই অনাদিকালের দ্বন্দ্বটা অনন্তকালেও থামবার নয়। সেটাও নিত্য সনাতন।

মৃত্যুর চেয়ে জরা ভীষণ। অনবচ্ছিন্ন যৌবনপ্রবাহের মৃত্যু একটা বাঁক, জন্ম তার উলটোপিঠ। কিন্তু জরা তার চড়া, তাকে তিলে তিলে শোষণ করে, নিঃস্বত্ব করে। মৃত্যুর পরেও যৌবন আছে, কিন্তু জরার মধ্যে যৌবন নেই। যৌবন যেন ঠাসবুনন, মৃত্যু তাকে যেখান থেকেই ছিঁড়ে নিক সে অল্পের মধ্যে সম্পূর্ণ। আর জরা যেন জাল-বুনন, যত দীর্ঘই হোক ফাঁকা ফাঁকা। 'One crowded hour of glorious life' হচ্ছে যৌবন, 'an age without a name' হচ্ছে জরা।

সেইজন্যে যৌবনের সত্যিকার বিপদ মরা নয়

জরা, বদলানো নয় বন্ধ হওয়া, ভাঙা নয় বাঁকা, নষ্ট হওয়া নয় স্বভাবভ্রষ্ট হওয়া। প্রতি বৎসর বিশ্বজরার সঙ্গে বিশ্বযৌবনের দ্বন্দ্ব বাঁধে, যৌবন আক্রমণ করার দ্বারা আত্মরক্ষা করে, জরা আত্মরক্ষার আশায় হটতে হটতে যায়; যৌবন আপনাকে বাড়াতে গিয়ে বাঁচে, জরা আপনাকে বাঁচাতে গিয়ে মরে। শীতের শুষ্কপাতা ঝরিয়ে দিয়ে বসন্তের কিশলয় দেখা দেয়, জ্যৈষ্ঠের জীর্ণ মাটি ভাসিয়ে নিয়ে শ্রাবণের বন্যা তাজা মাটি বিছিয়ে যায়। একের মরণ, অপরের জন্ম। কিন্তু উভয়ের ভিতর দিয়ে একই যৌবনের উষ্ণ রক্তপ্রবাহ।

এই উষ্ণ রক্তপ্রবাহ না হলে যৌবন বাঁচে না। তার বাঁচা তো কায়ক্লেশে বেঁচেবর্তে থাকা নয়, ক্ষীণজীবীদের পিন্ডার্থে ক্ষীণতরজীবীদের বংশান্বয় রক্ষা নয়, বালুকাগ্রস্ত ফল্গুপ্রবাহের মতো জরাগ্রস্ত অস্তিত্বটুকুকে অতি সন্তর্পণে টিকিয়ে রাখা নয়। তার বাঁচা আপনাকে প্রবলভাবে জাহির করা দিকে দিকে, প্রগাঢ়ভাবে বইয়ে দেওয়া স্রোতে স্রোতে। তার প্রতিভার আত্মপ্রকাশ সর্বতোমুখী, তার প্রেমের আত্মোপলব্ধি সর্বরসে। এমন বাঁচায় বিঘ্ন আছে, বিপদ আছে, মরণ আছে; কিন্তু পরোয়া নেই, হিসাব নেই, আপশোস নেই। যার প্রচুর আছে সে প্রচুর উড়িয়ে দিতে পারে, জীবন খোয়ালেও তার জীবনের অভাব হয় না। প্রাণহানি নয়, প্রাচুর্যহানিই তার মৃত্যু; প্রাণরক্ষা নয়, প্রাচুর্যরক্ষাই তার সমস্যা।

Struggle for existence যার সমস্যা সে নিছক প্রাণী, প্রাণের ওপরে উদ্বৃত্ত তার নেই। সে বৃদ্ধ, তার বৃদ্ধি পরিমিত, তার ভাবনা অভাবাত্মক। সে নিজেকে বাঁচাবে বলে নিজেকে ত্যাগ করতে করতে চলে, কচ্ছপের মতো আকাশকে ছাড়ে আপনাকে ঢাকে, অর্জনের ওপরে নয় সঞ্চয়ের ওপরে বাস করে। সে যতটুকু চলে তার বেশি দ্বিধা করে, যতটা দ্বিধা করে তার বেশি সন্দেহ করে, যতটা সন্দেহ করে তার বেশি ভয় করে। জীবনের জারকরস তার ফুরিয়ে এসেছে, সে গ্রহণ করতে পরিপাক করতে পারে না; আত্মসাৎ করতে, বৃদ্ধি পেতে পারে না। সন্ধান করবার অক্লান্ত উৎসাহ তার নেই, জয় করবার উন্মাদ সংকল্প তার নেই। সে শেখানো মন্ত্র নিষ্ঠার সঙ্গে জপ করে, পায়ের চেয়ে লাঠির ওপরে ভর করে বেশি।

তার সত্য নিরুপদ্রব নিশ্চিন্ত সত্য, যে সত্য মায়ামৃগের মতো ধরাছোঁয়ার নিত্য অতীত নয়, যে সত্যে নিত্য অভিসারের অসহ্য শ্রম, অসহ্য ব্যর্থতা ও অসহ্য কলঙ্ক নেই, যে সত্য সদ্যফলপ্রদ স্বপ্নাদ্য মাদুলির

মতো সস্তা এবং বুড়ো-ভোলানো। তার প্রেমের আদর্শে প্রেমাস্পদকে অর্জন করবার জন্যে তপস্যার দরকার করে না, রক্ষা করবার জন্যে পুনর্তপস্যার তাগিদ নেই, সমৃদ্ধ করবার জন্যে তপস্যারও যা অধিক সেই সৃষ্টিশীল প্রতিভার নব-নবোন্মেষ নেই। সর্বাগ্রে জাতি-কুল-বিত্ত-প্রতিপত্তি, তারপরে কর্তৃজনের সুখ-সম্মান-সুবিধা, তারপরে নিজের রূপগুণের পছন্দ। তারপরেও যদি এতটুকু ফাঁক থাকে তবে অত্যন্ত নিরাপদ একান্ত ভ্রমপ্রমাদহীন সম্পূর্ণ টেকসই বেড়া-দেওয়া চিহ্নিত-করা সাধুসম্মত প্রেম! সতর্কতার আর অন্ত নেই! পৃথিবীসুদ্ধ তার প্রতিকূল। গায়ে একটু বাতাস লাগলে হাড় ক-খানা পর্যন্ত এমন খটাখট আওয়াজ করে ওঠে যে চৌচির হয়ে খুলে পড়বে বুঝি-বা! গেল গেল গেল! প্রাণ গেল, মান গেল, ধর্ম গেল, সমাজ গেল! এবং ইদানীং শোনা যাচ্ছে, সাহিত্য গেল! যদি বলি, গেল তো আপদ গেল, ‘কালোহ্যয়ং নিরবধি:’, আবার আসবে, তবে অক্ষমের না আছে ক্ষমতা, না আছে বিশ্বাস, না আছে আশা, আছে কেবল হা-হুতাশ আর অভিশাপ।

Struggle for intense living তার সমস্যা যে প্রাণী নয় প্রাণবান, জীব নয় যুবা। দুই হাতে বিলিয়ে দেবার মতো ঐশ্বর্য, দুই ধারে ছড়িয়ে দেবার মতো বীর্য, দশদিক আলো করবার মতো আভা, এরই জন্যে তার ভাবনা; এ ভাবনা অভাবাত্মক নয়, ভাবাত্মক। সে চায় ঘনীভূত জীবন, আরও আরও আরও প্রাণ। সে চায় প্রাচুর্যান্বিত বৈচিত্র্যান্বিত সাহসান্বিত জীবন, যার অপর নাম যৌবন। সে চায় অজরত্ব, নিছক অমরত্ব তার কাছে তুচ্ছ।

পরের হাত থেকে অমনি সে কিছু নেয় না। সেইজন্যে পিতৃজনের দেওয়া জীবনটাকে হাজারো বার বিপন্ন করে সে আপনার করে নেয়, পিতৃগণের দেওয়া সত্যকে সে ভেঙেচুরে পুড়িয়ে গলিয়ে পুনর্সৃষ্টি করে। কিছুই তার কাছে অতি প্রাচীন বলে অতি পবিত্র নয়, লক্ষ বার পরীক্ষিত সত্যকেও সে লক্ষ বার পরীক্ষা না করে মানে না, বিনা যুদ্ধে সে সূচ্যগ্র পরিমাণ প্রতীতি দেয় না; প্রতিভার ক্ষুধায় সে যেখানে যা পায় তাই কাজে লাগায় আর সৃষ্টির সুধায় তাকে অনির্বচনীয় রূপ দেয়। প্রেমের বাহু বাড়িয়ে সে আকাশের চাঁদ পেড়ে আনে আর হৃদয়ের শক্ত মুঠোয় তাকে প্রতিদ্বন্দ্বীদের হাত থেকে ছিনিয়ে রাখতে থাকে।

তবু আসক্তিতে তার সুখ নেই। একদিন যা প্রাণভরে কামনা করে, অন্যদিন তা হাতে পেয়েও রাখে না। হারাতে হারাতে কী যায় কী থাকে সেদিকে তার খেয়াল নেই, তার খেলা খেলনাভোলার খেলা, খেলা যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেই তার তপস্যা। নিজের জন্যে সে চরম সৌভাগ্যকেও চরম মনে করে না, দেশের জন্যে সে উজ্জ্বলতম ভবিষ্যৎকেও যথেষ্ট উজ্জ্বল জ্ঞান করে না, জগতের জন্য সে যে আনন্দ আকাঙ্ক্ষা করে সে-আনন্দের সংজ্ঞা হয় না। ক্রমাগত সীমা ছেড়ে চলাই তার দেহ-মনের ধর্ম, কোনো কিছুকে আঁকড়ে ধরলেই তার মনে মরচে ধরে, দেহে কুঁড়েমি বাসা বাঁধে। কতদূর যে তার অধিকার, কত প্রশস্ত তার পরিধি আগে হতে কেউ তা ঠিক করে রাখেনি, নির্ভুলভাবে কোনো গুরুই তা ঠিক করে দিতে পারে না। নিজেকে কেবলই বিস্তীর্ণ, কেবলই বিচিত্র করতে করতে তার কতজনের সঙ্গে কত প্রথার সঙ্গে বিরোধ বাঁধে, সন্ধি হয়, পুনরায় বিরোধ বাঁধে; মরার আগে শেষ মীমাংসা হয় না, মরার পরেও শেষ মীমাংসা নেই।

এহেন যে যুবা তার প্রতি বৃদ্ধের সহানুভূতি অসম্ভব। একের সমস্যা অপরের অবোধ্য। বৃদ্ধ কখনো ধারণা করতে পারে না যুবা কী চায়, বিশ্বাস করতে পারে না সে-চাওয়া ভালো, স্বীকার করতে পারে না সে চাওয়া সত্য। বৃদ্ধ এসে সীমায় ঠেকেছে, তার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, চলৎশক্তি আড়ষ্ট, কল্পনাশক্তি ক্লান্ত, কেবল আতঙ্কবোধ তীব্র। ভালো মনে কিন্তু ভীতু মনে কখনো তার পায়ে শিকল পরিয়ে কখনো তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে কখনো তার মনে সংস্কার প্রবেশ করিয়ে বৃদ্ধ যুবাকে বাধাই দিতে ব্যগ্র, অনুগত করতে ব্যস্ত, মনোমতো করতে উৎকণ্ঠিত। পাঠশালায় বৃদ্ধই শিক্ষা দেয়, যুবা শিক্ষা পায়। সমাজে বৃদ্ধই শাসন করে, যুবা শাসিত হয়। শিক্ষা ও শাসন ধাতুগতভাবে একই; তাকে ভালোবেসে নিতে হয় না, মেনে নিতে হয়; তারমধ্যে এক পক্ষের আত্মসম্মানের চেয়ে অপর পক্ষের আত্মপ্রেস্টিজ বেশি। Superiority complex-এ গর্বান্ধ হয়ে অবশেষে আর্টকেও শিক্ষার বাহন শাসনের যন্ত্র বানাতে চায় স্কুলমাস্টার, পাহারাওয়ালার দল। প্রতিভাকে ভারাক্রান্ত ও

প্রেমকে পাশবদ্ধ করে তাদের শঙ্কা কমেনি, সৃষ্টিতেও তারা ফরমাশ খাটাবে; মানবাত্মাকে তার শেষ আনন্দ থেকে, স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশ থেকে, art for art's sake থেকে নিরস্ত করবে; নিরুদ্দেশ্য লীলার ওপরে আর্টে তাদের কৃপণ মনের উদ্দেশ্য চাপাবে। এই তাদের মনস্কামনা।

বৃদ্ধ হচ্ছে ভূতের চেয়ে ভয়াবহ। ভূত তবু আপন জীবনটুকুর ভূত, পরের জীবনটুকুর উপরে তার লোভ। বৃদ্ধ কিন্তু আপন যৌবনটার ভূত, পরের যৌবনটার সঙ্গে তার বাদ। জীবনের চেয়ে যৌবনের মূল্য বেশি। জীবনকে যে হরণ করে, সে সামান্যই হরণ করে, যৌবনকে যে হরণ করে সে সর্বস্ব হরণ করে। কাঁচা চুলকে উপড়ে দিলে বাজে কিন্তু বাধে না, কাঁচা চুলকে পাকিয়ে দিলে সর্বনাশ। মরার বাড়া গাল নেই, কিন্তু মরার বাড়া দুর্গতি আছে, সে-দুর্গতি জরা। এ দুর্গতির অনেক ছদ্মবেশ, অনেক ছদ্মনাম, অনেক ছদ্মলক্ষণ। যৌবনের তপোভঙ্গের জন্যে জরা যেসব চর পাঠায় তারা শনির মতো কোন ছিদ্রে যে ভিতরে প্রবেশ করে আর ভিতর থেকে মেরুদন্ডটিকে ক্ষয় করে আনে, প্রথম থেকে তা বোঝা যায় না এবং অনেক পরে যখন বোঝা যায় তখনও আসল ব্যাধিটার চিকিৎসা না করে চিকিৎসা করা হয় আনুষঙ্গিক উপসর্গগুলোর। এবং ভিতর থেকে বলাধান না করে বাইরে থেকে করা হয় উত্তেজক প্রয়োগ। ফলে হয়তো রোগী বাঁচে, কিন্তু সে-বাঁচা রোগকে নিয়ে বাঁচা, একটার পর একটা উপসর্গকে নিয়ে চিকিৎসকের মুখ চেয়ে টিকে থাকা, দৈবের দেওয়া মুষ্টিভিক্ষার প্রত্যাশায় কাঙালের মতো ধন্না দিয়ে পড়ে থাকা। এর মতো মরণ আর নেই, এ কেবল শ্বাসটুকু ছাড়া বাকি সমস্তটার পলে পলে মরণ।

জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ

এমন অনেক শিল্পীর কথা আমরা জানি যাঁদের হাতের ছোঁয়া লেগে পাষাণ হয়েছে অহল্যার মতো শাপমুক্তা সুন্দরী, কিন্তু যাঁদের নিজেদের জীবনের বেলায় তাঁদের শিল্পিত্ব খাটেনি। সেক্ষেত্রে তাঁরা অবস্থার দাস এবং তাঁদের জীবনের আদর্শও দুর্বল। অথচ শিল্পী নন এমন কোনো কোনো মানুষের জীবন এক-একখানি শিল্পসৃষ্টির মতো সযত্নরচিত, সুসংগত, অবান্তরতাবিহীন।

রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব এইখানে যে, তিনি তাঁর অপরাপর কাব্যের মতো করে তাঁর জীবনকালকেও ছন্দে মিলে উপমায়, ব্যঞ্জনায়, কল্পনার প্রসারে ও অনুভূতির গভীরতায় একখানি গীতিকাব্যের ঐক্য দিয়েছেন। সেটি বেশ একটি গোটা জিনিস হয়েছে, ভাঙা ভাঙা বা অসম্বন্ধ হয়নি, অন্তর্বিরোধসম্পন্ন বা অসংগতিবহুল হয়নি। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠকীর্তি তাঁর জীবন। তাঁর অন্যান্য কীর্তি বিস্মৃত হয়ে যাবার পরও তাঁর এই কীর্তিটি জীবিত মানুষের আন্তরিক যে জিজ্ঞাসা—'কেমন ভাবে বাঁচব?'—সেই জিজ্ঞাসার একটি সত্য ও নিঃশব্দ উত্তর হয়ে চিরস্মরণীয় হবে।

দেশের অতি বড়ো দুর্গতির দিনে যখন পরিপূর্ণ জীবনের আদর্শকে লোকে যুগপৎ উপহাস, ভয় ও সন্দেহ করছে তখন রামমোহন রায়ের জন্ম। এই মহাপুরুষ শাশ্বত ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করে তাকে একটি বৃহত্তর পরিধির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। এঁর কাছে রবীন্দ্রনাথ পেলেন দেশকালের অতীত হয়ে বাঁচবার দৃষ্টান্ত। আধুনিক ভারতবর্ষের জনক-ঋষি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের জনক। তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথ পেলেন ঋষি-দৃষ্টি ও মহত্ত্বের প্রতিনিয়ত আকাঙ্ক্ষা। ঠাকুর পরিবারে প্রাচীন ভারতবর্ষ ও আধুনিক পৃথিবীর সমন্বয় ঘটেছিল। যৌবনারম্ভে মহর্ষি উপনিষদের পৃষ্ঠা কুড়িয়ে পান ও মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে তাঁকে Geology-র গ্রন্থ পড়তে দেখা গেছিল। এই দুটি ঘটনা থেকে ঠাকুর পরিবারের আবহাওয়া অনুমান করা যায়। ধর্মে ও কর্মে, ত্যাগে ও ভোগে, কলায় ও বিদ্যায়, স্বাজাত্যে ও বিশ্বমানসিকতায় ঠাকুর পরিবারের শিক্ষা আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ ছিল। স্কুল-কলেজের অপেক্ষা রাখেনি। এই পরিবারের কাছে ও মধ্যে রবীন্দ্রনাথ পেলেন তাঁর বাল্য ও কৈশোরের শিক্ষা।

স্কুল-যন্ত্রের কবল থেকে অক্ষত দেহ-মন নিয়ে বেরোতে পারা রবীন্দ্রনাথের মতো শক্তিধর ব্যক্তির পক্ষেও অসম্ভব হত। ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন, রুটিন ও এগজামিনের যুগল হস্তের ঘন ঘন চপেটাঘাতে কল্পনাবৃত্তি অসাড় হয়ে যায় ও পাঠ্যপুস্তকে নিবদ্ধ হয়ে পর্যবেক্ষণশক্তি হয় আড়ষ্ট। পাছে প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘটে ও তার ফলে বিক্ষেপ জাত হয় তার দরুন স্কুলঘরের চারদিকে চারদেওয়াল প্রহরীর মতো খাড়া। 'যঃ পলায়তি সঃ জীবতি।' রবীন্দ্রনাথ স্কুল পালিয়ে নিজের শিক্ষার দায়িত্ব নিজের হাতে নিলেন। আজও সে-দায়িত্বে ঢিলে দেননি। তাঁর মতো বহুবিদ্য ব্যক্তি যেকোনো দেশে বিরল। কিন্তু অধীত বিদ্যা প্রচার করার চেয়ে বিদ্যার সৌরভ বিকিরণ করাই যথার্থ পান্ডিত্য। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাকে রসায়িত করে কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে পরিবেশন করেছেন, তা নিয়ে থিসিস লেখেননি। তাঁর লঘুতম রচনাতেও মার্জিত বুদ্ধির যে দীপ্তি দেখতে পাই সে-দীপ্তি অশিক্ষিত পটুত্বের নিদর্শন নয়। প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের সম্বন্ধে আমাদের একটা ভ্রান্তি আছে—তাঁরা বিনা সাধনায় সাফল্যলাভ করেন, যেহেতু তাঁরা দৈবশক্তিসম্পন্ন। রবীন্দ্রনাথ ডায়েরি রাখেননি, কিন্তু তাঁর ছিন্নপত্র থেকে জানি তিনি যেমন সব্যসাচী লেখক তেমনি সর্বভুক পাঠক এবং তাঁর পর্যবেক্ষণশীলতা ও কল্পনাকুশলতা কী প্রকৃতির সংসার, কী মানবের সংসার, উভয়ের অন্তর-বাহির পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবন করেছে।

স্কুল-কলেজে না গেলে ভদ্রসমাজে একঘরে হতে হয় এবং জীবিকা সম্বন্ধে অতি বড়ো ধনী সন্তানেরও ভয় থাকে। রবীন্দ্রনাথ অল্প বয়সে স্কুলত্যাগ করে তাঁর নিজের দিক থেকে ঠিক করলেও অন্য সকলে নিশ্চয়ই তাঁকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করেছিলেন ও তিনি ভুল করলেন বলে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিলেন। জীবনশিল্পী এমনি করেই নিজের পরিচয় দেন। পশুপক্ষীর ইনস্টিংক্টের মতো শিল্পীপ্রকৃতি মানুষের মধ্যেও ইনটুইশনের ক্রিয়া অমোঘ। কোন পথে মহতী বিনষ্টি তা ওঁরা লাভ-লোকসান তৌল না করে যুক্তিতর্কের মধ্যে না নেমে আপনার অপ্রবৃত্তি থেকেই উপলব্ধি করেন এবং আত্মহত্যার পথকে সমগ্র শক্তির সহিত পরিহার করেন।

রবীন্দ্রনাথের যৌবনোদগমে বিলাতযাত্রা তাঁর স্কুল পরিত্যাগেরই মতো একটি অর্থপূর্ণ ব্যাপার। তখনও আমাদের সমাজে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ ও অপ্রচলিত ছিল। অথচ বহির্বিশ্বের সঙ্গে পরিচয় কেবলমাত্র বিদেশি গ্রন্থ পাঠের দ্বারা হবার নয়। পৃথিবীতে এসে পৃথিবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল না, এর মতো দুঃখের কথা অল্পই আছে। বিশেষত যে-মানুষকে একদিন মানব মাত্রের বন্ধু হতে হবে, প্রতিভূ হতে হবে, মানব সম্বন্ধে তুলনামূলক জ্ঞান তাঁর সাধনার অত্যাবশ্যক অঙ্গ। গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করবার পূর্বে স্বদেশের সঙ্গে বিদেশকে ও নিকটের সঙ্গে দূরকে মিলিয়ে দেখা পূর্ব ও পশ্চিম উভয় মহাদেশের বহুকালীন আদর্শ। তার ফলে মাত্রাজ্ঞান জন্মায়, অহংকার ও মোহ কিছু কমে এবং নিজের ও পরের মাঝখানকার সত্যকার সীমারেখাটি আবিষ্কৃত হয়।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শোনা গেছে যে, তিনি জমিদার হিসেবেও বিচক্ষণ ছিলেন। কিন্তু বিচক্ষণ জমিদার হবার দরুন তাঁর বাণী তিক্ত, উদ্ধত বা বিষয়ীসুলভ হয়নি। পরন্তু বিচক্ষণ জমিদার হবার দরুন তাঁর রচনা রুগণ আদর্শবাদ ও গলদশ্রু ভাবালুতা থেকে মুক্ত। পরোপকার করতে চাইলেও করা উচিত নয়, যদি তার ফলে পরের আত্মসম্মান ও আত্মনির্ভরতা হয় বিড়ম্বিত। আমাদের দরিদ্রনারায়ণসেবা, কাঙালিভোজন ইত্যাদি আদর্শ এমন অস্বাস্থ্যকর যে, যথার্থ করুণা ও লোকপ্রীতির পৌরুষ তাতে নেই।

প্রাচীন ভারতবর্ষের গার্হস্থ্যের আদর্শই হচ্ছে সর্বদেশের সর্বকালের পূর্ণবয়স্ক মানুষের আদর্শ। তার মধ্যে ভোগ ও ত্যাগ, আনন্দ ও সংযম পাশাপাশি স্থান পেয়েছে। কেবল বিপন্নকে অভয়দান ও আতুরের সেবা নয়, অন্যায়কারীকে আঘাত ও অশিষ্টকে শাসনও তার অন্তর্গত। বিষয়সম্পত্তিকে উক্ত আদর্শ বিষের মতো পরিহার করতে বলেনি, বৃদ্ধি করতে রক্ষা করতে ও বিজ্ঞের মতো ব্যবহার করতে বলেছে। এই সম্পূর্ণতার আদর্শ সেকালে তথা একালে বহু মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। তাই সেকালে লোকে সন্ন্যাসী হয়ে যেত, একালে সোশ্যাল সার্ভিস নিয়ে মাতে। বিচিত্র সংসারের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কর্তব্যগুলোর প্রত্যেকটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করাতে চরিত্রের প্রতি অঙ্গের চালনা হয়। এই চালনাই স্বাস্থ্যকর। দুনিয়ার দুঃখদৈন্য দূর হল কি না সেটা ভাবতে যাওয়া অস্বাস্থ্যকর।

রবীন্দ্রনাথের গৃহস্থাশ্রমের দৃশ্য আমরা তাঁর সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের পত্রবিনিময়ের ফাঁক দিয়ে দেখতে পাই। ক্রমে ক্রমে যখন অন্যান্য চিঠিপত্রের বাতায়নদ্বার মুক্ত হবে তখন পূর্ণ দৃশ্যটি উদ্‌ঘাটিত হবে। সেটির এটা-ওটা করে অনেক রেখা ও রং আমাদের অপছন্দ হলেও আমাদের কাছে সমগ্র চিত্রখানির মূল্য কমবে না। রবীন্দ্রনাথ কাঁচা বা পাকা যা-কিছু লিখেছেন, হাতের লেখার দিক থেকে প্রত্যেকটি সুন্দর এবং সাহিত্যের দিক থেকে প্রত্যেকটি স্বকীয়। এর থেকে অনুমান হয় যে, তুচ্ছ বা মহৎ কোনো কাজই তাঁর পক্ষে হেলাফেলার যোগ্য নয় এবং তাঁর অন্তঃপ্রকৃতি সর্বমুহূর্তে সতর্ক থাকে পাছে তাঁর বহিঃপ্রকৃতিতে কিছুমাত্র কুশ্রীলতা বা মামুলিয়ানা প্রকটিত হয়ে পড়ে।

একালের মানুষ দিন দিন পল্লিকে ছেড়ে নগরে জুটছে। নগরের প্রধান আকর্ষণ তার নিত্যনতুন চমক, নিত্যনতুন খবর, নিত্যনতুন শিক্ষা, নিত্যনতুন সঙ্গ। এ আকর্ষণকে উপেক্ষা করা যায় না। কত অঞ্চলের কত দেশের মানুষের সঙ্গে দেখা হয়। তাদের সঙ্গে মিলিয়ে নিজের অভ্যস্ত আচার ও মনগড়া বিচারকে আমরা আর একটু উদার করি। কিন্তু হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র চরিতার্থতার জন্যে পল্লিই ছিল ভালো এবং পল্লিতে আমরা প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে পশুপক্ষী-বৃক্ষলতা-নদী-পর্বতের বৃহত্তর সমাজে ছিলুম। নগর যেমন নিত্যনতুন,

পল্লি তেমনি চিরন্তন। দুটোই সত্য এবং দুটোকে জড়িয়েই সত্য। রবীন্দ্রনাথ পল্লির প্রতি পক্ষপাত করলেও নগরকে বর্জন করলেন না। প্রকৃতির সুধা ও জনসংঘাত-মদিরা পান করে তিনি উভয় সত্যের স্বাদ গ্রহণ করলেন। পদ্মাবক্ষে নৌকাবাসের দিনগুলি আধুনিক যুগের নাগরিক মানুষের কাছে কেমন রোমান্সের মতো লাগে। অতটা নির্জনতা আমাদের সয় না। তাতে আমাদের আধ্যাত্মিক অগ্নিমান্দ্যের সূচনা করছে। পল্লি ও নগর উভয়কেই উপভোগ করতে পারা চাই। শুধু একবার চোখ বুলিয়ে গিয়ে উচ্ছ্বসিত হওয়া উপভোগ করা নয়। একান্তভাবে সভ্য ও আধুনিক হতে গিয়ে যা সৃষ্টি করব তা আধুনিকতার মতো অচিরস্থায়ী ও সভ্যতার মতো অগভীর হবে। অবিমিশ্র নাগরিক অভিজ্ঞতার উপদ্রব আমরা সাহিত্যে পোহাচ্ছি। চিড়িয়াখানায় গিয়ে জীবচরিত্র অধ্যয়ন করার মতো নগর থেকে কী মানবচরিত্র, কী বিশ্ব ব্যাপার, কোনোটার ঠিকমতো নিরিখ হয় না। বাস্তব বলে যাকে চালাই সেটা একটা বিশেষ অবস্থায় বাস্তব। বদ্ধঘরে প্রতিধ্বনির মতো জীবনের হাহাকারকে নগর অতিরঞ্জিত করে। জীবনের দুঃখদৈন্যগুলোকে অপরিমিত কালের পটভূমিকায় প্রসারিত করলে তাদের সত্যিকারের পরিমাণ উপলব্ধি করি এবং মানুষের সংসারকে অপরিমিত প্রাণলোকের অধিকারভুক্ত বলে জানলে যা নিয়ে উত্তেজিত পীড়িত ও ক্ষতিগ্রস্ত বোধ করছি তার দিকে সুদূরের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আনন্দ পাই।

রবীন্দ্রনাথের যৌবনের দিনগুলি অল্প পরিসরের মধ্যে সত্য ছিল, সম্পূর্ণ ছিল। সাংসারিক উচ্চাভিলাষ তাঁর ছিল না এবং সাহিত্য তাঁকে দেশের সর্বত্র পরিচিত করলেও দেশের কর্মপ্রবাহ থেকে তিনি দূরেই ছিলেন। হঠাৎ একদিন দেশে নবযুগের প্রাণস্পন্দন এল, সে যে কী অপূর্ব জন্মলক্ষণ *ঘরে-বাইরে*-তে তার বর্ণনা আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিভৃত সাধনা ছেড়ে সকলের সঙ্গে যোগ দিলেন। বৃহৎ সংসারের প্রতি কর্তব্য একদিন না একদিন করতেই হবে—দেশের প্রতি, সমাজের প্রতি, পৃথিবীর প্রতি। কিন্তু সেই কর্তব্য যার প্রতি, সে যে-পরিমাণে বৃহৎ, কর্তব্যের পূর্বাহ্নের সাধনাও যেন সেই পরিমাণে বিপুল হয়। দেশের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা কেবলমাত্র পণ্যনিবদ্ধ ছিল না; দেশের ধর্ম, সমাজ, ইতিহাস, সাহিত্য, সংগীত ইত্যাদি ঠাকুর পরিবারের অন্যান্যদের মতো তাঁরও অনুরাগের সামগ্রী ছিল। দেশের শিল্পদ্রব্যের পৃষ্ঠপোষকতা এঁরা স্বদেশি আন্দোলনের চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে থেকেই করে আসছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ প্রমুখ জন কয়েক মিলে একটি স্বদেশি বস্ত্রের দোকানও খুলেছিলেন। দেশে জন্মেছি বলে দেশ আমার নয়, দেশকে নিজের তনুমন দিয়ে সৃষ্টি করেছি বলে দেশ আমার, পেট্রিয়টিজমের এই সূত্রটি দেশকে রবীন্দ্রনাথ ধরিয়ে দিলেন। দেশ এর মর্যাদা তখন বুঝল না, এতদিন পরে আজ বুঝছে।

দেশের প্রাচীন শিক্ষাকে আধুনিক কালের উপযুক্ত করে দেশকে একদিক থেকে সৃষ্টি করার ব্রত নিলেন তিনি নিজে। এই উদ্দেশ্যে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা। আধুনিক কালে 'আশ্রম' কথাটির অর্থ বদলে গেছে। এখন আমরা 'আশ্রম' বলতে সাধনাপীঠ বুঝে থাকি। যথা, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম। রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত আশ্রম প্রাচীন অর্থের আশ্রম অর্থাৎ অবস্থা। রবীন্দ্রনাথের গার্হস্থ্যাশ্রম ও তাঁর শিষ্যগণের ব্রহ্মচর্যাশ্রম পরস্পরের পরিপূরকতা করল। এর আরম্ভ অতিসামান্য আকারে। এর দ্বারা রাতারাতি দেশের দুঃখমোচনের আশা ছিল না। নিরক্ষরতা দলন নয়, অর্থকরী বিদ্যাবিস্তার নয়, জনসেবা বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়। জীবনের সর্বাঙ্গীণতার প্রতি দৃষ্টি রেখে জীবনের প্রথম অঙ্গের অনুশীলন, পরিপূর্ণরূপে বালক হওয়া। আজ যারা পরিপূর্ণরূপে ফুল হতে পেরেছে তারাই কাল পরিপূর্ণরূপে ফল হতে পারে, অপরে নয়। ব্রহ্মচর্যাশ্রমী বালকের দেহ-মনকে নানা দিকে স্ফূর্তি দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথ খেলা, অভিনয়, গান ও উপাসনা এগুলিকে বিদ্যাশিক্ষার মতোই প্রয়োজনীয় বলে গোড়া থেকে জেনেছিলেন। বিদ্যাশিক্ষা বা নীতিশিক্ষাকে স্ফীত হতে দেননি এবং অপরগুলিকে ওর কোনোটার বাহন করেননি। বিদ্যার্জনই বালকের একমাত্র বা প্রধান করণীয়, সভ্যসমাজ থেকে এই বদ্ধমূল কুসংস্কার যদি কোনোদিন ঘোচে তবে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর দেশ ও জগৎ আর-একটু ভালো করে বুঝবে।

অল্প সময়ের ব্যবধানে একাধিক প্রিয়জনের মৃত্যু রবীন্দ্রনাথের দারুণ দুর্ভাগ্য। কিন্তু এই করুণ অভিজ্ঞতাকে রবীন্দ্রনাথ অপচিত হতে দেননি। তাঁর *খেয়া* ও *গীতাঞ্জলি* এই বেদনার রূপান্তর। তাঁর জীবন ও তাঁর কাব্য যেন এমন একটা পরিণতির প্রতীক্ষা করছিল। ফলের পক্বতার পক্ষে প্রখর রৌদ্রের প্রয়োজন ছিল। তাঁর মধ্যে কারুণ্যের সঞ্চার না হলে তিনি সকলের সর্বকালের কবি ও প্রতিভূ হতে পারতেন না। প্রিয়বিয়োগের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের প্রৌঢ়ত্বকে একান্ত mystic-ভাবাপন্ন করলে। তিনি ভগবানের মধ্যে হারানো প্রিয়দের সঙ্গ পেলেন, তাই ভগবান হলেন তাঁর প্রিয়তম। যিনি এতদিন পিতা ছিলেন, তিনি হলেন সখা ও প্রেমিক। 'গীতিমাল্য' ও 'গীতালি' রচিত হল।

অকস্মাৎ রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীব্যাপী খ্যাতির অধিকারী হন। ইতিহাসে অনুরূপ ঘটনার উল্লেখ নেই। রোগশয্যা বিনোদনের জন্যে কয়েকটি বাংলা রচনার ইংরেজি তর্জমা করেছিলেন, সেগুলি কী মনে করে লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইরিশ কবি ইয়েটসকে পড়তে দেন। একদা যেমন দুর্ঘটনার ভিড় জমেছিল একদিন তেমনি যশ, অর্থ ও সম্মান বন্যার মতো দিগদিগন্ত ব্যাপ্ত করে এল। দুঃখের সময় যিনি অভিভূত হননি সুখের দিনেও তিনি অভিভূত হলেন না। বঙ্গের কবি বিশ্বের অর্ঘ্য সহজভাবে নিলেন। ছিন্নভিন্ন পরাধীন দীনদরিদ্র দেশের মানুষ সাধনা করেছিলেন দিগবিজয়ীর মতো, আরম্ভ করেছিলেন রাজকীয় ধরনে। হাতে রেখে দান করেননি, হাতে হাতে ফল চাননি। যাঁর অধিক মূলধনের কারবার, তাঁর বিরাট ক্ষতি, বিরাট লাভ, তাঁর লাভের জন্যে ত্বরা নেই। প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় ও ব্যাপক যোগাযোগ, মানুষের গভীরতম চরিত্রে আস্থা, ভগবানের কল্যাণবিধানে সংশয়হীন বিশ্বাস, সৌন্দর্যের রসায়নে ব্যাবহারিক জীবনকেও রসায়িত করা—এতগুলো বড়ো বড়ো জিনিস কি ছোটো একটি দেশে আবদ্ধ থাকতে পারত? দু-দিন আগে না হলে দু-দিন পরে পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ত। তারপর রবীন্দ্রনাথ চিরদিন up-to-date। বিশ্বসাহিত্য তাঁর ভালো করে জানা, বিশ্বের আধুনিকতম ভাবনাগুলো তাঁরও ভাবনা। বাংলাদেশের পদ্মা নদীতে নৌকাবাস করবার সময় তিনি বিশ্বের কেন্দ্রস্থলেই বাস করেছেন।

বিশ্ববিখ্যাত হবার পর থেকে তাঁর দায়িত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পেল। বৃহত্তর মানবসংসারের ব্যাপারে তাঁর ডাক পড়ল। গত মহাযুদ্ধের বিনষ্টির ক্ষণে Nationalism সম্বন্ধে তাঁর নির্ভীক উক্তি তাঁকে তখনকার মতো অপ্রিয় করলেও আজ সভ্যজগতের বহু মনীষী ব্যক্তি তাঁরই মতে মত মিলিয়েছেন। মানুষের নতুন ভবিষ্যতের তিনি অন্যতম স্রষ্টা, সেই ভবিষ্যতের প্রতি বাৎসল্য তাঁর স্বদেশবাৎসল্যকেও ছাড়িয়ে যায়, তাই তাঁকে আমরা ভারতবর্ষের নেশন হওয়ার দিনে পাচ্ছিনে। কিন্তু যখনই ধর্ম আমাদের পক্ষে, তখনই তিনি আমাদের পক্ষে। জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রতিবাদ করতে তিনি মুহূর্তমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি।

মহাযুদ্ধের পর ইউরোপখন্ডে লিগ অব নেশনস-এর প্রতিষ্ঠায় Nationalism-এর জড় মরল না। যা যেমন ছিল তা প্রায় তেমনি থাকল। মানুষের চরিত্রে যা শ্রেষ্ঠ তা নিয়ে নেশনও নয়, লিগ অব নেশনসও নয়। স্বার্থের ঊর্ধ্বে না উঠতে পারলে মিলন সত্যকার হতে পারে না। হাট-বাজারকে আমরা মিলনস্থলী বলিনে। মানুষ যেখানে জ্ঞানবিনিময় প্রীতিবিনিময় করে সেইখানে তার মিলনতীর্থ। রবীন্দ্রনাথ একপ্রকার বেসরকারি লিগ স্থাপন করলেন, অব নেশনস নয়—অব কালচারস। তাঁর বিশ্বভারতী বিশ্বের সকলের ভারতী। মহাযুদ্ধের মহাপ্রলয়ের পর এই একটি সৃষ্টির মতো সৃষ্টি! আজ যথেষ্ট মর্যাদা পাচ্ছে না এ। বটবৃক্ষের বীজের মতো এর আকার ক্ষুদ্র, আয়োজন অল্প। কিন্তু বিপুল সম্ভাবনা যদি কোনো প্রতিষ্ঠানের থাকে তবে এরই আছে। আমাদের গৌরব এই যে, 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে' এমন একটি পুণ্যতীর্থের প্রতিষ্ঠা হল।

রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘজীবী হয়ে, শতায়ু হয়ে, তাঁর জীবন-শতদলের অপরাপর দলগুলি উন্মোচন করতে থাকুন। সেই তো তাঁর মুক্তি। একটি মুক্তপুরুষের দৃষ্টান্ত লক্ষ মুক্তপুরুষের আবাহন করে। কাল নিরবধি, পৃথিবীও বিপুলা। রবীন্দ্রনাথের উত্তরপুরুষরা এই বলে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন যে, মানুষের যা চরম উত্তরাধিকার তা-ই তিনি দিয়ে গেলেন। সেটি হচ্ছে 'কী ভাবে বাঁচব' এই জিজ্ঞাসার নিঃশব্দ উত্তর।

সমর ও শান্তি

দুটি কথায় জীবন হচ্ছে সংগ্রাম ও বিশ্রাম।

ভারতীয়রাও এমনইতরো একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 'চক্রবৎ পরিবর্তন্তে সুখানি চ দুখানি চ।' কিন্তু ইউরোপীয়রা বলতে পারেন জীবনের প্রতি অবস্থায় তো দুঃখ-সুখ জড়িয়ে রয়েছে, ওদের পারম্পর্য কোথায়? পরম্পরা যদি থাকে তবে তা সংগ্রামের ও বিশ্রামের। সংগ্রামে যে কেবলই দুঃখ তা নয়, আর বিশ্রাম যে অবিমিশ্র সুখের তা-ও নয়। সুখ-দুঃখ নিরপেক্ষভাবে সংগ্রাম হচ্ছে সংগ্রাম এবং বিশ্রাম হচ্ছে বিশ্রাম এবং দুই মিলিয়ে জীবন যদি হয় পদ্য তবে 'সংগ্রাম' ও 'বিশ্রাম' বোধ হয় 'দুঃখ' ও 'সুখ' অপেক্ষা গাঢ়তর মিল।

ইউরোপের ইতিহাস—ইউরোপ-নির্দিষ্ট অর্থে মানবের ইতিহাস—মাত্র দুটি শব্দের ওলটপালট খেলা। সমর ও শান্তি। কখনো রাজাতে রাজাতে, কখনো রাজাতে প্রজাতে, কখনো-বা নেশনে নেশনে সমর যেন একটার পর একটা ঢেউয়ের ভেঙে পড়া। আর শান্তি যেন সেই ঢেউয়ের পা টিপে টিপে ফিরে যাওয়া। এ খেলা ফুরোয় না, ফুরোবার নয়।

টলস্টয় প্রণীত 'সমর ও শান্তি' নেপোলিয়নীয় যুগের ইতিহাস। ইতিহাসের আক্ষরিক অর্থে নয়। তাই উপন্যাসপর্যায়ভুক্ত। অথচ সাধারণ উপন্যাসের মতো এক জোড়া নায়ক-নায়িকার বৃত্তান্ত নয়। এর নায়ক বলো নায়িকা বলো সে হচ্ছে স্বয়ং রাশিয়া, রাশিয়ার প্রাণ মন সম্মান। অথবা দেশকালের সীমার মধ্যে স্থিত অসীম মানববংশ। ইতিহাসের সত্যকার বিষয় যদি হয় মানবভাগ্য তবে এই উপন্যাস হচ্ছে ইতিহাসের ভগ্নাংশ এবং বিষয় এর দেশকাল-রঞ্জিত মানবভাগ্য। এর অসংখ্য পাত্র-পাত্রী হচ্ছে মানব-করতলরেখা।

১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে রুশ সৈন্যরা অস্ট্রীয় সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দিয়ে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় আউস্টারলিতসের রণক্ষেত্রে। হেরে যায়, 'হেরে গেছি' এই ভ্রান্তিবশত। প্রকৃতপক্ষে তাদের হারবার কথা ছিল না। ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে নেপোলিয়নের সঙ্গে রুশ সম্রাট আলেকজাণ্ডারের সাক্ষাৎ ঘটে, বন্ধুতা হয়। ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে সেই মৈত্রী পর্যবসিত হল শত্রুতায়। নেপোলিয়ন রাশিয়া আক্রমণ করেন, কিন্তু রুশ সেনাপতি কুটুজো দেখেন যে প্রতিরোধ করলে নিশ্চিত পরাভব। নেপোলিয়নের সৈন্যরা অবাধে মস্কো প্রবেশ করল, কিন্তু মস্কো জনশূন্য। একটিও রাশিয়ান তাদের সহযোগিতা করতে চাইল না। কেউ জানে না কে লাগিয়ে দিল শহরে আগুন। এরা বলে ওরা লাগিয়েছে। ওরা বলে এরা লাগিয়েছে। লুটপাট করে ফরাসিরা স্থির করল ফেরা যাক। কিন্তু যে বাঘ খাঁচায় ঢুকে পেট ভরিয়েছে ছাগমাংসে তারই মতো দশা হল তাদের। যতটা পথ এসেছিল ঠিক ততটা পথ ফেরার মুখে বহুগুণ বোধ হল। কুটুজো ইচ্ছা করলে রাস্তায় হানা দিয়ে তাদের নির্বংশ করতেন। কিন্তু অনাবশ্যক রক্তপাতে তাঁর প্রবৃত্তি হল না, তারা যখন স্বেচ্ছায় রাশিয়া ত্যাগই করছে। তাঁর কোনো কোনো সৈনিক কসাকদের দলপতি হয়ে চোরের ওপর বাটপাড়ি করল। এইসব গেরিলা যুদ্ধে ও শীতে বরফে খাদ্যের অভাবে নেপোলিয়নের গ্রাঁদ আর্মে কাহিল হয়ে পড়ল, সৈন্যদের অল্পই বাঁচল। তাও হল পথি-বিবর্জিত। নেপোলিয়ন চুপি চুপি দিলেন এক লম্ফ!

এই হল কাঠামো। সাধারণ ঔপন্যাসিক হলে তাঁর পাত্র-পাত্রীদের দিয়ে বড়ো বড়ো কাজ করাতেন। নতুবা যারা বড়ো বড়ো কাজ করেছে বলে ইতিহাসে লেখে তাদেরকেই করতেন পাত্র-পাত্রী। জাতীয় গৌরবের রঙে সমস্তটা হত অতিরঞ্জিত। সাধারণ ঐতিহাসিক হলে ঘটনার পশ্চাতে দেখতেন মানুষের ইচ্ছা, মানুষের পরিকল্পনা, মানুষের দূরদৃষ্টি। সেনাপতিদের চাল দেওয়া, সৈনিকদের বোড়ের মতো চলা, অধিক কৌশলীর জয়লাভ। পরাভূত পক্ষের ঐতিহাসিক ধরতেন উঠোনের দোষ—নেপোলিয়নের সর্দিকে করতেন দুর্ঘটনার জন্য দায়ী। ঘটনাচক্রে কুটুজো মস্কো রক্ষা না করাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে সাব্যস্ত করলেন তাঁর পরামর্শ-

পরিষদের সম্পূর্ণ অমতে। আর রোস্টোপশিনের শত চেষ্টা সত্ত্বেও শহরের লোক যে যেদিকে পারে পালিয়ে আত্মরক্ষা করল, নেপোলিয়ন থাকতে সেখানে ফিরল না। জাতীয় ঐতিহাসিক হলে টলস্টয় বলতেন, এ কি আমরা না ভেবেচিন্তে করেছি? আমরা অনেক দিন থেকে মাথা খাটিয়ে ঠিক করেছিলুম যে নেপোলিয়নকে বাধা না দিয়ে দেশের ভিতরের দিকে টেনে আনব ও মস্কো খালি করে তাতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে মজা দেখব।

টলস্টয় ঋষি। তিনি তাঁর দিব্যদৃষ্টিযোগে প্রত্যক্ষ করলেন ঘটনা কেমন করে ঘটল, কেমন করে ঘটে থাকা সম্ভব। যারা খেলা করে তারা জানে কার কতদূর দৌড়। কিন্তু যুদ্ধে অপরপক্ষের সামর্থ্য পরিমাপ করবার কোনো ধ্রুব মান নেই। যারা লড়াই করে তাদের ওইটেই একমাত্র ভাবনা নয়, তারা সবাই বীরও নয়। তাদের নিজেদের ছোটো ছোটো ঈর্ষা-দ্বেষ, তাদের কারুর মনে পড়ছে ঘরসংসার, কেউ গণনা করছে কবে মাইনে পাওয়া যাবে। সেনাপতিদের এক-একজনের এক-এক মত, তাদের সবাইকে একমনে কাজ-করানো প্রধান সেনাপতির নিত্য সমস্যা। পদাতিকদের অনুপ্রেরণা জয়গৌরব ততটা নয় যতটা লুঠতরাজ। মরণের সঙ্গে মুখোমুখি হয়েও বীরপুরুষেরা লুটের মাল আঁকড়ে থাকে। যুদ্ধ জিনিসটা একজনের হুকুমে হয় এর মতো ভ্রান্তি আর নেই। যুদ্ধ হয় একবার কোনোমতে শুরু করে দিলে আপনা-আপনি। থামে হয়তো একটা উড়ো কথায়। কেউ একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'আমরা হেরে গেছি।' অমনি সবাই ভঙ্গ দিল।

কেন যে যুদ্ধ হয়, কেন যে মানুষ মারে ও মরে, কী যে তার অন্তিম ফল টলস্টয় তার সম্বন্ধে অজ্ঞেয়বাদী। নেপোলিয়ন হুকুম করলেন, 'যুদ্ধ হোক', আর অমনি যুদ্ধ হল, এই সুলভ ব্যাখ্যায় তিনি সন্দিহান। নেপোলিয়ন নিয়তির বাহন, তাও একটা ঐরাবত কি উচ্চৈ:শ্রবা নন, প্রতিভা তাঁর নেই। মস্কোতে তিনি আগাগোড়া নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছেন। সেই শহরে খাদ্য মজুত ছিল ছয় মাসের। কিন্তু নেপোলিয়ন তার হিসাব রাখলেন না। সৈন্যরা লুটপাট করে তছনছ করল। মস্কোর ধনসম্ভার তাদের লোভ জাগিয়ে তাদেরকে এত দূরদেশে এনেছিল, সেই লোভের তান্ডব নাচ চলল। নেপোলিয়ন মোরগের মতো নিশ্চিত জানতেন যে নাগরিকরা তাঁর লম্বা-চওড়া ইস্তাহার পড়ে ফিরবে, আবার দোকানপাট বসাবে। গ্রামিকরা আসবে মাছ, তরকারি বেচতে। তাদেরকে তিনি ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন যে, যুদ্ধে যেমন তিনি অপরাজেয় শান্তিকালেও তেমনি তিনি প্রজারঞ্জক।

রাশিয়ার জনগণকেই টলস্টয় দিয়েছেন সাধুবাদ। তারা কোনো ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা চালিত হয়নি। তারা পরস্পরের পরামর্শ নেয়নি। তারা অন্তরে উপলব্ধি করল নিয়তির অভিপ্রায়। তাই মূঢ় রোস্টোপশিনের অনুজ্ঞায় কর্ণপাত না করে শহর ছেড়ে দিল। শহরে আগুন দিল কে তা কিন্তু বলা যায় না। হয়তো রাশিয়ানরা, হয়তো ফরাসিরা। যে-ই দিক সে নিয়তির ইঙ্গিতে দিয়েছে। বোঝেনি কীসের ফল কী দাঁড়াবে!

শত্রুর সঙ্গে অসহযোগ করব, ফিরব না মস্কোতে—এই যে তাদের অপ্রতিরোধের সংকল্প এও কারুর নির্দেশে বা শিক্ষায় নয়। এও তারা একজোট হয়ে পরস্পরের পরামর্শ নিয়ে করেনি। এ তাদের প্রত্যেকের অন্তরের আদেশ। এমন যদি না হত তবে সম্রাট বা সেনাপতিদের ইচ্ছা নেপোলিয়নের ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রলয় বাঁধাত, প্রলয়ংকরের করতালি তো এক হাতে বাজে না।

শেষজীবনে টলস্টয় যে জনগণের স্বভাববিজ্ঞতায় আস্থাবান হবেন, অপ্রতিরোধতত্ত্বের গোস্বামী হবেন, তার পূর্বাভাস তাঁর যৌবনের এই গ্রন্থেও লক্ষ করা যায়। নামহীন পরিচয়হীন মহাজনতায় আপনাকে হারিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁর সাধনা। পারেননি, এমনই উগ্র তাঁর ব্যক্তিত্ব। বদ্ধমূল আভিজাত্য উন্মূল হল না। তবু তাঁর দানবিক প্রয়াস একেবারে ব্যর্থ হয়নি। দেশান্তরে রূপান্তর পরিগ্রহ করেছে ভারতের সত্যাগ্রহে, গান্ধীজির জীবনাদর্শে। টলস্টয়কে দ্বিখন্ডিত করে কেউ কেউ নিয়েছে তাঁর যৌবনের অনবদ্য শিল্পিত্ব। কেউ নিয়েছে তাঁর পরিণত বয়সের অপ্রতিরোধতত্ত্ব।

কিন্তু এই যে তাঁর জনগণের সহজ বিচারের প্রতি আস্থা, এই তাঁর উভয় বয়সের উভয় প্রতিকৃতির মধ্যে সাদৃশ্য নির্ণয়ের সংকেত। শিল্পীঋষি ও সাধুঋষি মূলত ঋষি। তাঁর দৃষ্টিতে বিশ্বের কোন রহস্য ধরা পড়েছে?

ধরা পড়েছে এই যে, যাবতীয় ঘটনার যথার্থ পাত্র-পাত্রী ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা নন। নামপরিচয়হীন নির্বিশেষে জনতা যা করে তাই হয় এবং যা করে তা নিয়তির চালনায়। নিয়তি অন্ধ নয়, খেয়ালি নয়, তার ব্যবহারে আছে নিয়ম। যেমন পৃথিবীর ঘূর্ণন আমাদের অনুভূতির অতীত বলে আমরা একদা তাঁকে স্থাণু মনে করেছিলুম, তেমনি নিয়তির ইচ্ছায় কাজ করতে থেকেও আমরা তার সম্বন্ধে অচেতন, আমরা ঠাওরাচ্ছি আমরা ইচ্ছাময়।

সমর থেকে ওঠে নিয়তির কথা। তেমনি শান্তি থেকে ওঠে প্রকৃতির। বিচিত্র সংসারের ধারাবাহিকতায় কত রস, কত রূপ। যুদ্ধ চলেছে নেশনে নেশনে। কিন্তু অলক্ষিতে বালিকা হয়ে উঠেছে বালা, বালা হয়ে উঠেছে নবযুবতী। অন্তরালে শীতের সূর্য সুধাবর্ষণ করে যাচ্ছে, আকাশ ঘন নীল। কে বলবে যে এই সুন্দরী ধরণি একদিন হবে রণক্ষেত্র, বারুদের ধুমে ও গন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ পশুপক্ষীর হবে শ্বাসরোধ, পাতা ও ফুল যাবে বিবর্ণ হয়ে? টলস্টয়ের এই গুণকে কেউ কেউ আখ্যা দিয়েছেন আইডিল, সুখসরলতার ছবি। এক হিসাবে তা সত্য। সহজ, প্রসন্ন জীবন। বিশেষ অভাব-অভিযোগ নেই। নেই তেমন কোনো দ্বন্দ্ব। কারুর অতি বড়ো সর্বনাশ ঘটে না, জীবনদেবতা সকলেরই শেষ নাগাদ একটা সদব্যবস্থা করেন। কাউকে দেন সুমধুর মৃত্যু, মুখে হাসিটি লেগে থাকে। কাউকে রাখেন চিরকুমারী করে, নিজের নিষ্ফলতায় সন্তুষ্ট। কেউ আরম্ভ করেছিল বিশ্বের ভাবনা ভেবে। মরতে মরতে বেঁচে গেল। তারপর বিয়ে করল, সুখে থাকল।

আধুনিক পাঠকের এতটা শান্তি বিশ্বাস হবে না। তবে এটুকু পরিতোষ হবে যে পাপের পরাজয়, পুণ্যের জয় প্রতিপন্ন করবার অভিপ্রায় ছিল না ঋষির। আর এও না মেনে উপায় নেই যে প্রত্যেকটি কাল্পনিক চরিত্র ইতিহাসপ্রসিদ্ধ চরিত্রের মতো উতরেছে। তার মানে ওরা আস্ত মানুষ, কবি ওদের দেখেছেন সকলের মাঝে, দেখিয়েছেন যথাযথরূপে। ওরা থাকলেও থাকতে পারত ইতিহাসের পাতায়। ইতিহাসে থাকলে বিশ্বাস করতুম ওদের জীবনযাত্রার শান্তি।

কথা হচ্ছে সমরের মতো শান্তিকালেও টলস্টয় পড়েছিলেন তার অন্তর্নিহিত অর্থ। সমরের যেমন নিয়তি, শান্তির তেমনি সহজ বিকাশ, বিশুদ্ধ অস্তিত্ব। দ্বন্দ্বের স্থান রণাঙ্গনে। গৃহে বড়োজোর একটু মান-অভিমান, সহজ কলহ, একটু ব্যঙ্গ, একটু রঙ্গ। রাগ হলে বা রাগ হওয়া উচিত বলে মনে করলে একটা ডুয়েল। তাতে মরেও না শেষপর্যন্ত কোনো পক্ষ।

শান্তিও যে আজ আমাদের দিনে সমরের নামান্তর, প্রকারান্তর বলে গণ্য হবে তা তো ঊনবিংশ শতকের প্রথম পাদে সূচিত হয়নি। বিশেষত রাশিয়ায় এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের গন্ডি কালচিহ্নিত। যেমন খাপ তেমনি তরবারি। তথাপি সেকালের চিন্তায় জমিদার ও চাষার সম্বন্ধ কেমন হবে সে-জিজ্ঞাসা ছিল।

২

সমসাময়িক সমস্যার চেয়ে টলস্টয়কে ঢের বেশি আকুল করেছিল সনাতন জীবনরহস্য। কেন বাঁচব, কেমন করে বাঁচব, বাঁচার মতো বাঁচা কাকে বলে? এর এক-একটি প্রশ্নের উত্তর তিনি এক-একজনের চরিত্রে দিয়েছেন। মেয়েদের মধ্যে নাম করা যায় নাটাশা, মারিয়া, সোনিয়া, হেলেন-এর। পুরুষদের মধ্যে উল্লেখ করতে হয় অ্যান্ড্রু, পিটার, নিকোলাসকে। যাদের অগ্রাহ্য করলুম তারা কেউ উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু তাদের সংখ্যা শতাবধি। এতরকম এত ব্যক্তি অন্য কোন গ্রন্থে আছে? ডস্টয়েভস্কিও টলস্টয়ের পিছনে পড়ে যান।

নাটাশাকে আমরা প্রথম যখন দেখি তখন তার শৈশব সারা হয়ে গেছে অথচ কৈশোর উত্তীর্ণ হয়নি। সে দেখতে তত সুশ্রী নয়, বরং শ্রীহীন বলা যেতে পারে। কিন্তু রূপের অভাব পুষিয়ে দিয়েছে উচ্ছলিত প্রাণ। তখনও তার পুতুল খেলার অভ্যাস ভাঙেনি। হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ে। তার সে-হাসি সংক্রামক। এই মেয়ে বছর চারেক পরে হয়েছে ষোড়শী, ভাবাকুলা, সুদর্শনা। কিন্তু রয়েছে তেমনি প্রাণবতী। সামাজিক নৃত্যে সে এমন আনন্দ পায় যে তার নিষ্পাপ চিত্ত সকলের আনন্দ কামনা করে। তার উল্লাস যেন কোনো অপ্সরার, তা দিকে দিকে সৃষ্টি করে উল্লাস। তার অখলতা, তার অকৃত্রিমতা, তার সরল মাধুরী তার প্রতি আকৃষ্ট করল

অ্যান্ড্রুকে। অ্যান্ড্রু উচ্চপদস্থ, উচ্চবংশীয়, উচ্চমনা; বয়সেও বড়ো। দেশের মঙ্গলের নানা পরিকল্পনা ছিল তাঁর ধ্যান। কিন্তু তাঁর প্রথম বিবাহের স্ত্রী তাঁর উপযুক্ত সঙ্গিনী ছিলেন না। সামাজিকতার অশেষ তুচ্ছতায় তাঁর প্রতিভার অফুরন্ত খুচরো খরচ হয়েছিল—বাজে খরচ। বিরক্ত হয়ে তিনি যুদ্ধে গেলেন, কিন্তু যুদ্ধের স্বরূপ দর্শন করে তাঁর তাতেও অরুচি ধরল। যাকে আদর্শস্থানীয় বলে বিশ্বাস করেছিলেন সেই নেপোলিয়নকে নিকট থেকে দেখে বীতশ্রদ্ধ হলেন। প্রশান্ত নীল আকাশের নীচে আহত হয়ে পড়ে থাকার সময় তাঁর মনে হল তাঁর বুদ্ধিগম্য যাবতীয় বিষয় অসার, সার কেবল ওই অসীম বিশ্বরহস্য। এমন যে অ্যান্ড্রু তাঁরও নতুন করে বাঁচতে ইচ্ছা করল নাটাশার স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণপ্রবাহে ভেসে। তার নেই লেশমাত্র মলিনতা, সে ঝরনা। এক বছরের জন্যে অ্যান্ড্রু দেশের বাইরে গেলেন, ফিরে এসে নাটাশাকে বিয়ে করবেন। এই এক বছরে নাটাশা তাঁর প্রতীক্ষায় অধৈর্য হয়ে উঠল। এল তার কুগ্রহ আনাতোল। ক্ষণিক উন্মাদনায় সে প্রতারকের কবলে আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছিল, বাধা পেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করল। বেঁচে গেল কিন্তু বদলে গেল। অ্যান্ড্রু দেশে ফিরে যা শুনলেন তাতে তাঁর জীবনের স্পৃহা লোপ পেল, নারীর কাছে তিনি কোনোরূপ মহত্ত্ব প্রত্যাশা করলেন না, এত দুর্বল তারা। তিনি আবার গেলেন যুদ্ধে, এইবার মৃত্যু কামনা করে। আহত হয়ে আনীত হলেন, ঘটনাচক্রে নাটাশাদের আশ্রয়ে। মরণকালে তাঁর চিত্ত উদ্ভাসিত হল দিব্যভাবে। তিনি ক্ষমা করলেন, তিনি ভালোবাসলেন প্রাণী মাত্রকে, সংসারকে। তাঁর মনে ব্যর্থতার নিত্য খেদ রইল না। অনুতপ্তা সেবিকা প্রিয়াকে আশীর্বাদ করলেন।

নাটাশাকে তার শৈশব থেকে ভালোবাসত পিটার। লোকটা কেবল যে লাজুক, ভালোমানুষ, কিম্ভূতকিমাকার, মাথাপাগলা তা-ই নয়—নামগোত্রহীন সত্যকাম। তাই কাউকে কোনোদিন জানায়নি ভালোবাসার কথা। হঠাৎ মারা গেলেন কাউন্ট বেসুকো, উত্তরাধিকারী হল পিটার, বিরাট ভূসম্পত্তির তথা পদবির। তখন তাকে লুফে নিল নাটাশাদের চেয়ে উদ্যোগসম্পন্ন প্রতিপত্তিমান কুরাগিন বংশ। তার বিয়ে হল যার সঙ্গে সে অসামান্য রূপবতী, সোসাইটির উজ্জ্বলতম নক্ষত্র হেলেন। কোনো পক্ষে প্রেম নেই। বিভবের সঙ্গে সৌন্দর্যের বিবাহ। দুজনেই পরম অসুখী হল। হেলেন খুঁজল অমন অবস্থায় ওরূপ সমাজের রানিমক্ষিকারা যা খোঁজে। আর বেচারা পিটার হল ফ্রিমেসন। চরিত্রকে দিন দিন উন্নত করতে চেষ্টা করল, বিশ্বকল্যাণব্রত-রত। দোষের মধ্যে মদটা খায় অপরিমিত। তার সেই ভালোবাসা তার অন্তরে রুদ্ধ থাকে। নাটাশার সঙ্গে তার সহজ বন্ধুতা। নাটাশা তাকে সরল জন্তুটি বলে সখীর মতো বিশ্বাস করে। নেপোলিয়ন যখন রাশিয়া আক্রমণ করলেন পিটারের ধারণা জন্মাল যে, বাইবেলে যে রাক্ষসের বিষয়ে ভবিষ্যদবাণী আছে নেপোলিয়নই সেই রাক্ষস এবং তাকে হত্যা করবে যে সে আর কেউ নয়, সে আমাদের পিটার, যে একটা বন্দুকও ছুড়তে জানে না। পিটারের প্রয়াসের শেষ ফল হল এই যে পিটার অন্যান্যদের সঙ্গে ধৃত হয়ে প্রাণদন্ডের প্রতীক্ষায় সারি বেঁধে দাঁড়াল। তার চোখের সুমুখে মানুষ মরল ঘাতকের গুলিতে। তারও উপর গুলি চলবে এমন সময় তার প্রাণদন্ড মকুব হল, সে চলল বন্দি হয়ে ফিরন্ত ফরাসিদের সাথে। কসাকদের সাহায্যে অন্যান্য বন্দিদের সঙ্গে তাকেও উদ্ধার করল ডেনিসো ডোলোগো প্রভৃতি গেরিলা যুদ্ধের নায়ক। মৃত্যুর সামনাসামনি দাঁড়িয়ে, বহু লাঞ্ছনা সয়ে যে দুঃখ আমাদের পাওনা নয় সেই দুঃখকেও কেমন ভক্তির সহিত গ্রহণ করতে হয় তার দৃষ্টান্ত কারাটাইয়েভ নামক একটি পরম দুঃখী ঈশ্বরবিশ্বাসীর জীবনে প্রত্যক্ষ করে পিটারের গভীর অন্তঃপরিবর্তন ঘটেছিল। শৌখিন মানবহিত আর তাকে উদ্ভ্রান্ত করছিল না। সে পথ পেয়েছিল। বিষাদিনী নাটাশাকে বিয়ে করে (ততদিনে হেলেন মরেছিল) সে দস্তুরমতো সংসারী হল। নাটাশা আবার সেই আনন্দময়ী। প্রকৃতি নিজে তাকে সহজ আনন্দ জোগায়, উদ্ভিদকে যেমন রস। সে কালক্রমে ফলভারাবনত পূর্ণবিকশিত পাদপের মতো প্রসারিত, সমৃদ্ধ হল। কে তাকে দেখে চিনবে যে এ ছিল একদিন তন্বী আলোকলতা! তবু তাই তার প্রাকৃতিক পরিণতি। তা নইলে যা হত সেটা তার বিকৃতি। নাটাশা টলস্টয়ের মানসী নারী। সে ভালো। কিন্তু সজ্ঞানে ও সাধনার দ্বারা নয়। শিক্ষার দ্বারা নয়। নীতির চুলচেরা

তর্ক তার মনে ওঠে না। তার প্রাণ যা চায় সে তা-ই চায়। তার প্রাণ যা চায় তার ফলে অনর্থ ঘটলে সে তা ভোগে। নালিশ করতে চায় না।

অ্যান্ড্রুর বোন মারিয়া হচ্ছে কতক তার রূপহীনতার প্রতিক্রিয়ায়, কতক তার কঠোরস্বভাব জনকের তাড়নায় তপস্বিনী। তার সমবয়সিনিরা যখন খেলা করছে, লীলা করছে, শিকার করছে দুই অর্থে, মারিয়া তখন জ্যামিতির পড়া তৈরি করছে আর করছে লুকিয়ে অধ্যাত্মচর্চা। যা অমন দুঃখিনী হলে নারী মাত্রেই করে থাকে। আপনাকে ভাগবত জীবনের যোগ্য করছে নিষ্ঠার সঙ্গে, বিবাহের তো প্রত্যাশা নেই। তা বলে আশা কি মরেও মরে! কত বার নিরাশ হল। অবশেষে নাটাশার ভাই নিকোলাস তার পৈত্রিক সম্পত্তির খাতিরে তাকে বিয়ে করল, অবশ্য বিয়ের আগে তাকে বিদ্রোহী প্রজাদের হাত থেকে উদ্ধার করে তার হৃদয় জিতে। তাদের বিয়ে বেশ সুখেরই হল। মারিয়ার দীর্ঘাচরিত সংযম ও সাধুতা তাকে শুদ্ধ সুবর্ণের আভা দিয়েছিল। তার রূপহীনতাকে ঢেকেছিল সেই আভা।

নিকোলাস নাটাশারই মতো প্রাণময়, তবে সহাস্য নয়, সুগম্ভীর। তার সব কাজে হাত লাগানো চাই, উৎসাহ তার অদম্য, ব্যগ্রতা তার মজ্জাগত। ঘোড়ায় চড়া, ঘোড়া খরিদ, তরুণ সৈনিকের ভাবনাশূন্য জীবনের হাজার ভাবনা, শিকার, জুয়া এইসব তার বহির্মুখিত্বের নানা দিক। তাকে ভালোবাসে তাদের পরিবারের আশ্রিতা একটি মেয়ে, সোনিয়া। নিকোলাস তাকে ভালোবাসে, সে-ভালোবাসা তার অন্যান্য কাজের মতো ছেলেমানুষি। কথা দিয়েছিল বিয়ে করবে, কিন্তু সোনিয়ার অপরাধ সে নির্ধন। তাকে বিয়ে করলে নিকোলাসদের নষ্ট সম্পত্তি ফিরবে না। তার বাবা যে জুয়ায় সব হারিয়ে বসে রয়েছেন। নিকোলাসের মায়ের পীড়াপীড়িতে সোনিয়া তাকে তার প্রতিশ্রুতি থেকে মুক্তি দিয়ে নিজের সুখ বিসর্জন দিল। নিকোলাস বর্তে গেল, সে তো কিছুতেই তার পিতা-মাতাকে অসন্তুষ্ট করতে পারত না, অথচ প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করবার মতো বেইমান সে নয়। সোনিয়া এই কাব্যের উপেক্ষিতা।

ডোলোগো নিকোলাসের বন্ধু। কিন্তু দিব্যি বন্ধুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল জুয়াতে ভীষণ হারিয়ে। লোকটা অসাধারণ সাহসী, অথচ অবাধ্য। তার মনে একটা বড়ো দুঃখ সে গরিব। তাতে তাকে নির্দয় করেছিল। তার আর একটা বৃহৎ ক্ষোভ সে একটিও নারী দেখলে না যাকে সে শ্রদ্ধা করতে পারে, পূজা করতে পারে। তার ধারণা রানি থেকে দাসী পর্যন্ত প্রত্যেক রমণীকে কেনা যায়। সে যে বেঁচে আছে তা শুধু তার মানসীকে হয়তো একদিন দেখতে পাবে এই অসম্ভব আশায়। ততদিন সে শয়তানি করবে, করবে গুণ্ডামি। তার বিধবা মা আর কুব্জা বোন আর গুটিকয়েক বন্ধু ছাড়া সবাইকে সে বেখাতির করবে।

টলস্টয়ের বর্ণনাকুশলতা এমন যে পদে পদে মনে হতে থাকে টলস্টয় স্বয়ং এসব দেখেছেন, এসব জায়গায় উপস্থিত থেকেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে, মন্ত্রণাসভায়, দরবারে, অভিজাতমহলে, ফ্রিমেসনদের আড্ডায়, গ্রামের বাড়িতে, শিকারের পশ্চাতে, নাচের মজলিশে, চাষাদের সঙ্গে, বন্দিদের সাথে, গেরিলা দলে—সর্বঘটে তিনি আছেন। কল্পনার এই পরিব্যাপ্তি, সহানুভূতির এই প্রসার বিশ্বসাহিত্যে বিরল। অবশ্য সমাজের নিম্নতর স্তরগুলিতে তাঁর চিত্তের প্রবেশ ছিল বলে মনে হয় না। থাকলে তিনি হয়তো শেষবয়সে তাঁদেরই দিকে সম্পূর্ণ হেলতেন না। তারপর এত খুঁটিনাটি ভালোবাসতেন বলে তার প্রতিক্রিয়াবশত শেষের দিকে একেবারে ও-জিনিস বর্জন করলেন। এক চরমপন্থা থেকে অপর চরমপন্থায় চললেন। টলস্টয়ের জীবনের তথা আর্টের ট্র্যাজেডি এই।

আলোচ্য গ্রন্থে তিনি যাকে জরযুক্ত করেছেন সে পিটার, নাটাশাযুক্ত পিটার। কারাটাইয়েভ মরণের পূর্বে তাকে যে মন্ত্র দিয়েছিল তার প্রতিধ্বনি তার কানে বাজতে থাকে। জীবনই সমস্ত। জীবনই ভগবান। সর্বভূতের আছে গতি, সেই গতিই ভগবান। যতক্ষণ জীবন আছে ততক্ষণ আছে ভগবানের অস্তিত্বকে জানবার আনন্দ। জীবনকে ভালোবাসলেই ভগবানকে ভালোবাসা হয়। জীবনে সবার চেয়ে কঠিন অথচ সবচেয়ে গুণের কাজ হচ্ছে জীবনের যাবতীয় অহেতুক জ্বালা সত্ত্বেও জীবনকে ভালোবাসা।

রবীন্দ্রনাথের শেষজীবন

চার বছর আগে কবির সঙ্গে দেখা হয়েছিল আত্রাই নদীর বোটে। পতিসর থেকে ফিরে তিনি ট্রেনের অপেক্ষা করছিলেন। তারপরে আমরা প্ল্যাটফর্মে এলুম ও এক কামরায় উঠলুম। রবীন্দ্রনাথকে এত নির্জনে কোনো বার পাইনি। তখনই লক্ষ করেছিলুম তাঁর আননে অন্য এক সৌন্দর্য। সে-সৌন্দর্য গত বছর শান্তিনিকেতনে আবার লক্ষ করেছি। সর্বপ্রকার পার্থিব কামনার ঊর্ধ্বে উঠলে সংসার সম্বন্ধে সত্যসত্যই নির্লিপ্ত হলে শিল্পীপ্রকৃতির মানুষের জীবনে যে সৌন্দর্য বিকশিত হয় তার সঙ্গে যদি যোগ দেয় পরিণত বয়সের ‘all passion spent’ ক্ষান্তবর্ষণ শারদাকাশ তবে সেই শারদ-সৌন্দর্য বিভাসিত হয় শুক্ল কেশের কাশগুচ্ছের পটভূমিকায় প্রশান্ত উদাস ললাটে। রবীন্দ্রনাথকে এর আগে এত ভালো লাগেনি, এত সুন্দর মনে হয়নি। এই পরিচয় দিয়ে যাবার জন্যে তাঁর এতকাল জীবিত থাকার প্রয়োজন ছিল। জীবন যদি হয় পরিচয়জ্ঞাপন তবে আরও দীর্ঘ জীবনেরও প্রয়োজন আছে। বোধ হয় এইজন্যেই ঋষিরা বলে গেছেন, ‘পশ্যেম শরদং শতং জীবেম শরদং শতং।’

মৃত্যুর সমীপবর্তী হয়ে তাঁর মৃত্যুভয় ক্ষয় হয়েছে। মনে হয় তিনি সাগরসঙ্গমে অস্ফুট কল্লোল শুনতে পেয়েছেন। তাঁর ইদানীন্তন কবিতায় এই বিচিত্র উপলব্ধির বার্তা আছে। শারীরিক যন্ত্রণার সঙ্গে সংযুক্ত থাকলেও এটা একপ্রকার উপভোগ। নিরাসক্ত নিঃশঙ্ক নির্মল হয়ে জীবনকে তিনি চূড়ান্ত উপভোগ করছেন। ব্রাউনিং যে বলেছিলেন—

> Grow old along with me
> The best is yet to be—

তা এই উপভোগের আশায়। এ উপভোগ তখনই আসে যখন মানুষ যাবার জন্যে তৈরি হয়ে যানের অপেক্ষায় বসে। যা-কিছু সঙ্গে নেবার তাও গোছানো হয়েছে, যা-কিছু রেখে যাবার তাও গোছানো। কোথাও কোনো বিশৃঙ্খলা নেই, বাইরে কিংবা ভিতরে, পিছনে কিংবা সঙ্গে। কিছু এলোমেলো পড়ে থাকার ক্ষোভ নেই কিছু অসমাপ্ত রইল বলে খেদ নেই। তাই দু-দিন থেকে যাবার আগ্রহ নেই। তবে তিনি উতলাও নন। মানুষকে তিনি ভালোবাসেন, মানুষও তাঁকে ভালোবাসে। এই সম্পর্ক হঠাৎ ছিন্ন করবেন কী করে!

উতলা নন। অথচ তাঁর সঙ্গে কথা কইলে বোঝা যায়, যদিও তাঁর ব্যক্তিগত কোনো বাসনা নেই, তবু মানুষের কাছে তাঁর যে বিরাট প্রত্যাশা ছিল সে-প্রত্যাশার ক্রমিক অন্তর্ধান তাঁকে বিহ্বল করে তুলেছে। মানবজাতির অধঃপতন যে কত নিম্নে পৌঁছেছে তা মর্মে মর্মে অনুভব করে তিনি বেঁচে আছেন বলে গ্লানি বোধ করছেন। যে জার্মানিতে তিনি রাজসমারোহে অভিনন্দিত হয়েছিলেন সেই তাঁর অতি প্রিয় জার্মানি আজ কোথায়! কোথায় তাঁর আরও প্রিয় জাপান! আর ইংল্যাণ্ড? যে ইংল্যাণ্ড তার আবাল্য শ্রদ্ধাভাজন, যার শ্রদ্ধা তিনি প্রৌঢ় বয়সে লাভ করে বিশ্ববিখ্যাত হন, সেই ইংল্যাণ্ড! তাঁকে যাবার আগে এও দেখতে হল—এই পতন ও ধ্বংসের চিত্র! আর তাঁর দুর্ভাগ্য দেশ? দেশের জন্যে তাঁর যে আক্ষেপ তা বিলাপের তুল্য, কখনো কখনো প্রলাপের সদৃশ। গৌরব করবার কিছু নেই, আশা করবার কিছু নেই, শুধু দিনযাপনের গ্লানি, শুধু প্রাণধারণের পীড়া। তথাপি তাঁর আস্থা আছে ভারতের ওপর, গান্ধীজির ওপর। দেশ-বিদেশের নবজাতকদের প্রতি, নবীনদের প্রতি তাঁর আশীর্বাদ রয়েছে সবসময়। বিশ্বের অফুরন্ত যৌবনে তাঁর অফুরন্ত বিশ্বাস। তিনি আজকাল ভগবানে বিশ্বাস করেন কি না প্রশ্ন করে ধরাছোঁয়া পাইনি, কিন্তু প্রকৃতির অন্তর্নিহিত তারুণ্যে ও মানবের অন্তর্নিহিত মহত্ত্বে তিনি চিরদিনের মতো এখনও বিশ্বাসবান।

তাঁর জীবনের অস্তাচল যদিও মেঘাচ্ছন্ন তবু তিনি একমনে রশ্মি বিকিরণ করে চলেছেন। গ্যেটে ও টলস্টয়ের শেষজীবনের মতো তাঁর শেষজীবনও বিচিত্র প্রয়াসে পূর্ণ। তিনি যে এই বয়সেও প্রচুর লিখে

আমাদের প্রত্যহ লজ্জা দিচ্ছেন তা আমরা কনিষ্ঠেরা স্বীকার করি। কিন্তু সেই তাঁর একমাত্র কাজ নয়। আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমি ছবি আঁকি কি না। আঁকিনে শুনে ক্ষুণ্ণ হলেন, যেন ওর মতো আনন্দ আর নেই। যেন চেষ্টা করলে সকলে পারে। এবার তাঁর ছবি আঁকতে বসা চাক্ষুষ করে এলুম। বললেন তুলি দিয়ে তিনি যেমন আত্মপ্রকাশ করতে পারেন তেমন লেখনী দিয়ে নয়। দুয়োরানির চেয়ে সুয়োরানির দিকেই তাঁর শেষ বয়সের টান। সম্পাদকেরা তাঁকে লিখতে বাধ্য করেন, নইলে তিনি বোধ হয় লিখতেন না, আঁকতেন। চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ, তবু তুলির আঁচড় জোরালো ও ধারালো। সিংহের মতো থাবা ও নখর দিয়ে তিনি যা আঁকছেন তা এক হিসেবে লেখার চেয়েও দামি। তাতে তাঁর এই বয়সের আসল চেহারা ফুটছে। লেখেন তিনি অভ্যাসবশে। তেমন জিনিস গতানুগতিক না হয়ে যায় না। কিন্তু আঁকার বেলায় অন্য কথা। আমার মনে হয় তাঁর প্রকৃত পরিচয় এক এক বয়সে এক-একটি মিডিয়াম খুঁজেছে। এখনও তিনি গান রচেন, কিন্তু গানে আর তাঁকে তেমন করে পাওয়া যায় না, যেমন করে ছবিতে। পনেরো বছর আগে গানেই তাঁকে পাওয়া যেত, গদ্যে নয়। কবিতা অবশ্য তাঁর জীবনসঙ্গিনী। কিন্তু তাঁর কবিতাও ক্রমে তাঁর ছবির মতো খাপছাড়া হয়ে উঠেছে।

আমাকে বলছিলেন ছড়া লিখতে। বাংলা কবিতার নিজের রূপটি নাকি ছড়াতেই খোলে। ছড়ার কথা তিনি আমাকে এমন করে বোঝালেন যে আমি অতি সহজেই দীক্ষিত হলুম। তবে এখনও ছড়া লিখিনি। তিনি যেসব ছড়া লিখেছেন সেসব তাঁর ছবিরই আর-এক সংস্করণ। মনে হয় বিশুদ্ধ রেখার মতো বিশুদ্ধ শব্দের ভিতরে যে রস আছে সেই রস তিনি আস্বাদন করেছেন। অর্থের জন্যে তাঁর ভাবনা নেই। ছোটো ছেলেরা যেমন হিজিবিজি ও আবোল-তাবোলের রসে মুগ্ধ, কবিও তাঁর দ্বিতীয় শৈশবে সেই রসের রসিক। তবে এগুলি অর্থহীনও নয়, অর্বাচীনও নয়। তাঁর ছবিতে যে জিনিস সবচেয়ে চোখে ঠেকে সে তাঁর জোর, যে জোর ছিল প্রাগৈতিহাসিক মানবের। তাঁর ছড়ায় যে জিনিস কানে বাজে সে তাঁর বিস্ময়, যে বিস্ময়ের সহিত আদিমানব আবিষ্কার করেছিল শব্দের সঙ্গে শব্দ যোজনা করে শব্দধ্বনি। রবীন্দ্রনাথের ছবি ও ছড়া অবচেতন মনের প্রকাশ। যেন তাঁর মনের নীচের তলায় লক্ষ বছর আগের মন বাস করছে, তাকেই তিনি উপরে উঠে আসতে দিচ্ছেন।

কখনো ছবি আঁকছেন, কখনো ছড়া কাটছেন, কখনো গানে সুর দিচ্ছেন, কখনো নাচের মহড়া দেখছেন। শুনতে পাই গোপনে গোপনে রান্নার পরীক্ষাও চলে, আর হোমিয়োপ্যাথিক না বায়োকেমিক চিকিৎসার পরামর্শ দেওয়া হয়। এই কর্মিষ্ঠতা তাঁর সারা জীবনের অভ্যাস। শিলাইদহে শুনেছিলুম তিনি নাকি একবার মাটিতে মাছ পুঁতে নতুন রকমের সার তৈরি করতে চেয়েছিলেন, পচা মাছের গন্ধে গাঁয়ের লোকের টেকা দায় হয়েছিল। চাষ করবেন তাঁর ছেলে, সেজন্যে তিনি তাঁকে আমেরিকায় পাঠিয়ে ক্ষান্ত হননি, একটা আস্ত চর কিনেছিলেন বা কিনতে যাচ্ছিলেন কৃষির জন্যে। শিলাইদহের কাছারিতে তাঁর হাতের খানকয় জমিদারি চিঠি পড়েছিলুম। সেসব চিঠিতে তাঁর যে পরিচয় তা একজন ঝুনো জমিদারের। তাতে সাহিত্যের স্বাদ ছিল না, তবে রচনার সৌষ্ঠব ছিল বটে। পতিসরে তাঁর জমিদারি চালনার নমুনা দেখেছি, আর দেখেছি তাঁর প্রজাহিতৈষণার চিহ্ন। প্রজারা যে তাঁকে ভালোবাসত ও ভুলতে পারেনি তা আমি প্রজাদের মুখেই শুনেছি। একবার এক বৃদ্ধের মুখে তাঁর যৌবনের যেসব কাহিনি শুনেছিলুম তার একটি মনে আছে। তাঁর পিতৃশ্রাদ্ধের সময় প্রজারা তাঁকে যেসব উপঢৌকন দিয়েছিল, প্রথম দিন তিনি সেসব নিয়েছিলেন, কেননা ওটা একটা প্রথা। কিন্তু পরদিন তিনি সেগুলি ফিরিয়ে দিলেন। 'কী লজ্জা! আমার পিতার শ্রাদ্ধ! আমি নেব তোদের উপহার!' এই বলে তিনি তাদের অবাক করে দিলেন। বোধ হয় এমন অপূর্ব উক্তি ভূভারতের কোনো জমিদারের মুখে শোনা যায়নি। প্রজারা যে তাঁকে ভক্তি করবে এটা স্বাভাবিক। সে-বার আত্রাইতে কবি বলছিলেন, 'প্রজারা আমাকে দেখতে এসে বলল, পয়গম্বরকে আমরা চোখে দেখিনি। আপনাকে দেখে যাই।'

কিন্তু কর্মিষ্ঠতা যদিও রবীন্দ্রনাথকে গ্যেটে ও টলস্টয়ের সঙ্গে তুলনীয় করেছে তবু তাঁদের সঙ্গে তাঁর মূলত পার্থক্য আছে। কর্মের ভিতর দিয়ে তাঁদের যে চলা তা স্রোতের গতি, তার যতি নেই। আর রবীন্দ্রনাথের চলা

পাখির ওড়া। আকাশে ওড়ে, নীড়েও ফেরে।

যেন আমার গানের শেষে
থামতে পারি সমে এসে—

একথা ইউরোপের নয়, ভারতের। রবীন্দ্রনাথের সাধনা এই সমে আসার সাধনা। তাঁর অন্তরের অন্তরালে একটি পরম আশ্রয় আছে, সেটি তাঁর নীড়। সেখানে তিনি তাঁর জীবনের পর্বে পর্বে ফিরেছেন, সেইখান থেকে যাত্রা করেছেন। তিনি পদে পদে মিলিয়ে নিয়েছেন আকাশের সঙ্গে নীড়কে, নীড়ের সঙ্গে আকাশকে। তাই তাঁর আদির সঙ্গে অবসানের, উদয়ের সঙ্গে অস্তের একটি গভীর সংগতি পাবে ভাবীকাল। এমন সংগতি, এমন ঐক্য অন্য কারও জীবনে পাবে না এ যুগে।

একদিক থেকে এটা একটা বাধাও বটে। পাখিকে বেশি দূরে উড়তে দেয় না তার নীড়। সে প্রতি রাত্রে ফিরে আসে তার কেন্দ্রে। রবীন্দ্রনাথের জীবনে প্রাচুর্য আছে, বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু তাঁর পক্ষের বিস্তার সীমাহীন নয়, তাঁর জীবনের বাণী নিত্য বলেই তা পুনরুক্তিপরায়ণ। এই ক্রটি তাঁর একার নয়। এটা তাঁর দেশেরও। আমাদের পক্ষের বিস্তার নেই—কী কায়িক, কী মানসিক, আছে কেবল বাচিক। আমরা ছুটে গেলে ছুটে আসি, উধাও হতে পারিনে। পক্ষান্তরে অমন একরোখা গতি সদ্গতি নয়। ওতে শান্তি নেই। গ্যেটে বা টলস্টয়ের শেষজীবন শান্তির ছিল না। দ্বিধায়-সংশয়ে, পতনে-উত্থানে, ব্যাকুলতায়-জটিলতায় আবর্তিত ছিল। সেই নিগূঢ় অন্তর্বিরোধ রবীন্দ্রনাথের জীবনে থাকলে তা অত্যন্ত সুশাসিত। তিনি তাঁর পিতার কাছে যে শিক্ষা পেয়েছেন, যে শিক্ষা পেয়েছেন প্রকৃতির কাছে, তার ফলে তাঁর মনে বাইরের বিরোধের ছায়া পড়লেও তাঁর অন্তর নির্দ্বন্দ্ব। সম্প্রতি জগতের অন্যায় ও অনাচার তাঁর মনের ওপর আঘাত করছে কিন্তু ভিতরে শান্তির নীড়।

রবীন্দ্রনাথের ভিতরের বাঁধুনি তাঁকে আজীবন রক্ষা করেছে, জীবনের কোনো অবস্থায় ভ্রষ্ট হতে দেয়নি। সে-বাঁধুনি এতই কঠোর যে এই আশি বছর বয়সেও তাঁর কথাবার্তা একটুও বেফাঁস নয়, তাঁর উক্তি অসংবদ্ধ নয়। তিনি যা বলেন গুছিয়ে বলেন, রসিয়ে বলেন। অনুপ্রাস ও উপমা এই বয়সেও আছে। হাস্য-পরিহাস এখনও তাঁর স্বভাব। শরীর অবশ্য জীর্ণ হয়েছে, কিন্তু মনের কোথাও জরার লক্ষণ নেই। স্মৃতি ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে আসছে তাই ভুল হয় মাঝে মাঝে, কিন্তু বুদ্ধি তেমনি মার্জিত, কল্পনা তেমনি রঙিন, ভদ্রতা তেমনি অবারিত, স্নেহ তেমনি অকুণ্ঠিত। তাঁর মাজা দুর্বল হয়েছে, নুয়ে নুয়ে হাঁটেন, দেখলে কষ্ট হয়। কিন্তু মজ্জা তেমনি সবল। বুদ্ধির উপর কালের কুয়াশা নামেনি, প্রজ্ঞার দীপ্তি অম্লান। তাঁর ভিতরের বাঁধুনি তাঁকে শেষবয়সের চরম লজ্জা থেকে রক্ষা করেছে—ভীমরতি থেকে।

রবীন্দ্রনাথ কাজের লোক। উপনিষদে লিখেছে, 'কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।' কাজ করতে করতে তিনি আশি বছর অতিক্রম করতে যাচ্ছেন। কিন্তু তিনি কেবল কাজের লোক নন, তিনি ছুটির মানুষ। সে-ছুটি তিনি কাজের মাঝখানেই ভোগ করেন। যখনই তাঁর কাছে গেছি তখনই তিনি এমনভাবে অভ্যর্থনা করেছেন যেন তাঁর হাতে দেদার ছুটি, এমনভাবে কথা কয়েছেন যেন তাঁর সময় কাটছে না। কিন্তু সে আর কতক্ষণ! কয়েক মিনিট পরে আর কেউ গিয়ে হাজির। আসলে তাঁর সময় সিকি পয়সাও নেই, তিনি নিরন্তর ব্যাপৃত। অথচ তিনি তাঁর চারদিকে একটি ছুটির আবহাওয়া সৃষ্টি করে রেখেছেন। তাঁর ব্যস্ততা বা ত্বরা নেই। কোথায় যে তাঁর ছুটির উৎস আমি তার সন্ধান পাইনি। বোধ হয় মন মুক্ত হলে কাজ মানুষকে বাঁধে না। মানুষ খাটে, কিন্তু সে-খাটুনি খেলার মতো লাগে। রবীন্দ্রনাথ মুক্তপুরুষ, আধ্যাত্মিক অর্থে না হোক সাংসারিক অর্থে। তাঁর কোনো বাঁধন নেই, তাই তাঁর ভিতরে ছুটির ফুর্তি!

অন্যের বেলায় দেখি বয়স যত বাড়ছে রক্ষণশীলতাও তত প্রবল হচ্ছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কিনা মুক্তপুরুষ, তাই তিনি সংস্কারমুক্ত। শুনেছিলুম তাঁর সঙ্গে যেকোনো বিষয়ে আলাপ জমানো যায়, এমনকী promiscuity সম্বন্ধেও। তাঁর গত বছর প্রকাশিত 'ল্যাবরেটরি' গল্পটি পড়ে প্রমাণ পেলুম। কোনো আধুনিক লেখক তাঁর চেয়ে আরও আধুনিক নন, তাঁর দুঃসাহস আমাদের অনেকের পক্ষে অসমসাহস। অথচ এমনই সংযত তাঁর

শিল্পিত্ব যে মনে কোনো বিকার জাগে না। রবীন্দ্রনাথের মনের বাঁধুনি তাঁকে বর্মের মতো রক্ষা করেছে এখানেও। রবীন্দ্রনাথ চিরদিন এতটা সংস্কারমুক্ত ছিলেন না, তাঁর সতীত্বের সংস্কার একদা অতি দৃঢ়মূল ছিল। মনের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে সংস্কারের বাঁধন আলগা হয়েছে। তা বলে তিনি তাঁর বর্ম ও কবচ ত্যাগ করেননি। বরং তাঁর মনের বাঁধুনি শক্ত আছে বলেই তাঁর মন ক্রমে ক্রমে মুক্ত হতে পেরেছে। দেহের বাঁধুনি শক্ত না হলে যেমন আয়ুর ভার বহন করা যায় না, মনের বাঁধুনি শক্ত না হলে তেমনি মনের বাঁধন খোলে না। তিনি যে গদ্য, কবিতা লেখেন সেক্ষেত্রেও সেই একই কথা। তাঁর ছন্দের সাধনা নিখুঁত বলেই তিনি ছন্দের বিধিনিষেধ উপেক্ষা করতে পারেন, তাঁর মিলের হাতসাফাই আছে বলেই তিনি মিলকে সাফ অস্বীকার করতে পারেন। তিনি যে মুক্তক লেখেন তার পিছনে রয়েছে পদ্যের পদ্মাবতীর চরণচারণচক্রবর্তীপনা। জীবনব্যাপী পদসেবার পর তিনি একটু ঢিলে দিচ্ছেন। সে-অধিকার তাঁরই আছে।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন তাঁর জীবনশতদলের মুক্তির ইতিহাস। এক-একটি করে দল খুলেছে, সেইসঙ্গে বন্ধন খুলেছে। সমাপ্তির তটে বসে তিনি প্রতীক্ষা করছেন চরম মুক্তির শেষ খেয়ার।

রম্যাঁ রলাঁ

রম্যাঁ রলাঁ দেশকে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন, এইখানে তাঁর জিত। কালকে অতিক্রম করতে পারেননি, এইখানে তাঁর হার।

এ হার তাঁর একার নয়, এক জন কী দুজন বাদে আর সকলের। অথচ এ জিত তাঁর মতো এক জন কী দুজনের। আমরা আজ বিজেতাকে অভিনন্দন জানাব, কিন্তু বিজিতকেও সমবেদনা জানাতে ভুলব না! আত্মার সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ এমন নিগূঢ় যে হয়তো আমাদের আনন্দ-বেদনা মৃত্যুর পরপারে তাঁর কাছে পৌঁছোবে।

আঠারো-উনিশ বছর বয়সে তাঁর *জন ক্রিস্টোফার* আমার হৃদয় হরণ করেছিল। 'পিপলস থিয়েটার' আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ইচ্ছা করত জন ক্রিস্টোফারের মতো বাঁচতে, জনসাধারণের জন্যে সৃষ্টি করতে। জানতুম যে, জনসাধারণ আমাকে বুঝবে না, ক্রিস্টোফারকেও বুঝল না, সেইজন্যে আগে থাকতে শোক করতুম। শোক করতুম আর সুখী হতুম এই ভেবে যে, আমি সেই স্বল্পসংখ্যক দুঃখীজনের একজন যাদের কেউ বুঝবে না, অথচ যারা সকলের জন্যে সর্বস্ব দিয়ে গেছে। যখন বুঝবে তখন আর খুঁজে পাবে না, তার আগে আমরা জ্বলেপুড়ে নিঃশেষ।

এই যে 'elite' বা স্বল্পসংখ্যকের মোহ, এ মোহ আমার অনেক দিন পর্যন্ত ছিল, এখনও পুরোপুরি যায়নি। কিন্তু রলাঁ তাঁর এ মোহ শেষবয়সে কাটিয়ে উঠেছিলেন। যদি কেউ কোনোদিন তাঁর জীবনচরিত হৃদয় দিয়ে লেখেন তাহলে দেখবেন, এইটুকুর জন্যে তাঁকে কী অমানুষিক দুঃখ পেতে হয়েছিল। নিজেকে বহুসংখ্যকের একজন ভাবা শুনতে যত সহজ আসলে তত নয়। যাঁদের এক ছটাক প্রতিভা আছে তাঁরাও এক-একটি কেষ্টবিষ্টু। রলাঁর মতো দুর্লভ প্রতিভার অধিকারীর পক্ষে নোবেল প্রাইজের সিংহাসন থেকে নেমে চাষি-মজুরের সঙ্গে কাঁধ-মেলানো ইতিহাসে অপূর্ব। সতেরো বছরের অবিরাম অন্তর্দ্বন্দ্বের পরে তিনি তাঁর জীবনের মূল সমস্যার মীমাংসায় পৌঁছেছিলেন।

তাঁর জীবনের মূল সমস্যা বলেছি। বলা উচিত ছিল, তাঁর সাহিত্যিক বা শিল্পীজীবনের। এ ছাড়া তাঁর আরও একটা জীবন ছিল, নৈতিক বা আধ্যাত্মিক জীবন। তিনি ছিলেন মূর্তিমান বিবেক। টলস্টয়ের পরে ইউরোপের বিবেক ছিলেন তিনি এবং বার্নার্ড শ। বিবেকের সঙ্গে আপোশ দুজনের মধ্যে একজনও করেননি। কিন্তু শ-এর বিবেকের চেয়ে রলাঁর বিবেক নির্ভরযোগ্য। গত মহাযুদ্ধে এর অগ্নিপরীক্ষা হয়ে যায়।

তারপর থেকে ইউরোপের বিবেকীদের দৃষ্টি শ-এর প্রতি তেমন নয়, রলাঁর প্রতি যেমন। কিন্তু এবারকার এই মহত্তর যুদ্ধে দেখা গেল, রলাঁর বিবেকও অনির্ভরযোগ্য। বেঁচে থাকলে তিনি আর বিবেকীদের দৃষ্টিপথে পড়তেন না। সে-দৃষ্টি পড়ছে অলডাস হাক্সলি প্রমুখের ওপর। যদিও এঁরা কেউ রলাঁর মতো, শ-এর মতো বিরাট পুরুষ নন। এইখানেই তাঁর ট্র্যাজেডি।

কিন্তু এর উপর তাঁর হাত ছিল না। এ ট্র্যাজেডি অনিবার্য। তাঁর জীবন আলোচনা করে আমি বুঝতে পেরেছি, তিনি কেন সেবারকার যুদ্ধে যোগ দেননি, কেন এবারকার যুদ্ধে ঝাঁপ দিয়েছেন। কারণটা রাজনৈতিক বললে কিছুই বলা হয় না, কারণটা তাঁর স্বভাবের মধ্যে নিহিত। ওটা তাঁর নিয়তির নির্দেশ। বিবেক হেরে গেছে নিয়তির হাতে। তাঁর দোষ নেই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসিদের দেশে যে বিপ্লব ঘটে তার স্মৃতি ফরাসি মাত্রেরই মনোজীবনের অঙ্গ। এমন দিন নেই যেদিন তাদের মনে পড়ে না বিপ্লবী জনতার সুকৃতি বা দুষ্কৃতি, বিপ্লবী নেতাদের উদয় বা অস্ত। তারপরেও আরও কয়েক বার বিপ্লব ঘটে গেছে সেদেশে। ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের আঠারো বছর পরে রলাঁর জন্ম। তাঁর যখন পাঁচ বছর বয়স তখন আরও একবার বিপ্লব বাঁধে, কিন্তু ইতিহাসে তাকে বিপ্লব

বলে গণ্য করা হয় না; বলা হয়, কমুনার্দ বিদ্রোহ। রলাঁর মনোজগতে এইসব বিপ্লব বা বিদ্রোহের জের চলছিল জন্মকাল থেকে।

কিন্তু যাদের মাঝখানে তিনি মানুষ তারা মধ্যবিত্ত বা বুদ্ধিজীবী, তাদের স্বার্থ প্রথম বারের বিপ্লবেই সাধিত হয়েছে, দ্বিতীয় বারের অপেক্ষা রাখেনি। দ্বিতীয় বারের বিপ্লবে তাদের যেটুকু সহানুভূতি ছিল তৃতীয় বারের বেলা সেটুকুও রইল না। কমুনার্দ বিদ্রোহে তো তাদের সহানুভূতির বদলে অবজ্ঞার ভাব ছিল। মধ্যবিত্তরা বিপ্লবের নেতৃত্ব করা দূরে থাক, বিপ্লবকে হাড়ে হাড়ে ভয় করত। আবার বিপ্লব বাঁধবে, এতে তাদের অন্তরের সায় ছিল না। তবে তারা ভালো করেই বুঝত যে, জনসাধারণকে যদি তাতিয়ে কিংবা মাতিয়ে রাখা না যায় ওরা বিপ্লবের কথা ভাববে। সেইজন্যে জার্মানির সঙ্গে আবার কবে যুদ্ধ বাঁধবে, এবার ফ্রান্স জিতবে, এই ছিল তাদের নিত্যকার জল্পনা। আর ছিল আমোদপ্রমোদের ফলাও ব্যবস্থা। অন্তহীন মত্ততা এবং তপ্ততা।

রলাঁ মানুষ হন এই আবহাওয়ায়। তিনিও মধ্যবিত্ত তথা বুদ্ধিজীবী। স্বার্থের দিক থেকে বিচার করলে যুদ্ধবিগ্রহ ও ইন্দ্রিয়সুখ এই তো জীবনের লক্ষ্য। এর জন্যে যত পারো টাকা কামাও, যেমন করে পারো—ছলে-বলে-কৌশলে। তখনকার দিনের নৈতিক আদর্শ এর উপরে উঠত না। কিন্তু অতি অল্পবয়স থেকে রলাঁর তাতে বিরাগ আসে। দ্বিতীয়ত, তিনি যখন স্কুলের ছাত্র তখন থেকে টলস্টয়ের শিষ্য। যাকে বলে জীবনের সাফল্য তার চরমে উপনীত হয়েও টলস্টয়ের তৃপ্তি হল না, তিনি একে একে সব ত্যাগ করলেন—যা কিছু অর্থকরী, যা কিছু অনর্থকরী। কী করে মানুষকে ভালোবাসবেন, মানুষের সেবা করবেন—সব মানুষের, দীনহীন মানুষের—এই চিন্তায় টলস্টয় বিভোর। এমন সময় রলাঁর চিঠি—অজানা অচেনা তরুণের চিঠি তাঁর হাতে পৌঁছোয়। নগণ্য একটি তরুণকে 'প্রিয় ভ্রাতা' বলে সম্বোধন করে তিনি যে উত্তর দিয়েছিলেন সে-উত্তর দু-কথায় দায়সারা গোছের নয়। এই তরুণটি যেন তাঁর উত্তরাধিকারী, উত্তরাধিকারীকে সমস্ত জানাতে ও বোঝাতে হয়, তাই তিনি তাঁকে প্রকান্ড একখানি পত্র লিখেছিলেন। এইভাবে রলাঁর মন্ত্রদীক্ষা হল।

স্কুলের পড়া শেষ করে তিনি ইটালি যান, সেখানে দু-বছর কাটান। এক হিসাবে তাঁর শিক্ষানবিশি শেষ হয়েছিল স্বদেশেই। শিক্ষানবিশির পরে এক বছর দেশভ্রমণের রীতি ইউরোপের সনাতন প্রথা। রলাঁর ভ্রমণকাল কাটল ইটালির রোম প্রভৃতি অঞ্চলে। সেখানে তাঁর আলাপ হল এক বর্ষীয়সী জার্মান মহিলার সঙ্গে, নাম মালভিডা ফন মাইজেনবুগ। ইনি গ্যেটের সময়কার মানুষ। ভাগনার, নিটশে, মাতসিনি, গারিবল্ডি, ইবসেন প্রমুখের অন্তরঙ্গ বন্ধু। রলাঁকে দেখে ইনি চিনতে পেরেছিলেন তাঁর অন্তরবাসীকে। দুজনেই আদর্শবাদী, যে আদর্শ মরজগতে মহত্তম সেই আদর্শ দুজনের। মালভিডা তাঁকে আত্মপ্রত্যয় দিলেন, অস্তগামী তারা যেমন সূর্যকে দেয়। রলাঁ যখন রোম থেকে ফিরলেন তখন তিনি আদর্শনিষ্ঠ হতে কৃতসংকল্প। তখন আর তাঁকে মধ্যবিত্ত বলে ভুল করা যায় না। যাঁদের সে-ভুল ছিল তাঁদের ভুল ভাঙতে দেরি হল না। একজন তাঁকে বিয়ে করলেন ও বিয়ের অল্পকাল পরে আলাদা হলেন।

উপরে যাকে স্কুল বলা হয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে কলেজ। রলাঁ হলেন সেখানকার অধ্যাপক। পরে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের, প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হন। পরবর্তী বয়সে তিনি পদত্যাগ করেন। লেখা থেকে যা পেতেন তাতেই তাঁর চলত। সারাজীবন সামান্য খরচে চালিয়েছেন।

ইটালি থেকে ফেরার পরে তিনি যখন সাহিত্যে প্রবেশ করলেন তখন তাঁর প্রিয় বিষয় হল বিপ্লব ও প্রিয় বিভাগ হল নাটক। জনগণের নাট্যশালা বলে তাঁর একটি পরিকল্পনা ছিল। সাধারণ রঙ্গালয় তো আমোদপ্রমোদের দোকান। তারজন্যে নাটক লেখা মানে দোকানদারি। যাতে দু-পয়সা হবে না তেমন কোনো নাটকে কেউ অভিনয় করবে না। আর অভিনয় করলেও কেউ পয়সা দিয়ে দেখবে না। অথচ নাটকের মতো সার্বজনীন অভিজ্ঞতাকে আমোদপ্রমোদের আধার করে তাই দিয়ে বণিকবৃত্তি সম্পাদন যে ঘোর অসভ্যতা ও অনীতি। গ্রিকদের নাট্যশালা গির্জার মতো, মন্দিরের মতো ধনগন্ধহীন ছিল। ফরাসিদের নাট্যশালাও তাই হবে। তারজন্য তিনি লিখতে লাগলেন বিপ্লবের কাহিনি। বিপ্লবের ও ন্যায়নিষ্ঠতার। কিন্তু লিখলে কী হবে! বিপ্লবের প্রতি মধ্যবিত্তদের মনোভাব প্রসন্ন নয়, তাদের হাতেই কলকাঠি। তাতে জল মেশাতে রলাঁ রাজি

নন। সবচেয়ে দুঃখের কথা, জনগণ উদাসীন। হাড়ভাঙা খাটুনির পরে তারা চায় একটু রঙ্গ, একটু বিস্মৃতি। রলাঁ তা দিতে অক্ষম।

এরপরে তিনি নাটক লেখায় ক্ষান্তি দিয়ে জীবনচরিত ও উপন্যাস রচনায় মন দিলেন। এসব জনগণের জন্যে নয়। এগুলিতে বিপ্লবের কথা ছিল না, তবে বিদ্রোহের কথা ছিল। তাঁর মনের তার বিপ্লবের না হোক বিদ্রোহের সুরে বাঁধা প্রথম থেকেই। কিন্তু যুদ্ধের ওপর তাঁর আন্তরিক বিরাগ। যুদ্ধ বলতে ফরাসির কাছে বোঝায় জার্মানের সঙ্গে যুদ্ধ। জার্মান মানে মালভিডা ফন মাইজেনবুগ, জার্মান মানে বেঠোফেন। সংগীতের প্রতি তাঁর আকর্ষণ আশৈশব। তিনি বোধ হয় মনে মনে চেয়েছিলেন সংগীতশিল্পী হতে, ঘটনাচক্রে হয়ে দাঁড়ালেন সংগীতসমালোচক ও সাহিত্যিক। সংগীত ভালোবাসতেন বলে সংগীতনায়কদেরও ভালোবাসতেন। তাঁদের মধ্যে বেঠোফেনকেই ভালোবাসতেন সকলের চেয়ে বেশি। বেঠোফেন ছিলেন তাঁরই মতো বিপ্লবী বা বিদ্রোহী। সেই বেঠোফেনের স্বজাতির বিরুদ্ধে অসিধারণ? রলাঁর জন ক্রিস্টোফারও জার্মান। জন ক্রিস্টোফার-এর স্বদেশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ? কখনো নয়। যুদ্ধ যদি আর কারও বিরুদ্ধে হত তাহলে হয়তো কথা ছিল। কিন্তু আর কারও বিরুদ্ধে হলেও তিনি যুদ্ধবিরোধী হতেন। কারণ তাঁর হৃদয়টা আন্তর্জাতিক। তিনি জাতিভেদে বিশ্বাস করতেন না। সেইজন্যে তাঁর পক্ষে কঠিন হত যেকোনো জাতির বিরুদ্ধে খড়্গধারণ।

অথচ তিনি যে ঠিক অহিংসাবাদী ছিলেন তা নয়। তা যদি হতেন বিপ্লবের কথা ভাবতেন না। বিপ্লব কি কোনোদিন বিনা রক্তপাতে হয়েছে? না। তিনি তা জানতেন। সেইজন্যে তাঁকে অহিংসক বলে ধরে নেওয়া যায় না। কিন্তু টলস্টয়ের প্রভাবে তিনি অহিংসার প্রয়োজন মানতেন। বিপ্লব বা বিদ্রোহ ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য যদি অহিংসভাবে সিদ্ধ হয় তো অহিংসাই শ্রেয়, যদি না হয় তো হিংসার আশ্রয় নিতে হবে। উপায়কে উদ্দেশ্যের উপরে স্থান দিলে চলবে না। এটা যে কেবল তাঁর শেষবয়সের যুক্তি তা নয়, এ যুক্তি বরাবরই তাঁর মনের তলে প্রচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু এক বার যদি এ যুক্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় তো যুদ্ধবিগ্রহেরও সমর্থন করা হয়। যুদ্ধবিগ্রহকে সমর্থন করলে জার্মানির বিরুদ্ধে ইটালির বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাঁধে। বেঠোফোনের বিরুদ্ধে, মাইকেল এঞ্জেলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ? ক্রিস্টোফার-এর বিরুদ্ধে, গ্রাতসিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? অসম্ভব।

গত মহাযুদ্ধের মধ্যভাগে রাশিয়ায় যখন বিপ্লব ঘটে তখন রলাঁ পড়লেন দোটানায়। বিপ্লবী তিনি, তাঁর তো আনন্দে উদবাহু হওয়া উচিত। লেনিন না কি তাঁকে সহযাত্রী হতে সেধেছিলেন সুইটজারল্যাণ্ড থেকে রুশ দেশে। তিনি গেলেন না। বিপ্লব হলেই প্রতিবিপ্লব হবে, উভয় পক্ষে হাতাহাতি বেঁধে যাবে, তার মানে গৃহযুদ্ধ। তাই হল রাশিয়ায়। যুদ্ধের বিরুদ্ধে যিনি সুইটজারল্যাণ্ড থেকে প্রচারকার্য চালাচ্ছিলেন তিনি কেমন করে গৃহযুদ্ধের পোষকতা করতেন? অসংগতির অপবাদ রটত। তবে একথাও ঠিক যে, তিনি রক্তপাতে কাতর ছিলেন। ইতিহাসের বৃহত্তম যুদ্ধজনিত যে ভয়াবহ রক্তপাত ও তজ্জনিত শোকতাপ ইউরোপের বক্ষ ব্যাকুল করেছিল, রলাঁর বুকে বাজছিল সেই ব্যাকুল ব্যথা। এর উপর আবার বিপ্লব! তিনি প্রস্তুত ছিলেন না তারজন্যে।

মহাযুদ্ধের পরেও বহুকাল যাবৎ প্রস্তুত ছিলেন না। বিপ্লব যে মন্দ, এ যুক্তি তাঁর নয়। তাঁর যুক্তি, বিপ্লবের পদ্ধতি মন্দ। উদ্দেশ্য মন্দ নয়, উপায় মন্দ। বারবুসকে লিখেছিলেন,

> I wrote in Clerambault (and I am more than ever of that opinion) : It is not true that the end justifies the means. The means are ever more important for true progress than the end. ..For the end (so rarely reached and always incompletely) but modifies the external relation, between men. The means, however, shape the mind of men according either to the rhythm of justice or to the rhythm of violence.

কিন্তু উপায়ের উপর এতটা জোর দিলে প্রকারান্তরে বিপ্লবের মূলোচ্ছেদ করা হয়, কারণ ইতিহাসে এমন বিপ্লব কোথায় যাতে উপায়ের শুদ্ধিরক্ষা হয়েছে? এই স্বতোবিরোধ রলাঁকে নিষ্ফল করত যদি-না তিনি আকস্মিকভাবে আবিষ্কার করতেন গান্ধীকে। গান্ধীও বিদ্রোহী জননায়ক, অথচ তাঁর উপায় অশুদ্ধ নয়। রলাঁর

মন যা চায় তিনি তাই, তিনিই সেই বিপ্লবী যাঁর যুক্তি বিপ্লবের মূলোচ্ছেদ করে না। গান্ধীকে রলাঁ ইউরোপের বিপ্লবীমহলে পরিচয় করিয়ে দিলেন। কিন্তু ইউরোপের বিপ্লবীদের সম্মুখে তখন জরুরি প্রশ্ন : সোভিয়েত রাশিয়া যদি বিপন্ন হয় তাহলে কি উপায়ের কথা ভেবে সময় নষ্ট করা উচিত? রলাঁর গান্ধীচরিত এ প্রশ্নের উত্তর নয়। রলাঁ তা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই শেষপর্যন্ত উপায়ের অশুদ্ধতা মেনে নিয়েছিলেন।

ভালো হোক মন্দ হোক এতকাল পরে একটা বিপ্লব ঘটেছে, তার ফলে জনসাধারণের অধিকার ও ক্ষমতা বেড়ে গেছে, এটা তো স্পষ্ট। কথা হচ্ছে, তার দুর্দিনে তাকে বাঁচাতে হলে হিংসার আশ্রয় নেওয়া চলবে কি না? রলাঁ বললেন, চলবে। যদি সোভিয়েতকে নিয়ে যুদ্ধ বাঁধে তাহলে যুদ্ধে যোগদান চলবে কি না? রলাঁ বললেন, চলবে। এমনি করে তিনি যুদ্ধবিরোধী থেকে যুদ্ধসমর্থক হয়ে উঠলেন। কিন্তু এর জন্যে তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্বের সীমা ছিল না। জার্মানির সঙ্গে ইটালির সঙ্গে যুঝতে হল ফ্রান্সকে। বেঠোফেনের সঙ্গে মাইকেল এঞ্জেলোর সঙ্গে তাঁকে। কী প্রগাঢ় বেদনা! এ যেন নিজের হাতে নিজের পাঁজর ভাঙা।

খানিকটা আত্মপ্রতারণাও ছিল। রলাঁ মনে করেছিলেন, সময়মতো হস্তক্ষেপ করলে যুদ্ধ বাঁধবেই না। 'অ্যাকশন' 'অ্যাকশন' বলে তিনি যখন হাঁক ছাড়তেন তখন এই কথাটাই বোঝাতে চাইতেন যে, সময় থাকতে চেষ্টা করলে যুদ্ধ বন্ধ হবে। আমাদের অনেকেরই সেই ধারণা ছিল। হিটলারকে উঠতে না দিলে কি এত বড়ো যুদ্ধ বাঁধত? মুসোলিনিকে বাড়তে না দিলে কি হিটলারকে হারানো এত শক্ত হত? রলাঁর যুক্তি এক হিসেবে যুদ্ধবিরোধীরই যুক্তি। কিন্তু আমরা যেমন ছেলেমানুষ ছিলুম তিনিও তেমনি শিশু ভোলানাথ। জানতেন না যে, সরষের ভিতর ভূত থাকে।

লাভের মধ্যে হল এই যে, রলাঁর নৈতিক উচ্চতা টলস্টয়ের ধারেকাছেও রইল না। গান্ধীর কাছে তো নয়ই। নিয়তি।

তবে রলাঁ ছিলেন স্বভাবশিল্পী, সুযোগ পেলেই পিয়ানো নিয়ে বসতেন, বেঠোফেন বাজাতেন। নাটক বা উপন্যাস লিখতেন। লিখতেন সংগীত বিষয়ক প্রবন্ধ। মহাপুরুষদের জীবনদ্বন্দ্ব। জীবনছন্দ। তাঁর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দচরিত একপ্রকার শিল্পকাজ। ও-বই লিখে তিনি সোভিয়েত রাশিয়ার বা বিপ্লবী ইউরোপের জিজ্ঞাসা দূর করেননি। ভারতের আত্মার সঙ্গে পরিচয় করিয়েছেন ইউরোপের আত্মার। সাধনার সঙ্গে সাধনার। আবিষ্কার করে আনন্দিত হয়েছেন যে, বাইরে আমাদের দূরত্ব যত হোক অন্তরে আমরা নিকট। এই আবিষ্কার তাঁকে শান্তি দিয়েছে শেষবয়সের চরম অশান্তির মাঝে। বলও দিয়েছে।

সাহিত্য হিসেবে তাঁর জীবনবৃত্তগুলির মূল্য কত জানিনে। তাঁর নাটক বেশি পড়িনি, মূল্য আমার অজানা। দুখানি উপন্যাস পড়েছি—'জন ক্রিস্টোফার' ও 'মন্ত্রমুগ্ধ আত্মা'। দ্বিতীয়টি শেষ করিনি। যতদূর পড়েছি তার ওপর নির্ভর করে বলতে পারি প্রথমটির সমান হয়নি, কিন্তু তার চেয়েও গভীর হয়েছে। রসঘন হয়েছে। হয়েছে মর্মন্তুদ।

উভয় গ্রন্থেই গ্রন্থকারের মনে একই জিজ্ঞাসা—কেমন করে বাঁচব? একই উত্তর—মিথ্যার সঙ্গে আপোশ করব না, সত্য করে বাঁচব। এর দরুন যদি দুঃখ পেতে হয় দুঃখ পাব, এড়াব না। জীবনে বহু দুঃখ আছে তা জেনেও জীবনকে ভালোবাসব। সেই তো বীরত্ব। মর্তলোকে একমাত্র বীরত্ব।

ক্রিস্টোফার ও আনেত, দুই উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা, উভয়েই অসুখী। তাদের সুখী করার জন্যে তাদের স্রষ্টার বিন্দুমাত্র প্রয়াস নেই। কিন্তু যাতে তারা খাঁটি থাকে—পোড়-খাওয়া সোনার মতো খাঁটি—সৃষ্টিকর্তার সমস্তক্ষণ লক্ষ। সাংসারিক অর্থে তারা সাধু বা সাধ্বী নয়, কিন্তু উচ্চতর অর্থে তারা শুদ্ধ, তারা নির্মল। পিউরিটি বলতে কী বোঝানো উচিত তার এক জোড়া নতুন উদাহরণ দিয়ে গেলেন রলাঁ। হয়তো শুধু এইজন্যেই তাঁকে এ দুটি মহাভারত-রামায়ণ লিখতে হয়েছিল এতকাল ধরে।

মহাভারত-রামায়ণের সঙ্গে এ দুটি এপিক উপন্যাসের তুলনা করছি আর এক কারণে। উভয়েরই অন্তরালে রয়েছে দুই প্রলয়ংকর যুদ্ধ। ভাবী যুদ্ধের ছায়া পড়েছে 'জন ক্রিস্টোফার'-এর ওপরে। 'মন্ত্রমুগ্ধ আত্মা'র ওপর

ভূত-ভবিষ্যৎ উভয় যুদ্ধের ছায়া। সুতরাং পরোক্ষভাবে এ দুখানি যুদ্ধকাব্য। উচ্চাঙ্গের কি না, স্মরণীয় কি না, সে-বিচার মহাকাল করবে।

আমাদের কারো কারো জীবনে রলাঁর এ দুটি পুথি স্থায়ী প্রভাব রেখে গেছে। বিংশ শতাব্দীর ইউরোপে *জন ক্রিস্টোফার* অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে ওর সমকক্ষ অনেক। ওর চেয়েও মাথায় উঁচু টলস্টয় ডস্টোয়েভস্কির একাধিক উপন্যাস। রলাঁর স্থান সাহিত্যের সভায় তাঁদেরই পাশে। তবে *জন ক্রিস্টোফার* বা *মন্ত্রমুগ্ধ আত্মা* প্রধানত জীবনজিজ্ঞাসুদের জন্যে। 'সমর ও শান্তি' বা 'কারামাজভ' জীবনজিজ্ঞাসু তথা সর্বসাধারণের জন্যে।

'জন ক্রিস্টোফার' বিশেষ করে সংগীতপ্রেমিকদের জন্যে। এর পাতায় পাতায় সংগীত প্রসঙ্গ। বোধ হয় বেঠোফেনের জীবনী লিখে রলাঁর সংগীত সম্বন্ধে বলবার কথা ফুরোয়নি, তার সঙ্গে মিলেছে সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তব্য। ক্রিস্টোফারের সঙ্গে অলিভিয়েরের। জার্মানের সঙ্গে ফরাসির। ক্রিস্টোফারকে জার্মান না করলে কি চলত না? না, চলত না। উঁচুদরের সংগীতকার যাঁরা তাঁদের শিক্ষা এক পুরুষের নয়, তিন-চার পুরুষের। বাখ ও বেঠোফেন প্রমুখ পুরুষানুক্রমে সংগীতশিল্পী। জার্মানিতে এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত, ফ্রান্সে বিরল। তারপর সংগীতশিক্ষা তো কেবল পরিবারে হয় না, হয় রাজরাজড়ার দরবারে। জার্মানিতে শত শত দরবার ছিল একশো বছর আগেও। ফ্রান্সে বড়োজোর ছিল একটি। তারপর জার্মানি এমন দেশ যে তার ছোটো-বড়ো সব শহরেই থিয়েটার, অপেরা, কনসার্ট ও সেই-জাতীয় অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠান অগুনতি। পাড়ায় পাড়ায় জলসা, ঘরে ঘরে গানবাজনা। কাজেই ক্রিস্টোফারকে জার্মান করতেই হল। কিন্তু জার্মানিতে তখন সামরিকতার বাড়াবাড়ি, খুদে কর্তাদের সঙ্গে মুখ সামলে কথা কইতে হয়, কথায় কথায় বিধিনিষেধ। স্বাধীনচেতা ক্রিস্টোফারকে তাই বিপদে পড়ে ফেরার হতে হল প্যারিসে। সেখানে তাঁর ধীরে ধীরে পসার জমল, নামডাক হল। প্যারিস যদিও ফ্রান্সের রাজধানী তবু আন্তর্জাতিকতার পীঠস্থানও বটে। গুণী লোক দেখলে ফরাসিরা খাতির করে। ক্রিস্টোফার তাদের একজন হয়ে উঠল, ফ্রান্সকে ভালোবাসল অলিভিয়েরকে বন্ধু পেয়ে। এদের দুজনের বন্ধুতা প্রেমের চেয়েও নিখাদ। দেশের ব্যবধান অলীক, ভাষার ব্যবধান অলীক।

অলিভিয়ের আদর্শবাদী সাহিত্যিক। ক্রিস্টোফার আদর্শবাদী সংগীতকার। এমনই আরও কয়েক জন আদর্শবাদীকে বাস্তববাদীকে আমরা পাচ্ছি, তাদের কেউ নারী কেউ পুরুষ। তাদের এক-একজনের এক এক ধারা, এক এক দিকে গতি। একজনের নাম ফ্রাঁসোয়াজ উদোঁ। অভিনেত্রী। এঁর সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলেছেন,

> But especially he was indebted to her for a better understanding of the theatre; she helped him to pierce through to the spirit of that admirable art, the most perfect of all arts, the fullest and most sober. She revealed to him the beauty of that magic instrument of the human dreams,—and made him see that he must write for it and not for himself, as he had a tendency to do...Francoise's ideas were in accordance with Christopher's, who, at that stage in his career, was inclined towards a collective art, in communion with other men, Francoise's experience helped him to grasp the mysterious collaboration which is set up between the audience and the actor...It was this common soul which it was the business of the great artist to express.

এরপরে আধুনিক ইউরোপ সম্বন্ধে বলা হয়েছে,

> Modern Europe had no common book : no poem, no prayer, no act of faith which was the property of all. Oh! the shame that should overwhelm all the writers, artists, thinkers, of to-day! Not one of them has written, not one of them has thought, for all. Only Bethoven has left a few pages of a new Gospel of consolation and brotherhood : but only musicians can read it, and the majority of men will never hear it.

রলাঁর সাধ ছিল সংগীতকার হতে। বিধাতা বাদী। পূর্বপুরুষেরা সংগীতশিল্পী নন। নাট্যকার হতে স্পৃহা ছিল। তাঁর স্পৃহা থাকলে কী হবে, লোকের আগ্রহ ছিল না। বার বার তিন বার। এবার ঔপন্যাসিক। এবার সিদ্ধার্থ।

কিন্তু তাঁর সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাই বলা যায় বেঠোফেন সম্বন্ধে যা তিনি বলে গেছেন। একটু ঘুরিয়ে বললে যা দাঁড়ায় তা এই :

> Rolland has left a few pages of a new Gospel of consolation and brotherhood : but only seekers after Life can read it, and the majority of men will never hear it.

গ্যেটে ও তাঁর দেশকাল

গ্যেটের বয়স যখন চল্লিশ তখন ইউরোপের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে—ফরাসি বিপ্লব। গ্যেটের ব্যক্তিগত জীবনেরও একটা অধ্যায় শেষ হয়ে যায়। এই ঘটনার জন্যে নয়, অথচ এর সঙ্গে একটা প্রচ্ছন্ন সম্বন্ধও ছিল। সমষ্টির জীবনের সঙ্গে ব্যক্তির জীবন নানা অদৃশ্য সূত্র দিয়ে বাঁধা।

ইংরেজিতে একটা প্রবচন আছে, যে ঘটনা ঘটবে তার ছায়া পড়ে তার পূর্বে। ফরাসি বিপ্লবের ছায়া কেবল ফ্রান্সে নয়, ফ্রান্সের বাইরেও পড়েছিল বেশ কিছুকাল আগে। জার্মানিতে এই ছায়াপাতের যুগটাকে বলা হয় ঝড়ঝাপটার যুগ। এর অগ্রণীদের মধ্যে ছিলেন গ্যেটে স্বয়ং। তাঁর বাইশ-তেইশ বছর বয়সে লেখা 'গ্যোটস' নাটক ও তেইশ-চব্বিশ বছর বয়সে লেখা 'ভের্টর' উপন্যাস জার্মানিতে যে ভাবাবেগের সূচনা করে তা কেবল জার্মানিতেই আবদ্ধ থাকে না। ইউরোপের সর্বত্র 'ভের্টর'-এর অনুবাদ হয়। তা পড়ে বহু যুবক আত্মহত্যা করে। তরুণের প্রাণে তখন এক অভূতপূর্ব অশান্তি। তার যেন কত কী করবার আছে, না করতে পারলে তার জীবন বৃথা, অথচ সময় অনুকূল নয়। সময়ের জন্যে সবুর করতে হবে। সবুর করতে করতে জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ অতিবাহিত হবে। ততদিনে বল বয়স চলে যাবে। কে করবে সবুর!

গ্যেটে হয়তো এই জ্বালা থেকে মুক্ত হবার জন্যে আত্মহত্যা করতেন, কিন্তু তাঁকে উদ্ধার করল তাঁর ভাগ্য। ছাব্বিশ বছর বয়সে তিনি ভাইমারের সামন্তরাজার মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হন। রাজকার্যের দায়িত্ব তাঁর অশান্ত অন্তরকে প্রশান্তি দিতে না পারলেও নিত্যনতুন প্রয়াসে ব্যাপৃত রাখল। তাঁর প্রয়াসের বিষয় ছিল কৃষি ও খনি। অন্য কোনো ভাগ্যবান হলে অবিলম্বে বিবাহ করতেন। উপযুক্ত গৃহলক্ষ্মীর অভাব ছিল না। কবি কিন্তু সেদিকে উদাসীন। থাকতেন একটি ছোটো বাগানবাড়িতে। ওটি যদি না পেতেন তাহলে মন্ত্রীপদ স্বীকার করতেন না, ভাইমার থেকে চলে যেতেন। ওই তপোবনে তাঁর একমাত্র সঙ্গী ছিল তাঁর মালি ও একমাত্র সঙ্গিনী ছিলেন বিশ্বপ্রকৃতি। সঙ্গিনীর সঙ্গে আলাপের ভাষা হল বিজ্ঞান। বিজ্ঞান তাঁকে তন্ময় করে রাখল।

এইভাবে কেটে গেল দশ-এগারো বছর। বিপ্লবের ছায়া পড়ছে দেশে-বিদেশে। ঝড়ঝাপটার যুগ সমানে চলছে। লোকে আশা করছে গ্যেটে থাকবেন যুগের পুরোভাগে। তিনি কিন্তু ধীরে ধীরে পেছিয়ে পড়লেন। তেমন লেখা আর তাঁর হাত দিয়ে বেরোয় না। দিন দিন তিনি নিজেকে সংযত ও অনাসক্ত করতে লাগলেন। অথচ সন্ন্যাসীর মতো নয়। ঈশ্বরে তাঁর বিশ্বাস ছিল, মহাপুরুষদের তিনি শ্রদ্ধা করতেন, কিন্তু প্রচলিত ধর্মমতের ওপর তাঁর আস্থা ছিল না। এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন ফরাসি বিপ্লবের নেতাদের সমানধর্মা, রুশো-ভলতেয়ারের সগোত্র। সাঁইত্রিশ বছর বয়সে যখন তিনি ইটালিযাত্রা করেন তখন তাঁর জীবন নানা বিপরীত শক্তির সংঘাতে দোলায়মান ও বিক্ষুব্ধ। কবি ও নাট্যকার হিসেবে তিনি ঝড়ঝাপটার যুগ অতিক্রম করেছেন, কিন্তু কোনখানে নোঙর ফেলবেন তা ঠিক করতে পারছেন না। বিজ্ঞানসাধক হিসেবে তিনি অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন, কিন্তু বিজ্ঞান তো মানুষের সৌন্দর্যপিপাসা মেটাতে পারে না। সামাজিকতা তিনি পরিহার করেছেন, ভলতেয়ার ও রুশোর মতো তিনি অবন্ধন। কিন্তু এমন কোন পাখি আছে যার নীড় নেই, সঙ্গিনী নেই, সন্তান নেই? স্বাধীনতা ভালো, কিন্তু অতিমাত্র স্বাধীনতা ভালো নয়।

বছর দুই পরে যখন তিনি ইটালি থেকে ফেরেন তখন তাঁর সাহিত্যের আদর্শ স্থির হয়ে গেছে। ঝড়ঝাপটা এরপর থেকে তাঁর বাইরে। ভিতরে তার প্রবেশ নেই। জানালার খড়খড়ি ও শার্সি তুলে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত। প্রাচীন গ্রিক ও রোমকদের মতো তাঁর সৌন্দর্যের আদর্শ ক্লাসিক। স্বদেশের ও স্বকালের রোমান্টিক আদর্শ তিনি পিছনে ফেলে এসেছেন। কিংবা বলা যেতে পারে তিনিই পেছিয়ে যেতে যেতে প্রাচীন গ্রিস ও রোমে পৌঁছে গেছেন। আর কেউ অমন করে পিছু হটেনি। অথচ বিজ্ঞানে তিনিই সবচেয়ে আধুনিক। তখনকার দিনে

বিবর্তনবাদের উদয় হয়নি। গ্যেটেই তার পূর্বদ্রষ্টা। বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগেও তাঁর দান সেকালের পক্ষে বিস্ময়কর। কোনো বৈজ্ঞানিকের কোনো মতবাদই চিরস্থায়ী হয় না, তাঁর বেলায়ও এর ব্যতিক্রম হয়নি।

ইটালি থেকে ফিরে তিনি সঙ্গিনী গ্রহণ করলেন। শ্রেণির বাধা ছিল বলে হোক বা ধর্মের প্রতি অনাস্থা ছিল বলেই হোক বিবাহের অনুষ্ঠান ঘটল না। হয়তো এক্ষেত্রেও তাঁর ওপর রুশোর প্রভাব পড়েছিল। গৃহিণীকেই গৃহ বলা হয়। গৃহ পেয়ে তিনি স্থিতি পেলেন। অথচ সামাজিক মানুষ হলেন না। সমাজ থেকে যেমন দূরে ছিলেন তেমনি দূরেই, বোধ হয় তার চেয়েও দূরে রইলেন। ওদিকে ডিউক দিলেন তাঁকে রাজকীয় রঙ্গমঞ্চের পরিচালনার ভার। থিয়েটার তাঁকে চিরকাল আকর্ষণ করেছে। এবার সুযোগ জুটল ইচ্ছামতো পরীক্ষানিরীক্ষা করবার।

এসব নিয়ে যখন তিনি সুশৃঙ্খল ও শান্ত, তখন এল কিনা ফরাসি বিপ্লব। আর পাঁচ-দশ বছর আগে আসতে কে বারণ করেছিল! এমন অকস্মাৎ আসবে বলে কোনো নোটিশ দিল না! দেখুন দেখি কী দারুণ অভদ্রতা! মানুষ একটু শান্তি ও শৃঙ্খলার স্বাদ পাবে চল্লিশ বছর বয়সে, তাও বরাতে নেই। গ্যেটে অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করলেন। ফরাসি বিপ্লব সম্বন্ধে তাঁর আপত্তির প্রথম কথা হল ওটা শান্তি ও শৃঙ্খলার পরিপন্থী। ভুলে গেলেন যে জার্মানির ঝড়ঝাপটাও আইন বাঁচিয়ে চলবে বলে অঙ্গীকার করেনি। মোট কথা, সবুর করতে পারবে না বলে কেউ কেউ আত্মহত্যা করেছিল। সবুর করতে করতে কেউ কেউ বোঝাপড়া করেছিল। অনেকের বেলায় সে-বোঝাপড়া আপোশের পর্যায়ে পড়ে। গ্যেটের বেলায় তা হয়নি। তাঁর জীবনযাত্রা আর দশজন অভিজাতের মতো ছিল না। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিও ফিউডাল যুগের নয়। যেসব শক্তির বিরুদ্ধে বিপ্লব, তাদের চেয়ে তিনি নিকটতর ছিলেন যেসব শক্তির অনুকূলে বিপ্লব, তাদের। তাঁর স্ত্রী জনগণের কন্যা, যেমন 'এগমন্ট'-এর ক্লারা। তাঁর প্রকৃতি-আরাধনা বিপ্লবী নায়কদের ধর্ম। তাঁর 'হেরমান ও ডরোথেয়া' নতুন ধরনের লোকসাহিত্য। বিপ্লবের পূর্বে রচিত ঝড়ঝাপটা যুগের নাটক উপন্যাস প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ ঘোষণা। বিপ্লবের পরে রচিত 'স্বয়ংবৃত সম্পর্কাবলি' সামাজিক বিধিনিষেধের চেয়ে মানব-মানবীর স্বাধীন সম্পর্ককেই বড়ো স্থান দিয়েছে। 'ফাউস্ট' নাটকের জীবনদর্শন যে অক্লান্ত ও অনাসক্ত কর্মযোগ সে তো বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও পুরাতন হয়নি।

ফরাসি বিপ্লবের পরবর্তী পঁচিশ বছর ইউরোপের জীবন যেমন রোমাঞ্চকর তেমনি দুঃখে দ্বন্দ্বে ভরা। যুদ্ধবিগ্রহের দ্বারা বিপর্যস্ত ইউরোপ কবিকে হয়তো পাগল করে তুলত, যদি-না থাকত তাঁর বিজ্ঞানসাধনা ও ক্লাসিক মার্গ। আপনাকে বাঁচাবার জন্যে তিনি একপ্রকার বানপ্রস্থ অবলম্বন করেছিলেন। সেটা এক হিসাবে ছাব্বিশ বছর বয়স থেকেই, কিন্তু বিশেষ করে চল্লিশের পর। নেপোলিয়নের পতন হলে যখন বিপ্লব-প্রতিবিপ্লবের যুগ শেষ হয়ে যায় তখন গ্যেটের জীবনের দ্বিতীয় পর্যায় সারা হয়। তখন বাইরের জগতে শান্তি আসে, শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়। জানালার শার্সি-খড়খড়ি বন্ধ করে রাখার দরকার থাকে না। পত্নীর সঙ্গে সম্বন্ধ ইতিমধ্যে বিধিবদ্ধ হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর কবির ঘরসংসারের ভার নেন উচ্চবংশীয়া পুত্রবধূ। বাগানবাড়ি থেকে ইতিপূর্বে উঠে আসা হয়েছিল বাসগৃহে। গ্যেটের জীবনের অবশিষ্ট সতেরো বছর যেকোনো একজন পদস্থ রাজপুরুষের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে তুলনীয়। নানা দিগবিদিক থেকে ভক্তেরা আসতেন তাঁর দর্শন পেতে। আরাম ও সম্ভ্রমের অভাব ছিল না। লোকে বলত, 'ইয়োর একসেলেন্সি'। পদবি মিলেছিল 'ফন গ্যেটে'। এই বয়সেও তাঁর প্রকৃতিপূজার বিরাম ছিল না। তাঁর ক্লাসিক মার্গও ছিল অপরিত্যক্ত, কিন্তু একটু তফাত ছিল।

নেপোলিয়নের ফরাসি ফৌজ বার বার জার্মানি আক্রমণ করায় জার্মানিদের জাতীয় ঐক্যবোধ নতুন করে উদ্দীপিত হয়। এ বোধ যে কোনো কালে ছিল না তা নয়। বহু বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত ও বোহেমিয়া-হাঙ্গেরি প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গে সংযুক্ত থাকায় জার্মানির রাজনৈতিক জীবনে ঐক্য ছিল না। কিন্তু সংস্কৃতিতে, সংগীতে, সাহিত্যে জার্মান মাত্রেরই একটা মিলনভূমি ছিল, যদিও সেখানেও প্রোটেস্টান্ট ও ক্যাথলিকের ভেদবুদ্ধি ছিল। এবার রাজনৈতিক জীবনকেও একসূত্রে বাঁধবার প্রয়োজন দেখা দিল। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স রাজনৈতিক ঐক্যের

দরুন দিগবিজয়ী হয়েছে, ভূমন্ডলের সর্বত্র রাজ্যলাভ করেছে, অর্থে ও সামর্থ্যে তারা অগ্রগণ্য। জার্মানি তাদের চেয়ে সব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হয়েও সব বিষয়ে পশ্চাৎপদ শুধু রাজনৈতিক ঐক্যের অভাবে। জার্মানি যদি এক রাষ্ট্র হত, জার্মানরা যদি এক নেশন হত তাহলে কি নেপোলিয়নের হাতে বার বার লাঞ্ছিত ও পরাজিত হত?

এমনি করে ন্যাশনালিজমের সূত্রপাত হয়। সারা শতাব্দী ধরে এর মরশুম চলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আমরা এর পরিণাম দেখেছি। ন্যাশনালিজমের সঙ্গে তথাকথিত সোশ্যালিজম মিলিত হয়ে যে বিভীষিকা সৃষ্টি করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তারও পরিণাম লক্ষ করেছি। গ্যেটে গোড়া থেকেই এর বিরোধী ছিলেন। একবার তিনি বলেছিলেন, ফরাসিদের প্রাণকেন্দ্র প্যারিস, ইংরেজদের লণ্ডন। জার্মানদের প্রাণকেন্দ্র কিন্তু ভিয়েনা নয়, বার্লিন নয়; জার্মানির প্রাণ বহুকেন্দ্রিক। ফ্রাঙ্কফোর্ট, লাইপজিগ, মিউনিখ প্রভৃতি ভিয়েনা-বার্লিনের মতো প্রাণবন্ত। জার্মানির মতো দেশকে ইংল্যাণ্ডের মতো নেশন করতে গেলে তার সভ্যতার মূলসূত্রটি হারিয়ে যাবে। প্রাণধারার ঐক্যই আসল ঐক্য, রাজনৈতিক ঐক্য তা নয়। গ্যেটের কথা যদি তাঁর দেশ মনে রাখত তাহলে তার আজ এ দশা হত না। কিন্তু তখনকার দিনের জার্মানরা তাঁর কথা শুনে তাঁকে গালমন্দ দিয়েছিল, তারপরেও তাঁকে ঠিক বোঝেনি, এখনও ভুল বোঝে। তিনি তাঁর দেশকে, তাঁর জাতিকে কারও চেয়ে কম ভালোবাসতেন না। কিন্তু তাঁর নেশনবিরোধিতার কদর্থ করা হল এই বলে যে, তিনি বিশ্বপ্রেমিক তাই আর-সকলের মঙ্গল চান, স্বদেশের চান না। তিনি নেপোলিয়নের ভক্ত, তাই স্বদেশের বিপদে সাড়া দেন না, ছেলেকে যুদ্ধে পাঠান না। তিনি ফরাসি জাতির গুণমুগ্ধ, জার্মান জাতির নিন্দা ছাড়া প্রশংসা করেন না। অর্থাৎ তিনি পোয়েট, কিন্তু পেট্রিয়ট নন।

গ্যেটের শেষজীবন তাই অবিমিশ্র শান্তিময় ছিল না। শিলারকে তাঁর দেশবাসী মাথায় তুলে নিয়েছিল। শিলারের জনপ্রিয়তার একাংশও গ্যেটের ভাগ্যে জোটেনি। তিনি জানতেন যে, তাঁর লেখা সকলের জন্যে নয়। সকলে যেদিন বুঝবে সেদিন অবশ্য সকলের হবে, তার দেরি আছে। সেইজন্যে জনপ্রিয়তার প্রত্যাশা রাখেননি। কিন্তু যশ তিনি আজীবন পেয়েছিলেন। স্বদেশে বিদেশে—সব দেশে। নেপোলিয়ন তাঁকে দেখে বলেছিলেন, একটা মানুষ বটে। দিগবিজয়ী তাঁর 'ভের্টর' পড়েছিলেন সাত বার। যুদ্ধযাত্রার সময় যেসব বই নেপোলিয়নের সঙ্গে যেত 'ভের্টর' তার একটি।

গ্যেটের মৃত্যুর পর এক শতাব্দীর ওপর কেটে গেছে। এখনও তিনি জনপ্রিয় হতে পারলেন না। কিন্তু তাঁর যশ তাঁকে অলিম্পাস পর্বতের গ্রিক দেবতাদের সঙ্গে আসন দিয়েছে। আর কোনো জার্মান সাহিত্যিক এ সম্মান লাভ করেননি। দান্তে ও শেক্সপিয়রের পরবর্তী ও টলস্টয়ের পূর্ববর্তী আর কোনো ইউরোপীয় সাহিত্যিক তাঁর সঙ্গে এক সারিতে বসার যোগ্য নন। ইউরোপের বাইরে একালে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ তাঁর তুল্য। হাজার বছরে সারা পৃথিবীতে যে পাঁচ জন অমর সাহিত্যিক অবতীর্ণ হয়েছেন গ্যেটে তাঁদের মধ্যমণি। মধ্যম পান্ডবের মতো তিনি সব্যসাচী ছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক 'ফাউস্ট', শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'ভিলহেলম মাইস্টার' ও অজস্র প্রেমের কবিতা বিশ্বসাহিত্যে চিরস্মরণীয়।

কিন্তু তাঁকে যে অলিম্পিয়ান বলা হয় এ শুধু তাঁর সাহিত্যসাধনার জন্যে নয়। এ তাঁর জীবনদর্শনের জন্যেও। জীবনকে তিনি দেখেছিলেন বাহির থেকে, ভিতর থেকে, উপর থেকে, তলা থেকে। দেখেছিলেন মানুষের চোখে, প্রকৃতির চোখে, দেবতাদের চোখে। তন্নতন্ন করে দেখেছিলেন, নেতি নেতি করে দেখেছিলেন। যেটি যেখানকার সেটিকে সেখানে রেখে দেখেছিলেন, তার আশেপাশের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছিলেন, সমগ্রের মধ্যে স্থাপন করে দেখেছিলেন। দৃষ্টির তপস্যা তাঁর মতো আর কেউ করেননি সর্বতোভাবে। গাছ-পাতা-ফুল-প্রজাপতি-হাড়-দাঁত-কঙ্কাল-করোটি-গ্রহ-তারা-মেঘ-বাষ্প-রং-রেখা-রূপ-স্পর্শ কিছুই তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার বাইরে ছিল না। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক, নারীর সঙ্গে নরের সম্পর্ক, রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রজার সম্পর্ক, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, এমনি করে কতরকম সম্পর্ক তাঁর দৃষ্টির বিষয় ছিল। তাঁর ধ্যানের বিষয় অন্তহীন প্রগতি, যার মূলে অবিরাম পরিশ্রম, পরীক্ষা ও

পরিত্যাগ। কোনো কিছুতে আসক্ত হয়ে থাকলে প্রগতির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। তা সে যতই পুরাতন, যতই পরিচিত, যতই প্রিয় হোক। মনে হবে হৃদয়হীনতা, আসলে বেদনার পর বেদনার অভিজ্ঞতা।

আজ কি তাঁকে আমাদের দরকার আছে এই উন্মত্ত পৃথিবীতে? প্রগতির পথ ধরে ধ্বংসের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি আমরা সভ্যমানব। বিজ্ঞান আমাদের বন্ধু নয়, যেমন ফাউস্টের বন্ধু নয় মেফিস্টোফেলিস। গ্যেটে পাঠ করে কী আমাদের সান্ত্বনা?

এর উত্তর নানা পাঠক নানাভাবে দেবেন। একজন পাঠক হিসেবে আমার উত্তর দিই। ফরাসি বিপ্লবের পরবর্তী অধ্যায়ের মতো রুশ বিপ্লবের পরবর্তী অধ্যায় এখন চলছে। এ অধ্যায় কবে শেষ হবে, কে হারবে, কে জিতবে, গ্যেটের মতো আমাদেরও অজানা। তাঁর দৃষ্টান্ত যদি অনুসরণ করি তাহলে বাইরের শত অশান্তি সত্ত্বেও আমরা প্রকৃতিস্থ থাকব, আত্মস্থ থাকব, ধ্যানস্থ থাকব। এ অধ্যায় একদিন শেষ হবেই। ততদিন যদি বেঁচে থাকি তাহলে বাইরেও শান্তি আসবে। যতদিন বেঁচে আছি ততদিন সাধ্যমতো বাইরের শান্তির জন্যেও চেষ্টা করব। গ্যেটের হৃদয়ে জাতিপ্রেম ছিল। কিন্তু জাতিভেদ তিনি মানতেন না। তাঁর জন্ম উচ্চ শ্রেণিতে, কিন্তু বিবাহ নিম্ন শ্রেণিতে। স্বয়ং অভিজাত হয়েও জনগণের সঙ্গে তাঁর সাযুজ্য। মানুষে মানুষে হিংসা-দ্বেষ এক দিনের জন্যেও তাঁর মনে ঠাঁই পায়নি। তাঁর কোনো শত্রু ছিল না; না ব্যক্তিগত জীবনে, না সমষ্টিগত জীবনে। বহু অত্যাচার তাঁর জীবদ্দশায় ঘটেছে, তার দরুন তিনি বেদনাবোধ করেছেন কিন্তু মানুষকে তারজন্যে ঘৃণা করেননি। হিংসার বদলে হিংসার কথা ভাবেননি। তাঁর মতো আমাদের অন্তঃকরণ নির্মল হোক, নির্বিষ হোক। তাঁর স্বাস্থ্য যেন আমরাও পাই। মত্ততার যুগে তিনি ছিলেন অপ্রমত্ত। আমরাও যেন তাই থাকি।

অপ্রমাদের জন্যে তাঁকে করতে হয়েছিল একহাতে বিজ্ঞানচর্চা, আর একহাতে ক্লাসিকচর্চা। একসঙ্গে প্রকৃতির আরাধনা তথা শাশ্বত সৌন্দর্যের উপাসনা। এই দুই ডিসিপ্লিন এখনও আমাদের পরম প্রশান্তি প্রদান করতে পারে। তাহলেও আধুনিক সাহিত্যিকের চিত্ত সান্ত্বনা মানে না। দিনের পর দিন যে প্রশ্ন তাঁকে অস্থির করে তুলেছে সে-প্রশ্ন কি গ্যেটের মতো অলিম্পিয়ানকে আকুল করেনি? আমরা কি কেবল নীরব সাক্ষীর মতো দেখে যাব, পরে সাক্ষ্য দেব? আমরা কি কোনো অবস্থায় হস্তক্ষেপ করব না, কণ্ঠক্ষেপ করব না? এই নিষ্ক্রিয় স্তব্ধতা কি পুরুষোচিত? এ কি অমানুষিক নয়?

গ্যেটের কাছে এর উত্তর আশা করা বৃথা। তারজন্যে যেতে হবে টলস্টয়ের কাছে, রবীন্দ্রনাথের কাছে।

সেকুলার স্টেট

সেকুলার স্টেট-এর বাংলা কী?

যে দু-একজন মন্ত্রী সরকারি নথিপত্রে বাংলা ভাষা ব্যবহার করে থাকেন তাঁদের একজনকে লিখতে দেখা গেল—ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। মুগ্ধ হলুম তাঁর ভাষাপ্রেম লক্ষ করে। নিজে কিন্তু ইংরেজিতে লিখলুম সেকুলার স্টেট।

কেন? ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র কী দোষ করল? অন্তত লৌকিক রাষ্ট্র তো খবরের কাগজের দৌলতে বাজার-চলতি হয়ে গেছে। এর কোনোটা পছন্দ না হলে হাতের কাছে টেলিফোন তো ছিল, রাজশেখর বসু মহাশয়কে টেলিফোনে স্মরণ করলে খাপসই একটা পারিভাষিক শব্দ পেতে কতক্ষণ লাগত? সংস্কৃত ভাষার অন্তহীন ধ্বনিভান্ডারে শব্দের অভাব কবে ঘটল?

চেষ্টা করলে যেকোনো বিদেশি শব্দকে স্বদেশি ভাষায় অন্তরিত করা যায়। কিন্তু শব্দ যেখানে আসল নয়, অর্থ যেখানে আসল, আইডিয়া যেখানে আসল, সেসব জায়গায় বিদেশির বদলে স্বদেশি ব্যবহার করলে ভাষান্তরের সঙ্গে সঙ্গে ভাবান্তর ঘটা বিচিত্র নয়। বিশেষত শব্দের পিছনে যদি বহু শতকের সংগ্রামের বা সংঘাতের ইতিহাস থাকে তবে তো প্রতিশব্দের মধ্যে সেই ঘাত-প্রতিঘাতের আভাসটুকুও মেলে না।

সেইজন্যে আমি সেকুলারের বাংলা ধর্মনিরপেক্ষ বা লৌকিক লিখতে রাজি নই। তা ছাড়া আরও কারণ আছে। খোদ সেকুলার কথাটি আমাদের কাছে নতুন। পাঁচ বছর আগে জওহরলাল একদিন সেটি ব্যবহার করলেন, দেশবিভাগের পূর্বাহ্নে। দেশবিভাগের পরে গান্ধীজিকে সেটি ব্যবহার করতে দেখা গেল। এতদিন আমরা শুনে আসছিলুম যে স্বরাজ বলতে বোঝাবে রামরাজ্য। শুনলুম রামরাজ্য নয়, সেকুলার ডেমোক্রেসি বা সেকুলার স্টেট। রামরাজ্যের পালটা রহিমরাজ্যের চেহারা দেখে আমাদের নেতাদের তাক লেগে যায়। কে জানে রামরাজ্য হয়তো দু-দিন পরে হনুমদ রাজ্যে পরিণত হত। তাই রাতারাতি সেকুলার বিশেষণটি উড়ে এসে জুড়ে বসল। অভিধানে এর সঙ্গে আমাদের মুখ চেনা ছিল। কিন্তু জীবনে পরিচয় ছিল না। এই নবাগতের সঙ্গে আমাদের কীসের প্রয়োজন তাও আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়নি। এর তাৎপর্য নিয়ে যখন তর্ক উঠল তখন এক একজন এক একরকম ব্যাখ্যা দিলেন। গান্ধীজি তখন নেই। তাঁর এক বিশিষ্ট অনুচর নিজস্ব অভিমত জানিয়ে বললেন, ইংরেজিতে সেকুলার শব্দের অর্থ যা-ই হোক-না কেন আমরা তো ও-শব্দ অন্য অর্থে ব্যবহার করতে পারি।

এইখানেই বিপদ। ইংরেজিতে ডেমোক্রেসি শব্দের অর্থ যা-ই হোক-না কেন স্তালিন তা অন্য অর্থে ব্যবহার করছেন। মাও সে তুং করছেন অন্য অর্থে। তেমনি আমাদের সম্পাদক ও রাজনীতিকরা যদি সেকুলার শব্দের অন্য অর্থ করেন তাহলে আশ্চর্য হব না। কিন্তু শঙ্কিত হব। কারণ সেকুলার শব্দটি খামোকা আসেনি। ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে এর প্রবেশ যদিও অকস্মাৎ তবু আকস্মিক নয়। হিন্দু-মুসলমানের মাথাকাটাকাটি কি কেবল দেশবিভাগের দ্বারা এড়াতে পারা যায়? এর স্থায়ী সমাধান হচ্ছে সেকুলার মনোভাব। যে মনোভাব ইউরোপে এসেছে বহু শতকের রক্তাক্ত সংঘর্ষের ফলে। যার অন্য অর্থ নেই।

কিন্তু কী এর প্রকৃত অর্থ?

এর উত্তর দিতে হলে দু-তিন হাজার বছরের ইতিহাস বিশ্লেষণ করতে হয়। প্রথমত, পশ্চিম ইউরোপের ইতিহাস মায় আমেরিকার ইতিহাস। দ্বিতীয়ত, ভারতবর্ষের ইতিহাস।

পশ্চিম ইউরোপের লোক যখন খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করে তখন ধর্মগুরু ও ধর্মসংঘের প্রতি তাদের সকলের আনুগত্য দেখে খ্রিস্টেনডম বা খ্রিস্টরাজ্য নামক ধারণাটি মানুষের মনে বসে যায়। রাজা একাধিক, কিন্তু পোপ

এক। রাষ্ট্র একাধিক, কিন্তু চার্চ এক। প্রত্যেক দেশেই পোপের অধীনস্থ ধর্মযাজকের দল একজোট হয়ে কাজ করে যায়, এক দেশ থেকে আরেক দেশে বদলি হয়, ল্যাটিন ভাষায় উপাসনা করে, ল্যাটিন ভাষায় নাম রাখে। চার্চের তুলনায় রাষ্ট্র অনেকটা ক্ষীণবল, রাজা অনেকসময় চার্চের হাতের পুতুল। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে চার্চ তার নিজের আদালত বসায়, বিচার করে, দন্ড দেয়, আগুনে পোড়ায়, খাজনা আদায় করে। এমন এক সময় আসে যখন দেখা যায় পোপের হাতে কেবল নৈতিক বা সামাজিক ক্ষমতা নয়, রাজনৈতিক বা সামরিক ক্ষমতাও এসে পড়েছে। কেউ যদি বিধর্মী হয় তাকে তিনি কেবল সমাজচ্যুত করে ক্ষান্ত হবেন না, ধনে-প্রাণে ধ্বংস করবেন। পৃথিবীর চারদিকে সূর্য ঘুরছে কেউ যদি এই তত্ত্ব অস্বীকার করে বলে সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘুরছে তাহলে আর রক্ষা নেই। অমনি বিধর্মী হয়ে গেল। চিন্তার স্বাধীনতা, বাক্যের স্বাধীনতা, কর্মের স্বাধীনতা, সব কিছু ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এবং ধর্ম বলতে বোঝায় ধর্মগুরু ও ধর্মসংঘ। এবং তাঁদের হাতে ইহলোকের পরলোকের সবরকম যন্ত্রণার যন্ত্র।

হাজার বছর ধরে এই অদ্ভুত এক্সপেরিমেন্ট চলল। এর ভালো দিক যে ছিল না তা নয়। মধ্যযুগের অসভ্যতার অন্ধকারে সভ্যতার দীপ জ্বালিয়ে রেখেছিল চার্চ, যদিও তাতে অন্ধকার যায়নি। বহুচারী ক্ষত্রিয়দের এক বিবাহে বাধ্য করাও সামান্য কীর্তি নয়। প্রায় দু-হাজার বছর আগে রোমান চার্চ যা পেরেছে প্রায় দু-হাজার বছর পরেও দিল্লির কংগ্রেস সরকার তা পারছেন না। হিন্দুরাজ, মোগলরাজ, ব্রিটিশরাজও পারেননি। করাচির নয়া মুসলিমরাজ তো তার কাছ দিয়েও যাচ্ছেন না। কাজেই রোমান চার্চের কৃতিত্বের প্রশংসা করতেই হয়। তা সত্ত্বেও পশ্চিম ইউরোপের অর্ধেক দেশ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে সামাজিক মানসিক বাচনিক স্বাধীনতার অভাবে। রেনেসাঁস তাদের চোখ ফুটিয়ে দেয়। রেনেসাঁসের ন্যায়সঙ্গত পরিণতি রিফর্মেশন। পোপের বিরুদ্ধে, রোমান চার্চের বিরুদ্ধে, ল্যাটিনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। পোপের রাজকীয় ক্ষমতাই তাঁর কাল হল। গুরুমহারাজ যদি সত্যিকারের মহারাজ হয়ে ওঠেন তাহলে সত্যিকারের মহারাজের দল কি তা সহ্য করতে পারেন? ইংল্যাণ্ডের অষ্টম হেনরি যে প্রজাবন্ধু ছিলেন তা নয়। ব্যক্তিগত স্বার্থেই তিনি পোপের শত্রু হন। তাঁর প্রজারা তবু তাঁকে সমর্থন করে। ইংল্যাণ্ডের খ্রিস্টানরা দেখতে দেখতে প্রোটেস্টান্ট হয়ে যায়। ক্যাথলিকরা হয়ে দাঁড়ায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। অবাক কান্ড! কেবল ইংল্যাণ্ড নয়, জার্মানি, হল্যাণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন ইত্যাদি বহু দেশ পোপের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। নিজেদের এক-একটা চার্চ খাড়া করে। সেখানেও শেষ নয়। সরকারি চার্চ প্রায় রোমান চার্চের মতো হস্তক্ষেপকারী বলে সরকারি চার্চ থেকেও বহু লোক নাম কাটিয়ে নেয়। তাদের ছোটো ছোটো সম্প্রদায় না মানে গুরুমহারাজকে না মানে রাজা মহারাজকে; অবশ্য ধর্মের ক্ষেত্রে।

এসব একদিনে হয়নি, বিনা দ্বন্দ্বেও হয়নি। ঘোরতর মারামারি কাটাকাটি ত্রিশ-চল্লিশ বছর ধরে চলে। আমরা আর কতটুকু রক্তারক্তি করেছি। মানুষের মাংস তো আর খাইনি। জার্মানরা না-কি তাও করে দেখেছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত এই স্থির হল যে ইংল্যাণ্ডের মতো দেশে পোপের চেয়ে রাজা বড়ো, রাজার চেয়ে প্রজা বড়ো। প্রথম চার্লসের মাথা কেটে ও দ্বিতীয় জেমসকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে ইংল্যাণ্ডের লোক কেবল পোপকে নয়, রাজাকেও সমঝিয়ে দেয় যে সবার ওপর মানুষ সত্য তাহার ওপর নাই। প্রজাপ্রভাবিত রাষ্ট্রই হল চার্চের চেয়ে বড়ো। প্রজাদের রাষ্ট্র ধীরে ধীরে অলক্ষিতে সেকুলার স্টেট হয়ে ওঠে। এক শতক পরে যখন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তার মূলনীতি হয় সেকুলারিজম। তার কিছুদিন পরে যখন ফরাসি বিপ্লব ঘটে তখন সেকুলারিজমের জয়জয়কার। ইংল্যাণ্ডে যা প্রচ্ছন্ন ছিল ফ্রান্সে তা প্রকট হল। প্রজারা যদি নাস্তিক হয়, ধর্ম বলে কিছু না মানে, তাহলেও তারা রাজ্যের অধিকারী। রাষ্ট্র তাদের চিন্তায়, বাক্যে ও আইনসঙ্গত কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করবে না। চার্চ থাকতে পারে, কিন্তু কোনোরকম পৃষ্ঠপোষকতা দাবি করবে না, বিশেষ অধিকার প্রত্যাশা করবে না। প্রজাদের কার কী ধর্ম, আদৌ কোনো ধর্ম আছে কি না, এ প্রশ্ন উঠবে না। ধরে নিতে হবে যে, ধর্ম তাদের ঘরোয়া ব্যাপার। পাবলিক নয়, প্রাইভেট ব্যাপার। যার

কোনো ধর্ম নেই সেও সরকারি চাকরি করতে পারে, সেনাপতি হতে পারে, সেও নির্বাচনে দাঁড়াতে পারে, প্রেসিডেন্ট হতে পারে, সেও দেশশাসন করতে পারে, প্রধানমন্ত্রী হতে পারে।

ফরাসি বিপ্লবের পর আরও এক শতক লাগল এ নীতি বলবৎ করতে। ফরাসিদের দেশে দ্রেফু নামে এক ইহুদি মিলিটারি অফিসার ছিলেন, তাঁর একমাত্র অপরাধ তিনি ইহুদি। ওই অপরাধে তাঁকে সৈন্যবিভাগ থেকে বিদায় করা যায় না। মিথ্যা মামলা সাজানো হল, তাও প্রকাশ্য আদালতে দায়ের করার মতো সৎসাহস ছিল না, সামরিক আদালতের বিচারে বা অবিচারে দ্রেফুর হয়ে গেল দ্বীপান্তর। দুনিয়ার লোক জানল বিশ্বাসঘাতকের উপযুক্ত দন্ড হয়েছে। কিন্তু ফ্রান্সের যাঁরা বিবেকী ব্যক্তি তাঁরা ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারলেন নিরপরাধের সাজা হলে কেউ নিরাপদ নয়, নিরপরাধ এক্ষেত্রে ধর্মভেদের জন্যে দন্ডিত, সুতরাং সেকুলার স্টেট বিপন্ন। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক এমিল জোলা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে অপরিচিত এক ইহুদি অফিসারের পক্ষ নিয়ে বিশ্বের জনমতের সামনে নিজের দেশের রাষ্ট্রনায়কদেরই অভিযুক্ত করলেন, তখন রাগের চোট পড়ল জোলার ওপরে। জোলার আত্মত্যাগ ব্যর্থ গেল না। শিক্ষিত ফরাসি মাত্রেই চঞ্চল হয়ে উঠলেন। যেন একটি মানুষের প্রতি সুবিচার-অবিচারের ওপর একটি জাতির সুনাম-দুর্নাম নির্ভর করছে। বারো বছর ধরে অবিরাম আন্দোলন চলে। দ্রেফুকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করা হয়।

দ্রেফু যদি ইহুদি না হয়ে ক্যাথলিক হয়ে থাকতেন তাহলে ব্যাপার এতদূর গড়াত না। বিপ্লবের দেশ ফ্রান্স, সেখানেও মানুষের ধর্ম সম্প্রদায় বিচার করে মামলার বিচার হয়। এই বারো বছরে ফ্রান্স তার আত্মাকে আবিষ্কার করল। ফ্রান্সের দৃষ্টান্ত অন্যান্য দেশের ওপর প্রভাব বিস্তার করল। সেকুলার স্টেট এই অগ্নিপরীক্ষায় সীতার মতো উত্তীর্ণ হল। পশ্চিম ইউরোপে ফরাসি বিপ্লবের আদর্শ এদিক দিয়ে জয়ী হয়েছে। রুশ বিপ্লবের পর রুশ পরিচালিত সোভিয়েত ইউনিয়নেও। আমেরিকার তো কথাই নেই। ফরাসি বিপ্লবের আগে আমেরিকার স্বাধীনতা, গোড়া থেকেই সেখানে সেকুলার স্টেট। নিছক ধর্মবিশ্বাসের দরুন সেখানকার কোনো প্রজা রাষ্ট্রের দরবারে ছোটো বা বড়ো নয়, ধর্মাধিকরণে তো নয়ই। কে ক্যাথলিক, কে প্রোটেস্টান্ট, কে ইহুদি এসব বাছবিচার ঘরে চলতে পারে, বাইরে চলে না। বর্ণবিদ্বেষ অবশ্য আছে, কিন্তু সেটা অপ্রাসঙ্গিক।

২

এবার ভারতবর্ষের ইতিহাস। পশ্চিম ইউরোপে যেমন এককালে একটি মাত্র ধর্ম ছিল, একজন মাত্র ধর্মগুরু ছিলেন, একটি মাত্র ধর্মসংঘ ছিল, এদেশে তেমন নয়। কোনোকালেই নয়। সাধারণত যাকে হিন্দু ধর্ম বলা হয়ে থাকে তা একাধিক ধর্মের সমবায় বা সমন্বয় সেই আদি যুগ থেকে। হিন্দু পোপ বা হিন্দু চার্চ কোনোদিন কেউ কল্পনাও করেনি, তবে হিণ্ডুডম বলে একটা ধার-করা বুলি কিছুদিন আগে শোনা যাচ্ছিল বটে।

ইসলামেও পোপের অনুরূপ বা চার্চের অনুরূপ নেই, তবে খলিফা বলে একজন ছিলেন, কিন্তু ভারতের সুলতান ও বাদশাহদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এত কম ছিল যে সংঘর্ষের উপলক্ষ্য কোনোদিন ঘটেনি।

পোপ বা চার্চ না থাকলেও আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, উলেমা ছিলেন। এঁদের প্রভাব কেবল আধ্যাত্মিক বা পারলৌকিক ব্যাপারে নিবদ্ধ ছিল না, জীবনের প্রত্যেকটি ব্যাপারে প্রসারিত ছিল। এমন কোনো হিন্দু রাজার নাম জানিনে যিনি ব্রাহ্মণপ্রাধান্য অস্বীকার করেছিলেন, এমন কোনো বৌদ্ধ নরপতির নাম জানা নেই যিনি শ্রমণপ্রাধান্য উপেক্ষা করতে পেরেছিলেন। আকবরই বোধ হয় একমাত্র মুসলমান সম্রাট যিনি উলেমাপ্রাধান্য কাটিয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজেই একটা নতুন ধর্ম প্রবর্তন করে পোপ হয়ে উঠতে যাচ্ছিলেন। এর নাম সেকুলার স্টেট নয়।

অপরপক্ষে আমাদের রাজারাজড়াদের সংযত করাও আমাদের ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, উলেমাদের সাধ্যের অতীত ছিল। তাঁরা যা-খুশি করতে পারতেন, যাকে খুশি হত্যা করতে পারতেন, যটা খুশি বিয়ে করতে পারতেন। তাঁদের স্বেচ্ছাচারিতা ছিল অবাধ অপ্রতিহত। পোপ বা চার্চ থাকতে পশ্চিম ইউরোপে এই পরিমাণ

স্বেচ্ছাচারিতা সহজ ছিল না। এদেশের প্রজাশক্তিও রাজশক্তিকে নিয়মন করতে জানত না। ভারতের প্রজাশক্তি সম্প্রতি এই রাজশক্তির সঙ্গে লড়াই করে জিতেছে।

বস্তুত সেকুলার স্টেট-এর আদর্শ রাজতন্ত্রী আদর্শ নয়, ধর্মতন্ত্রী আদর্শ তো নয়ই। এটা ধর্মতন্ত্র ও রাজতন্ত্র উভয়ের পতনের ওপর বা নিয়মনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিলে তবেই সেকুলার স্টেট-এর প্রশ্ন উঠে। তর্কের খাতিরে উলেমাদের ব্রাহ্মণ ও সুলতানদের ক্ষত্রিয় বলে ধরে নিচ্ছি। ব্রিটিশ আমলের আগে আমাদের দেশে সেকুলার স্টেট-এর নামগন্ধ ছিল না। ইংরেজের নিজের দেশে প্রজাশক্তির অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে একপ্রকার সেকুলার মনোভাব আসে, ইংরেজ এদেশে তার পত্তন করে। লাটসাহেবদের সঙ্গে একদল যাজক এসেছিলেন বটে, কিন্তু শাসনের ব্যাপারে তাঁদের সংস্রব ছিল না। তাঁদের ইচ্ছা অনুসারে আইন তৈরি বা আইন রদবদল হত না। তাঁদের মুখ চেয়ে আদালতের বিচারকার্য হত না। তাঁদের কথায় কেউ ফাঁসি যায়ও নি, কারও ফাঁসি বন্ধও হয়নি। তাঁদের ধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বা একমাত্র ধর্ম এমন কোনো নীতি তাঁরা ব্রিটিশ শাসকদের দিয়ে চালু করাতে পারেননি। সব ধর্মের সমান অধিকার এটা ব্রিটিশ শাসনেরই বিশেষত্ব। তার আগে দু-একজন হিন্দু রাজা বা মুসলমান সুলতান ব্যক্তিগতভাবে এ নীতি অনুসরণ করলেও রাষ্ট্রের দ্বারা এ নীতি ব্যাপকভাবে অনুসৃত হবার সংবাদ আমি রাখিনে। একই অপরাধের জন্যে শূদ্র ফাঁসি যাচ্ছে বামুন ছাড়া পাচ্ছে বা অল্প সাজা পাচ্ছে এইটেই ছিল নিয়ম। উলেমা বা ফকির হলে তার সাতখুন মাফ। হ্যাঁ, ইংরেজই সর্বপ্রথম এ নিয়ম উলটে দেয়।

সেকুলার স্টেট-এর বুনিয়াদ তাহলে দুটি। এক, প্রজাশক্তির অভ্যুদয়। দুই, সব প্রজার সমান অধিকার। প্রজাদের মধ্যে ভেদবুদ্ধি এনে তাদের দুর্বল করা চলবে না। দুঃখের বিষয় ব্রিটিশ আমলের শেষের দিকে সাম্রাজ্য বাঁচানোর জন্যে ইংরেজ এই ভেদনীতির আশ্রয় নিয়েছিল, কিন্তু আইনে আদালতে নয়। সেদিক থেকে ব্রিটিশ শাসন বরাবর সেক্যুলার ছিল।

ব্রিটিশ শাসন যখন শেষ হবার মুখে তখন একদল লোক হাঁক ছেড়ে বলল, আমরা চাই পাকিস্তান, তার মানে ইসলামি রাষ্ট্র। তা শুনে আরেক দল লোক তাল ঠুকে বলল, আমরা চাই হিন্দুস্থান, তার মানে হিন্দু রাষ্ট্র। কোথায় গেল গান্ধীজির রামরাজ্য। রামরাজ্য যে হিন্দু রাষ্ট্র নয়, ইংরেজি 'কিংডম অফ গড'-এর ভাষান্তর, কে একথা বোঝে, কেই-বা বোঝায়! বিদেশি শব্দের স্বদেশি প্রতিশব্দ যে কেমন বিপজ্জনক গান্ধীজির রামরাজ্যই তার সেরা দৃষ্টান্ত। টলস্টয়ের বই থেকে গান্ধীজি ওটি নিয়েছিলেন, তুলসীদাসের পুথি থেকে নয়। কিন্তু যারা টলস্টয় পড়েনি, তুলসীদাস পড়েছে, তারা রামরাজ্য বলতে বুঝবে অযোধ্যার বর্ণাশ্রমী রাজ্য রামচন্দ্রের রাজত্ব। কোথায় কিংডম অফ গড আর কোথায় রামচন্দ্রের রাষ্ট্র!

রামরাজ্যের স্বপ্ন গান্ধীজির মন থেকে মিলিয়ে গেল হিন্দু-মুসলমানের খুনোখুনি দেখে। ভালোই হল। কিংডম অফ গড প্রতিষ্ঠা করার সাধ মানুষের ইতিহাসে এই প্রথম নয়। খ্রিস্টধর্মের আদিপর্বের তাৎপর্য তো কিংডম অফ গড প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। কিংডম অফ গড থেকে একধাপ নেমে খ্রিস্টেনডম, তার থেকে একধাপ নেমে পোপ সাম্রাজ্য ও মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি চিন্তা-বাক্য সব স্বাধীনতার দ্বারে অর্গল। হাজার বছর কেউ টুঁ শব্দটি করেনি, পাছে কিংডম অফ গড প্রজাপতির মতো উড়ে পালিয়ে যায়। তারপরে প্রতিবাদের ভাব জাগে। হঠাৎ একদিনে নয়। ধীরে ধীরে পাঁচশো বছর সময় নিয়ে পাঁচশো বছর ধোঁয়াতে ধোঁয়াতে অবশেষে জ্বলে ওঠে আগুন। এই অকরুণ অভিজ্ঞতার পর পশ্চিম ইউরোপের লোক আর কিংডম অফ গড-এর স্বপ্ন দেখে না। গত কয়েক বছরে হিন্দু-মুসলমানের পিশাচমূর্তি দেখে আমাদেরও সে-স্বপ্ন ভেঙেছে। ভাঙা স্বপ্ন জোড়া লাগে না। তার বদলে পাওয়া গেল সেকুলার স্টেট-এর আদর্শ।

সেকুলার স্টেট-এর সূত্রপাত ব্রিটিশ আমলেই হয়েছিল। তবে আমাদের মনের ওপর নয়। আমরা ওর মর্ম বুঝিনি, ওকে আপন করে নিইনি। এখন ইতিহাস আমাদের দুখানা হাত কেটে নিয়ে আমাদের সমঝিয়ে দিয়েছে সেকুলার স্টেট কেন মূল্যবান। সবাই সমঝেছে তা নয়, তবু যেটুকু অগ্রগতি হয়েছে সেটুকুর জন্যে কৃতজ্ঞ হতে হয়। পাকিস্তানেও এর ঢেউ পৌঁছেছে। পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলনটা পশ্চিম ইউরোপের

ল্যাটিনবিরোধী আন্দোলন ছাড়া আর কী? ওইভাবেই রিফর্মেশন শুরু হয়। শেষ যখন হবে তখন দেখা যাবে ইসলামি রাষ্ট্রের দালান ধসে পড়েছে। ভগ্নস্তূপের নীচে থেকে উঁকি মারছে সেকুলার স্টেট-এর বটবৃক্ষ। তুর্কি যে পথে গেছে পাকিস্তানও যাবে সেই পথে।

তাহলে সেকুলার স্টেট-এর বাংলা কী? বস্তুটা কী আমি যতদূর বুঝি বোঝাতে চেষ্টা করলুম। নামটা কী হবে তা আপনারাই স্থির করুন। নামকরণের ভার আমার ওপর নয়। যাঁদের ওপরে তাঁরা যেন অভিধান মন্থন না করে ইতিহাস তল্লাস করেন।

টলস্টয়, গান্ধী ও আমি

আমার যখন সতেরো কী আঠারো বছর বয়স তখন আমি আবিষ্কার করি যে আমি অন্তর থেকে নৈরাজ্যবাদী। আমার পছন্দ রাষ্ট্রহীন অস্তিত্ব—সৈন্য নেই, পুলিশ নেই, নেই ম্যাজিস্ট্রেট, নেই আদালত। পরিবার, বিবাহ, জাত, শ্রেণি এগুলিতে আমার বিশ্বাস অল্পই। সম্পত্তি, মালিকিস্বত্ব, উত্তরাধিকার, টাকা-খাটানো এগুলোরও কোনো অর্থ হয় না আমার কাছে।

অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে আমিই হয়ে দাঁড়াই রাষ্ট্রযন্ত্রের অঙ্গ। ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে পুলিশ নিয়ে কাজ করি। জজ হয়ে আইন প্রয়োগ করি। আবার ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে ফৌজ নিয়ে কাজ করি, স্বরাজের পরে অর্ধসামরিক ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করি। বেশ বুঝতে পারি যে, আমার জীবিকা নির্ভর করে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাকে কায়েম রাখার ওপর। যে ব্যবস্থা বৈদেশিক শাসনের চেয়েও গভীর, ধনতন্ত্রের চেয়েও বনেদি, ফিউডালিজমের চেয়েও প্রাচীন।

তবে কি আমি আমার নৈরাজ্যবাদ বিসর্জন দিই বা অতিক্রম করি? না। বরঞ্চ উপলব্ধি করি যে নৈরাজ্যবাদের মধ্যে রয়েছে আরও উন্নত, আরও তৃপ্তিকর ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি। যদি নৈরাজ্যবাদের পূর্বে একটি বিশেষণ বসানো হয়। বিশেষণটি 'অহিংস'। একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য যে আগে আসবে অহিংসা, তারপরে আসবে নৈরাজ্যবাদ।

এমনি করে আমি অন্তরের প্রত্যয় থেকে হলুম অহিংস নৈরাজ্যবাদী। এক্ষেত্রে আমার গভীর সাযুজ্য ছিল টলস্টয়ের সঙ্গে, গান্ধীর সঙ্গে। একই বিশ্বাসে বিশ্বাসবান আমরা। সে-বিশ্বাস দাঁড়িয়েছে ঋদ্ধ অভিজ্ঞতার অচলের ওপরে। রণজর্জর জগতে আমরা ধরে আছি সেই নিশ্চিত বিশ্বাসকে যে-বিশ্বাস স্থির থাকবে সব বিপর্যয়ের পরেও, সব ভাঙাচোরার পরেও।

কিন্তু এর মানে কি এই যে আমি টলস্টয়বাদী বা গান্ধীবাদী? না। তার কারণ তাঁদের সঙ্গে দু-তিনটি জায়গায় আমার গুরুতর মতভেদ আছে।

প্রথমত, আমার কাছে আর্ট হচ্ছে নিজেই নিজের লক্ষ্য। মহত্তর লক্ষ্যের উপলক্ষ্য হতে গেলে আর্ট তার আত্মাকে হারায়। অহিংস নৈরাজ্যবাদী হিসেবে আমার আত্মাকে পেতে গিয়ে আর্টিস্ট হিসেবে আমি আমার আত্মাকে হারাতে রাজি নই। নতুন সমাজব্যবস্থায় শিল্পীকে ছেড়ে দিতে হবে তার নিজের মতো করে বাঁচতে, তার নিজের মনের মতো সৌন্দর্যপ্রতিমা গড়তে। তার জীবিকার জন্যে সে এমন লোকের অনুগ্রহনির্ভর হবে না যারা শিল্পকে শিল্প বলে মূল্য দেয় না। এ জায়গায় আমি টলস্টয় ও গান্ধীর মতো আপোশহীন, কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে।

দ্বিতীয়ত, প্রেম বলতে আমিও মানবপ্রেম বুঝি, যেমন বুঝতেন টলস্টয় ও গান্ধী। কিন্তু আমি প্রেম বলতে আরও বুঝি পুরুষের প্রতি নারীর ও নারীর প্রতি পুরুষের প্রেম। টলস্টয়ের সারাজীবন গেল এর সঙ্গে যুঝতে। গান্ধীও বৃথা চেষ্টা করলেন সন্তোষজনক সমাধানে পৌঁছোতে। টলস্টয়ের অপূর্ব জ্ঞান সত্ত্বেও, গান্ধীর নিখুঁত শিভ্যালরি সত্ত্বেও নারীকে তাঁরা কেউ চিনতেই পারলেন না। অচেতনভাবে নারীকে তাঁরা দেন অধীনতার ভূমিকা, যেমন দিয়ে এসেছেন ধার্মিক পুরুষেরা এতকাল মাতৃত্বের নামে। গৌরবে দিশাহারা হয়ে। আসলে কিন্তু নারীকে তাঁরা নরকের মতো ডরাতেন। তাঁদের সহজাত সংস্কার তাঁদের বলত, নারী ও পাপ একে অপরের সঙ্গে যুক্ত। আমি এ মনোবৃত্তি সম্পূর্ণ অস্বীকার করি। নতুন সমাজব্যবস্থায় মানবপ্রেম ও নরনারীর প্রেম সমান গুরুত্ব পাবে।

তৃতীয়ত, টলস্টয় বা গান্ধী কেউ বিশ্বাস করতেন না আধুনিক সভ্যতায়। আমি বিশ্বাস করি। এই সভ্যতার কতকগুলি মূল্য যে মন্দ তা আমিও মানি। কিন্তু কতকগুলি মূল্য আছে যা ভালো, যা উৎকৃষ্টতর, যা অনন্য। এই মার্গই বিবর্তনের মার্গ। এই মার্গে চলতে চলতে আমরা মন্দকে অতিক্রম করতে পারি। যন্ত্রপরায়ণ, নাগরিক, প্রকৃতির সঙ্গে যুধ্যমান, দুর্বলের যম, নির্মমভাবে হিংস্র এই সভ্যতা নিজের হাতেই মরবে, যদি-না এর অন্তরের পরিবর্তন হয়। তা বলে এর কীর্তিগুলো কেবলমাত্র আধিভৌতিক নয়, আধ্যাত্মিকও বটে। এ সভ্যতা আমাদের বহু পরিমাণে দিয়েছে অভাব থেকে, উৎপীড়ন থেকে, অতীত উপাসনা থেকে, পারলৌকিকতা থেকে, সামাজিক অবিচার থেকে মুক্তি; বহু পরিমাণে সাম্য, বহু পরিমাণে জ্ঞান। বহির্বিশ্বের জ্ঞান তো বটেই, অন্তর্জগতের জ্ঞানও। সত্যই যে ভগবান, এটি আধুনিক সভ্যতারই দান। এমনকী অহিংসার নতুন ব্যাখ্যাও আধুনিক সভ্যতার কল্যাণে। টলস্টয় ও গান্ধী উভয়েই আধুনিক সভ্যতার সন্তান। আমিও। কিন্তু সজ্ঞানে।

চেতাবনি

কিছুদিন থেকে লক্ষ করছি রাষ্ট্রের ভার যাঁদের উপর বর্তেছে তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত ধর্মানুষ্ঠানকে রাষ্ট্রের ব্যাপার করে তুলতে ব্যস্ত। গাছ লাগানো হবে, তার একটা গালভরা সংস্কৃত নামকরণ হল বনমহোৎসব। গাছ থেকে বন হতে বিশ বছর দেরি, অথচ মহোৎসবটি এখন থেকে সেরে রাখতে হবে। যেমন পরীক্ষা পাশ করার আগেই সিদ্ধিমহোৎসব। তারজন্যে পুরোহিত ডাকো, মাটিতে বসো, মন্ত্র পড়ো, দক্ষিণা দাও, প্রণাম করো। কুম্ভমেলা হচ্ছে, পুণ্য অর্জন করতে হবে; তার জন্যে পান্ডা পাকড়াও, গঙ্গায় ডুব দাও, দক্ষিণা দাও, প্রণাম করো।

এই যদি ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবিশেষের ধর্মবিশ্বাস হয় তাহলে অপরের বলবার কিছু নেই। কিন্তু এখানে দুটি ভুল হচ্ছে। এক, যে টাকাটা খরচ হচ্ছে সেটা আসছে সমষ্টির তহবিল থেকে। সমষ্টির তহবিলে ট্যাক্সো জুগিয়েছে অনেক অজ্ঞেয়বাদী বা নাস্তিক, অনেক জড়বাদী বা নিরাকারবাদী, অনেক পুরোহিতবিরোধী বা ব্রাহ্মণপ্রাধান্যবিরোধী, অনেক সংস্কৃতবিরোধী বা মন্ত্রবিরোধী। এরাও হিন্দু। এ ছাড়া আর যারা ট্যাক্সো জুগিয়েছে তাদের অনেকে আদিবাসী, অনেকে খ্রিস্টান, পারসি বা মুসলমান, অনেকে বৌদ্ধ বা জৈন। এদের সংখ্যা কম বলে যে মূল্য কম তা নয়। যুদ্ধবিগ্রহের দিন যখন জয়-পরাজয় সমান অনিশ্চিত তখন দু-চার হাজার লোক এদিক থেকে ওদিকে গেলেই পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। সেইজন্যে একটি লোককেও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে নেই। তাদের রক্ত-জল-করা কড়ি তোমার হাতে পড়েছে বলে তুমি তোমার দেবতাকে বা তোমার পুরোহিতকে বা তোমার সম্প্রদায়কে উৎসর্গ করবে এ কখনো ন্যায়নীতি হতে পারে না। এখানে ভোটের জোর খাটে না।

দুই, রাষ্ট্রের কর্তা যাঁরা হবেন তাঁরা এক হিসেবে প্রতীক স্বরূপ। রাষ্ট্রীয় পতাকার মতোই তাঁদের প্রতীক সত্তা। তাঁদের মাথা যদি মাটিতে গড়ায় বা পায়ে ঠেকানো হয় তাহলে দেশসুদ্ধু মানুষের মাথা হেঁট হয়—ভারতের পতাকা মাটিতে গড়ালে বা পায়ে ঠেকালে যেমন হয়। কর্তারা যখন গঙ্গাস্নানে যান তখন তাঁদের সঙ্গে বহু লোকলশকর যায়। এঁরা রাষ্ট্রের কর্মচারী। বলতে গেলে রাষ্ট্রই তাঁদের সঙ্গে গঙ্গাযাত্রা করে। আমাদের এটা নবীন রাষ্ট্র। এখনও এর গঙ্গাযাত্রার বয়স হয়নি। একে অকালে গঙ্গাযাত্রায় পাঠালে এর ভবিষ্যৎ আর কদ্দিন! এটা তো আমাদের সেক্যুলার স্টেটের মূলনীতির সঙ্গে মেলে না। হিন্দু রাষ্ট্রের মূলনীতির সঙ্গে মিলতে পারে, কিন্তু ভারত তো হিন্দু রাষ্ট্র নয়। গোপনে গোপনে তা-ই যদি হয়ে থাকে তাহলে সংবিধান সংশোধন করা হোক। এখানে বলে রাখতে চাই যে, হিন্দু রাষ্ট্র কস্মিনকালে প্রজাতন্ত্রী ছিল না। যখন প্রজাতন্ত্রী ছিল তখন সেক্যুলার স্টেটই ছিল, হিন্দু রাষ্ট্র ছিল না। প্রজাতন্ত্র বহু দেশে ও বহু যুগে প্রবর্তিত হয়েছে। কোথাও তা ধর্মের ভেক ধারণ করেনি। যখনই করতে গেছে তখনই মরেছে। তখন আর তা প্রজাতন্ত্র নয়, অভিজাততন্ত্র, তার থেকে আবার রাজতন্ত্র। অর্থাৎ পুনর্মূষিক।

ধর্ম চিরকাল থাকবেই, ধর্ম না হলে মানুষের চলে না। রাষ্ট্র চিরকাল থাকবে, যদি-না মানুষের জীবন বিকেন্দ্রীকৃত হয়। ধর্মের সঙ্গে আমাদের ঝগড়া নেই, আমরা বরং ধর্মের ঝগড়া চুকিয়ে দিতে চাই। সে-অধ্যায় শেষ হলেই আমরা বাঁচি। আমরা বলি, ধর্মও থাকুক, রাষ্ট্রও থাকুক, কিন্তু জোড়া লেগে ধর্মরাষ্ট্র না হোক। বকও ভালো, কচ্ছপও ভালো, কিন্তু সুকুমার রায়ের ছড়ার সেই 'বকচ্ছপ' ভালো নয়। সেক্যুলার স্টেট সকলের কাছে সমান আনুগত্য দাবি করে, তাই সকলের প্রতি তার সমান অপক্ষপাত। হিন্দু রাষ্ট্র সকলের প্রতি সমান অপক্ষপাতী হতে পারে না, কাজেই তার প্রতি সকলের সমান আনুগত্য সম্ভব নয়। আনুগত্যের প্রয়োজনই নির্দেশ করে দিচ্ছে অপক্ষপাতের প্রয়োজন। আমাদের কর্তাদের ব্যবহারে একচুল

পক্ষপাত এসে পড়লেই আমাদের জনসাধারণের আনুগত্যে চিড় ধরবে। তাতে কর্তাদের কী! তাঁরা তো গঙ্গার দিকে পা বাড়িয়েই বসে আছেন। কিন্তু ভুগবে ভবিষ্যৎ বংশ। সেই ভবিষ্যতের মুখ চেয়েই বর্তমানকে সতর্ক হতে হবে। বর্তমান যদি অতীতের দিকে মুখ ফিরিয়ে সংস্কৃত মন্ত্র পড়তে থাকে তাহলে কে জানে হয়তো ভবিষ্যৎ একদিন বর্তমানের দিকে মুখ ফিরিয়ে রুশ মন্ত্র বা চীন মন্ত্র পাঠ করবে। সেও তো একপ্রকার শাস্ত্র।

ধর্ম নিজের পায়ে হাঁটতে শিখুক। ঘোড়ার পিঠে চড়া ছেড়ে দিক। ঘোড়ার পিঠ থেকে তাকে নামতে হবেই। কেউ-না-কেউ তাকে নামাবে। আমরা ধর্মের শুভানুধ্যায়ী বলেই তাকে পরামর্শ দিই—বাপু তুমি মন্দিরে থাকো, মসজিদে থাকো, গির্জায় থাকো, গৃহে থাকো, বেদিতে থাকো, মর্মে থাকো কিন্তু রাজদ্বারে যেয়ো না। রাজপুরুষদের মাথায় উঠো না। রাজকোষের অর্থ নিয়ো না। আজ নাহয় ওরা তোমার দৌলতে জনপ্রিয় হবে, জনতার ভোট পাবে, কিংবা উপরওয়ালার নেকনজর; কিন্তু কাল যখন ওরা তলিয়ে যাবে তখন তুমিও তো তলিয়ে যাবে ওদের সঙ্গে। অতএব সময় থাকতে নিরস্ত হও। তুমিও বাঁচবে, ওরাও বাঁচবে। আর নয়তো তোমার ভক্তরাই তোমাকে সাবাড় করবে। হিন্দু-মুসলমানে ওই যে খুনোখুনিটা হল তাতে তুমি হিন্দুত্ব আর তুমি ইসলাম তুমিও তো ঘায়েল হয়ে রয়েছ। মধ্যযুগের ইউরোপে তুমি খ্রিস্টধর্ম তোমার কী দশা হল মনে আছে? ক্যাথলিকে প্রোটেস্টান্টে হানাহানির ফলে তোমারও বলহানি হল। তোমার যারা শুভানুধ্যায়ী তারা তোমাকে রাষ্ট্রের পিঠ থেকে মানে মানে নেমে আসতে প্রবর্তনা দেয়। যেখানে যেখানে তুমি তা করলে সেখানে সেখানে তুমিও বাঁচলে, রাষ্ট্রও বাঁচল। ভলতেয়ারের চেতাবনি শুনলে ফরাসি বিপ্লবের প্রয়োজন হত না। ফরাসিদের শিক্ষা হয়েছে, তাদের রাষ্ট্র সত্যি সত্যি সেক্যুলার। ইংল্যাণ্ডে ক্রমওয়েলের প্রজাতন্ত্র বেশিদিন টিকল না বটে, কিন্তু রাজতন্ত্রও সাবধান হল সেই থেকে। সেখানকার রাষ্ট্র কাগজে-কলমে নয় কিন্তু ভিতরে ভিতরে সেক্যুলার; রাজা না থাকলে কাগজে-কলমেও হত। রাজার খাতিরে কতকটা আপোশ করতে হয়েছে অতীতের সঙ্গে, ঐতিহ্যের সঙ্গে। আমেরিকায় তার দরকার হয়নি। স্বাধীনতা অর্জনের পর আমেরিকা এক কলমের খোঁচায় রাজতন্ত্র খারিজ করে, সঙ্গে সঙ্গে রাজধর্মকে। সেখানে রাষ্ট্রধর্ম বলে কিছু নেই। নেই ধর্মরাষ্ট্র। এতে ধর্মও বাঁচল, রাষ্ট্রও বাঁচল। নইলে জড়াজড়ি করে দুজনেই ডুবত। যেমন ফরাসি বিপ্লবের সময় ফ্রান্সে। রুশ বিপ্লবের সময় রুশ দেশে।

সেক্যুলার স্টেট যেমন একহাতে রাষ্ট্রকে উদ্ধার করে তেমনি আর একহাতে ধর্মকে। আমরা যারা সেক্যুলার স্টেটকে ‘বকচ্ছপ’ হতে দেখলে দুঃখ পাই, আমরাই বকের বন্ধু তথা কচ্ছপের। বকও ভালো, কচ্ছপও ভালো, কিন্তু ‘বকচ্ছপ’ ভালো নয়।

আমাদের ভবিষ্যৎ

এই সেদিন আর একটা দেশ ভাগ হয়ে গেল। ইন্দোচীন। অবশ্য দেশের লোক ইচ্ছা করলে নির্বাচনে ঐক্য ফিরিয়ে আনতে পারবে, কিন্তু সকলেই জানে তা হবার নয়। কারণ আজকের দুনিয়ায় মতবাদ বলে একটা শক্তি কাজ করছে। মতবাদ বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ হলে দেশ ভাগাভাগি হয়ে যায়। নয়তো গৃহযুদ্ধ চলতে থাকে। বাইরের লোক তাতে ইন্ধন জোগাতে থাকে। দেখতে দেখতে হয়ে দাঁড়ায় বাইরের সঙ্গে বাইরের যুদ্ধ। সেইজন্যে একালের গৃহযুদ্ধ সারা দুনিয়ার লোককে ভাবায়। তা সে কোরিয়ায় হোক বা ইন্দোচীনে হোক। সব জায়গায় ওটা শেষপর্যন্ত ক্যাপিটালিজমে-কমিউনিজমে বলপরীক্ষা। এই বলপরীক্ষার নিট ফল তোর অর্ধেক মোর অর্ধেক। তুই নে ন্যাজাটা মুই নিই মুড়োটা। মস্কো আর ওয়াশিংটন একমত না-হলে ভাঙা ইন্দোচীন আর জোড়া লাগবে না। ভাঙা কোরিয়া ভাঙা রয়ে যাবে। ভাঙা জার্মানিরও সেই দশা। এক যদি বিশ্বযুদ্ধ বাঁধে, যদি এক পক্ষ অপর পক্ষকে পরাস্ত করে তবে অবশ্য অন্য কথা।

আমাদের এখানেও মতবাদ নামক শক্তিটা সক্রিয়। তবে ঠিক ওই অর্থে নয়। এখানেও ক্যাপিটালিস্ট বনাম কমিউনিস্ট আছে, তাদের কাজ তারা করে যাচ্ছে, কিন্তু এখানে তার চেয়েও সক্রিয় ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বনাম বিশ্ব ইসলাম। ভারত যার নাম তার প্রতিষ্ঠা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বনেদের উপর। আর পাকিস্তান যার নাম তার ভিত্তি হল বিশ্ব ইসলাম। পাকিস্তান হচ্ছে মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত একটি শৃঙ্খলের অঙ্গ। ভারত সে-শৃঙ্খলের ধারাবাহিকতা ভঙ্গ করছে। আর করছে বর্মা ও সিংহল। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে ইন্দোনেশিয়া ভারতের অনুসরণে সেক্যুলার স্টেট স্থাপন করেছে, ইসলামিক স্টেট নয়। এবং ভারতেরই অনুসরণে ক্যাপিলাটিস্ট বা কমিউনিস্ট কোনো পক্ষের শিবিরে যোগ না দিয়ে নিরপেক্ষ রয়েছে। বর্মাও তাই। সিংহল এখনও দ্বিধাগ্রস্ত।

আবার অন্য দিকে দেখা যাচ্ছে কামাল পাশার কীর্তি নাশ করে তুর্কি এখন সেক্যুলার স্টেটের নীতি বিসর্জন দিতে বসেছে, এখন সেখানে ইসলামের দোহাই দিলে ভোটে জেতা যায়। জেতারা ব্যবসাদার শ্রেণির লোক, তাঁদের প্রধান মুরুব্বি আমেরিকা। টাকা দিচ্ছে স্যামচাচা, ভোট পাচ্ছে—যাক গে, ওদের নাম ভুলে গেছি। এর থেকে আমাদেরও শেখবার আছে। জনগণকে আফিং খাওয়ানো বড়োলোকদের চিরকেলে পেশা, আর আফিং হল জনগণের চিরকেলে নেশা। আজ আমরা সেক্যুলার স্টেট পত্তন করলুম আর অমনি জনগণের নেশা ছুটে গেল তা হয় না। তাদের ভালো করে বুঝিয়ে দিতে হবে কেন আমরা সেক্যুলার স্টেট চেয়েছি। কার স্বার্থে? সেটা কি জনগণের স্বার্থ নয়?

দুরকম পরাধীনতা আছে। একটা প্রত্যক্ষ, যেমন সাত বছর আগে ব্রিটিশ সরকার এদেশ শাসন করতেন, আমরা ছিলুম ইংরেজের প্রজা। আর একটা পরোক্ষ, যেমন নামে মিরজাফর বাংলাদেশ শাসন করতেন, আসলে করত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। বাংলাদেশের লোক ছিল নবাবের প্রজা, অথচ ইংরেজের অধীন। এই হল মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলির মোটামুটি চেহারা। প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই একটি করে মিরজাফর থাকেন, তাঁর পিছনে থাকেন হয় ইংরেজ, নয় ফরাসি, নয় মার্কিন ধনশক্তি। জনশক্তি সেসব দেশে নেশায় বুঁদ। এর ব্যতিক্রম ঘটেছিল তুর্কির বেলায়, কামাল পাশার নেতৃত্বে। এখন নেতাবদল হয়েছে, তুর্কি এখন তাঁবেদারিতে ফিরে চলল। আর একটি ব্যতিক্রম এই সম্প্রতি লক্ষ করা যাচ্ছে ইজিপ্টে। এর পরমায়ু কদ্দিন তা জোর করে বলা যায় না। মধ্য প্রাচী যখন, তখন নেশার দিকে ঝোঁকটাই স্বাভাবিক। এসব দেশকে দীর্ঘকাল ধরে ইউরোপীয় শিক্ষা দেওয়া দরকার। ইন্দোনেশিয়া সেটা বুঝেছে। আমাদের ইন্দোনেশীয় বন্ধু বললেন, সেখানকার সরকার নিজের খরচে ছ-হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে ইউরোপে আমেরিকায় অস্ট্রেলিয়ায় ও ভারতে

পাঠিয়েছে। আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে ইউরোপের ইতিহাস যারা মন দিয়ে পড়েছে তারাই কেবল সেক্যুলার স্টেট বস্তুটিকে ধারণ ও বহন করতে পারে। পত্তন যেই করুক-না-কেন। তবে এটাও ঠিক যে সেক্যুলার স্টেটকে ভেঙে যেতে দিলে যে মারটা কপালে আছে সে-মারটাই প্রকৃষ্ট শিক্ষা। মার খেতে খেতে ইউরোপ যা শিখেছে মার খেতে খেতেই ভারত তা শিখবে। আর মধ্য প্রাচী-র তো মার ছাড়া আর কোনো শিক্ষাই নেই। মধ্য প্রাচী বলতে আমি পাকিস্তানও বুঝি।

কিন্তু কেন সেক্যুলার স্টেট? প্রত্যক্ষ পরাধীনতা থেকে মুক্তির উপায় সকলের জানা। কোথাও তা সশস্ত্র বিদ্রোহ, কোথাও নিরস্ত্র প্রতিরোধ। কিন্তু পরোক্ষ পরাধীনতার কী চিকিৎসা? আফিং-ছাড়ানো। সাধে কি আমরা মাদকবর্জন নীতি গ্রহণ করেছি! কিন্তু মাদক কেবল মাদ-গাঁজা-আফিং নয়। মাদকের তালিকায় পড়ে সেকেলে শিক্ষা। যে শিক্ষা টোল মাদ্রাসা মক্তবে দেওয়া হত। যেখানে স্কুল নেই হাসপাতাল নেই জল নেই জলনিকাশ নেই বাস নেই বস্ত্র নেই অন্ন নেই সেখানে বেগার খাটিয়ে মসজিদ বা মন্দির তৈরি করাও মাদক দ্রব্যের তালিকায় পড়ে। কেন, গাছতলায় বসে কি নামাজ পড়া যায় না, উপাসনা করা যায় না? বড়ো ইমারত না-হলে যদি ধর্মকর্ম না-হয় তবে সেটা রাষ্ট্রের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া কেন? যারা সে-ভার বইতে পারে তারাই সে-ভার নিক। রাষ্ট্রকে বলো রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালন করতে। আধুনিক রাষ্ট্রের দায়িত্বটি বড়ো কম নয়। প্রত্যেকটি প্রজাকে কর্ম জোগানো আধুনিক রাষ্ট্রের প্রাথমিক দায়িত্ব। যে দেশে বেকারসংখ্যা বেশি সেদেশের রাষ্ট্র তার প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করেনি বলতে হবে।

জনগণের স্বার্থে সেক্যুলার স্টেট যেমন অবশ্য গ্রহণীয় তেমনি গ্রহণীয় নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক নীতি। ভারত কোনো শিবিরে যাবে না, সে ও তার মতো আরও দুটি-একটি দেশ মিলে নিরপেক্ষ থাকবে, তার ডাক শুনে যদি কেউ না আসে তা হলে সে একলা চলবে। দীর্ঘকালের দাসত্বের পর যে-দেশ সদ্য মুক্ত হয়েছে তার পক্ষে এ ছাড়া আর কোনো নীতি যুক্তিযুক্ত নয়। যেসব পণ্ডিত এর মধ্যে যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন না, তাঁদেরকে আমেরিকার ইতিহাস পড়তে বলি। স্বাধীনতার পর আমেরিকাও এই নীতি গ্রহণ করে যে, আন্তর্জাতিক ব্যাপারে সে নিরপেক্ষ থাকবে। তার নিরপেক্ষতা শতাব্দীকাল স্থায়ী হয়েছিল। সেই শতাব্দীকালের আত্মবিকাশের ফলে সে ক্রমে প্রথম শ্রেণির শক্তি হয়ে ওঠে। নতুবা সে তৃতীয় শ্রেণিতেও স্থান পেত না। আমেরিকার সৈন্যদল তার সীমান্তরক্ষার কাজে নিযুক্ত ছিল। সেইজন্যে আকারে প্রকারে ক্ষুদ্র ছিল। সামরিক ব্যয়ে যে টাকাটা বরবাদ হতে পারত সে-টাকা জনকল্যাণে লাগল। প্রথম থেকেই আমেরিকা শিক্ষার জন্যে বহুধন ব্যয় করে। প্রাথমিক শিক্ষার উপর জোর দিতে গিয়ে উচ্চশিক্ষাও ব্যাহত হয় গোড়ার দিকে। প্রাথমিক শিক্ষা সেক্যুলার পদ্ধতিতে হত। রাষ্ট্র ব্যতীত আর কাউকে প্রাথমিক বিদ্যালয় চালাতে দেওয়া হত না। এবং রাষ্ট্র তার বিদ্যালয়গুলিতে ধর্মমত শেখাত না। যার যার শিক্ষা তার তার ঘরে। তা বলে রাষ্ট্র যা শেখাত তা অধর্ম নয়। তা সকলের শিক্ষণীয় সাহিত্য-গণিত-বিজ্ঞান-ইতিহাস। প্রাথমিক শিক্ষার পরে বেশিরভাগ ছাত্র কাজকর্ম খুঁজে নিত। যারা কলেজে যেত তারা ইচ্ছা করলে খ্রিস্টান কলেজে খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা করতে পারত। কিন্তু কলেজ রাষ্ট্রের হলে তাতে ধর্মরক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। আমেরিকা খ্রিস্টানদের দেশ। অখ্রিস্টান অল্প কয়েক জন ছিল, তাদের অনুপাত পশ্চিম পাকিস্তানের হিন্দুর চেয়েও কম। পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুর চেয়ে তো অনেক কম। তা সত্ত্বেও কেন সেদেশ তার প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা থেকে ধর্মকে সযত্নে বাদ দেয়? এর মূল কারণ তার স্বাধীনতাপ্রিয়তা। স্বাধীনতাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করতে হলে সেক্যুলার মনোভাবকে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই প্রোথিত করতে হবে। তার জন্যে যে খরচটা হবে সেটা আসবে সামরিক ব্যয়সংকোচের ফলে। এবং সামরিক ব্যয়সংকোচ সম্ভব হবে নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক নীতির ফলে। ইতিহাসে আমাদের নীতি নজির আছে। স্বাধীনতাপ্রিয় সুইসরাও নিরপেক্ষ তথা সেক্যুলার। তা বলে তারা ধর্মবিরোধী নয়। সেক্যুলার কথাটা ধর্মের বিপরীত নয়। ধর্ম থাক, কিন্তু তা যেন জনগণের আফিং না হয়। ধর্মের নেশায় যেন তারা স্বাধীনতা বিকিয়ে না দেয়।

পাকিস্তানের জনগণ ক্রমে এসব বুঝবে। তার আগে অনেক দুর্ভোগের ভিতর দিয়ে যাবে। তাদের ঐতিহ্য মধ্য প্রাচ্যের সঙ্গে মেলে। ভারতের সঙ্গে মেলে না। তারা ইউরোপীয় শিক্ষা বয়কট করেছিল। বয়কট প্রায় অর্ধ শতাব্দী স্থায়ী হয়েছিল। যদি-বা তারা ইউরোপীয় শিক্ষায় ব্রতী হল সেইসঙ্গে আলিগড়ের মতো বিদ্যাপীঠে ধর্মকেও তার সঙ্গে জুড়ে দিল। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতাদের অধিকাংশ আলিগড়ি বা আলিগড়পন্থী। প্রধান প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদালি ঝিনাভাই খোজানি—যিনি মহম্মদ আলি জিন্নাহ নামে প্রখ্যাত—আলিগড়ি বা আলিগড়পন্থী ছিলেন না। কিন্তু জনগণের সঙ্গে তাঁর সংস্পর্শ না থাকায় সেক্যুলার স্টেট যে কাদের জন্যে দরকার, কেন দরকার, সে-অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল না। পাকিস্তান তার ঐতিহ্যকে অতিক্রম করতে এখনও অর্ধ শতাব্দী সময় নেবে। ততদিন তার ভাগ্য তার, ভারতের ভাগ্য ভারতের। পাকিস্তান ও ভারত একই যুগে বাস করলেও একই যুগের নয়। ভারতকে আধুনিক করে তোলা যত কঠিন পাকিস্তানকে আধুনিক করে তোলা তার চেয়ে অনেক কঠিন। তার ভবিষ্যৎ ও ভারতের ভবিষ্যৎ একইরকম হলে আমি সুখী হতুম। কিন্তু একইরকম হবার সম্ভাবনা নেই।

আমি বিশ্বাস করিনে যে পাকিস্তানকে ভারতের শামিল করলেই তার সমস্যার সমাধান হবে; বরং উলটোটি হবে। তার সমস্যা আরও জটিল হয়ে দাঁড়াবে। তার সমস্যার সমাধান হল ইন্দোনেশিয়ার মতো অতীতকে এক দিনে ঝেড়ে ফেলা। ইন্দোনেশিয়ার লোক শিক্ষাবিস্তারের সুবিধার জন্যে রোমকলিপি গ্রহণ করেছে। তার আগে ছিল আরবিলিপি। কিন্তু পাকিস্তানের লোক প্রাণ ধরেও রোমকলিপি নেবে না। পাকিস্তানিরা বলে বটে তাদের শিশুরাষ্ট্র, শিশুজাতি; কিন্তু কার্যকালে দেখা যায় সে-শিশু নতুন কিছু করবে না, যা চিরকাল হয়ে এসেছে তাই চিরকাল হবে—এই তার জীবনদর্শন। আমি অনেকসময় হাঁফ ছেড়ে বাঁচি এইজন্যে যে এ শিশুর জন্যে আমার কিছুমাত্র দায়িত্ব নেই। তার পরেই মনে পড়ে যায় আমি তো জনগণকে এক ও অবিভাজ্য বলে বিশ্বাস করি। তাদের স্থিতি যে রাষ্ট্রেই হোক-না কেন তাদের জন্যে আমার সমান দায়িত্ব। আমি তো হিন্দু-মুসলমানে ভেদ করিনে। তাহলে আমি কী করে এ দায়িত্ব এড়াতে পারব? একশো বার ভাবি পাকিস্তানের ব্যাপারে কথা কইব না। একশো বারের পরের বার ভাবি, কথা কওয়া দরকার। একটা পা পেছিয়ে থাকবে, আর একটা পা এগিয়ে যাবে এ কি কখনো হতে পারে? পাকিস্তানকে টেনে নিয়ে চলতে হবে আমাদের, যেমন চলেন সাহেবি-পোশাক-পরা বিলেতফেরত স্বামী, পিছনে শাড়িপরা ঘোমটা মাথায় দেওয়া বঙ্গললনা।

পাকিস্তান স্বতন্ত্র হয়েছে, স্বতন্ত্রই থাকুক। কিন্তু তাকে পর করে দেওয়াও বিজ্ঞতা নয়। তাকে আপন করতে হবে। নিজেদের আদর্শ বা কর্মপন্থা বিসর্জন না-দিয়ে কী করে এটা সম্ভব? আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা নীতি ত্যাগ করা কিছুতেই চলতে পারে না। তেমনি আভ্যন্তরিক ক্ষেত্রে সেক্যুলার স্টেট নীতি বিসর্জন দেওয়া কোনো মতেই চলবে না। আমরা যদি এই দুটি পদতলভূমির উপর অটল থাকি তাহলে পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের সমঝোতা কি কোনোদিন হবে? আরও পরিষ্কার করে বলছি। ভারত হিন্দু রাষ্ট্র নয়। সেক্যুলার স্টেট। এ রাষ্ট্রে হিন্দু কে আর মুসলমান কে আর খ্রিস্টান কে তা আইন আদালত আপিস আর্মি মিল ফ্যাক্টরি ডক ইয়ার্ড ইত্যাদি কোনোখানেই খোঁজ করা হয় না, যদি হয় তবে তা কনস্টিটিউশন-বিরুদ্ধ। তলে তলে হয়তো অনেকে ভেদবুদ্ধি জিইয়ে রেখেছে। কিন্তু তারজন্যে রাষ্ট্র দায়ী নয়। যে রাষ্ট্র সকলের কল্যাণের দায়িত্ব নিয়েছে, যে কাউকে ধর্মভেদের জন্যে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চায় না, সে রাষ্ট্রে নিশ্চয় কাশ্মীরি মুসলমানদেরও স্থান আছে। তারা যে মুসলমান তার চেয়েও বড়ো কথা তারা ভারতীয়। চার কোটি মুসলমান যদি ভারতীয় হতে পারে তাহলে কয়েক লক্ষ কাশ্মীরি মুসলমান কেন তা পারবে না? কেনই-বা আমরা ধরে নেব যে তারা মুসলমান বলেই তাদের স্থান এখানে নয়, পাকিস্তানে? অথচ পাকিস্তান এ বিষয়ে স্থির নিশ্চয় যে কাশ্মীর পাকিস্তানের অঙ্গ। ভারত তাকে বঞ্চিত করেছে। এ দুই দৃষ্টিভঙ্গির কোনোটা বেঠিক নয়। সেইজন্যে এ প্রশ্নের মীমাংসা এখনও হয়নি, হবেও না। এও সেই মতবাদের দ্বন্দ্ব। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বনাম বিশ্ব ইসলাম। গৃহযুদ্ধ এড়াবার জন্যে অখন্ড ভারত দ্বিখন্ড হয়েছে। গৃহযুদ্ধ রহিত করার জন্যে কাশ্মীরেও লাইন টানা

হয়েছে। সে-লাইন তুলে দেওয়ার সঙ্গে মতবাদের প্রশ্ন, ভারসাম্যের প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে। কাশ্মীরকে গায়ের জোরে এক রাষ্ট্রভুক্ত করতে হলে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যাবে। সে-যুদ্ধ কাশ্মীরের সীমানায় আবদ্ধ থাকবে না। তার ফলে মার্কিন ও রুশ দুই দিক থেকে হস্তক্ষেপ ঘটতে পারে। তার থেকে আর একটা বিশ্বযুদ্ধ।

যেমন সেক্যুলার স্টেট বনাম ইসলামিক স্টেট নিয়ে মতবাদঘটিত বিরোধ, কাশ্মীর যার পরীক্ষাস্থল, তেমনি নিরপেক্ষতা নীতি বনাম কোনো এক পক্ষে যোগদান নীতি নিয়ে নীতিঘটিত বিরোধ। মার্কিন পক্ষে যোগদান এখানেও অনেকে চায়, কিন্তু এদের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক নেই। জনগণ কোনো পক্ষে যোগ দেবে না। রুশ পক্ষেও না। কমিউনিস্টরা তাদের রুশ পক্ষে যোগ দেওয়াতে পারবে না। তাদের মোটা মোটা অভাবগুলো মিটিয়ে দেবার জন্যে জওহরলাল ও বিনোবা উভয়ই তৎপর। অপরপক্ষে পাকিস্তানের মোটা মোটা অভাবগুলো মেটাবার দায় চলে যাচ্ছে বিদেশি বান্ধবদের কাঁধে। এ নীতি আমাদের নয়। এর পরিণাম ভেবে আমরা সতর্ক। সমঝোতা তাহলে হবে কোন সূত্রে? আমি তো সাহিত্য ব্যতীত আর কোনো উপলক্ষ্য দেখতে পাচ্ছিনে।

ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ

চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে আমাদের বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীর কাছে আমরা এই শিক্ষাই লাভ করেছিলুম যে ভারতের সংস্কৃতি হচ্ছে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর মতো তিনটি স্রোতের ত্রিবেণিসংগম—প্রাচীন আর্য বা হিন্দু, মধ্যযুগীয় মুসলিম বা সারাসেন, আধুনিক ব্রিটিশ বা ইউরোপীয়।

গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের সময় একটি বেণি ছাঁটা হল। ইংরেজের সঙ্গে তখন আমাদের শত্রুতা চলছে। সুতরাং আমাদের সংস্কৃতি যে তাদের সংস্কৃতির কাছে ঋণী, এ চিন্তা আমাদের অসহ্য লাগত। ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে ইউরোপের দান বাদ দিলে যা থাকে তা হিন্দু-মুসলমানের যৌথ সম্পদ। গঙ্গা-যমুনার যুক্ত বেণি। সরস্বতী একদম লুপ্ত। রবীন্দ্রনাথের এটা ভালো মনে হয়নি। কিন্তু কে শোনে তাঁর প্রতিবাদ! আমরা তখন নিশ্চিত জেনেছি যে গোটা ইংরেজি আমলটাই আমাদের ইতিহাসে প্রক্ষিপ্ত। ওটা আমাদের ওপর গায়ের জোরে চাপানো হয়েছে। আমরা যদি ওর দ্বারা সম্মোহিত হই, তবে আমাদের সেটা দাস মানসিকতা। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সবাইকে আমরা দাস মানসিকতায় দাগি করে আত্মপ্রসাদ বোধ করলুম। কেবল ছাড় দিলুম সিপাহি বিদ্রোহের নায়কদের এবং তাঁদের মানসিকতায় দীক্ষিত হিন্দু-মুসলমানদের। খেয়াল ছিল না যে, ইংরেজের ওপর রাগ করে আস্ত আধুনিক যুগটাকেই বর্জন করছি।

তারপর বেঁধে গেল হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা। প্রথম প্রথম তার পিছনে আমরা একমাত্র ইংরেজের হাত দেখতে পেলুম। কিন্তু সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের পর আমাদের চোখ থেকে পর্দা সরে গেল। মুসলমানের ওপর রাগ যতই বাড়তে থাকল, ততই আসতে লাগল মুসলিম ধারা সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা। একটু একটু করে আর একটি বেণি ছাঁটা গেল। সেটা মুসলমানেরও ইচ্ছায়। সংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝলুম মুসলিমবর্জিত। তার মানে একাদশ শতাব্দীর পূর্বের। যখন সোমনাথের মন্দির কলুষিত হয়নি। আর ওঁরা বুঝলেন হিন্দুবর্জিত। তার স্থানে আরব-ইরান প্রভৃতি মুসলমান-অধ্যুষিত দেশের। যেখানকার রাষ্ট্র নাকি ইসলামি রাষ্ট্র।

পাকিস্তান হাসিল হবার পর অনেকে আশা করেছিলেন যে, হিন্দুস্থান প্রতিষ্ঠা হবে। সেখানকার সংস্কৃতিতে কেবলমাত্র গঙ্গাই থাকবে গঙ্গাজলের শুদ্ধতা নিয়ে। যমুনা থাকবে না। সরস্বতী থাকবে না। ইতিহাস থেকে প্রায় হাজার বছর কাটা পড়বে। কিন্তু ইংরেজির বদলে হিন্দি শিখতে হবে শুনে টনক নড়ল। তখন ইংরেজির খাতিরে ইংরেজ আমলটাকে কোনোরকমে হজম করা গেল। অন্তত ইংরেজি শিক্ষাটাকে। ইংরেজ আমলটা যত খারাপ হোক-না কেন, ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনটা বেশ ভালো কাজ হয়েছিল। তবে তাতে রামমোহনের বাহাদুরি নেই। তিনি যে মুসলমানদের দ্বারা পরিবৃত থাকতেন সেটা নিষ্ঠাবান হিন্দুদেরই সুকৃতি। রামমোহন গেলে রবীন্দ্রনাথও যান। ব্রাহ্মসমাজ যায়। থাকেন তাহলে 'শশধর, হাকসলি ও গুজ'। ইংরেজ আমলে ওইটুকুই আমাদের লাভ। আর সব লোকসান।

এই কয় বছরে মাথা অনেকটা সাফ হয়েছে। তবে যবনবিদ্বেষ এখনও বিদ্যমান। সরস্বতীকে স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে, কিন্তু যমুনাকে না। উত্তরপ্রদেশ, যেখানে গঙ্গা-যমুনার সংগম, সেখান থেকে যমুনাকে সর্বতোভাবে সরাতে হবে। শাসনতন্ত্রে উর্দু পড়ানোর বিধান আছে, তবু উর্দু পড়ানো চলবে না। মুসলমান যদি থাকে তো হিন্দি পড়তে বাধ্য। তাও যদি সে পড়ল, তবে তার গোরু-খাওয়া বন্ধ করতে হবে। এবার দেখা যাবে কেমন করে সে থাকে! তা সত্ত্বেও যদি থেকে যায়, তবে অন্য কোনো উপায় খুঁজতে হবে। নইলে শুদ্ধি কেমন করে সম্ভব হবে?

সংস্কৃতিকে শুদ্ধ করতে হবে, এ ভূত নামতে চায় না। যা হাজার বছর ছিল মিশ্র, আজ তাকে অমিশ্র করার স্বপ্ন দেখা হচ্ছে। হাজার বছর? তার আগেও কি সে মিশ্র ছিল না? শক, হূন, কুষাণ ইত্যাদি কি

বাইরে থেকে এসে গঙ্গাপ্রবাহে মধ্য এশিয়ার বারিধারা মেশায়নি? আরও আগে আর্য, দ্রাবিড়, মোঙ্গল, কোল ইত্যাদি? বৈদিকের সঙ্গে বৌদ্ধ, ষড়দর্শনের সঙ্গে আরও ছয়টি দর্শন, নাস্তিক্যের সঙ্গে নাস্তিক্য? সংস্কৃতির স্বভাবই এই যে, তার মধ্যে বহু স্বতোবিরোধ থাকে। যে সংস্কৃতি নানা বিবাদী সুরকে সংগতি দিতে জানে না সে তার শুদ্ধতা নিয়ে কালগর্ভে বিলীন হয়। আমাদের সংস্কৃতি যে এখনও বিলীন হয়নি তার কারণ বৈচিত্র্যকে অশুদ্ধ বলে বর্জন করা যৌবনকালে তার স্বভাব ছিল না। এ ভাব এসেছে বৃদ্ধবয়সে। জরাকে যৌবনে পরিণত না করলে সে আমাদের নবলব্ধ স্বাধীনতাকেও জরাগ্রস্ত করবে।

সংস্কৃতির মধ্যে কেবল একটি নয়, একাধিক ধারার স্বরসংগতি রয়েছে। কী ভাষা কী সাহিত্য কী সংগীত কী চিত্রকলা কী ভাস্কর্য কী স্থাপত্য কী বেশভূষা কী রন্ধনকলা কী দর্শন কী বিজ্ঞান কী সমাজতত্ত্ব—যেদিক থেকেই বিবেচনা করা হোক-না কেন, ভারতীয় সংস্কৃতি ত্রিবেণির জল; শুধু গঙ্গাজল নয়। এমনকী ধর্মেও সমন্বয়ের চেষ্টা হয়েছে। ইদানীং অবশ্য আর শোনা যায় না যে, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর খ্রিস্টীয় ও মুসলমান মতের সাধনা। অবিকল রামমোহন যা চেয়েছিলেন। গান্ধী যা চেয়েছেন। খ্রিস্টধর্ম প্রায় উনিশ শতাব্দী ধরে ভারতের মাটিতে দৃঢ়মূল হয়েছে; ইসলাম প্রায় হাজার বছর ধরে। ভারতের মাটির গুণে তাদেরও পরিবর্তন ঘটেছে, তারাও পরিবর্তন ঘটিয়েছে। তার ফলে বিশুদ্ধ হিন্দু বা বিশুদ্ধ মুসলমান বলে কেউ নেই। বিশ্বাসের দিক দিয়ে সকলেই অল্পবিস্তর মিশ্র।

তিনটি বেণির মধ্যে গঙ্গা চিরদিনই বড়ো ছিল, চিরদিনই বড়ো থাকবে। তা বলে যমুনা ও সরস্বতী উড়ে যাবে না। রাজনৈতিক মনোমালিন্য থেকে যে বর্জনশীল মনোভাব আসে, তা শেষপর্যন্ত আপনাকেই বিড়ম্বিত ও বঞ্চিত করে। ইংরেজি পড়ব না, উর্দু শিখব না, দেড়শো বছরকে অবহেলা করব, হাজার বছরকে অবজ্ঞা করব—এতে আমাদেরই ক্ষতি। প্রকৃতিস্থ অবস্থায় মানুষ আত্মখন্ডন করে না। ফিরিয়ে আনতে হবে সেই প্রকৃতিস্থ অবস্থা, যা চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর পূর্বেও ছিল। এরজন্যে ইংরেজের বা পাকিস্তানি কর্তাদের শুভবুদ্ধির অপেক্ষায় বসে থাকা যায় না। যা সত্য তা স্বয়ংক্রিয়, তা অন্যের মুখ চেয়ে নিষ্ক্রিয় নয়। ভারতের সংস্কৃতি যদি ত্রিবেণিসংগম হয়ে থাকে, তবে তা এই কয়েক বছরের দুর্ঘটনার ফলে ত্রিধাবিভক্ত হতে পারে না। আমরা যা হয়েছি তা বহু সহস্র বৎসরের বিবর্তনে হয়েছি। তার মধ্যে বিগত হাজার বছরও পড়ে। গত দেড়শো বছরও পড়ে। মুসলমান আমল ও ইংরেজ আমল অকারণে হয়নি, অকারণও হয়নি। শান্তভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায়, এসব অবশ্যম্ভাবী প্লাবন আমাদের জাতীয় জীবনের উষরতম মুহূর্তে ঘটেছে ও উর্বরতা বিধান করেছে। ভাঙন অপ্রীতিকর, পলিমাটি প্রীতিকর। ভাঙনের কথা মনে পুষে রাখব না, পলিমাটির উপর নতুন ফসল ফলাব।

ত্রিবেণির সঙ্গে আমি আর একটি বেণি যোগ করতে চাই। সেটি ভারতেরই চির-উপেক্ষিত লোকসংস্কৃতি। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী আমাদের সকলের দৃষ্টি জুড়েছে, দৃষ্টির অন্তরালে রয়েছে ফল্গু। লোকসংস্কৃতির চর্চার জন্যে কোথাও কোনো ব্যবস্থা নেই, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তার ধার ধারে না। মাঝে মাঝে গ্রামের গায়কদের শহরে এনে গান করানো হয়, সেটা তাঁদের স্বস্থান নয়, সেখানে তাঁদের উপযুক্ত আবহাওয়া নেই। মাঠের রাখালকে এনে মঞ্চে দাঁড় করালে সে মাঠের অভাবে মিঠে বাঁশি বাজাতে পারবে না। সাঁওতাল সং সাজবে। বাউল বেল্লিক হবে। এদের চরিত্রভ্রষ্ট করে কার কী লাভ! লোকসংস্কৃতির দিকে মন যাচ্ছে এই যা সুফল। কিন্তু এতে বিশ্বাস রাখতে হবে। এটা চতুর্থ একটা ধারা। অথর্ববেদের মতো সবচেয়ে পুরাতন অথচ সবচেয়ে নতুন। এর ইতিহাস কেউ জানে না, অথচ সকলের ইতিহাস এর মধ্যে সংরক্ষিত হয়েছে। এক-একটি রূপকথা প্রায় প্রাগৈতিহাসিক। এক-একটি ছড়ার বয়সের গাছপাথর নেই। অথচ মুখে মুখে ঘুরতে ঘুরতে তা নিত্য নবীন।

ভবিষ্যতে যারা সংস্কৃতির গর্ব করবে তাদের এই চারটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। বৈদিক-বৌদ্ধ সংস্কৃতির ম্যাট্রিকুলেশন, মুসলিম সংস্কৃতির ইন্টারমিডিয়েট, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিএ আর লোকসংস্কৃতির

এমএ। ইচ্ছা করলে উলটো দিক থেকেও পাশ করা যায়। কিন্তু শিক্ষা অসমাপ্ত রয়ে যাবে যদি এর কোনো একটি অঙ্গ বাদ পড়ে। চারটি অঙ্গ মিলেই আমাদের সংস্কৃতি চতুরঙ্গ।

বোরিস পাস্তেরনাক

এমন সময় ছিল যখন পাস্তেরনাক বললে লোকে বুঝত প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী লেওনিদ পাস্তেরনাক। মস্কো কলাভবনের অধ্যাপক। টলস্টয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। *রেজারকশন* উপন্যাসের ছবিগুলি যাঁর আঁকা। যাঁর পত্নী রোজা কাউফমান বিবাহের পূর্বে পিয়ানো বাজিয়ে নাম করেছিলেন। যাঁর গৃহে টলস্টয় এসেছিলেন কন্যাদের নিয়ে পিয়ানো শুনতে।

এই শিল্পীদম্পতির জ্যেষ্ঠ পুত্র বোরিস পাস্তেরনাক আজন্ম ললিতকলায় লালিত। দুই চোখ ভরে দেখেছেন। দুই কান ভরে শুনেছেন। যত রাজ্যের গুণীদের পায়ের তলায় বসেছেন। তাঁর জীবনের গোড়া থেকে টলস্টয় রয়েছেন তাঁদের বাড়ির হাওয়ায়। বিশ বছর ধরে তিনি সেই মহাপুরুষের সংস্পর্শের হাওয়ায় নিশ্বাস নিয়েছেন। একবার টলস্টয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন এক বিদেশি যুবা। বোরিস পাস্তেরনাকের বয়স তখন দশ। রেলপথে মস্কো ফিরছেন সপরিবারে। সহযাত্রী ও সহযাত্রিণী হলেন একটি যুবক ও একটি মহিলা। তাঁদের নামিয়ে দেবার জন্য ট্রেন মাঝপথে থামল। টলস্টয়ের বাড়ি থেকে জুড়িগাড়ি এসে তাঁদের নিয়ে গেল। বালক পাস্তেরনাক তখন জানতেন না সহযাত্রীর নাম, জানতেন না তিনি একজন কবি। আরও দশ বছর পরে একদিন বইয়ের আলমারি সাজাতে গিয়ে দেখেন একখানা বই পড়ে গেছে মেজেতে। তুলে নিয়ে পড়েন। রিলকের কবিতা। লেওনিদ পাস্তেরনাককে উপহার। পরে একদিন ডাকে এল রিলকের আরেকখানি বই। এখানিও উপহার। কে এই রিলকে? পিতা বললেন ইনিই সেই সহযাত্রী।

সেকালের রাশিয়ার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কম্পোজার স্ক্রিয়াবিন একবার পাস্তেরনাকদের কাছাকাছি বাসা নেন এক পল্লিগ্রামে। বালক বোরিস তাঁর বাজনা শুনে এমন মুগ্ধ হলেন যে মনে মনে ঠিক করে ফেললেন বড়ো হয়ে তিনিও হবেন সংগীতের কম্পোজার। আরম্ভ হয়ে গেল একমনে সংগীতসাধনা— একলব্যের মতো দ্রোণের অগোচরে। আর কোনো পিতা-মাতা হলে ছেলের খেয়ালে বাধা দিতেন। কিন্তু বোরিসের পিতা-মাতা অন্য প্রকৃতির। কম্পোজার হয়ে জীবিকা অর্জনে তাঁদের আপত্তি নেই। ছ-বছর ধরে গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে সংগীতসাধনার পর আবার স্ক্রিয়াবিনের সঙ্গে দেখা। নমুনা শুনে সংগীত-নায়ক 'হ্যাঁ-ও' বলেন না; 'না-ও' বলেন না। শুধু পরামর্শ দেন মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন না পড়ে দর্শনশাস্ত্র পড়তে। উনিশ বছর বয়সে তরুণ পাস্তেরনাক তাঁর জীবনের প্রথম আঘাত পেলেন যখন বুঝতে পারলেন যে সংগীতে তাঁর ভবিষ্যৎ নেই। তাহলে আছে কীসে? আইনে? নেই। দর্শনে? কে জানে!

একবার আত্মবিশ্বাস ভেঙে গেলে সহজে জোড়া লাগে না। পাস্তেরনাক হয়তো পথ খুঁজে পেতেন না। নিয়তি সহায় হল। পদ্মানদী যেমন একদিক ভাঙে তেমনি আরেক দিক গড়ে। তরুণদের একটি আড্ডায় তাঁকে ডাকা হত তিনি কবি বলে নয়, সংগীত ও চিত্রকলায় তাঁর প্রবেশ আছে বলে। সেখানে কবিরাও যেতেন। আলাপ হত। রিলকের কবিতা আবিষ্কার করার পর একদিন পাস্তেরনাক রিলকে পড়ে শোনালেন। তাঁর জীবনের সন্ধিক্ষণে রিলকের কবিতা যেন ঈশ্বরের দান। এরপরে আরও দু-বছর কেটে গেল। একদিন তাঁর মা তাঁর হাতে দুশো রুবল দিয়ে বললেন, এ আমার অনেক দিনের অনেক কষ্টের সঞ্চয়। যাও, বিদেশে বেড়িয়ে এসো। পাস্তেরনাকের কাছে এটা অপ্রত্যাশিত। জার্মানির মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় একেই তো প্রাচীন, তার ওপর তখনকার দিনে নব্য কান্টীয় দর্শনের প্রধান কেন্দ্র। পাস্তেরনাকের মনে সাধ ছিল সেখানে গিয়ে হার্মান কোহেনের কাছে পড়বেন। কিন্তু উপায় ছিল না। অর্থাভাব। দৈবাৎ এই টাকাটা পেয়ে তিনি ঠিক করে ফেললেন গ্রীষ্মাবকাশটা মারবুর্গে কাটাবেন। খোঁজ নিয়ে জানতে পেলেন বিশ্ববিদ্যালয় সে-সময় খোলা থাকবে। জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের রীতি অন্যরকম।

মারবুর্গে গিয়ে ভালোই চলছিল। কোহেনের তাঁকে খুব পছন্দ। কিন্তু ঘটে গেল এক বিচিত্র ব্যাপার। এটিও অপ্রত্যাশিত। মস্কোতে তিনি এক বড়োলোকের মেয়েকে পড়াতেন। সে ও তার ছোটোবোন বিদেশে বেড়াতে গিয়ে মারবুর্গে হাজির। তাদের সঙ্গে গুরুজন নেই। পুরোনো প্রেম ঝালিয়ে নেবার এই তো সুযোগ। পাস্তেরনাক সাহসে বুক বেঁধে একদিন বলেই ফেললেন কথাটা। 'ওগো, যাবার আগে বলে যাও আমার কপালে কী আছে।' যতদূর সম্ভব বিনয়ের সঙ্গে প্রিয়া বললেন, 'তোমার কোনো আশা নেই।' পরের দিন পাস্তেরনাকের চোখে পৃথিবীর রূপ বদলে যায়। এ হল তাঁর জীবনের দ্বিতীয় গুরুতর আঘাত। উনিশ বছর বয়সে গেল সংগীত। বাইশ বছর বয়সে গেল প্রেম। কিন্তু কে জানে কেমন করে এল কবিতা। পাস্তেরনাক আবিষ্কার করলেন যে তিনি কবিতার পর কবিতা লিখে চলেছেন। বিদায় মারবুর্গ! বিদায় দর্শনশাস্ত্র! পকেটে সামান্য কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাই দিয়ে কোনোরকমে ভেনিস ও ফ্লোরেন্স দেখা হল। দেশে ফিরে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট হলেন ১৯১৩ সালে। সেই বছরই কাব্যে আত্মসমর্পণ করলেন।

পরের বছর প্রথম মহাযুদ্ধ। শাপে বর হল তাঁর খোঁড়া পা। সেই যে-বার পল্লিগ্রামে স্ক্রিয়াবিনের সঙ্গ পান সেই বছরই ঘোড়ার থেকে পড়ে পা ভাঙেন। সেরে ওঠার পর দেখা গেল এক-পা ছোটো, এক-পা বড়ো। এমন লোককে তো সৈন্যদলে ভরতি করা যায় না। সমবয়সিরা সবাই চলল যুদ্ধে লড়তে—কবিবন্ধুরাও। ইতিমধ্যে তিনি ফিউচারিস্টদের একটি উপদলে যোগ দিয়েছিলেন। উপদলটির নাম 'সেন্ট্রিফিউগ'। আরেকটি উপদলের স্বনামধন্য কবি মায়াকোভস্কির সঙ্গে ইতিমধ্যেই তাঁর ভাব হয়। তখনকার দিনে সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্যটাকেই লোকে বড়ো করে দেখত। কবিরা নিজেরাও তাই একদল আরেক দলকে নেমন্তন্ন করে ডেকে এনে বাক্যবাণে জ্বালিয়ে মারত। ইমেজিস্ট বলে একটা দল ছিল। তারা দস্তুরমতো গুণ্ডামি করত। এসেনিন ছিলেন এই দলের সেরা কবি। যেমন গরমপন্থী ফিউচারিস্টদের মধ্যমণি ছিলেন মায়াকোভস্কি। পাস্তেরনাকের উপদলটা নরমপন্থী। বেশি বয়সে কবিতা লিখতে শুরু করে অন্যের তুলনায় তিনি পেছিয়েই রয়েছিলেন।

ফেব্রুয়ারি বিপ্লব যখন ঘটে পাস্তেরনাক তখন মস্কো থেকে অনেক দূরে উরাল পর্বতের ধারে এক অস্ত্রশস্ত্রের কারখানায় কেরানিগিরি করছেন। সেখান থেকে নিকটতম ডাকঘর হল ১৭০ মাইল ব্যবধানে। খবরটা পেয়েই তিনি রওনা হলেন তিন ঘোড়ার বরফগাড়ি ট্রোইকায় চড়ে কাজান। কাজান থেকে রেলপথে মস্কো। সেই বছরই লেখা হয় তাঁর কবিতার বই, *জীবন, বোন আমার*। লেখা হয়, কিন্তু ছাপা হয় না। ছাপা হতে পাঁচ বছর দেরি হয়। কিন্তু যেদিন ছাপা হল সেইদিনই তাঁর আসন স্থির হয়ে গেল মায়াকোভস্কি ও এসেনিনের সঙ্গে বিপ্লবোত্তর গিরিশিখরে। ব্লক ততদিনে মৃত। সিম্বলিস্ট কবিদের দিন গেছে। অ্যাকমিইস্ট কবিদের নেতা গুমিলিওভ নিহত। তাঁর পত্নী আখমাতোভা জীবিত, কিন্তু তাঁদের দলটিরও দিন গেছে। শুধু ফিউচারিস্ট ও ইমোজিস্ট এই দুই দলেরই নামযশ। এঁরা বিপ্লবকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু মায়াকোভস্কি ও এসেনিন যেমন বিপ্লবের বাণীমূর্তি হয়ে উঠেছিলেন পাস্তেরনাক তেমন নন। পাস্তেরনাক কোনোদিনই রাজনীতির মধ্যে ছিলেন না, রাজনীতি নিয়ে একেবারেই ভাবতেন না। তবে বিপ্লব যে একদিন হবেই এটা তিনি জানতেন সেই ১৯০৫ সাল থেকে, তাঁর বয়স যখন পনেরো বছর। এই বছরের ঘটনা অবলম্বন করে তাঁর একখানি কাব্যগ্রন্থ আছে। প্রকৃতির জগতে যেমন ঝড়ঝঞ্ঝা মানুষের জগতেও তেমনি যুদ্ধ আর বিপ্লব। যারই নাম ঝড়ঝঞ্ঝা তারই নাম যুদ্ধ আর বিপ্লব। এই তাঁর জীবনদর্শন।

পাস্তেরনাক যদি বিপ্লববিরোধী হতেন তাহলে তাঁকে রাশিয়ায় থাকতে হত না, থাকলে যেকোনো দিন প্রাণ যেত। একে একে তাঁর বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন রাশিয়া থেকে সরে পড়েন। তাঁর মা-বাবা চলে যান ১৯২১ সালে। পাস্তেরনাককে চাকরি নিতে হয় লেখকদের বইয়ের দোকানে সেলসম্যানরূপে। *জীবন, বোন আমার* প্রকাশ করে পরের বছর তিনি যশস্বী হন। বিবাহ করেন। বধূকে নিয়ে বার্লিনে যান পিতা-মাতাকে প্রণাম করতে। বার্লিনে তিনি এক বছর কাটান। সেইখানেই তাঁর পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। সেখানে থাকতেই প্রকাশিত হয় তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ *আস্থায়ী আর অন্তরা*। বার্লিনে তথা মস্কোতে একই কালে। পাস্তেরনাক ইচ্ছা করলে

জার্মানিতে থেকে যেতে পারতেন। জার্মান তাঁর কাছে মাতৃভাষার মতো সহজ। রাশিয়ায় ফিরতেই হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। না ছিল সম্পত্তি, না বাড়িঘর, না চাকরি। কেন তবে তিনি ফিরতে গেলেন? যখন যে পারছে সে পালাচ্ছে। এর উত্তর, তিনি রুশ ভাষার কবি। কেবল রুশ ভাষার না, রুশ কথ্যভাষার। তিনি সারস্বত কথ্যভাষার জাদুকর। তা ছাড়া রুশ দেশের জনগণের সঙ্গে তাঁর আত্মার যোগ ছিল। তিনি টলস্টয়পন্থী না হলেও টলস্টয়ের প্রভাবে মানুষ হয়েছিলেন। যেখানে জনগণ সেখানে তিনি। তা ছাড়া তিনি ইতিহাসের স্রোতে ওতপ্রোত হতেও ভালোবাসতেন। তিনি রুশ দেশের ইতিহাসের জলের মাছ। বিদেশে বাস করলে হবেন ডাঙার মাছ।

লেনিন তখনও বেঁচে। যদিও তিনি হাড়ে হাড়ে রাশিয়ান মুজিক তবু তিনি অন্তরে অন্তরে ইউরোপীয় ইন্টেলেকচুয়াল—মার্কস স্বয়ং যা ছিলেন। বিপ্লব ঘটে গেছে বলে রাশিয়ার চিন্তাশীলরা ইউরোপের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হবেন এটা তাঁর কাম্য ছিল না। লেনিন দীর্ঘকাল পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আত্মগোপন করে মূলস্রোতের মহিমা অনুভব করেছিলেন। সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তিনি চিন্তা করতেন, তর্ক করতেন, লিখতেন। তাঁর ব্যক্তিস্বাধীনতা কেউ অস্বীকার করেনি। স্বাধীন ব্যক্তি হিসেবেই তিনি স্বেচ্ছায় মার্কসপন্থী হয়েছিলেন। সকলেই সেইভাবে মার্কসপন্থী হবেন এই ছিল তাঁর আশা ও বিশ্বাস। জোরজুলুম করে কাউকে তিনি ভজাতে চাননি। নিজের দেশের ইন্টেলেকচুয়ালদের উপর জোরজুলুম করা অবশ্য সহজ, কিন্তু পৃথিবীর প্রথম শ্রমিক-কৃষক রাষ্ট্র যদি এরূপ কুদৃষ্টান্ত দেখায় তাহলে পশ্চিম ইউরোপের ইন্টেলেকচুয়ালরা তা দেখে বিগড়ে যাবেন। তাহলে বিপ্লব দিকে দিকে ছড়াবে না। একমাত্র রাশিয়াতেই সীমাবদ্ধ থাকবে। তা যদি হয় তবে রাশিয়াতেও দৃঢ়মূল হবে না। পশ্চিম ইউরোপেও বিপ্লব ঘটা চাই। তারজন্যে সেসব দেশের ইন্টেলেকচুয়ালদের আকর্ষণ করতে পারা চাই। তাদের আকর্ষণ করার সেরা উপায় হচ্ছে রুশ লেখকদের ব্যক্তিস্বাধীনতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করা।

সাহিত্যিক ব্যাপারে লেনিনের পরামর্শদাতা ছিলেন গোর্কি। তিনিও লেনিনের মতো পাশ্চাত্য সংসর্গে ও ব্যক্তিস্বাধীনতায় আস্থাবান। তাই রুশ লেখকদের রকমারি 'ইজম'ও গোষ্ঠী বিপ্লবের পূর্বে যেমন ছিল পরেও তেমনি রইল। বিপ্লববিরোধীরা আপনি সরে পড়েন। যাঁরা থাকেন বা ফিরে আসেন তাঁরা সকলে বিপ্লববাদী না হলেও বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতিশীল স্বাধীন লেখক। লেনিন ও গোর্কি এঁদের মর্যাদা স্বীকার করতেন। তাই পাস্তেরনাক নিজের কথা নিজের মতো করে বলতে পেরেছিলেন। লেনিনের মহাপ্রস্থানের পরেও আরও কবিতা লিখেছিলেন, আরও গল্প, গদ্যে আত্মজীবনী, পদ্যে উপন্যাস। যদিও তিনি ভুলেও আর কারও মতো হবেন না তবু তাঁর অনন্যতাও জনপ্রিয় হয়। কিন্তু ক্রমেই দেশের আবহাওয়া বদলে যায়। প্রথমে আত্মহত্যা করেন এসেনিন ১৯২৫ সালে। তারপরে আত্মহত্যা করেন মায়াকোভস্কি ১৯৩০ সালে। তারপরে আপনা হতে অপসরণ করেন পাস্তেরনাক ১৯৩২ সালে। সেই যে তিনি মৌনব্রত অবলম্বন করেন সে-ব্রত অল্প কিছুদিনের জন্যে ভঙ্গ করেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় দেশ যখন আক্রান্ত। তারপরে আবার নীরব হন যুদ্ধজয়ের সঙ্গে সঙ্গে 'কসমোপলিটানিজম'-এর উপর কর্তৃপক্ষের ধর্ষণ লক্ষ্য করে। যুদ্ধকালে যারা মিত্র ছিল যুদ্ধের পরে তারাই হল শত্রু। সুতরাং তাদের সংস্কৃতিও হল বর্জনীয়। মাঝখানে খাটিয়ে দেওয়া হল লৌহ যবনিকা। রাশিয়ার ইতিহাসে দেখা যায় সম্রাট পিটার প্রমুখ একদল যেমন রাশিয়াকে ইউরোপীয় বানানোর পক্ষে, ডস্টইয়েভস্কি প্রমুখ আরেক দল তেমনি ইউরোপীয় সংস্কৃতির বিপক্ষে। লৌহ যবনিকা তারই রকমফের। পাস্তেরনাক মৌলিক রচনায় হাত না দিলেও কলম একেবারে বন্ধ করেননি। অনুবাদ করেছেন অপরের রচনার। জর্জিয়ান বন্ধুদের কবিতা, শেক্সপিয়ার, শেলি, গ্যেটে প্রমুখের নাটক ও কাব্য। এইসূত্রে তিনি 'কসমোপলিটান' অথবা ইউরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সংযুক্ত থেকেছেন। দেশান্তরে পালিয়ে গিয়ে যেমন ডাঙার মাছ হননি, দেশে আটক থেকেও তেমনি কুয়োর ব্যাং হননি। তা বলে তিনি কারও চেয়ে কম রাশিয়ান নন। মূল তাঁর রাশিয়ার মাটিতেই। যদিও সর্বাঙ্গে তাঁর ইউরোপের মূলস্রোত। লেনিন ও গোর্কির রাশিয়ায় এটা নিন্দনীয় ছিল না। হল স্টালিন ও জদানভের রাশিয়ায়।

স্টালিনের দিক থেকেও যথেষ্ট বলবার আছে। লেনিন, ট্রটস্কি প্রমুখের বিশ্বাস ছিল যে, ইউরোপের অপরাপর দেশে বিপ্লব ঘটলেই তার ফলে রুশবিপ্লব দৃঢ়মূল হবে। কিন্তু আট-দশ বছর অপেক্ষা করেও দেখা গেল তার সম্ভাবনা নেই। তাহলে রুশবিপ্লব সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় কী করে? একা রাশিয়া কতদূর যাবে? চারদিকেই যে শত্রু। ক্রেমলিনে তখন বড়োরকম একটা পরিবর্তন হয়। তার ফল হয় সুদূরপ্রসারী। সবাইকে ও সব কিছুকে মোবিলাইজ করা হয়। জীবনের কোনো বিভাগকে, সমাজের কোনো অংশকে বাদ দেওয়া হয় না। কাব্যকেও না, কবিকেও না। বিপ্লবকে তো মেনে নিয়েছি, এই বলে নিস্তার পাবেন ভেবেছেন? ভবি ভোলবার নয়। লিখতে যখন জানেন তখন লিখতে হবে কলকারখানা, লোহালক্কড়, যন্ত্রপাতির উপর। তা আপনার ভালো লাগুক আর না-ই লাগুক। তা আপনি বুঝুন আর না-ই বুঝুন। আপনি হয়তো হৃদয়প্রধান কবি কিংবা দর্শনেন্দ্রিয়প্রধান কিংবা শ্রবণেন্দ্রিয়প্রধান। আপনি হয়তো মস্তিষ্কচর্চা করেন না, পাছে আপনার কবিতা নীরস হয়। তা বলে আপনার ওজর-আপত্তি শুনব না। আপনাকে মার্কসীয় ডায়ালেকটিকস আয়ত্ত করতেই হবে। অন্তত কয়েকটা পড়ে পাওয়া বুকনি। আপনাকে মাফ করতে বলছেন? উঁহু। একজনকে মাফ করলে আরেক জনকে মাফ করতে হয়, এক এক করে সবাইকে মাফ করতে হয়। আপনি যিনিই হন-না কেন, যত বড়োই হন-না কেন, আপনার ছাড় নেই।

গোর্কি ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। কিন্তু শেষের দিকে অসহায় ও অসুখী। স্টিমরোলার তাঁকেও গুঁড়িয়ে দিয়ে যায়। অন্যে পরে কা কথা? কবিদের গোষ্ঠীগুলি একে একে ভেঙে যায়। রকমারি 'ইজম' গিয়ে একটিতে ঠেকে। কমিউনিজম। দল উপদল গিয়ে একটিতে বিলীন হয়। রাশিয়ান প্রোলিটারিয়ান রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন। পরে রাইটার্স ইউনিয়ন। কর্মকর্তাদের নেপথ্যে বড়োকর্তা। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। স্টালিন কিন্তু সত্যিই দয়ালু ছিলেন। পাস্তেরনাক যদিও লিখতে ভুলে গেছেন তবু তাঁকে ডেলিগেশনে প্রতিনিধির মর্যাদা দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হল প্যারিসে—অ্যান্টিফ্যাসিস্ট রাইটার্স কংগ্রেসে। মাথা গোঁজবার একটা ঠাঁইও দেওয়া হল মস্কোর অদূরে লেখকদের উপনিবেশে। কিন্তু পাস্তেরনাকও আরেক ভবি। ভবি ভোলবার নয়। মার্শাল তুখাচভস্কি প্রমুখের প্রাণদন্ডের সমর্থন করে এক ইস্তাহার সই করতে যখন পাস্তেরনাককে বলা হল তিনি সই করলেন না। সে-সময় অর্থাৎ ১৯৩৭ সালে গোর্কিও বেঁচে নেই যে তাঁকে রক্ষা করবেন। সে-বছর আর তার পরের বছর বহু লোককে কোতল করা হয়। তাঁদের মধ্যে লেখকও ছিলেন বড়ো কম না—পাস্তেরনাকের বন্ধুও। বহু লেখক আত্মহত্যা করেন, বিলুপ্ত হয়ে যান।

যেখানে প্রাণে বেঁচে থাকাই দায় সেখানে আত্মাকে বাঁচিয়ে রাখা আরও কত কঠিন! পাস্তেরনাক প্রাণেও বাঁচলেন, আত্মাকেও বাঁচালেন, আফিনোগেনোভ বলে একজন তরুণ নাট্যকারকে পক্ষপুটে আশ্রয়ও দিলেন। স্টালিন দয়ালু না হলে কি সম্ভব হত এসব? কিন্তু যাঁর প্রতি দয়ালু তিনি একজন সত্যাগ্রহী। শুধু তা-ই নয়, তিনি যে কত বড়ো একজন কবি তা ১৯২৯ সালে প্রকাশিত চতুর্দশ সংস্করণ *এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা* খুললে প্রমাণ হবে। লিখেছেন প্রিন্স মিরস্কি—

> Boris Pasternak (born-1891), unquestionably the greatest living Russian poet (principal book of lyrics, *My Sister, Life*, written 1917, published 1922) is externally connected with some aspects of Futurism, but in substance he is nearer to the traditions of Tyutchev and Fet. His poetry is marked by an absolute freshness of perception and combined with a tensity of lyrical emotion that is to sic found only in the greatest. His prose (*Tales*, 1925) is also of the highest order, and being concerned with the realities of the soul stands apart from that of his contemporaries. Russian Language and Literature, (*Encyclopaedia Britannica*, 14th Edition, Vol. 19, p. 757)

প্রিন্স মিরস্কি যখন এই নিবন্ধ লেখেন মায়াকোভস্কি তখনও জীবিত। মিরস্কি তাঁকে প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান দেননি। দ্বিতীয় স্থান দিয়েছেন মারিনা স্বেতায়েভা (Marina Tsvetayeva)-কে।

পাস্তেরনাকের এই পোজিশন তাঁর স্বদেশের বিপ্লবী সমালোচক মহল মেনে নেননি। যে কবিতা প্রত্যক্ষভাবে সমাজের বা রাষ্ট্রের পরিবর্তন সাধনের কাজে লাগে না, যার ফিউচারিজম শুধুমাত্র সাহিত্যে নিবদ্ধ, তা নিয়ে তাঁরা করবেন কী? সত্যি, সমাজের বা রাষ্ট্রের প্রয়োজনের কথা ভেবে পাস্তেরনাক কবিতা লিখতেন না। তাঁর ভাবনা ব্যক্তির জন্যে, সত্যের জন্যে, রূপের জন্যে, রসের জন্যে, উক্তির জন্যে, জীবনের জন্যে, জীবনের তাৎপর্যের জন্যে। তাঁর ইতিহাসবোধ প্রখর। ইতিহাসকে তিনি অবহেলা করতে চান না। কিন্তু কাব্য যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তা নিয়ে তিনি করবেন কী? দেশের কর্তাদের সঙ্গে, সমালোচকদের সঙ্গে, সবাক সাধারণের সঙ্গে এই নিয়ে তাঁর গুরুতর মতভেদ। বছর খানেক ইনসমনিয়ায় ভুগে তাঁর মানসিক অসুখের পূর্বলক্ষণ দেখা দেয় ১৯৩৫ সালে। তাঁর সতীর্থদের মধ্যে কত লোক যে আত্মহত্যা করেন, কত লোক নিহত বা বিলুপ্ত হন, কত লোক নির্বাসনে যান! প্রতিভাময়ী মহিলা কবি মারিনা স্বেতায়েভা ১৯২২ থেকে ১৯৩৯ অবধি বিদেশে ছিন্নমূল ছিলেন। দেশের মাটিতে মূল ফিরে পাবার আশায় যেই-না ফিরেছেন অমনি বেচারির স্বামীকে ধরে নিয়ে গিয়ে বধ করা হল পুরাতন প্রতিবিপ্লবী বলে। পুত্রকে পাঠিয়ে দেওয়া হল যুদ্ধক্ষেত্রে, সেখানে তারও প্রাণবিয়োগ হল। কন্যাকেও গ্রেপ্তার করে কোথায় চালান দেওয়া হল। মারিনাকে বলা হল এক মফসসল শহরে থাকতে, সেখানে তিনি একটা ঝি-গিরিও জোটাতে পারলেন না। অগত্যা উদ্বন্ধনে বিদায় নিলেন দেশের কাছ থেকে ১৯৪১ সালে।

যারা হেরে গেল, হারিয়ে গেল, বোবা হল, ভেঙে পড়ল, বেঁচে থেকেও মরে রইল তাদের কথা কি কেউ কোনোদিন শুনবে না? কে শোনাবে? কার কত সাহস? কণ্ঠরুদ্ধের কণ্ঠস্বর হবে কে? পাস্তেরনাক। আর তো কাউকে এগিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে না। তা হলে কি মৌনভঙ্গ করতে হবে? পাস্তেরনাক সময় নিলেন। গোটা চতুর্থ দশকটাই অতীত হল। 'ডাক্তার জিভাগো' শুরু করতে তাঁর ত্বরা ছিল না। তিনি কবি। উপন্যাস তো তাঁর মিডিয়াম নয়।

অথচ শুরু না করে তাঁর শান্তি ছিল না। ভিতরে অসহ্য যন্ত্রণা। বিশ বছর ধরে যা জমেছে তাকে ঢেলে দিতে হবে সাহিত্যের আধারে। সে-আধার কাব্য নয়, উপন্যাস। তাহলেই তাঁর বেদনামুক্তি। নইলে নয়। স্টালিন তখনও বেঁচে। আরও কতকাল বাঁচবেন কে জানে! প্রকাশের আশা নেই। তবু লিখতেই হবে। লেখাটাই প্রকাশ। বই লেখার মাঝখানে স্টালিনের মৃত্যু। সাহিত্যে 'তুষারদ্রব'। বছর কয়েক পরে তার ফলে নতুন লেখক দুদিনতসোভের *কেবল রুটি দিয়ে নয়* বেরিয়ে গেল। পুরোনো লেখক পাস্তেরনাকের *ডাক্তার জিভাগো* বেরোবে না? পাণ্ডুলিপি পাঠানো হল *নোভি মির* পত্রিকায়। পত্রিকায় প্রকাশিত হলে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা সহজ হবে। তখন ১৯৫৬ সাল।

'নোভি মির' পাণ্ডুলিপি ফিরিয়ে দেন সংশোধনের জন্যে। কয়েকটি জায়গায় তাঁদের আপত্তি ছিল। আপত্তির পক্ষে তাঁরা যুক্তি দিয়েছিলেন। পাস্তেরনাককে তাঁরা অশ্রদ্ধা দেখাননি। সরাসরি প্রত্যাখ্যান তাঁদের উদ্দেশ্য নয়। এরপরেও পাস্তেরনাকের কবিতা তাঁরা প্রকাশ করেন। শত্রুতা থাকলে এটা সম্ভব হত না। বস্তুত *ডাক্তার জিভাগো* লিখতে গিয়ে লেখক হাতে রেখে বলেননি, রেখে ঢেকে বলেননি, মন রাখা কথা বলেননি। তা যদি করতেন তাহলে তাঁর বেদনামুক্তি ঘটত না, তিনি শান্তি পেতেন না। তাঁর জীবনের সত্য তিনি কতকাল গোপন রাখতেন! বয়স তো হল গিয়ে ছেষট্টি। আর কদ্দিন বাঁচবেন যে বুকে চেপে রাখবেন! পাস্তেরনাক বরাবর স্পষ্টবাদী। তার একটা পুরাতন নমুনা দিচ্ছি :

> ....In time to come, I tell them, we'll be equal
> to any living now. If cripples, then
> no matter, we shall just have been run over
> by 'New Man' in the waggon of his 'plan'.
> And when from death the tablet doesn't save us,
> then time will hurry on more freely still

to that far point, where 'Five year plan' the second
prolongs the dissertations of the soul.
Don't kill yourselves, don't grieve. I'll still be with you
that day; by all my weaknesses, I swear.
And the strong men are promised their survival
from the worst plagues that have subdued us here.

(Second Birth translated by J.M. Cohen,
Pasternak, Prose and Poems, Benn, P. 310)

ডাক্তার জিভাগো একটি দুর্বল মানুষকে নিয়ে লেখা। কিন্তু লিখেছেন যিনি তিনি বলবান পুরুষ। কায়ে-মনে-আত্মায় তিনি মহামারি অতিক্রম করেছেন। কিছুতেই তাঁকে দুর্বল করতে পারেনি, দমাতে পারেনি। হতাশ করতেও পারেনি। তিক্ত করতেও না।

২

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির হঠাৎ পরিবর্তন না হলে, 'তুষারদ্রব' বন্ধ না হলে রাশিয়াতেই হয়তো *ডাক্তার জিভাগো* প্রথম দিনের আলো দেখত। পাস্তেরনাক তো আন্তর্জাতিক ব্যাপারে ওয়াকিবহাল নন, তিনি ইতিমধ্যে ইটালীয় সংস্করণের অনুমতি দিয়ে ফেলেছেন। ইটালীয় প্রকাশক তাঁর অধিকার ছাড়বেন কেন? রুশ কর্তাদের নিষেধ অগ্রাহ্য করে তিনি ও-বই প্রকাশ করলেন। অমনি ইউরোপে আমেরিকায় এশিয়ায় আফ্রিকায় অস্ট্রেলিয়ায় পাস্তেরনাকের অন্তর উদ্‌ঘাটিত হল। হল না কেবল তাঁর নিজের দেশে। টলস্টয়ের বরাতেও এরকম ঘটেছিল। তাঁর বই জারশাসিত রাশিয়ায় স্বভাষায় প্রকাশ করতে দেওয়া হল না। প্যারিসে ছাপা হল ফরাসি ভাষায়। জার কিন্তু তাঁর গায়ে হাত দিতে সাহস পাননি। আরও একবার এরকম ঘটে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায়। পিলনিয়াকের *মেহগ্নি* রাশিয়ায় প্রকাশ করা বারণ হল। তখন ছাপা হল বার্লিনে। তাঁকে রাইটার্স ইউনিয়ন থেকে বহিষ্কার করা হয়। আট বছর পরে ১৯৩৭ সালের 'পার্জ'-এ তিনি বিলুপ্ত হন। শোনা যায় তাঁকে গুলি করা হয়।

ডাক্তার জিভাগো বিদেশে প্রকাশিত হওয়ায় পাস্তেরনাকের দশা হল শোচনীয়। দেশের লোক তো বিমুখ হলই, বিদেশের লোকও এমনভাবে তাঁকে মাথায় করে নাচতে লাগল যেন তিনি দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ। তা দেখে তিনি সম্ভবত ভগবানকে প্রার্থনা করতে লাগলেন, 'হে প্রভু, আমার বন্ধুদের হাত থেকে আমাকে বাঁচাও।' এইসব অতি প্রশংসকদের মনোগত অভিপ্রায় পাস্তেরনাককে বড়ো করা নয়, সোভিয়েত রাশিয়াকে ছোটো করা। রুশবিরোধী প্রচারকার্যের হাতল হল পাস্তেরনাকের নামঞ্জুর উপন্যাস। যেন আর কোনো দেশে আর কোনো পত্রিকার দ্বারা আর কারও উপন্যাসাদি নামঞ্জুর হয়নি। জেমস জয়েসের *ইউলিসিস*, ডি এইচ লরেন্সের *লেডি চ্যাটার্লিস লাভার* দূরের কথা, মহাত্মা গান্ধীর *হিন্দ স্বরাজ* ও রবীন্দ্রনাথের *রাশিয়ার চিঠি*-র ইংরেজি সংস্করণ এককালে নিষিদ্ধ ছিল। শুনলে হাসি পাবে ফরস্টারের *এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া* ভারতে আসতে দেওয়া হত না গোড়ার দিকে। অপরপক্ষে সোভিয়েত রাশিয়ায় স্বয়ং ডস্টইয়েভস্কির অধিকাংশ গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ বন্ধ ছিল। এই সম্প্রতি তাঁর বরাত ফিরেছে। শোলোকোভের ১৯২৮ সালে প্রকাশিত 'শান্ত বহে ডন' উপন্যাসকেও পরে শোধন করা হয়। পাস্তেরনাকের বই নিয়ে যে কলরব চলল তাতে অদ্ভুত সব অত্যুক্তি ছিল। এ বই নাকি টলস্টয়ের *সমর ও শান্তি*-র সমপর্যায়ের ও একই ঐতিহ্যের। কিন্তু সবচেয়ে মজার কথা পাস্তেরনাককে মনে করা হল বিপ্লববিরোধী। তাই যদি তিনি হতেন তবে বুনিনের মতো, স্বেতায়েভার মতো দেশান্তরি হলেন না কেন? বরং বিপ্লবের দিনেই তাঁর কবিতার হাত খুলে গেছে। বিপ্লব না ঘটলে তাঁর জীবনও একঘেয়ে হত। তাঁর দৃষ্টিও কি খুলত! তা বলে বিপ্লবী বা বিপ্লববাদী তিনি ছিলেন না। তিনি ব্যক্তিত্ববাদী এবং সেই কারণে আজ্ঞাবহ লেখক হতে নারাজ। বিরোধটা পলিটিকাল নয়। তাঁর দেশের লোকও তাঁকে ভুল বুঝল। ঘরের শত্রু বিভীষণ বলে তাঁর নিন্দাবাদ চলল। তাতেও তাঁর ক্ষতি হত না। কারণ

তিনি চেনা বামুন। কিন্তু যাঁরা এতকাল তাঁকে নোবেল প্রাইজের উপযুক্ত বলে গণ্য করেননি, করেছেন বহু অখ্যাতনামাকে, তাঁরা অকস্মাৎ তাঁকে স্মরণ করলেন। আগুনে ঘি পড়লে যা হয়। পাস্তেরনাককে তো রাইটার্স ইউনিয়ন থেকে বিতাড়ন করা হলই। বলা হল, 'যান, যান, প্রাইজ নিন গিয়ে। কিন্তু আর ফিরে আসতে হবে না সোভিয়েত ইউনিয়নে।'

লেখক পুরস্কারের জন্যে বই লেখে না। লেখে অন্তরের সত্যকে বাইরে আনতে। কেউ যদি বিনা শর্তে পুরস্কার দেয় নিতে আপত্তি নেই। কিন্তু যে-কালে ও যে-অনুষঙ্গে পাস্তেরনাককে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয় সে-কালে ও সে-অনুষঙ্গে প্রাইজ নেওয়ার অর্থ হত পাস্তেরনাক তাঁর দেশের মুখে কালি মাখিয়েছেন বলেই তাঁকে পৌনে দু-লাখ টাকা বকশিশ দেওয়া হল। শত্রুরা তো অমন কথা বলতই, তথাকথিত মিত্ররাও বলত। কবি পাস্তেরনাকের অসামান্য কীর্তির খবর তারা রাখে না, রাখলে অনেক আগেই তাঁকে নোবেল প্রাইজ দেবার কথা তুলত। তাহলে তাতে রাশিয়ারও সম্মান বাড়ত, শুধু পাস্তেরনাকের নয়। কিন্তু ঔপন্যাসিক পাস্তেরনাক আলো-ছায়া মিলিয়ে যে আলেখ্য এঁকেছেন তাঁর দরুন তাঁকে রাতারাতি এই যে সম্মান দেওয়া এটা তো সেই ছায়ার জন্যেই, যে ছায়া রাশিয়ার মুখে পড়েছে। তাই পাস্তেরনাকের সম্মান রাশিয়ার সম্মান নয়। পাস্তেরনাক পুরস্কৃত হলে রাশিয়া তিরস্কৃত হয়।

পাস্তেরনাক মৌন হতে হতে মুনি হয়ে গেছেন। শোলোকোভের ভাষায় 'মুনি কর্কট'। তা ছাড়া পুরস্কার, নামডাক ও প্রকাশ্য আরতিকে পাস্তেরনাক চিরকাল পরিহার করে এসেছেন। তাঁর কবিতার বই যখন তাঁর স্বদেশে বার বার বিভিন্ন সংস্করণে প্রকাশিত হয়ে হাতে হাতে ঘুরছে তখন স্টালিন একবার ফতোয়া দেন যে বিপ্লবোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন ও রয়েছেন মায়াকোভস্কি। স্টালিনকে ব্যক্তিগতভাবে চিঠি লিখে ধন্যবাদ দেন পাস্তেরনাক। কেন? তাঁর আত্মপ্রসঙ্গ থেকে তুলে দিচ্ছি এর উত্তর :

> ...for it protected me from the inflation of my role ; this began about the time of the Writers' Congress in the middle 'thirties'. I am satisfied with my life and fond of it. I like it as it is, without any extra gold leaf. Nothing is further from my mind than a life stripped of privacy and anonymity and displayed in the glass glitter of a showcase. (*An Essay in Autobiography*, tr. by Manya Harari, Collins and Harvill, p. 119).

এই প্রবন্ধ লেখা হয় *ডাক্তার জিভাগো* শেষ করে প্রস্তাবিত কাব্যসংকলনের ভূমিকারূপে। তখন কি তিনি জানতেন যে তাঁর উপন্যাস বিদেশে প্রকাশিত হয়ে নোবেল প্রাইজ টেনে আনবে, আর সেইসঙ্গে 'অতিরিক্ত সোনার পাত'? ও-আপদ প্রত্যাখ্যান করেই তিনি তাঁর জীবনের প্রাইভেসি ও অজ্ঞাতনামীয়তা রক্ষা করলেন বা করতে চেষ্টা করলেন।

উক্ত প্রবন্ধে *ডাক্তার জিভাগো*-র উল্লেখ করে তিনি বলেছেন সারা জীবন ধরে তিনি যত কবিতা লিখেছেন সমস্তই তাঁর এই উপন্যাসটির অভিমুখে পদযাত্রা ও প্রস্তুতি। অনেকে মনে করেন উপন্যাসের নায়ক স্বয়ং পাস্তেরনাক। সেটা ভুল ধারণা। তাঁর জীবনের তথ্য তিনি যেটুকু খুলে দেখাবার সেটুকু খুলে দেখিয়েছেন উপরোক্ত প্রবন্ধে ও *নিরাপদ অতিক্রমণ* নামে পুরাতন আত্মজীবনীতে। এই উপন্যাসে বিধৃত সত্য তাঁর জীবনের তথ্য নয়, জীবনের সত্য। এও একখানি *জীবন, বোন আমার*। তারই সম্প্রসারিত, সমাপিত, সুপরিণত, সংস্কৃতরূপ।

> My sister, life's in flood to-day, she's broken
> her waves over us all in the spring rain,
> but people with cheap watchchains go on grumbling
> and, like snakes in the grass, politely sting.
> The older folk. of course, have got their reasons,
> but really your reason's quite absurd,

for in the thunder eyes and lawns are lilac
and the horizon smells of reseda.
For when it's May, and in the railway carriage
you read timetables on a local track,
they are far grandeur than the holy scriptures
or coachseats that the dust and storms made black...

(*My sister, Life*, tr. J M Cohen. *Pasternak, Prose and Poems*, Benn, p. 260)

ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের অল্পকাল পরে লেখা কবিতায় বিপ্লবকে প্লাবনকে বিনা কারণেই বরণ করে নেওয়া হয়েছে। ঝড়কে, বিদ্যুৎকে সৌন্দর্যের সঙ্গে, সৌরভের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। শাস্ত্রের চেয়ে বড়ো হয়েছে যাত্রাপথের টাইমটেবিল। পাস্তেরনাক প্রচারক নন, কবি। তাঁর লেখনী একইসঙ্গে ছবি আঁকে, গান করে; তাঁর উক্তিগুলি তির্যক ও প্রতীকময়। তাঁর কাব্যরচনার পদ্ধতি নিয়ে তাঁর নিজের মত তুলে দিচ্ছি :

...my concern has always been for meaning, and my dream that every peom should have content in itself—a new thought or a new image. And that the whole of it with all its individual character should be engraved so deeply into the book that it should speak from it with all the silence and all the colours of its colourless black print...I was concerned neither with myself nor with my readers nor with the theory of art. All I cared about was that one poem should contain the town of Venice, and the other the Brest...railway station.

(*An Essay in Autobiography*, ibid, p. 81)

পাস্তেরনাক অতি যত্নে তাঁর স্বধর্ম রক্ষা করে এসেছেন। বিপ্লবে, দুর্ভিক্ষে, পরিকল্পিত শিল্পায়নে, কালেকটিভাইজেশনে, মহাযুদ্ধে আর শীতল যুদ্ধে তিনি যেমন প্রকৃতির ওপর লক্ষ রেখেছেন, যেমন ইতিহাসের ওপর, তেমনি তাঁর স্বধর্মের ওপর। দেশান্তরি হবার কথা দুঃখের দিনেও ভাবেননি। পুরস্কার ও ঢক্কানিনাদের জন্যে দেশত্যাগ করবেন? যাদের তিনি কোনো অবস্থায় ছেড়ে যাননি সেইসব পরাজিত, দুর্বল, অসহায় মানুষকে ছেড়ে যাবেন প্রাইজের লোভে? কত লোক নৈতিক বল পাচ্ছে তাঁর নৈতিক বল থেকে। তাদের তিনি পথে বসিয়ে যাবেন? পাস্তেরনাক তা পারেন না। তাই নোবেল প্রাইজ প্রত্যাখ্যান করতে হল। অভদ্রতা? না। ত্যাগ। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ত্যাগ।

পাস্তেরনাকের জীবন ত্যাগে ত্যাগে জর্জর। সংগীত ত্যাগ, দর্শনশাস্ত্র ত্যাগ, মনের মতো জীবিকা ত্যাগ তাঁর প্রথম যৌবনেই ঘটে। কবিতাকে বরণ করে নেবার পর যখন মায়াকোভস্কির সঙ্গে আলাপ হয় তার বছর খানেক পরে তাঁর মনে হল তাঁর কবিপ্রতিভা নেই, যেমন মায়াকোভস্কির আছে। তখন সাহিত্য ত্যাগের কথাও তিনি ভাবেন। কিছু-একটা ছাড়তেই হবে, না ছেড়ে পরিত্রাণ নেই, তাঁকে পেয়ে বসে এই নেশায়। শেষে তিনি স্থির করেন রোমান্টিক ধারা ত্যাগ করবেন। *নিরাপদ অতিক্রমণ* নামে তাঁর চল্লিশ বছর বয়সে লেখা আত্মজীবনী থেকে নীচেরটুকু উদ্ধৃত হল।

But a whole conception of life lay concealed under the Romantic manner which I was to deny myself from henceforth. This was the conception of life as the life of the poet. It had come down to us from the Symbolists and had been adapted by them from the Romantics principally the Germans. This conception had influenced Blok but only during a short period. It was incapable of satisfying him in the form in which it came naturally to him. He could either heighten it or abandon it altogether. He abandoned the

conception. Mayakovsky and Esenin heightened it. In the poet who imagines himself the measure of life and pays for this with his life, the Romantic conception manifests itself brilliantly and irrefutably in his symbolism, that is in everything which touches upon Orphism and Christianity imaginatively. In this sense something inscrutable was incarnate both in the life of Mayakovsky and in the fate of Esenin, which defies all epithets, demanding self-destruction and passing into myth....When 'My Sister, Life' appeared, and was found to contain expressions not in the least contemporary as regards poetry, which were revealed to me during the summer of the Revolution, I became entirely indifferent as to the identity of the power which had brought the book into being because it was immeasurably greater than myself and than the poetical conceptions surrounding me. (*Safe, Conduct*, tr. by Beatrice Scott, *Pasternak*, *Prose & Poems*, Benn, p. 110)

এখন মনে হয় পাস্তেরনাক মায়াকোভস্কি ও এসেনিনের অনুসৃত পন্থা ত্যাগ করেছিলেন বলেই তাঁর নিয়তি অন্যরূপ হল। ত্যাগ যাকে বলা হয় সেও একপ্রকার মনোনয়ন। আপন নিয়তি মনোনয়ন। পাস্তেরনাক ত্যাগ করতে করতেই তাঁর নিয়তি মনোনয়ন করে নিয়েছেন। নোবেল পুরস্কার ত্যাগও এইরকম এক নিয়তি মনোনয়ন।

অসাধারণ ত্যাগ ও বিজ্ঞতা ভিন্ন কেউ ঝড়ঝঞ্ঝা কাটিয়ে নিরাপদ অতিক্রমণ করতে পারে না। কোনোমতে প্রাণে বাঁচার জন্যে অবশ্য অত বড়ো প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই। আপোশ করলে, হুকুম মেনে চললে, পাখির মতো পড়লে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয় না। কিন্তু আত্মা বাঁচে না। পাস্তেরনাকের মধ্যে রাশিয়ার আত্মা বেঁচে আছে।

বিপ্লবের পর থেকে এই কথাই আমার মনে হয়েছে যে সমগ্র রাশিয়ায় একটিমাত্র সুর আছে, সে-সুর শতকণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে, সে ছাড়া দ্বিতীয় কোনো সুর নেই। টলস্টয়ের নদী মরুপথে ধারা হারিয়েছে। যেমন সে দেশের জীবনে তেমনি সেদেশের সাহিত্যে। পাস্তেরনাকের রচনা আমার সে-ভুল ভেঙে দিয়েছে। তিনি যে ঠিক টলস্টয়-ঐতিহ্যের অনুবর্তী এমন কথা বলব না। কবি পাস্তেরনাকের ওপর টলস্টয়ের প্রভাব পড়ার কথা নয়। মিরস্কি লক্ষ করেছেন ত্যুচভ ও ফেত নামক ঊনবিংশ শতাব্দীর দুই পূর্ববর্তীর প্রভাব, অন্যেরা করেছেন রিলকের। দুই-ই যথার্থ। টলস্টয়ের প্রভাব পড়ে থাকতে পারে কবির ওপরে নয়, কাহিনিকারের ওপরে হয়তো, মানুষের ওপরে নিশ্চয়। মানুষ পাস্তেরনাক মানুষ টলস্টয়ের ধারাবাহী। সত্যনির্ণয়ের জন্যে, সত্যকথনের জন্যে, সত্য করে বাঁচার জন্যে, সত্যের দ্বারা বাঁচার জন্যে তাঁর মধ্যে ছিল টলস্টয়ের মতো ব্যাকুলতা। তাই তিনি কোনো ত্যাগকেই অত্যধিক মনে করেননি। সেই যে মৌনব্রত সেও কত বড়ো একটা ত্যাগ! কী বেদনাদায়ক!

পদ্মকান্ত ত্রিপাঠীকে পাস্তেরনাক বলেন, 'তুমি হয়তো জান না যে, ৩৩ সনেও আমার কবিতা মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য ছিল। রুশ ভাষার প্রফেসাররা আমাকে মহান কবি ভেবে বসেছিলেন এবং আমার এক-একটি কবিতার চার-চারটি মানে তাঁরা করতেন। কিন্তু অকস্মাৎ এই প্রফেসাররা ঘোষণা করলেন যে, আমি জনগণ থেকে দূরে সরে গেছি, আমি অহংবাদী, 'আমি সিম্বলিস্ট'। বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রভাব এখনও নাকি আমার ভিতরে বিদ্যমান। একটি কাগজ লিখল, আমি এমন কবিতা লিখি, যা শুধুমাত্র আমিই বুঝতে পারি। এবং তারপর....'

'তারপর!'

'এবং তারপর আমি আর কবি থাকলাম না। শুধু এটুকু নয়, আমি কখনো কবি ছিলামই না।' (I no more remained poet, not only that, I never existed as a poet.)

'তারপর আপনি কী করলেন?'

‘কিছুই করলাম না। লেখা ছেড়ে দিলাম। তারপর আমি লেখকই থাকলাম না। লেখক সংঘ (রাইটার্স ইউনিয়ন) আমাকে একটা খুব বড়ো কাজের দায়িত্ব দিলেন। বাকুর তৈল মজদুর সম্বন্ধ কিছু লেখার। এই কাজ করতে পারলাম না কেন? কারণ, আমি বাকুর সঙ্গে পরিচিত ছিলাম, মজদুরের সম্বন্ধেও জানতাম, কিন্তু লিখতে ভুলে গিয়েছিলাম। আমি বললাম আমি লেখার শক্তি হারিয়ে ফেলেছি। লেখকসংঘ কৃপাপূর্বক এটা মেনে নেয় এবং আমাকে পচা ডিমের মতো একদিকে ছুড়ে ফেলে দেয়। মহান স্টালিন দয়ালু ছিলেন। তিনি আমাকে জেলে পাঠাননি....’

পাস্তেরনাক আবার যেন বিগত স্মৃতিতে ফিরে গেলেন। অনেকক্ষণ তিনি চুপ করে রইলেন। আমি নতুন সিগারেট ধরিয়ে নিলাম। অকস্মাৎ নিজেই বলে উঠলেন, ‘পঁচিশ বছর ধরে না লেখার অর্থ বোঝ? কখনো কখনো মনে হয় আমি একজন ফুটবল খেলোয়াড়। কিন্তু আমার ডান পা-র একটা নাড়ি ছিঁড়ে গেছে। ‘‘কিক’’ মারার জন্যে পা আর ওঠে না। পঁচিশ বছর ধরে আমি অন্যান্যদের খেলা দেখে আসছি। যে ছোটো ছোটো বাচ্চারা পা ওঠাতে জানত না, তারা নামকরা খেলোয়াড় হয়ে উঠল। যশ, অর্থ, রাজ্যাশ্রয়—সবই ছিল ওদের কাছে। তারপর আমার পা-ও ঠিক হয়ে উঠল, কিন্তু মাঠে আর নামতে পারলাম না।’

‘কেন?’

‘কারণ তখন খেলার নিয়মকানুন বদলে গেছে। এবং ওই নিয়মগুলো থাকতে আমি খেলোয়াড় থাকা পছন্দ করলাম না। যশ, অর্থ, গৌরব কিছুই পাব না জেনেও।’

(*পাস্তেরনাকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার,* পদ্মকান্ত ত্রিপাঠী, *দেশ* ২৮ নভেম্বর ১৯৫৯)

কী করুণ! অথচ কী বীরত্বব্যঞ্জক! পাস্তেরনাক আত্মিক বলে বলীয়ান ছিলেন। নইলে খেলা ছেড়ে থাকতে পারতেন না। যেকোনো শর্তে খেলতেন। অন্তত লুকিয়ে লুকিয়ে লিখতেন। তাও তিনি করবেন না। যখন বলেছেন যে তিনি লিখতে ভুলে গেছেন, লেখার শক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছেন, তখন তাঁকে মৌলিক রচনায় সত্য করে ক্ষান্তি দিতেই হবে। নইলে কথা উঠবে যে তিনি লিখতে জেনেও লিখছেন না, রাষ্ট্রের আদেশ লঙ্ঘন করেছেন। সোভিয়েট রাশিয়ায় কার ঘাড়ে দুটো মাথা যে ক্ষমতা থাকতে আদেশ অমান্য করবে! সুতরাং সত্যের খাতিরে তাঁকে অক্ষম হতে হল। অক্ষম সাজতে নয়, সত্যি সত্যি অক্ষম হতে।

কিন্তু এই তাঁর জীবনের মহত্তম ত্যাগ নয়। আমার কাছে যথেষ্ট প্রমাণ নেই, তবু আমার মনে হয় এর চাইতেও মহৎ, এর চাইতেও করুণ ত্যাগ ১৯২৩ সালে ঘটে। যখন তিনি বার্লিন থেকে মস্কো ফিরে আসেন। আত্মীয়স্বজন তো ফিরলেন না, ফিরবেনও না। বিপ্লবকে তাঁরা বিশ্বাস করেন না। তাঁদের কাছে ওটা নিতান্তই একটা উৎপাত। পাস্তেরনাকের কাছে ওটা একটা নৈসর্গিক ঘটনা। আপনার লোকের সঙ্গে এই যে বিচ্ছেদ, এই যে বিচ্ছেদজাত নিঃসঙ্গতা, রাশিয়ায় ফিরে এর ক্ষতিপূরণ কি কোনোদিন হয়েছে? আমার ধারণা এই বিচ্ছেদই সাত-আট বছর পরে বিবাহবিচ্ছেদে পর্যবসিত হয়। মস্কো শহরে তাঁর দ্বিতীয় পত্নীর ও তাঁর মাথা রাখবার জায়গা থাকে না। অতিথি হতে হয় জর্জিয়ার রাজধানী তিফলিস শহরে গিয়ে য়াশাভিলি নামক কবিবন্ধুর। ইনি আত্মহত্যা করেন ১৯৩৭ সালে।

এই যে পারিবারিক বিচ্ছেদ জিভাগো এ যাতনা সইতে পারেনি। পরাজিত হয়েছে। পাস্তেরনাক সয়েছেন, তাই অপরাজিত রয়েছেন। *ডাক্তার জিভাগো* ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়, সব দেশে সব কালে ঝড়ঝঞ্ঝায় যে পাখির বাসা ভেঙে যায়, প্লাবনে যে পাখির আশ্রয়তরু ভেসে যায়, সেই পাখির ট্র্যাজেডি। সমস্তটাই সত্য। প্লাবনও সত্য, তরুও সত্য, পাখিও সত্য, সর্বনাশও সত্য। টলস্টয় ছিলেন সৈনিক তথা দ্রষ্টা। যুদ্ধ করেছেন এবং দেখেছেন। পাস্তেরনাক বিপ্লবী নন। বিপ্লবের সাক্ষী আর ভুক্তভোগী।

কিন্তু ঝড় যত বড়ো সত্য হোক-না কেন সে চিরকাল থাকে না। সে যখন চলে যায় তখন কী হয় তা নিয়ে পাস্তেরনাক তাঁর মৌনভঙ্গের পর একটি কবিতা লিখেছেন। সেটি রুশ ভাষায় অপ্রকাশিত। রঘুবংশীয় আমেরিকান অধ্যাপক ইউজিন কেডেন স্বয়ং পাস্তেরনাকের কাছ থেকে সেটি উপহার পেয়ে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। পুরোটাই উদ্ধার করছি :

The air is heavy with the passing storm.
The earth lies calm and free and glad again.
Through all its pores the flowering lilac bush
Drinks deep the pure cool freshness of the plain.

The world's reborn, transfigured by the storm.
The gutters shed a flood of rain. Now fair
And vast the blue beyond the shrouded sky,
And bright ranges of celestial air.
But more exalted far the poet of power,
Who washes clean the dust and grime away,
When by his art emerge transformed the harsh
Realities and truths of naked day.

Then memories of decades with the storm
Retreat. Free from the past of tutelage,
Our century demands the time has come
To clear a passage for the coming age.
No swift upheaval swelling of itself
Can make the way for our new life to be ;
Our hope—the message of a spirit kindled
By truth revealed and magnanimity.

(tr. Eugene M Kayden, *New Statesman*,
27 December 1958)

পাস্তেরনাক পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার আগে এই প্রত্যয় আপনার ভিতর থেকে পেয়েছেন যে, মৃত্যু যেমন সত্য রিসারেকশনও তেমনি।

সেই অর্থে তিনি খ্রিস্টপন্থী। মৃত্যু আর রিসারেকশনের যে নিত্যলীলা চলেছে বিশ্বের বিশাল রঙ্গমঞ্চে, তাকেই তিনি প্রত্যক্ষ করে গেলেন ইতিহাসের প্রেক্ষাগারে। তাঁর সব দুঃখ-শোক গলে গিয়ে মিশে গেছে এই একটি রসে। *অন্ধ যখন দৃষ্টি পাবে* নামে কী-যেন এক নাটক লিখছিলেন। শেষ করে যেতে পেরেছেন কি না জানিনে। কিন্তু পাবে। পাবে। অন্ধ একদিন দৃষ্টি পাবে। সেদিন আপনি দেখবে, আপনি বুঝবে। আর স্মরণ করবে চক্ষুষ্মানকে। কবরে রেখে আসবে একগুচ্ছ লাইলাক। পাস্তেরনাকেরও রিসারেকশন হবে। তাঁর অন্য একটি কবিতার এই কয় ছত্র তাঁর এপিটাফ বলে গণ্য হবার যোগ্য।

So that he'd master well his life in bondage,
In famine, in defeat, without a fault,
And thus abide a model through the ages,
A man in sturdiness as plain as salt.

(tr. Eugene M Kayden, *New Statesman*
27 December 1958)

যে-দেশে বহু ধর্ম বহু ভাষা

যে-দেশে বহু ধর্ম সেদেশের মূলনীতি কী হওয়া উচিত? এ প্রশ্নের উত্তর পাকিস্তান একভাবে দিয়েছে। ভারত দিয়েছে অন্যভাবে। পাকিস্তানের অধিকাংশের ইচ্ছা অনুসারে স্থির হয়ে গেছে পাকিস্তান হচ্ছে ইসলামি রাষ্ট্র।

সেই যুক্তি অনুসরণ করলে ভারত হতে পারত হিন্দু রাষ্ট্র। কিন্তু ভারত করল অপর একটি যুক্তি অবলম্বন। ভারতের মতে সব ধর্মই সমান, সব ধর্মই সত্য, সংখ্যাগুরুর মুখ চেয়ে একটি ধর্মকেই রাষ্ট্রধর্মে পরিণত করলে আর-সব ধর্মের ওপর অবিচার করা হবে, সুতরাং সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু নির্বিশেষে সর্বোদয়ের বিচারে সকলের প্রতি সমদর্শিতার খাতিরে ভারতকে হতে হবে সেকুলার স্টেট। যে রাষ্ট্র ধর্মের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ।

এই যুক্তি বর্মাও অবলম্বন করেছিল। কিন্তু কী যে দুর্বুদ্ধি হল উ নু এবং তার দলের, তাঁরা সাধারণ নির্বাচনে জিতেই আইন পাশ করিয়ে নিলেন যে বর্মা হবে বৌদ্ধ রাষ্ট্র। অধিকাংশের ইচ্ছায় কর্ম, কে বাধা দেবে? কিন্তু এর পরিণাম হল অশুভ। শান, কারেন প্রভৃতি পার্বত্য জাতির তরফ থেকে দাবি উঠল আংশিক স্বাতন্ত্র্যের। শেষে প্রধান সেনাপতি রাষ্ট্রীয়ক্ষমতা আত্মসাৎ করে শাসনতান্ত্রিক সরকার ধ্বংস করলেন। পাকিস্তানেও তাই হয়েছে। তবে ইসলামি রাষ্ট্র এখনও লোপ পায়নি, যেমন লোপ পেয়েছে বৌদ্ধ রাষ্ট্র। পাকিস্তানি জনগণ যদি কোনো গণতন্ত্রের মর্যাদা বোঝে তাহলে সেইসঙ্গে সেকুলার স্টেটের মর্যাদাও বুঝবে। যেখানে সেকুলার স্টেট নেই সেখানে গণতন্ত্র কেবলমাত্র অধিকাংশের ইচ্ছাসাপেক্ষ নয়, সর্বজনের ইচ্ছানির্ভর। গণতন্ত্রে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক থাকতে পারে না। যারা প্রতিবেশীকে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পর্যবসিত করে তারা ডিক্টেটরের পদানত হবেই। তারা আত্মকর্তৃত্বের যোগ্য নয়। কারণ তারা অপরের সমান অধিকার মানে না।

ভারত সেকুলার স্টেট হয়ে বর্মা ও পাকিস্তানের দশা এড়িয়েছে। সেকুলার স্টেট যতই দৃঢ় হবে গণতন্ত্রও ততই দৃঢ় হবে। অনেকেই এটা হৃদয়ঙ্গম করেছেন, কিন্তু সকলে এখনও করেননি। তাঁরা চান হিন্দু রাষ্ট্র, হলই-বা সেটা ফ্যাসিস্টশাসিত। ইতিহাস এঁদের বাসনা পূর্ণ করলে ভারতেরও দশা হবে পাকিস্তান বা বর্মার মতোই।

এ গেল ধর্মের কথা। ইতিমধ্যে ভাষার প্রশ্ন প্রবল হয়েছে। যেদেশে বহু ভাষা সেদেশের মূলনীতি কী হওয়া উচিত? এর উত্তর বেলজিয়াম ও সুইটজারল্যাণ্ড একভাবে দিয়েছে। ভারত দিয়েছে অন্যভাবে। কার উত্তরটা ঠিক? কারটা বেঠিক?

বেলজিয়াম বলে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৩০ সালে। তার রাষ্ট্রভাষা হয় ফরাসি। দশটা বছর যেতে-না-যেতেই ফ্লেমিশদের দিক থেকে প্রতিবাদ ওঠে। তারাও তো বেলজিয়ান। তবে তাদের ভাষা কেন ফরাসির সমান মর্যাদা পাবে না? দীর্ঘকাল আন্দোলন চালানোর ফলে ১৮৯৮ সালে আইন করে ফরাসি ও ফ্লেমিশ উভয় ভাষাকেই বেলজিয়ামের ন্যাশনাল ভাষারূপে সমান স্থান দেওয়া হয়। এখন সেদেশের রাষ্ট্রভাষা এক নয়, দুই। সরকারি কাজকর্ম দুই ভাষায় চলে।

তেমনি সুইটজারল্যাণ্ডে ১৮৭৪ সালের শাসনতন্ত্রে মেনে নেওয়া হয় যে, তাদের ন্যাশনাল ভাষা হবে জার্মান, ফরাসি ও ইটালিয়ান। বলা বাহুল্য এ তিনটি ভাষা শুধু উপরের দিকের কাজকর্মের ভাষা। নীচের দিকের কাজকর্ম জেলা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় চলে। জেলা স্তরে আরও দুটি ভাষারও অস্তিত্ব আছে। এ ছাড়া সর্বত্র ইংরেজির প্রচলন। সেটা অবশ্য বেসরকারিভাবে। সুইসরা একাধিক ভাষা শিখতে অভ্যস্ত।

একটা দেশের একটাই রাষ্ট্রধর্ম হবে এ ধারণা ইউরোপেও ছিল। তার দরুন প্রচুর রক্তপাত হয়েছে। সংখ্যাগুরুরা সংখ্যালঘুদের জ্বালিয়েছে। আজকাল আর সে-ধারণা নেই। কিন্তু একটা দেশের একটাই

রাষ্ট্রভাষা হবে, এ ধারণা অত্যন্ত ব্যাপক। এর ফলে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে যথেষ্ট অত্যাচার হয়েছে। আলসাস-লোরেনের লোক একবার জার্মানদের হাতে মার খেয়েছে, একবার ফরাসিদের হাতে।

এখন ভারতের কথা বলি। একটা দেশের একটাই রাষ্ট্রধর্ম হবে, এ ধারণা যাঁদের মধ্যে নেই তাঁরাও বিশ্বাস করেন যে, একটা দেশের একটাই রাষ্ট্রভাষা হবে। বেলজিয়ামের চেয়ে, সুইটজারল্যাণ্ডের চেয়ে বহুগুণ বৃহৎ যে-দেশ, যার ভাষাসংখ্যা খুব কম করে ধরলেও চোদ্দো-পনেরোটি, সে দেশ যখন পরাধীন ছিল তখন একটি মাত্র বিদেশি ভাষার দ্বারা একসূত্রে গাঁথা ছিল। তার থেকে একটা সংস্কার জন্মেছে যে রাষ্ট্রভাষা একাধিক হতে পারে না। আমি কিন্তু এই সংস্কারের স্বতঃসিদ্ধতা স্বীকার করিনি। এটার সত্যতা নির্ভর করছে সকলের সম্মতির ওপরে, সুবিধার ওপরে, ন্যায়বোধের ওপরে। অধিকাংশের ভোটের জোরে কোনো একটি ভারতীয় ভাষাকে আর সকলের ওপর চাপালে পাকিস্তানের ইসলামি রাষ্ট্রের মতো একটা অপরিণামদর্শী সমাধান হয়। সেরকম একটা সমাধান যখন বেলজিয়ামে বা সুইটজারল্যাণ্ডে টিকল না তখন ভারতেও টিকতে পারে না। ইতিমধ্যেই তামিলদের জন্যে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের প্রস্তাব উঠেছে। মাত্র পনেরো বছর যেতে-না-যেতেই এই। এখনও তো অর্ধশতাব্দী কাটেনি। ভারত যদি ছত্রভঙ্গ হয় তবে ভাষার ইসুতেই হবে।

হিন্দির পিছনে সকলের সম্মতি নেই। সকলের তাতে সুবিধা হবে না। সকলের ন্যায়বোধ তার দ্বারা চরিতার্থ হবার নয়। তার পক্ষে একটি মাত্র যুক্তি—অধিকাংশ লোক হিন্দি চায়। অর্থাৎ অধিকাংশের ইচ্ছাই চূড়ান্ত। পাকিস্তানে যেমন ধর্মের ব্যাপারে অধিকাংশের ইচ্ছাই চূড়ান্ত, ভারতে তেমনি ভাষার ব্যাপারে অধিকাংশের ইচ্ছাই চূড়ান্ত। এরূপ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকত্বের আশঙ্কা জাগে। এমন কয়েকটি বিষয় আছে যা গায়ের জোরে বা ভোটের জোরে নিষ্পত্তি করা যায় না। ধর্ম তার একটি। ভাষা তার আরেকটি। ধর্মের বেলা আমরা বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছি। ভাষার বেলায়ও কি দিতে পারিনে?

তর্কটা হিন্দি বনাম ইংরেজি নয়। ইংরেজিকে সরানোর পরে ঘোরতর বিবাদ বেঁধে যাবে। তামিলরা হিন্দিকে মানবে না, নাগারা মানবে না, কাশ্মীরিরা মানবে না। বাঙালিরাও মানবে না। এমনই না মানার লক্ষণ চারদিকে। কংগ্রেস থাকতেই এই। কংগ্রেস কি চিরস্থায়ী? পরে যে দলটার হাতে ক্ষমতা পড়বে সে-দল যদি সব ক-টা রাজ্যের আস্থা না পায় তখন হিন্দির প্রতি বিরাগ হবে মানুষকে খেপিয়ে তোলার একটা উপায়। যেমন হিন্দুর ওপর বিরাগ হয়েছিল মুসলমানকে বিভ্রান্ত করার অব্যর্থ উপায়। সেইজন্যে তর্কটা হিন্দি বনাম ইংরেজি নয়। তর্কটা আসলে হচ্ছে হিন্দি বনাম তামিল-বাংলা-পাঞ্জাবি ইত্যাদি। হিন্দি হবে কেন্দ্রীয় সরকারের একমাত্র ভাষা, এর মানে হিন্দি হবে সারা ভারতের একচ্ছত্র ভাষা। যাদের মাতৃভাষা হিন্দি নয় তারা হিন্দি শিখতে গিয়ে দেখবে যে, প্রত্যেকটি হিন্দিভাষী শিশু জন্মত স্টার্ট পেয়ে এগিয়ে রয়েছে। যেমন জন্মত স্টার্ট পেয়ে এগিয়ে থাকত প্রত্যেকটি ইংরেজ শিশু। ইংরেজিকে যারা বিদায় করবে তারা কি ইংরেজির একমাত্র উত্তরাধিকারীকেও একদিন ঘাড় থেকে নামাতে চাইবে না?

হিন্দি যে ইংরেজির একমাত্র উত্তরাধিকারী হবার স্বপ্ন দেখছে, হিন্দি কি বুঝতে পারছে না যে আর সকলের সঙ্গে ভাগ না করে ভোগ করা যায় না? ভাগ করার নমুনা কি এই যে, হিন্দিই হবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ও আর সব আঞ্চলিক ভাষা? সব ক-টা ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করা চাই। সেটা যদি কাজের কথা না হয় তবে এমন একটি ভাষাকে হিন্দির সঙ্গে বন্ধনীভুক্ত করা চাই যার দ্বারা আর সকলের ন্যায়বোধ চরিতার্থ হবে। প্রতিযোগিতার বা পরীক্ষার ভাষা যদি হয় ইংরেজি, তাহলে আমাদের ন্যায়বোধ যতখানি চরিতার্থ হয় হিন্দি হলে ততখানি হয় না। বিদেশি ভাষা বলে ইংরেজিকে হটাতে চাও? বেশ। তার বদলে এমন একটি ভাষাকে হিন্দির সঙ্গে বন্ধনীভুক্ত করো, যে ভাষা আমাদের ন্যায়বোধকে পীড়া দেবে না। সে-ভাষাটি যে কোন ভাষা, অহিন্দিভাষীদের দ্বারাই সেটি স্থির হোক।

আর কোনো ভাষা ভারতের সকল প্রান্তে ইংরেজির মতো ব্যাপকভাবে প্রচলিত নয়, এটা একটা প্রত্যক্ষ সত্য। যেখানে হিন্দি চলে না সেখানেও ইংরেজি চলে। ইংরেজির অধিকারে না থাকলে সেসব অঞ্চল হিন্দির অধিকারেও আসত না। ইংরেজি নামক সত্যটির উৎপত্তিস্থল ইংল্যাণ্ড। তেমনি আরও অনেকগুলি সত্যেরও

উৎপত্তি ইংল্যাণ্ডে বা ইউরোপে। আমাদের শাসনব্যবস্থা, সংবিধান, আইন-আদালত, পার্লামেন্ট, আর্মি, নেভি, পুলিশ, স্কুল-কলেজ, ল্যাবরেটরি, রেল, স্টিমার, ডাকঘর, ডাক্তারখানা, ব্যাঙ্ক, স্টক এক্সচেঞ্জ, ছাপাখানা, খবরের কাগজ, থিয়েটার, সিনেমা, রেডিয়ো, ট্রাম, বাস, মোটর—কোনোটিই-বা বিদেশাগত নয়? এমনকী কংগ্রেসও তো বিদেশি। হিন্দ, হিন্দু, হিন্দি এসবও তো বিদেশি ভাষার শব্দ। আজকাল স্বদেশি পারিভাষিক শব্দ দিয়ে শোধন করে নেওয়া চলেছে। 'রাজভবন' বললে স্বদেশিয়ানার একটা বিভ্রম সৃষ্টি হয়। কিন্তু যে বস্তুর নাম পালটে দেওয়া হয় তার বস্তুসত্তা অবিকল তেমনি রয়ে যায়। টেলিফোনকে কী-একটা বিকট হিন্দি নাম দেওয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও সেটা টেলিফোন নামক বিদেশি একটা যন্ত্রই। বিদেশি বলেই সেটা বর্জনীয় নয়।

তেমনি ইংরেজি। তার সঙ্গে পরাধীনতার সম্পর্ক একদা ছিল, এখন তো নেই। ভবিষ্যতেও সে-সম্পর্ক ফিরবে না। ইতিমধ্যেই স্থির হয়ে গেছে যে, সব ছাত্রকেই একটা স্তরে ইংরেজি শিখতে হবে। অবশ্যশিক্ষণীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজিতে কারও আপত্তি নেই। তাই যদি হল তবে শিক্ষার শেষ ধাপে পরীক্ষা ও প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ইংরেজি হলে আপত্তির কী কারণ থাকতে পারে? তামিলরা ও বাঙালিরা জিতে যাবে, হিন্দিভাষীরা তাদের সঙ্গে পেরে উঠবে না, এই কারণ নয় তো? উপরের দিকে পরীক্ষা ও প্রতিযোগিতার মাধ্যম ইংরেজি যেমন ছিল তেমনি থাকাই রাষ্ট্রের স্বার্থ। সেইভাবেই রাষ্ট্র যোগ্যতম প্রার্থী বেছে নিতে পারে। করদাতার অর্থ সেইভাবেই সৎপাত্রে পড়বে। নিকট ভবিষ্যতে আমি এই ব্যবস্থার রদবদলের পক্ষপাতী নই। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সবাইকে সমান সুযোগ দেওয়াই যদি নীতি হয় তবে প্রতিযোগিতার মাধ্যম ইংরেজিই থাকবে, ইংরেজি ভিন্ন আর কোনো ভাষা হবে না। যদি হিন্দিকেও অন্যতম মাধ্যমে করো তবে বাংলাকেও করতে হবে, তামিল, তেলেগু, কন্নাডিগ, মালয়ালমকেও করতে হবে।

জাতীয় মর্যাদার খাতিরে হিন্দি ভারত রাষ্ট্রের সরকারি ভাষা হোক, কিন্তু আভ্যন্তরিক ন্যায়ের খাতিরে ইংরেজিই পরীক্ষা ও প্রতিযোগিতার মাধ্যমরূপে থাকুক। ইংরেজি মাধ্যম না থাকলে পরীক্ষা ও প্রতিযোগিতার মাধ্যম হোক বাংলা, উর্দু, মারাঠি, গুজরাতি ইত্যাদি চোদ্দো-পনেরোটি ভাষা—শুধু হিন্দি নয়। যেখানে হিন্দিকে বসালে অহিন্দিভাষীদের ক্ষতি সেখানে ইংরেজিকে রাখাই সমীচীন। বিদেশি বলে তাকে খেদিয়ে দিলে স্বদেশি বলে শুধু হিন্দিকে নয়, বাংলাকে, পাঞ্জাবিকে, তামিলকেও বসাতে হবে। যেখানে কারুর কোনো ক্ষতি নেই সেখানে হিন্দি আরাম করে বসুক। কিন্তু অপরের ক্ষতি যেখানে, সেখানে হিন্দির আরাম করে বসার অধিকার নেই। জাতীয়তার জন্যে তাকেও ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।

একটা দেশের একটাই রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। এটা একভাষী দেশের বেলাই খাটে। ভারতের মতো বহুভাষী দেশে এটাকে খাটাতে যাঁরা চাইছেন তাঁরা মনে মনে ইংরেজিরই নজির অনুসরণ করছেন। ইংরেজি যেমন একচ্ছত্র ছিল তেমনি একচ্ছত্র হবে অন্য একটা ভাষা, অন্য একটি মাত্র ভাষা। সেই বিদেশি লজিকের জোরে হিন্দিকেও একচ্ছত্র করতে হবে। কিন্তু বিদেশি ভাষা বলে ইংরেজি যদি বিদায় হয় তবে তার নজিরটাকেই-বা মানতে যাব কেন? জাতীয় ঐক্য কি সুইসদেরও নেই? বেলজিয়ানদেরও নেই? একাধিক রাষ্ট্রভাষা কি তাদের ঐক্যহানি ঘটিয়েছে?

শেষপর্যন্ত তর্কটা দাঁড়ায় ইংরেজি হল বিদেশির ভাষা, বিজেতার ভাষা। তাকে বিদায় না দিলে স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হবে না। বেশ, তাই হোক। তাহলে ইংরেজির নজিরটাকেও মন থেকে ঝেড়ে ফেলা যাক। ভারতের সব ক-টা ভাষাকেই হিন্দির সঙ্গে সমান মর্যাদা দিয়ে ভারতীয় ইউনিয়নের সরকারি ভাষা করা হোক। সেটা কাজের কথা নয় এ যুক্তি আর আমরা শুনতে চাইনে। একটা বহুভাষী দেশের রাষ্ট্রভাষা একটাই হবে এটাও কি কাজের কথা? ইংরেজরা তাদের নিজেদের সুবিধের জন্যে ওরকম করেছিল। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ভারতীয়েরও ওতে কিছু সুবিধে হয়েছিল। কিন্তু জনগণের দিক থেকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা—হিন্দি হলেও—কাজের কথা নয়। যতগুলি ভাষা ততগুলি রাষ্ট্রভাষা এইটেই কাজের কথা। আমরা যদি এই সত্যকে স্বীকার

না করি, এই সত্যের সঙ্গে আপোশ রফা না করি তবে অমীমাংসিত সমস্যা একদিন আপনার পথ আপনি করে নেবে। বহুভাষী দেশ বহু রাষ্ট্র হবে।

ইউরোপীয়রা যদি না আসত তাহলে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতবর্ষে বহুসংখ্যক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হত। এরা যে-যার সুবিধামতো এক-একটা স্বদেশি ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একাধিক স্বদেশি ভাষাকে। হিন্দির সার্বভৌমত্ব সব হিন্দু মেনে নিত না। উর্দুর সার্বভৌমত্ব সব মুসলমান মেনে নিত না। হয়তো সবাই মিলে একদিন একটা ফেডারেশন বা কনফেডারেশন গড়ে তুলত। কিন্তু সেই সম্মিলিত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা যে একমাত্র হিন্দি বা একমাত্র উর্দু হওয়া উচিত এটা সবাইকে দিয়ে মানিয়ে নেওয়া খুবই কঠিন হত। অতদূর যেতে হবে কেন? ধরুন ১৯৪৭ সালে যদি জিন্না সাহেব ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনায় রাজি হয়ে যেতেন, যদি অখন্ড ভারতবর্ষের হাতেই ক্ষমতা হস্তান্তর করা হত তাহলে সম্মিলিত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা কি এক হত না একাধিক হত, না হিন্দি-উর্দুর যমজ রূপ হত? সকলেই জানেন যে, একমাত্র হিন্দির একচ্ছত্র দাবি কেউ স্বীকার করতেন না। না জিন্না, না গান্ধী। ঐক্যের খাতিরে হয় যমজ ভাষাকে সম্মিলিত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা করতে হত, নয় ইংরেজিকেই অনির্দিষ্টকাল বহাল রাখতে হত।

দেশভাগ হয়ে গেছে বলেই একদিকে হিন্দি ও অন্যদিকে উর্দু একচ্ছত্র হবার ছাড়পত্র পেয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি মুসলমান হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছে যে ওই ছাড়পত্রটা উর্দুভাষী মুসলমানদের শাসন-শোষণের সনদ। তাই তারা বাংলাকেও উর্দুর সমান অংশীদার করার জন্যে প্রাণপণ করছে। আক্ষরিক অর্থে প্রাণ দিয়েছেও। উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে এটা তারা কোনোকালে মেনে নেবে না। তারা যেন বেলজিয়ামের ফ্লেমিশভাষী। লেগে থাকলে তাদের মাতৃভাষাও পাকিস্তানের প্রাদেশিক ভাষা হবে, শুধু পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক ভাষা নয়। উর্দুভাষীরা যদি তাতে নারাজ হয়, তবে রাষ্ট্র দু-ভাগ হয়ে যাবে। তার জন্যে দায়ী হবে উর্দুভাষীদের জেদ। আর নয়তো ইংরেজিকেই অনির্দিষ্টকাল বহাল রাখতে হবে। আপোশের আর কোনো উপায় নেই। ইংরেজি বিদেশি ভাষা, কিন্তু আপোশের একমাত্র উপায়।

উর্দুর বিরুদ্ধে নয়, উর্দুভাষীদের প্রচ্ছন্ন সনদের বিরুদ্ধেই পূর্ব পাকিস্তানিদের এ বিক্ষোভ। তেমনি হিন্দিভাষীরাও একটা সনদ পেয়ে গেছে। ভাবী ভারতের শাসক ও ধনিকশ্রেণি হবে হিন্দিভাষী এরকম একটা ইঙ্গিত দেখা দিয়েছে। মহাত্মাজি ভেবেছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অতি অল্প ক্ষমতা দেবেন, আর সব ছড়িয়ে দেবেন প্রদেশে প্রদেশে, গ্রামে গ্রামে। ঠিক উলটোটি হয়েছে। বিকেন্দ্রীকরণের ভরসা নেই। ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন বিকেন্দ্রীকরণের অন্তরায়। দেশ ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনকেই বরণ করে নিয়েছে। অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাকে হিন্দিভাষীদের ধনাধিক্য ও ভোটাধিক্যের ওপর ছেড়ে দিলে সেটা গণতন্ত্রের মতো দেখায়, কিন্তু সেটা হয় উত্তর ভারতের দ্বারা ভারাক্রান্ত মাথাভারী গণতন্ত্র। তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ অবশ্যম্ভাবী। তামিলদের একদল এরই মধ্যে খেপেছে। হিন্দি নামক ভাষার বিরুদ্ধে ততটা নয়, যতটা হিন্দিভাষী শাসক ও ধনিকশ্রেণির সনদের বিরুদ্ধে। মিটমাট না হলে দেশ আবার ভাঙবে। আপোশের আর কী উপায় আছে— ইংরেজিকে সহচর ভাষারূপে অনির্দিষ্টকাল বহাল রাখা ভিন্ন?

আমাদের হাজার বছরের অভিজ্ঞতা বলছে যে, দেশ বহু খন্ড হলে স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না। বিপদের সময় দেশবাসী একজোট হয় না। সুতরাং শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন চাই। এতকাল পরে আমরা আমাদের নিজেদের একটি কেন্দ্রীয় সরকার পেয়েছি। কাশ্মীরি, কেরলি, বাঙালি, তামিল, অসমিয়া, গুজরাতি, পাঞ্জাবি প্রভৃতি নানা প্রান্তের লোক একবার কুরুক্ষেত্রে মিলিত হয়েছিল শুনেছি। সেটা কিন্তু মিলেমিশে দেশ-চালানোর জন্যে নয়। ইতিহাসে এই প্রথম বার আমরা একজোট হয়ে রাষ্ট্র চালাচ্ছি। এ জোট যদি ভেঙে যায় তবে আবার পরাধীনতা। একে অটুট রাখতেই হবে। অথচ একমাত্র রাষ্ট্রভাষার সনদ যে একে তলে তলে ভাঙছে। এটা এমন একটা ইসু যার একপ্রান্তে হিন্দিভাষীদের স্বার্থ, অপরপ্রান্তে অহিন্দিভাষীদের স্বার্থ, মাঝখানে ওই আপোশের প্রস্তাব। ওই সহচর ভাষা। ভাঙনকে রোধ করতে হলে ওর চেয়ে আর কোনো সহজ উপায় নেই। বিদেশি বলে ইংরেজিতে যাঁদের আপত্তি তাঁরা ইচ্ছে করলে ইংরেজির বদলে বাংলা

তামিল মারাঠি ইত্যাদি চোদ্দো-পনেরোটি ভাষাকে সহচর ভাষা বানাতে পারেন। কিন্তু সেটার নাম আরও সহজ নয়, আরও জটিল।

'বিদেশি' এই বিশেষণটাই যদি যত নষ্টের গোড়া হয়ে থাকে তবে আমরা তার বদলে 'আন্তর্জাতিক' এই বিশেষণটি ব্যবহার করতে পারি। স্বাধীন রাষ্ট্র যদি কমনওয়েলথ নামক সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে তো আন্তর্জাতিক ভাষা ব্যবহার করলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। স্বাধীনতার সঙ্গে সেটা যদি খাপ খায়, তবে এটাই-বা বেখাপ হবে কেন? আগেকার দিনে বিদেশি ভাষার বিরুদ্ধে যতগুলি যুক্তি শোনা যেত ইদানীং স্বদেশি ভাষার বিরুদ্ধেও ততগুলি শোনা যাচ্ছে। তামিলরা তো সাফ বলে দিয়েছে যে, হিন্দিও ওদের পক্ষে বিদেশি। আমরাও তো দেখছি হিন্দি শিখতে ইংরেজির চেয়ে কম শক্তি খরচ হলেও হিন্দিতে শেখবার যোগ্য বিষয় অল্পই আছে, ইংরেজিতে বিস্তর। শব্দগুলো হয়তো চেনা, কিন্তু অর্থ এক নয়। আর ব্যাকরণ তো আরবির কাছাকাছি যায়। 'মহাত্মা গান্ধীকি' হল কেন? 'কা' হল না কেন? কারণ 'জয়' শব্দটা স্ত্রীলিঙ্গ। আর বিশেষ্য যদি স্ত্রীলিঙ্গ হয় তবে বিশেষণকেও স্ত্রীলিঙ্গ হতে হবে, ক্রিয়াপদকেও স্ত্রীলিঙ্গ হতে হবে। কিন্তু গোড়ায় গলদ, 'জয়' কেন স্ত্রীলিঙ্গ হবে। 'ফতে' স্ত্রীলিঙ্গ বলে?

যা-ই হোক, হিন্দি আমাদের দেশের সবচেয়ে বহুল প্রচলিত ভাষা। দেশের লোকের সঙ্গে কারবার করতে হলে হিন্দি আমাদের শিখতেই হবে। রাষ্টভাষা না হলেও শিখতুম। শিখেছি। 'মহাত্মা গান্ধী কি জয়' হেঁকেছি। হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে বলে সুখীই হয়েছি। তাহলে বাধছে কোনখানে? বাধছে এইখানে যে, ভারত যেমন ধর্মের বেলা নিরপেক্ষ তেমনি নিরপেক্ষ ভাষার বেলা নয়। হিন্দু ধর্মের সঙ্গে সে তার রাষ্ট্রকে একাকার করেনি, কিন্তু হিন্দি ভাষার সঙ্গে তা করেছে। ভারত হিন্দু রাষ্ট্র নয়, কিন্তু সংবিধানের যদি সংশোধন না হয়, তবে ১৯৬৫ সালে হিন্দি ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরে একমেবাদ্বিতীয়ম হওয়ামাত্র ভারতকে বলতে পারা যাবে হিন্দি-রাষ্ট্র। তখন হিন্দিভাষীরাই হবে প্রথম শ্রেণির নাগরিক। পাকিস্তানের হিন্দুরা যেমন দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক ভারতের বাংলাভাষী, তামিলভাষী, পাঞ্জাবিভাষীরাও তেমনি দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক বনবে। সংবিধান রচনার সময় কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেমব্লির সদস্যেরা সর্বসম্মতিক্রমে হিন্দিকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করেননি। তাঁদের মধ্যে তখনই দ্বিমত দেখা দিয়েছিল। একপক্ষ ছিলেন হিন্দির সমর্থক। অপর পক্ষ ইংরেজির। বলা বাহুল্য, ইংরেজির সমর্থকরা জানতেন যে ইংরেজি একটি বিদেশি ভাষা। শুধু বিদেশির নয় বিজেতার ভাষা। ইংরেজির সমর্থন করেছিলেন বলে তাঁরা যে কম স্বদেশি বা কম স্বাধীনতাপ্রিয় ছিলেন তা নয়। তাঁরাও কংগ্রেসের লোক। ভোটে দিয়ে দেখা গেল দু-পক্ষের ভোটসংখ্যা প্রায় সমান সমান। হিন্দির সঙ্গে ইংরেজির সামান্য একটি মাত্র ভোটের ব্যবধান। এরূপ ক্ষেত্রে হিন্দি ইংরেজি দুটি ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করা উচিত ছিল।

এখানে আর একটি কথা পরিষ্কার করে বলতে চাই। আমাদের সংবিধানে কোনো ভাষাকেই 'রাষ্ট্রভাষা' বা 'জাতীয় ভাষা' বলে আখ্যাত করা হয়নি। হিন্দিকে বলা হয়েছে 'সরকারি ভাষা'। সংবিধান যদি সংশোধন করা হয়, তবে ইংরেজিকে বলা হবে 'সহচর সরকারি ভাষা'। 'রাষ্ট্রভাষা', 'জাতীয় ভাষা' ইত্যাদি আখ্যা প্রকৃতপক্ষে সব ক-টি ভারতীয় ভাষারই পাওনা, কোনো একটি ভাষার নয়। হিন্দি যদি সেরকম একটা আখ্যা পেয়ে থাকে তবে সেটা বিধিসম্মতভাবে নয়, সেটা পাঁচজনের মুখে মুখে। যেমন সুবোধ মল্লিক মহাশয়কে লোকে 'রাজা' বলত। যেমন কংগ্রেস সভাপতিকে লোকে 'রাষ্ট্রপতি' বলত। রাষ্ট্রভাষা বলে হিন্দির একটা নামডাক হয়েছে। মন্ত্রীরাও তাকে রাষ্ট্রভাষা বলে চালিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু সংবিধানে এর কোনো সমর্থন নেই। সুতরাং হিন্দি এমন কিছু হারাচ্ছে না, যা সংবিধান অনুসারে তার প্রাপ্য। আর ইংরেজিও এমন কিছু পাচ্ছে না যার বলে সে রাষ্ট্রভাষা বলে গণ্য হবে। লোকমুখে হিন্দিই থেকে যাবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। কিন্তু সংবিধানে তার একটি সহচর সরকারি ভাষা জুটবে। সেটি যদি ইংরেজি না হয়ে উর্দু কিংবা তামিল হত তাতেও হিন্দি গোঁড়াদের আপত্তির তরঙ্গ উঠত। ইংরেজিকে যেমন তাঁরা 'বিদেশি' বলে অপাঙক্তেয় করতে চান, তেমনি তাকেও করতেন অন্য কোনো ছুতোয়। মোদ্দা কথা শরিক তাঁরা চান না, হলেই-বা সে স্বদেশি।

হিন্দি থাকছে, ইংরেজিও থাকবে, ভবিষ্যতে ভাব বিনিময়ের ভাষার অভাব হবে না। যাঁরা হিন্দিতে চান তাঁরা হিন্দিতে ভাব বিনিময় করবেন, যাঁরা ইংরেজিতে চান তাঁরা ইংরেজিতে। যদি বিনিময় করবার মতো ভাব থাকে। যদি সেরকম মনোভাব থাকে। সরকারের কাজকর্মের ভাষা ছাড়া কি ভাব বিনিময় হয় না? সংস্কৃতেও হতে পারে। উর্দুতেও।

গান্ধীজি সাধারণত হিন্দিতেই ভাব বিনিময় করতেন, কিন্তু জীবনের শেষ দিনও তাঁকে বাংলা হাতের লেখা তৈরি করতে দেখা গেছে। নোয়াখালিতে ফিরে বাংলায় ভাব বিনিময় করতেন। তামিলদের সঙ্গে ভাব বিনিময়ের জন্যে তিনি তামিল ভাষা শিখেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতে। পশ্চিমা মুসলমানদের সঙ্গে ভাব বিনিময়ের জন্যে তিনি উর্দুতেও কথা বলতেন। রথীবাবুর সঙ্গে, আমার সঙ্গে তিনি ইংরেজিতে কথা বললেন ১৯৪৫ সালে। ভাব বিনিময় একটি মাত্র ভাষায় হবে—হিন্দিতে; এমন অদ্ভুত ধারণা তো গান্ধীজির ছিল না।

এই প্রসঙ্গে একটি মজার গল্প মনে পড়ল। বছর কয়েক আগে স্বাধীন ভারতের সংস্কৃতভাষী সুধীদের এক সম্মেলন হয়। আমাদের এক বিশিষ্ট অধ্যাপক গেছলেন যোগ দিতে। ফিরে এসে বললেন, আলোচনা হল—কোন ভাষায় বলুন তো? ইংরেজিতে!

আর একটা মজার গল্প বলি। পাঞ্জাবে সেদিন দারুণ বচসা বেঁধে গেল। খোঁপা আর এলোচুলে নয়, পাঞ্জাবিতে আর হিন্দিতে। তামাশা এই যে, দু-পক্ষেরই বাক্যবাণ বর্ষিত হল উর্দু সংবাদপত্রে। মামলার ভাষা হল উর্দু। মনে আছে, ছেলেবেলায় আমি একবার লালা লাজপৎ রায়ের *বন্দে মাতরম* পত্রিকার নমুনা চেয়ে পাঠাই। পত্রিকা দেখে আমার চক্ষুঃস্থির। হিন্দি নয়, ইংরেজি নয়, উর্দু। যেখানে উর্দু উভয়ের জানা সেখানে ভাব বিনিময়ের ভাষা উর্দু হওয়াই স্বাভাবিক। স্কুল-কলেজে যিনি যা-ই পড়ুন-না কেন দেখা হলে হিন্দুতে আর শিখে বাতচিৎ হয় উর্দুতেই।

সরকারি ভাষা বলে গণ্য না হলেও উর্দুতেই পশ্চিমা হিন্দু ও শিখদের স্বাচ্ছন্দ্য আমি অনেক বার লক্ষ করেছি। তেমনি সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃত না হলেও ইংরেজির কদর এদেশে দীর্ঘকাল থাকবে। কেন থাকবে তার একশো কারণ। জাতীয়তাবাদীরা যত সহজে ইংরেজকে হটিয়েছেন, তত সহজে ইংরেজিকে অচলিত করতে পারবেন না। কাজেই সে-চেষ্টা না করাই ভালো। স্বাধীনতার পরে আমাদের গ্রামে গ্রামে হাই স্কুল হয়েছে। লোকে চায় হাই স্কুল। টোল নয়, মাদ্রাসা নয়, বুনিয়াদি নয়, বিশুদ্ধ বাংলা বিদ্যালয় নয়, সেই সেকালের মতো হাই স্কুল। কিংবা টেকনিক্যাল স্কুল। কলেজের সংখ্যাও বাড়ছে। যেখানে মাধ্যম হিসাবে ইংরেজি উঠে যাচ্ছে সেখানেও বিষয় হিসাবে ইংরেজি থেকে যাচ্ছে। এটাও জনগণের ইচ্ছায়।

ইংরেজির কাজ হবে স্ট্যাণ্ডার্ড ঠিক করে দেওয়া বা ঠিক করতে সাহায্য করা, সে-কাজ হিন্দির দ্বারা হতে পারে না। সামনের দশ-বিশ বছরে তো নয়ই, এই শতাব্দীতে নয়। একবিংশ শতাব্দীর ভাবনা একবিংশ শতাব্দী ভাববে। আমরা যারা বিংশ শতাব্দীতে বাস করছি, তাদের ভাবনা বিংশ শতাব্দীকেই ঘিরে। যতদূর দেখতে পাচ্ছি ইংরেজির প্রয়োজন থাকবে। সে-প্রয়োজন প্রশাসনঘটিত নাও হতে পারে। বাংলাদেশ যদি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হত তাহলে আমরা কেউ ইংরেজিকে সরকারি ভাষা বা তার সহচর করতুম না। সব যুক্তিকে খারিজ করত সেন্টিমেন্ট। বাংলা ভাষাই হত রাষ্ট্রভাষা। কিন্তু সেরূপ ক্ষেত্রেও ইংরেজির প্রয়োজন ফুরোত না। লোকে ইংরেজিকে চাইত বাংলার স্ট্যাণ্ডার্ড ঠিক করে দেবার জন্যে। লেখার ও সমালোচনার আদর্শ চোখের উপর তুলে ধরার জন্যে। ইংরেজের যুগ গেছে, ইংরেজির যুগ যায়নি। আরও আধ শতাব্দী থাকবে।

কিন্তু তাই-বা কেমন করে বলি? খাস ইংরেজের দেশে ইংরেজি যদি পেছিয়ে পড়ে, তেমন বড়ো লেখক যদি না জন্মান, বইগুলো যদি হয় অন্তঃসারশূন্য, সাময়িকপত্রগুলো যদি হয় অন্তঃসারশূন্য, খবরের কাগজগুলো যদি হয় বিশেষত্বহীন, সেই জ্বলন্ত বিবেক যদি নিবে আসে, চিন্তার স্বাধীনতা যদি চোরাবালিতে ঠেকে যায়, তাহলে অর্ধশতাব্দীকাল কে একটা মরা সাহিত্য কাঁধে করে বেড়াবে? ইংরেজি যদি বাংলাকে বা হিন্দিকে এগিয়ে দিতে না পারে তবে ইংরেজির অবস্থানকাল আধ শতাব্দীও নয়। আরও আগে তার ওপর

থেকে লোকের মন উঠে যাবে। মানুষকে জোর করে ইংরেজি শেখানোর আমি পক্ষপাতী নই। ইংরেজি যে অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয় হয়েছে, এটাও আমার মতে অনুচিত। ছেলেরা যদি ইংরেজি শিখতে না চায় না শিখবে। না শিখলে পরে পস্তাবে। নিজেদের ছেলেমেয়ে হলে তাদের বলবে অমন ভুল না করতে। কতক লোকের পস্তানো দরকার। আজকাল মাড়োয়ারির ছেলেরা মন দিয়ে ইংরেজি শেখে। বাঙালির ছেলেরা ফাঁকি দেয়।

ইংরেজির পিছিয়ে পড়া যেমন অসম্ভব নয় হিন্দির এগিয়ে যাওয়াও তেমনি সম্ভবপর। এক পুরুষের মধ্যে হিন্দির অসাধারণ উন্নতি হতে পারে। ইচ্ছা করলে সে উর্দুকে আত্মসাৎ করতেও পারে। দেবনাগরী লিপি ছাড়া অন্যান্য লিপিতে কি হিন্দি লেখা যায় না, ছাপা যায় না? রোমক লিপিতে ছাপা হলে হিন্দি বই কাগজ আরও চলবে। বাংলা লিপিতে ছাপলে বাঙালিরা অনায়াসে পড়বে। কতক হিন্দি বই কাগজ একাধিক লিপিতে ছেপে পরীক্ষা করা উচিত পাঠকসংখ্যা কী পরিমাণ বাড়ে। অনেকে দেবনাগরীর ভয়ে হিন্দির দিকে ঘেঁষতে চায় না। তাদের ওপর জোরজুলুম করে যেটুকু ফল হবে তার চেয়ে ঢের বেশি হবে বিভিন্ন লিপিতে হিন্দি বই কাগজ ছেপে। তারপর হিন্দির ব্যাকরণ আরও সরল হওয়া চাই। পশুপাখির কার কী লিঙ্গ তাই আমাদের জানা নেই। শব্দ মাত্রেরই লিঙ্গ থাকবে ও আমরা তা জানব, এ কী জ্বালা!

শেষ কথা, ইংরেজির দীপশিখা নিভে গেলেই যে হিন্দির দীপশিখার, বাংলার দীপশিখার, অন্যান্য ভারতীয় ভাষাগুলির দীপশিখার দেওয়ালি হবে এটা একপ্রকার নঞর্থক চিন্তা। বরং ইংরেজির দীপ যতক্ষণ জ্বলছে জ্বলতে দাও, তার সাহায্যে নিজেদের দীপ জ্বালিয়ে নাও। ফুঁ দিয়ে তাকে অকালে নিবিয়ে দিলে পরে হয়তো দেখবে নিজেদের দীপও নিবু-নিবু। দেওয়ালি হবে, না কালী পুজো হবে কে এখন থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করবে?

সেকুলারিজম

সংকটকালে সৈনিকের কর্তব্য যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া, নাগরিকের কর্তব্য যেমন যে যার জায়গায় স্থির থেকে নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন করা, ইন্টেলেকচুয়ালের কর্ম তেমনি প্রত্যেকটি বিষয় পরিচ্ছন্নভাবে চিন্তা ও প্রকাশ করা। মানসিক বিশৃঙ্খলাও দেশের পক্ষে অহিতকর।

এই সংকটে ভারতের আভ্যন্তরিক দুর্বলতা হচ্ছে, সাধারণ লোক বোঝে না সেকুলার স্টেট বলতে কী বোঝায়। যাঁরা সাধারণ নন, অসাধারণ, তাঁরাও সেকুলার শব্দটির বিভিন্ন অর্থ করেন। তার ফলে সাধারণের মনে ধাঁধা লাগে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে সব দেশেই রাজতন্ত্রের সঙ্গে পুরোহিততন্ত্রের বা সন্ন্যাসীতন্ত্রের মণিকাঞ্চনযোগ ছিল। তখনকার দিনে কল্পনাই করতে পারা যেত না যে রাষ্ট্র আর ধর্ম দুই স্বতন্ত্র সত্তা, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ধর্মের হস্তক্ষেপ বা অনুপ্রবেশ অন্যায়, ধর্মীয় ব্যাপারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ বা অনুপ্রবেশ অন্যায়।

আমেরিকার তেরোটি ব্রিটিশ উপনিবেশ যখন স্বাধীনতা লাভ করে রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে তখন তাদের সেই প্রজাতন্ত্রে রাজতন্ত্রের সাথি পুরোহিততন্ত্র বা সন্ন্যাসীতন্ত্রের ঠাঁই হয় না। মণির সঙ্গে সঙ্গে কাঞ্চনও বাদ যায়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে রাষ্ট্রপতি আছেন, কিন্তু তাঁর যে কী ধর্ম তার উল্লেখ নেই। গভর্নমেন্ট আছে, কিন্তু তার যে কী ধর্ম তারও সন্ধান নেই। কংগ্রেস আছে, কিন্তু তার যে কী ধর্ম তারও ঠিকানা নেই। অর্থাৎ যাঁর যে ধর্মে রুচি সে-ধর্মে তিনি বিশ্বাস করতে পারেন, কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তিনি খ্রিস্টান না ইহুদি, খ্রিস্টান হয়ে থাকলে ক্যাথলিক না প্রোটেস্টান্ট, প্রোটেস্টান্ট হয়ে থাকলে লুথারপন্থী না ক্যালভিনপন্থী বা কোয়েকার না মেথডিস্ট না অন্যান্য শাখার অন্তর্ভুক্ত কেউ তা জানেও না, জানতে চায়ও না। মনে রাখবেন 'রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে'। সামাজিক ক্রিয়াকর্মের বেলা জানতে চায়, জানে। হয়তো বাছবিচার করে। কিন্তু সংবিধান সে-বিষয়ে নীরব।

আমেরিকার বিপ্লবের পর এই যে রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের বিয়োগ এটা ফরাসি বিপ্লবেরও অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়। ফরাসিরা আরও এক-পা এগিয়ে গিয়ে রাজার ও চার্চের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে। একদল তো ঈশ্বরকে পর্যন্ত অস্বীকার করে। আমেরিকানরা নাস্তিককে সহ্য করে না কিন্তু ফরাসিরা করে।

তারপর একে একে অনেকগুলি দেশ রাজতন্ত্র ছেড়ে প্রজাতন্ত্র গ্রহণ করেছে। কিন্তু মার্কিন বা ফরাসির মতো রাজার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় হস্তক্ষেপ বা অনুপ্রবেশকে রাষ্ট্রীয় ব্যাপার থেকে বিদায় দিতে হবে এটা অনেকেই মানে না। সেইজন্য প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেও সংবিধানের ললাটে এঁকে দিয়েছে 'ক্যাথলিক' বা 'ইসলামি', 'ইহুদি' বা 'বৌদ্ধ'। আমাদের প্রতিবেশী বর্মা প্রথমে হয়েছিল আমাদেরই মতো সেকুলার স্টেট। কিন্তু সুবুদ্ধি থাকিন নু-র কুবুদ্ধি হল। তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সাহায্যে ভোটযুদ্ধে বিজয়ী হবার পর তাদের সহায়তার মূল্য দেবার জন্যে 'বৌদ্ধ রাষ্ট্র' প্রবর্তন করেন। সঙ্গে সঙ্গে খ্রিস্টধর্মী কারেন, কাচিন, শানরা পৃথক শাসন দাবি করে। তা দেখে সেনাপতি নে উইন ক্ষমতা হাতে নেন। থাকিন নু এখনও বন্দি। বর্মা এখন আবার সেকুলার স্টেট। ভোটের বালাই নেই বলে বৌদ্ধ ভিক্ষুদেরও রাজনৈতিক ওজন নেই।

দূরদর্শী নেহরু এইসব কারণেই হিন্দু রাষ্ট্র প্রবর্তন করেননি। তখন গান্ধীজি জীবিত ছিলেন। তিনিও পরামর্শ দেন সেকুলার স্টেট সংস্থাপন করতে। 'আমাদের সংখ্যার জোর বেশি। আমরা আমাদের খুশিমতো হিন্দু রাষ্ট্র প্রবর্তন করব।' এই যাদের যুক্তি তাদের হাতে পড়লে এদেশ বেশিদিন সংহতিরক্ষা করতে পারবে না। খ্রিস্টধর্মী নাগারা তো স্বাধীনতার জন্যে লড়বেই। লড়বে বৌদ্ধধর্মী সিকিম, ভুটান। লড়বে পাঞ্জাবের শিখরা,

কেরলের খ্রিস্টানরা ও সর্বোপরি কাশ্মীরের মুসলমানরা। হিন্দুদেরও তো বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ি। এক বার ভাঙন ধরলে এ রাষ্ট্র চৌচির হয়ে যাবে।

সুতরাং সেকুলার স্টেট হচ্ছে সেই ভিত্তি যা আমাদের রাষ্ট্রকে ধারণ করে আছে। যে ধারণ করে আছে তাকেও ধারণ করা অত্যাবশ্যক। এটা একজনের একটা খেয়াল নয় যে একে বিসর্জন দিলেও চলে। অথচ এরকম বিপরীত বুদ্ধি আমাদের দেশে অতি সুলভ। হিন্দুরাই যেন এদেশের মালিক, আর সকলে হিন্দুদের কৃপায় বাস করছে। প্রকৃত সত্য তা নয়। হিন্দুরাও আর-সকলের কৃপায় বাস করছে। তারা যদি বিমুখ হয় তবে রাষ্ট্র ভেঙে যাবে, শিখরা প্রাণ দিয়ে লড়বে না, পারসিরা সেনা পরিচালনা করবে না, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা শত্রুবিমান ভূতলে নামাবে না, খ্রিস্টানরা নার্স হয়ে রণাঙ্গনে যাবে না। আর মুসলমানরা প্রাণভয়ে পালিয়ে গেলে অর্থনীতি বিধ্বস্ত হবে। অর্থনীতির বিভিন্ন ধাপ তাদের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। হিন্দুর চেয়ে মুসলমান কম দরকারি নয়। এখানে মানুষ হিসেবে বিচার করতে হবে। টিকি দেখে বা দাড়ি দেখে নয়। ঘরে আগুন লাগলে যারা নিবিয়ে ফেলতে ছুটে আসে তারা কে কোন ধর্মের লোক, কোন সমাজের লোক এটা মূর্খের গণনা। তেমনি শিল্পে-বাণিজ্যে-কৃষিতে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যার কর্ম তারে সাজে। তাকে পরম সমাদরে তার স্বস্থানে নিযুক্ত রাখতে হবে। তাকে ভয় দেখিয়ে ভাগিয়ে দেওয়া চলবে না। তাকে কথায় কথায় সন্দেহ করাও নির্বুদ্ধিতা। কোটি কোটি নাগরিককে সন্দেহ করলে মানুষ বিশ্বাস করবে কাকে? শেষকালে নিজের সম্প্রদায়কেও অবিশ্বাস করে বসবে।

সংকটকালে শুভবুদ্ধি জাগ্রত থাকলে সংকট পার হওয়া তত কঠিন হবে না, যত কঠিন হবে ঘরে বাইরে সর্বত্র জুজু দেখলে। সেকুলার স্টেটের বিরোধী যাঁরা তাঁরা এতকাল বলে এসেছেন, লোক বিনিময় করা উচিত। তাঁদের মতে সব মুসলমানই কালো, সব হিন্দুই সাদা। মানুষকে অমন করে সাদায়-কালোয় ভাগ করা যায় না। সেটা যে আমরা করিনি এরজন্যে ভগবানকে ধন্যবাদ। পূর্ব পাঞ্জাবে মুসলমান নেই, সুতরাং সেখানকার জনগণের ওপর বোমা ফেলতে পাকিস্তানি বোমারু বৈমানিকদের বাধে না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান আছে। এখানকার জনগণের ওপর বোমা ফেললে মুসলমানেরাও মরবে। তাই পশ্চিমবঙ্গের ওপর পাকিস্তানি বোমারু বৈমানিকরা বোমাবর্ষণ করছে না। লোক বিনিময়বাদীরা যদি পশ্চিমবঙ্গকে নির্মুসলমান করতেন তবে তাঁরাই বোমার বলি হতেন।

হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে থাকা কেন প্রয়োজন, একথা হাজার তর্ক করেও বোঝানো যায়নি। এতদিনে ওটা সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হবে। তাই যদি হয় তবে মুসলমানকে ধরে রাখাই প্রাণে বাঁচার উপায়। যাকে রাখ সেই রাখে। একথা ওপারের হিন্দুদের বেলায়ও খাটে। ওখানকার মুসলমানরা এবার হিন্দুদের প্রাণপণে রক্ষা করেছে। হিন্দুরা থাকলে এপারের বৈমানিকরা বোমাবর্ষণ করবে না। মুসলমানদেরও প্রাণরক্ষা হবে। এর থেকে একদিন আসবে ইসলামি রাষ্ট্রে অরুচি ও সেকুলার রাষ্ট্রে রুচি। তর্ক করে যেটা বোঝানো যায়নি সংকটের লজিক সেটা বোঝাবে। পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদের অন্তঃপরিবর্তন যখন আরও গভীর হবে তখন পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান হতে পৃথক হয়ে যেতে পারে। আর যদি পূর্ব পাকিস্তানের মতো পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমানরাও উপলব্ধি করে যে বিপৎকালে অপর সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলেমিশে থাকাই শ্রেয় তাহলে তাদেরও অন্তঃপরিবর্তন ঘটবে। তখন পাকিস্তান আর ইসলামি স্টেট বলে অহংকার বোধ করবে না। বরং পূর্ব পাকিস্তানকে সঙ্গে রাখার জন্যে সেকুলার মতবাদ অবলম্বন করতে চাইবে।

একদিন ক্লাসের পরে আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে আমার প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল মহাশয় বলেন, ‘অশোকের ওই বিশাল সাম্রাজ্য পরে ভেঙে পড়ল কেন, তার আসল কারণ জান? বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব। যে-দেশে বহু ধর্ম সেদেশে একটি ধর্ম যদি রাজধর্ম হয় ও সেই ধর্মটির প্রতি যদি রাজানুকূল্য বর্ষিত হয় তবে সে-রাজ্য টেকে না।’

আমি তাঁর সঙ্গে তর্ক করি। আমার মনে হয়েছিল তিনি নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব বলেই অমন উক্তি করলেন। তিনি আমাকে বোঝান যে, তিনি বৌদ্ধ ধর্মের বিরুদ্ধে নন, বৌদ্ধ ধর্মের রাজধর্ম হওয়ার বিরুদ্ধে। অশোকের বৌদ্ধ

হওয়াটা ভুল নয়, বৌদ্ধ ধর্মকে রাজধর্ম করাটাই ভুল।

তেতাল্লিশ বছর পরে তাঁর সঙ্গে আমি একমত। ব্যক্তিগত মুক্তি বা নির্বাণ বা পরিত্রাণের জন্যে যেকোনো ব্যক্তি যেকোনো ধর্মে বিশ্বাস করতে পারেন, কিন্তু রাজা তাঁর নিজের ধর্মকে রাজধর্ম করবেন ও আর-সব ধর্মের উপর অগ্রাধিকার দেবেন এটা হয়তো সেই ধর্মটির দিক থেকে সুবিধের, রাজ্যের দিক থেকে সুবুদ্ধি নয়। বৌদ্ধ ধর্মেরও শেষপর্যন্ত এতে লাভ হয়নি। বিস্তার ঘটেছে, কিন্তু শিকড় ক্ষয়ে গেছে।

প্রত্যেক রাষ্ট্রের একটা কাঠামো থাকে। সেটা যদি মজবুত হয়ে থাকে তবে বহিঃশত্রুর আক্রমণ, ক্ষমতা নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব, প্রজাদের অসন্তোষ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নেপোটিজমের অবশ্যম্ভাবী কুফল ইত্যাদি বহু শতাব্দী ধরে সে পোহাতে পারে। প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রের কাঠামো মোটের ওপর শক্ত ছিল। সেটা ছিল ব্রাহ্মণে-ক্ষত্রিয়ে একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। রাজা ক্ষত্রিয়, মন্ত্রী ব্রাহ্মণ। সামরিক ক্ষমতা ক্ষত্রিয়ের, অসামরিক ক্ষমতা ব্রাহ্মণের। ক্ষত্রিয় শব্দটির সংজ্ঞা যথেষ্ট উদার ছিল। গায়ের জোরে যে জবরদখল করত সে-ই ক্ষত্রিয় হতে পারত। কে মনে রাখতে যাচ্ছে যে তার গর্ভধারিণী শূদ্রাণী? চন্দ্রগুপ্তের জননী যেমন শূদ্রাণী অশোকের তেমনি ব্রাহ্মণী। আর ব্রাহ্মণ শব্দটির সংজ্ঞাও যথেষ্ট উদার ছিল। শকদের সঙ্গে তাদের পুরোহিতরাও আসেন ও পরে ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হন। যেমন একালের নমঃশূদ্রদের পুরোহিতরাও ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিচ্ছেন ও ব্রাহ্মণের পদবি নিচ্ছেন।

চন্দ্রগুপ্ত ব্যক্তিগত জীবনে জৈন হলেও ক্ষত্রিয়ই ছিলেন। ক্ষত্রিয়সমাজই তাঁর সমাজ। তেমনি অশোকও ব্যক্তিগত জীবনে বৌদ্ধ হলেও ক্ষত্রিয়ই ছিলেন। বৌদ্ধদের গ্রন্থে এর স্পষ্ট উল্লেখ আছে। ক্ষত্রিয়সমাজই তাঁর সমাজ। তবে শেষের দিকে তিনি বোধ হয় বৌদ্ধদের সংঘে যোগ দেন। সংঘে যারা যোগ দিত তারা জাত দিত। সমাজে যারা থাকত তারা জাত রাখত। অমুক ব্যক্তি জৈন বা বৌদ্ধ বা শিখ বললে এমন কথা বোঝায় না যে অমুক ব্যক্তি জাতে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বা শূদ্র নন; জাতি ও ধর্ম এদেশে একার্থক নয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও চেয়েছিলেন যে ব্রাহ্ম হবার পরেও লোকে ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ বা নাপিত বা মুচি থাকে। এটা কেশবচন্দ্র প্রমুখের অসহ্য হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সেই যে বিদ্রোহ সে-বিদ্রোহ ইতিহাসে অপূর্ব। জাতিভেদের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে এখন আর কাউকে সন্ন্যাস নিতে বা সংঘে যোগ দিতে হয় না। সমাজে থেকে ও গৃহস্থ হয়েও এখন জাত দেওয়া যায়। নতুন একটা জাত তৈরি করারও দরকার হয় না।

চন্দ্রগুপ্ত জৈন হবার দরুন বা অশোক বৌদ্ধ হবার দরুন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি। সামরিক ক্ষমতা, শাসকের ক্ষমতা ক্ষত্রিয়দের হাতেই রয়ে গেছে। অসামরিক ক্ষমতা, মন্ত্রীর ক্ষমতা ব্রাহ্মণদের হাতছাড়া হয়নি। এসব সাধারণত বংশানুক্রমিক। জাত জিনিসটা আসলে পেশার ধারাবাহিকতা। যার যেমন পেশা তার তেমন জাত। পরে, যার যেমন জাত তার তেমন পেশা। সাধারণত সেটা বংশানুক্রমিক ছিল। কেউ একজন বৌদ্ধ বা কোনো একটি পরিবার জৈন হলেই অমনি তার বা তাদের পেশা বদলে যেত না। তাই জাত বদলে যেত না। ধর্ম নিয়ে দ্বন্দ্ব বলতে একালে যা বোঝায় প্রাচীন ভারতে তা বোঝাত না। তার সূচনা মুসলমান আগমনের পর থেকে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সেই প্রথম আঘাত পড়ে। মুসলমান হলেই সবরকম পদে অধিকার বর্তায়। যে চন্ডাল মুসলমান হয়েছে সে রাজাও হতে পারে, মন্ত্রীও হতে পারে, সেনাপতিও হতে পারে, সওদাগরও হতে পারে। চিরন্তন কাঠামোটিকে বিপর্যস্ত করে দিতে পারে।

মুসলমানি আমলের গোড়ার দিকে ইসলামি রাষ্ট্রের কাঠামো আমদানির চেষ্টা যে হয়নি তা নয়, কিন্তু এদেশের মাটিতে ও-জিনিস টেকে না। বহু অঞ্চল হিন্দুদের দখলে থেকে যায়, যেসব অঞ্চলে পুরাতন বন্দোবস্ত। মুসলমান অধিকৃত অঞ্চলেও হিন্দুদের সঙ্গে একটা নয়া বন্দোবস্ত হয়। সাধারণত দেওয়ানি হিন্দুদের হাতে, ফৌজদারি মুসলমানদের হাতে। তার মানে সেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়। তবে ঠিক সাবেক অর্থে নয়। জাতে ব্রাহ্মণ নন এমন বহু লোক মুসলমান সরকারে অসামরিক পদ পান, পরে জমিদারি পান। ক্ষত্রিয় নন এমন বহু লোক সামরিক পদ পান, সামন্তরাজা হন। ওদিকে সৈয়দরা বা মৌলানারা ব্রাহ্মণের মর্যাদা পান।

ক্ষত্রিয় মর্যাদা পান। ক্ষত্রিয় মর্যাদা যে সব মুসলমানকেই দেওয়া হয় তা নয়। আভিজাত্যের সৃষ্টি হয়। মুসলমান সমাজ আর ডেমোক্র্যাটিক থাকে না।

ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি হিন্দুতে মুসলমানে নয়, হিন্দুতে হিন্দুতে, মুসলমানে মুসলমানে। সব উপরের স্তরে। নীচের স্তরে কারও সামনে কোনো লোভনীয় পদ বা মর্যাদা ছিল না। যে ভিস্তি সে ভিস্তিই। যে দর্জি সে দর্জিই। তেমনি যে তাঁতি সে তাঁতিই। যে কামার সে কামারই। নীচের স্তরে যেটা ছিল সেটা গোহত্যা নিয়ে দাঙ্গা বা সেই-জাতীয় ব্যাপার। ধর্মের লড়াই বলতে মধ্যযুগের ইউরোপের ইতিহাসে যা বোঝায়, যার জন্যে বহু লোক আমেরিকায় চলে গিয়ে স্বাধীনভাবে বিশ্বাস করতে চাইল, সে-জিনিস ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাসে অনুপস্থিত। বিশ্বাসের স্বাধীনতা এখানে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো নিত্য প্রবাহিত ছিল। মুসলমানরা বিশ্বাসের স্বাধীনতায় যেটুকু হস্তক্ষেপ করেছিল সেটুকু মানুষকে দেশছাড়া বা ঘরছাড়া করবার মতো নয়। হিন্দু রাজাদের উৎপীড়নে হিন্দুরা হিন্দুরাজ্য ছেড়ে পালিয়েছে, আবার ফিরে এসেছে। তেমন উৎপীড়নকে ধর্মের উৎপীড়ন বলে না। মুসলমান রাজারাই এদেশে ইসলামি রাষ্ট্র প্রবর্তনে আপত্তি করেন। রাজা মুসলমান হলেই রাষ্ট্র ইসলামি হয় না। দেশটাও তার উপযোগী হওয়া চাই। অধিকাংশ মুসলমান রাজার সেটুকু বাস্তবজ্ঞান ছিল। যাঁদের ছিল না তাঁদের বুদ্ধির ভুলে তাঁদের ধর্ম অশোকের আমলের বৌদ্ধ ধর্মের মতো রাজ-আনুকূল্য পেয়ে রাজ্যের স্থায়িত্বের অন্তরায় হল। ধর্মের বিস্তার ঘটল, কিন্তু রাজ্যের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যেতে লাগল। ফলে পলাশিতে পরাজয়।

আমি ইসলামের বিরুদ্ধে নই, ইসলামকে রাজধর্ম করার বিরুদ্ধে। তেমনি হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে নই, হিন্দুত্বকে রাজধর্ম করার বিরুদ্ধে। মারাঠাদের আমলে রাজধর্ম দস্যুধর্মে পরিণত হয় ও স্বধর্মীকে রক্ষণের নামে ভক্ষণ করে। বর্গির হাঙ্গামায় যত লোক পালিয়েছে তুর্কের হাঙ্গামায় তত লোক নয়। ইংরেজরা যে অত সহজে এদেশ করায়ত্ত করে তার প্রধান কারণ তারা তাদের ধর্মকে কোনোরকম বিশেষ মর্যাদা বা অগ্রাধিকার দেয় না। প্রথম থেকেই এই নীতি স্থির হয় যে, ইংরেজ সরকার সব ধর্মকে সমান মর্যাদা দেবে, কোনো ধর্মে হস্তক্ষেপ করবে না। এটার নজির আকবর দেখিয়েছিলেন, তাঁর আগেও এর নজির খুঁজলে পাওয়া যায়, কিন্তু এবার সমসাময়িক ইউরোপের নতুন সুরে বাধা। ইউরোপে ওটার নাম এনলাইটেনমেন্টের যুগ। লণ্ডন থেকে যাঁরা নীতি নিয়ন্ত্রণ করছিলেন তাঁরা ধর্মের যুগ পেরিয়ে এসেছেন, মধ্যযুগ থেকে বেরিয়ে এসেছেন। এদেশে যেটা কোনো একজন রাজা বা সম্রাটের ব্যক্তিগত উদারতা হিসেবে গণ্য ছিল সেটা এখন থেকে রাষ্ট্রের নৈর্ব্যক্তিক ভিত্তিশিলা হিসেবে পুরুষানুক্রমিক হল। একজন রাজা পরধর্মসহিষ্ণু হন তো তাঁর বংশধর পরধর্ম অসহিষ্ণু হন। কিংবা তিনি এক এক বয়সে এক এক মূর্তি ধরেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের হিন্দু বৌদ্ধ জৈন মুসলমান এক একজন রাজার এক এক নীতি। পাকাপাকিভাবে রাষ্ট্রের নৈর্ব্যক্তিক নীতি তা নয়। সেইজন্যে উদারচরিত রাজন্যদের সংখ্যা যত বেশিই হোক-না কেন তাঁদের কারও রাষ্ট্রকেই ধর্মনিরপেক্ষ বলা যায় না। সেকুলার বলা যায় না।

কেউ কেউ সেকুলারের অর্থ করেন ধর্মে নিরপেক্ষতা। সেটা ঠিক নয়। যে মানুষ ধর্মে নিরপেক্ষ তারও একটা নিজের ধর্ম থাকে। কিন্তু এমন তো হতে পারে যে তার কোনো ধর্মে বিশ্বাস নেই, সে অজ্ঞেয়বাদী বা নাস্তিক। ইংরেজ আমলে ধর্মে নিরপেক্ষতা ছিল, কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল না। নাস্তিক বা অজ্ঞেয়বাদীকে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে বা বিশিষ্ট রাজপদে অধিষ্ঠান করতে দেওয়া হত না। শপথ নিতে হত ভগবানের নামে। এমনকী পার্লামেন্টেও ব্র্যাডলকে বসতে দেওয়া হয়নি, তিনি শপথ নিতে রাজি হলেও তাঁকে নিতে দেওয়া হয়নি যেহেতু তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী নন। সেই ইংরেজই তো ছিল এদেশের হর্তাকর্তা বিধাতা।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পত্তন ইতিহাসের প্রাচীন বা মধ্যযুগে তো নয়ই, ইংরেজ আমলেও নয়। এটা কংগ্রেস আমলেরই বিশেষত্ব। এরজন্যে আমরা গর্ব অনুভব করতে পারি। আমাদের হাত দিয়েই বা ভোট দিয়েই এটা সম্ভব হয়েছে। একে রক্ষা করা আমাদের পরম দায়িত্ব। ধর্মের জন্যে কেউ যদি এ রাষ্ট্র ছেড়ে পালায় তবে সেটা আমাদের কলঙ্ক, আমাদের ওপর অনাস্থাসূচক।

এই নতুন রাষ্ট্রের ভিত্তিশিলা সর্বধর্মসহিষ্ণুতা তো বটেই, তার চেয়েও কিছু বেশি। এ রাষ্ট্র ধর্মের এলাকার বাইরে যারা থাকবে, তাদের প্রতিও সহিষ্ণু। না, তার চেয়েও বেশি। এ রাষ্ট্র তাদের নাস্তিক হবার, অজ্ঞেয়বাদী হবার অধিকারও মেনে নেয়। তারা যে যার নিরীশ্বরতায় অবিচল থেকে ধাপে ধাপে রাষ্ট্রীয় পদে আরোহণ করতে পারে। একদিন হয়তো দেখা যাবে যে রাষ্ট্রপতি নিরীশ্বরবাদী। তিনি না হিন্দু, না মুসলমান, না খ্রিস্টান, না শিখ, না পারসি, না বৌদ্ধ, না ইহুদি, না জৈন। হয়তো আরেকটি লেনিন কি স্টালিন। তাঁকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে এমন কোনো শপথবাক্য আমাদের সংবিধানে নেই।

আজকালকার পরিভাষায় যাকে কনস্টিটিউশন বলা হয়, আগেকার যুগে সেরকম কিছু বিবর্তিত হয়নি এদেশে। কিন্তু সেই যে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সেটাও এক হিসাবে একটা অলিখিত সংবিধান। মুসলমান আমলে সেটার অদলবদল হয়, কিন্তু পুরোপুরি রদ হয় না সেটা। ইংরেজ আমলে সেটা পাকাপাকিভাবে রদ হয়। তার বদলে দেখা দেয় আরেকরকম বন্দোবস্ত। এগজিকিউটিভ, জুডিশিয়াল, লেজিসলেটিভ এই তিন অঙ্গ। সব ক-টাই ইংরেজদের মুঠোর মধ্যে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে মুঠোর ভিতর থেকে বেরোয়। যাঁদের হাতে একটু একটু করে যায় তাঁরা প্রধানত হিন্দুসমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণির উচ্চশিক্ষিত স্তরের ব্যক্তি। তাঁদের প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলমান সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণির অনুচ্চশিক্ষিত স্তরের ব্যক্তি। সরাসরি প্রতিযোগিতায় না পেরে এঁরা ধর্মের নামে দাবি করতে শুরু করেন ও প্রশ্রয় পান। এইভাবে যে ঝগড়ার সূচনা তা ক্রমশ নীচের স্তরে সঞ্চারিত হয়, উপরের স্তরেও সংক্রামিত হয়। অভিজাতদের মধ্যে কোনোকালেই ধর্ম নিয়ে বিরোধ ছিল না। অন্তত মোগল আমলে তো নয়ই। এই সেদিন দেখা গেল। ইংরেজ চলে গেলে তার উত্তরাধিকারী কে হবে, এই নিয়ে বেঁধে গেল দুই শরিকের লড়াই। কিছুতেই মিটমাট হল না। উপর থেকে নীচ অবধি ফাটল। প্রত্যেকটি বিভাগ দু-ফাঁক। সৈন্য, পুলিশ, পেয়াদা, কেরানি, হাকিম।

আমরা স্বচক্ষে দেখলুম যে, আমাদের দেশ দু-চির হয়ে গেল। যে ফাটল তাকে দু-চির করতে পারল সেই ফাটলের মতো আরও দু-চারটি ফাটল কি তাকে চৌচির করতে পারত না? হিন্দুরাষ্ট্র হলে শিখরা কি বলত না, লড়কে লেঙ্গে শিখিস্থান? নাগা খ্রিস্টানরাও কি বলত না, লড়কে লেঙ্গে নাগাল্যাণ্ড? সিকিমের বৌদ্ধরাও কি বলত না, লড়কে লেঙ্গে স্বাধীন সিকিম? কাশ্মীরের মুসলমানরাও কি বলত না, লড়কে লেঙ্গে স্বাধীন কাশ্মীর?

যে যার ধর্মকে রাজধর্ম বা রাষ্ট্রধর্ম করতে চাইলে এদেশ দু-চির কেন, চৌচির হবে; চৌচির কেন, ছ-চির হবে। এই সর্বনাশা ফাটল দিয়ে আবার বাইরের শত্রু ঢুকবে। স্বাধীনতা বিপন্ন হবে। স্বাধীনতার জন্যে এতকালের তপস্যা ব্যর্থ হবে। এসব কথা চিন্তা করেই ভারতীয় ইউনিয়নের কনস্টিটিউশনে হিন্দু ধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম করা হয়নি। হিন্দুরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। সুতরাং অধিকাংশের ভোটে হিন্দুরাষ্ট্র পত্তন করা অনায়াসেই সম্ভব ছিল। কিন্তু ওটা একটা ফাঁদ। ওতে পা দিলে মৌর্য সাম্রাজ্য বা গুপ্ত সাম্রাজ্য বা হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য ফিরে পাওয়া যেত না। মাঝখান থেকে হারিয়ে যেত ভারতীয় জাতীয়তাবাদ, জাতীয়তাবাদী মুক্তিসংগ্রাম, জাতীয় মুক্তি, জাতীয় ঐক্য ও সংহতি। জাতীয়তার অর্থ এখানে হিন্দু জাতীয়তা নয়, হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রিস্টান পারসি নির্বিশেষে ও সবাইকে সমমূল্য দিয়ে ভারতীয় জাতীয়তা। যে জাতীয়তা শিখকে বলে এটাও তোমারই স্থান, আলাদা একটা স্থান নিয়ে কী করবে? যে জাতীয়তা নাগা খ্রিস্টানকে বলে, এটাও কি তোমার ল্যাণ্ড নয়? স্বাধীন নাগাল্যাণ্ড নিয়ে কী করবে? যে জাতীয়তা কাশ্মীরি মুসলমানকে বলে, এটা হিন্দুস্তান নয়, এটা ইন্ডিয়া, এখানে তুমি চিরকাল ছিলে, চিরকাল থাকবে। স্বাধীন কাশ্মীর নিয়ে কী করবে, কেনই-বা পাকিস্তানে যোগ দেবে?

সেকুলারিজম ভারতের সীমান্ত রক্ষা করছে। শুধুমাত্র বন্দুক কামান যা না-পারে একটি কলমের খোঁচা তা পারে। একটি শব্দ তা পারে। সেকুলারিজম তেমনি একটি কলমের খোঁচা। তেমনি একটি শব্দ। একে ওলটপালট করে দাও, দেখবে সীমান্তবর্তী অহিন্দু অঞ্চলগুলি এক এক করে খসে যাবে, যারা ছিল ঘরের লোক তারাই হবে বাইরের শত্রু। হিন্দুরাষ্ট্র অনায়াসেই সম্ভব, পার্লামেন্টের দুই-তৃতীয়াংশ ভোট তাকে

যেকোনো দিন সম্ভব করতে পারে। কিন্তু তার পরের দিন তার সীমান্তগুলিতে ভাঙন ধরবে। হিন্দুরাষ্ট্র নিজেই নিজেকে কোণঠাসা করবে। অভ্যন্তরে অহিন্দু যারা থেকে যাবে তারাও অশান্ত হবে। তারা দাবি করবে চাকরিবাকরিতে আনুপাতিক অংশ ও তার উপর ওয়েটেজ। তারপর দাবি করবে স্বতন্ত্র নির্বাচন, সেক্ষেত্রেও ওয়েটেজ। তারপর দাবি করবে মন্ত্রীমন্ডলীতে স্থান, কংগ্রেসি হিসেবে নয়, কংগ্রেস ভিন্ন অন্য এক সাম্প্রদায়িক দলের সদস্যরূপে। এগজিকিউটিভ, জুডিশিয়াল, লেজিসলেটিভ, সর্বত্র ফাটল ধরবে। দেশ অরাজক হবে। পুলিশ বা মিলিটারি যা না-পারে সেকুলার স্টেট তা পারে। সীমান্তরক্ষা তথা শান্তিরক্ষা।

সেকুলার স্টেট ভারতের ইতিহাসে একটি নতুন এক্সপেরিমেন্ট। এ যদি হিন্দুদের মনে না বসে, যদি শুধু মুখের বুলি হয়, যদি তাদের মনের কথাটা হয় হিন্দু আধিপত্য, যার অন্য নাম ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বেনিয়া মনোপলি, তাহলে ভিতরের সত্যটা একদিন-না-একদিন বাইরে ফুটে বেরোবে। কী করে মনে বসবে, যদি যুগ সম্বন্ধে কোনো ধারণা তাদের না থাকে? যুগটাই ফরাসি বিপ্লবের সময় থেকে রাজতন্ত্র তথা ধর্মতন্ত্র তথা উভয়ের মণিকাঞ্চনযোগে বিশ্বাস হারিয়েছে। ইংরেজ চলে গেছে বলে যুগটা তো চলে যায়নি। যুগের হাওয়া থেকে কোনো দেশই মুক্ত নয়। ভারতের স্বাধীনতার অর্থ যুগের হাত থেকে মুক্তি নয়। আমরা বরং আমাদের যুগের সঙ্গে আরও অবাধে যুক্ত হবার সুযোগ পেয়েছি। এ হাওয়া যে বার্তা বহন করে এনেছে তার অনুরূপ অতীতের আর কোনো যুগে শোনা যায়নি। না মহাভারতের যুগে, না মৌর্য যুগে, না গুপ্ত যুগে, না মুঘল যুগে। যাকে আমরা ব্রিটিশ যুগ বলে জানি সেটা একটা বৃহত্তর যুগের অঙ্গ। এ যুগ ভারতকে বিশ্বের মধ্যে ও বিশ্বকে ভারতের মধ্যে সঞ্চারিত করেছে। আমাদের অতীত বিচ্ছিন্ন হতে পারে, বর্তমান বিচ্ছিন্ন নয়, ভবিষ্যৎ বিচ্ছিন্ন থাকবে না। এ যুগের যা শিক্ষা তাকে অন্তর থেকে গ্রহণ করতে হবে।

একদিন পাকিস্তানের মুসলমানরাও করবে। তারজন্যে ধৈর্য ধরতে হবে। ওরা যদি সেকুলার নাও হয় তবু আমরা হব। সেইভাবে আমরা অন্যান্য অগ্রসর দেশগুলির সঙ্গে পা মিলিয়ে নেব। পাকিস্তানের অনুকরণে ধর্মরাষ্ট্র প্রবর্তন নয়, সেকুলার স্টেট অগ্রগতির শর্ত।

সম্পাদকের সঙ্গে আমি একমত নই যে পশ্চিমবঙ্গে সেকুলার মানসিকতা বিরাজমান। সর্বাধিক প্রচারিত সংবাদপত্র কীসের সাক্ষ্য দেয়? বারোয়ারি দুর্গা পূজা, কালী পূজা, বিশ্বকর্মা পূজা এমনকী শীতলা পূজার এমন উৎকট প্রাদুর্ভাব ইংরেজ আমলেও তো দেখিনি। সরকারি অফিসে ও থানাতেও আজকাল পূজাপার্বণ হয়। রাষ্ট্রের যাঁরা কর্ণধার তাঁরা তাঁদের কর্ণ গুরুমহারাজদের হাতে সঁপে দিয়েছেন দেখা যায়। দিল্লিতে না কি হেন মন্ত্রী নেই যাঁর জ্যোতিষী নেই। বছরের ক-টা দিন কাজকর্ম হয়? সম্প্রদায়ের—প্রধানত হিন্দুদের—ধর্মকর্মের জন্যে ছুটি। সরকারি কর্মচারীরা ভুলে যান যে তাঁদের মাইনে জোগায় সব সম্প্রদায়ের লোক। কালী পূজার উদ্বোধন কি বেসরকারি ব্যক্তিদের দিয়ে হত না? সম্পাদকের প্রশ্নের উত্তরে বলি, কাশ্মীরের বোমাবর্ষণ বিমানবন্দর প্রভৃতি সামরিক লক্ষ্যবস্তুর ওপর নিবদ্ধ ছিল বলেই জানি। অসামরিক জনতার ওপর দুটো-একটা বোমা পড়ে থাকলে সেটা আকস্মিক। জনতা যেখানে মিশ্র সেখানে বিপদ অপেক্ষাকৃত কম।

টোমাস মান শতবার্ষিকী

মধ্যযুগের জার্মানিতে ধনপতি সওদাগরদের একটি সংঘ ছিল। হান্স সংঘ বা হানসিয়াটিক লিগ। সেই লিগের শাসনাধীন ছিল কয়েকটি সামুদ্রিক বন্দর শহর। তাদের অবস্থান সাম্রাজ্যের ভিতরে অথচ তাদের বাণিজ্য সাম্রাজ্যের বাইরে। এমনই এক হানসিয়াটিক বন্দর শহরের নাম লুএবেক। এরই এক পুরাতন সওদাগর বংশে টোমাস মানের জন্ম। তাঁর পিতা সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার থেকে না হোক দক্ষিণ আমেরিকা থেকে সুন্দরী বধূ ঘরে এনেছিলেন। টোমাসের মাতৃকুল জার্মান নয়। স্প্যানিশ বা পোর্তুগিজ ঔপনিবেশিক ঘরানা। শোনা যায় তাঁদের কেউ একজন রেড ইন্ডিয়ান বিবাহ করেছিলেন। দক্ষিণ আমেরিকায় এটা এক পুরাতন রীতি। এতে কারও সম্ভ্রমহানি হয় না। খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি গ্রহণ করলে পরে বর্ণ একটা সমস্যা নয়।

টোমাসের পিতৃকুল নিরেট বুর্জোয়া। সমৃদ্ধি, সম্মান, শৃঙ্খলাবদ্ধ সামাজিক জীবন, অনিন্দনীয় আচরণ, পিউরিটান নীতি এইসব তাঁদের লক্ষ্য। ব্যবসাবাণিজ্যে অবহেলা, অর্থোপার্জনের অনীহা, শৃঙ্খলাহীন অসামাজিক জীবন, সংগীতে বা সাহিত্যে মনোযোগ, সৌন্দর্যের জন্যে ঘরসংসার ত্যাগ এসব তাঁদের কাছে দুর্বোধ্য ও দুরাচরণীয়। তিন শতাব্দীর পৈতৃক বাসভবনে এমন অঘটন কখনো ঘটেনি। কারণ মাতৃকুলও ছিল পিতৃকুলের অনুরূপ। নববধূর সঙ্গে সঙ্গে এল নতুন কেতা। বাড়িতে শ্রী এল। কিন্তু সৌভাগ্য চলে গেল। পতন হল বাণিজ্যের। মৃত্যু হল কর্তার। সম্পত্তি বিক্রি করে মান পরিবার প্রস্থান করলেন উত্তরের বন্দর শহর থেকে দক্ষিণের রাজ্য-রাজধানী মিউনিখ নগরে।

শিল্প-সংগীত-সাহিত্যের জন্যে মিউনিখ প্রসিদ্ধ। প্যারিসের দিকে ওর এক মুখ, আর এক মুখ ভিয়েনার দিকে। কিছুকাল ইটালিতে কাটিয়ে এসে মিউনিখেই টোমাস বসতি করেন ও জীবিকার জন্যে বেছে নেন সাহিত্যিক জীবন। বাইশ বছর বয়সে শুরু করে পঁচিশ বছর বয়সে শেষ করেন *বুডেনব্রুকস* নামক যে বিরাট উপন্যাস সে-গ্রন্থ প্রকাশিত হতে-না-হতেই জার্মান সাহিত্যের একটি ক্ল্যাসিক বলে গণ্য হয়। যশ আর অর্থ, গৃহিণী আর গৃহ তাঁর প্রতিষ্ঠা পরিপূর্ণ করে। সেই যে তিনি উঠলেন তারপরে আর পড়লেন না। প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সে প্রকাশিত হয় *ম্যাজিক মাউন্টেন*। প্রকাশের পাঁচ বছরের মধ্যেই বহন করে নিয়ে আসে সাহিত্যের জন্যে নোবেল প্রাইজ ও বিশ্বখ্যাতি। তিনিই দ্বিতীয় জার্মান সাহিত্যিক যাঁকে এই সম্মান প্রদান করা হয়। প্রথম জন গেরহার্ড হাউপ্টমান। ততদিনে হাউপ্টমানের দেহান্ত হয়েছে। সুতরাং টোমাস মানই হন অদ্বিতীয়।

এখানে বলে রাখি যে, টোমাসের অগ্রজ হাইনরিখও ছিলেন সমসাময়িক ঔপন্যাসিকের মধ্যে সমান শক্তিশালী। হাইনরিখ বাস করতেন বার্লিনে। আর বার্লিনের জীবন ছিল মহারাজধানীর আরও বিচিত্র জীবন। সেদিক থেকে হাইনরিখের সৌভাগ্য বেশি। এ যেন গভীরতরের সঙ্গে উদারতরের প্রতিযোগিতা। অনেক দিন পর্যন্ত অনিশ্চিত ছিল কোন ভাই কোন ভাইয়ের কাছে হারবেন। কিন্তু নোবেল প্রাইজের পর আর সন্দেহ রইল না যে, ছোটোভাই মিউনিখে বসে বার্লিনবাসী বড়োভাইয়ের চেয়ে অধিকতর সম্মানের অধিকারী।

কিন্তু নিয়তির এমনই কৌতুক যে এর চার বছরের মধ্যেই দুই ভাইকেই দেশত্যাগ করতে হয়। যঃ পলায়তি সঃ জীবতি। হিটলারের ক্রোধ থেকে। তিন শতাব্দীর বনেদি জার্মান যাঁরা তাঁরা আর জার্মান বলে পাঙক্তেয় নন। কারণ তাঁদের রক্ত বিশুদ্ধ আর্যরক্ত নয়। টোমাস আবার ইহুদি কন্যা বিবাহ করে আরও কয়েকটি অশুদ্ধ আর্যসন্তানের জনক। আর হাইনরিখ তো পাকা সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট। নাতসিদের চক্ষুশূল। হিটলার যেখানে সর্বেসর্বা সেখানে বাস করা মানে জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ। হাইনরিখ কোথায় যান জানিনে, কিন্তু টোমাস প্রথমে যান সুইটজারল্যাণ্ডে ও সেখানে কয়েক বছর থেকে তারপরে আমেরিকা

যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় নেন। আরও কয়েক বছর বাদে সেদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। হিটলারের পতনের পরে আবার যখন স্বদেশে ফিরে আসেন তখন দেখেন দেশ হয়েছে দু-ভাগ। তাঁর সাহিত্যগুরু গ্যেটে আর শিলারের কর্মক্ষেত্র পড়েছে পূর্ব জার্মানিতে। আর পশ্চিম জার্মানিতে তাঁর নিজের কর্মক্ষেত্র। তিনি পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির প্রতি সমান অনুরক্ত এটা পশ্চিম জার্মানির লোক পছন্দ করে না। তা ছাড়া তিনি যে যুদ্ধকালে শত্রুশিবিরে ছিলেন এটাও দেশানুরাগীরা ভালো চোখে দেখেন না। তাঁকে আবার চলে যেতে হয় সুইটজারল্যাণ্ডে। সেখানেই তিনি তাঁর জীবনের কাজ শেষ করেন। অবশ্য কিছু অসমাপ্ত রয়ে যায়। এখানে বলে রাখি যে, তাঁর মিউনিখের ঘরবাড়ি টাকাকড়ি হিটলার অনেক আগেই বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। কেড়ে নিয়েছিলেন তাঁর জার্মান নাগরিকত্ব। আমেরিকান নাগরিকত্ব গ্রহণ করার আগে তাঁকে দীর্ঘকাল অনাগরিক অবস্থায় কাটাতে হয়। নাৎসিরা পুড়িয়ে ফেলে *বুডেনব্রুকস*।

জার্মানি একদা আরও বৃহৎ ছিল। তার কেন্দ্রভূমি ছিল অস্ট্রিয়া। অস্ট্রিয়ার রাজবংশ তথা অভিজাতকুলে যাঁদের জন্ম তারা কেউ বিশুদ্ধ আর্যরক্তের অধিকারী ছিলেন না। বিশুদ্ধ আর্যরক্তের ওপর বিশুদ্ধ জার্মানত্ব নির্ভর করে এই আইডিয়াটা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের প্রাশিয়াকেন্দ্রিক জার্মানির। মান-এর জন্মস্থান লুএবেক ও কর্মস্থান মিউনিখ ছিল প্রাশিয়ান আধিপত্যের কেন্দ্রস্থল থেকে দূরে দুই প্রান্তে। সেখানকার লোক কারও চেয়ে কম জার্মান নয়, কিন্তু তাদের জার্মানত্বের সংজ্ঞা নাৎসি আমলের মতো সংকীর্ণ নয়। তাই যদি হত তবে *বুডেনব্রুকস* জার্মান জাতির একটি জাতীয় গ্রন্থ বলে ত্রিশ বছর ধরে সমাদৃত ও ঘরে ঘরে পঠিত হত না। তার অপরাধ রক্তগত, জার্মানত্বের থিসিসের সঙ্গে তার মেলে না। যে থিসিস জার্মানিকে যুদ্ধে টেনে নিয়ে গিয়ে হারিয়ে দিয়ে দু-ভাগ করে ছাড়ল সে-থিসিস টোমাস মান বা হাইনরিখ মানদের মতো বড়ো জার্মানদের থিসিস নয়, সে-থিসিস হিটলারের মতো ছোটো জার্মানদের থিসিস। জার্মানিকে ছোটো করে দিয়ে গ্যেটের জন্মস্থান ফ্রাঙ্কফুর্টকে করে দিল তাঁর কর্মস্থান ভাইমারের থেকে বিচ্ছিন্ন।

নোবেল প্রাইজ পাবার পূর্বেই টোমাস মান তাঁর জার্মান জাতীয়তাবাদী মানসিকতার ঊর্ধ্বে ইউরোপীয় সভ্যতার অভিন্ন চেতনায় উপনীত হয়েছিলেন। তাই তাঁর *ম্যাজিক মাউন্টেন* ছিল জার্মান সাহিত্যের তথা ইউরোপীয় সাহিত্যের একটি শৈলশিখর। জার্মানিতে নয়, সুইটজারল্যাণ্ডে তার উপস্থাপনা। একটি স্যানাটোরিয়ামে সমবেত হয়েছে ইউরোপের বিভিন্ন জাতির যক্ষ্মারোগী ও তাদের বন্ধুবান্ধব। জার্মানির ঘরোয়া সমস্যাকে অতিক্রম করেছে ইউরোপের জটিল ও দুরারোগ্য সমস্যা। এ গ্রন্থের যিনি গ্রন্থকার তিনি ইউরোপকে নিয়েই চিন্তিত ও শঙ্কিত। ইউরোপের সেটা প্রথম মহাযুদ্ধের পুরোগামী যুগ। বুর্জোয়াদের স্বর্ণযুগ বললেও চলে। কে জানত তার ভিতরে রয়েছে ব্যাধিবীজ! ভিতর থেকে কুরে কুরে খাচ্ছে। ইতিপূর্বে *ভেনিসে মৃত্যু* লিখে মান তার পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। সেটিও একটি অনবদ্য সৃষ্টি। সে-কাহিনি পড়লেই বোঝা যায় সেখানে যার নাম কলেরা এখানে তার নাম যক্ষ্মা। আর ব্যাধিটা ভিতরের।

ইউরোপীয় স্তরে উত্তীর্ণ হবার পরেও মান তাঁর নোবেল প্রাইজ গ্রহণকালীন ভাষণে ঘোষণা করেন যে, তিনি জার্মান জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। জার্মানি তখন প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজিত শুধু নয়, যুদ্ধাপরাধে অপরাধী ও লিগ অফ নেশনস থেকে একঘরে। তার স্বপক্ষে দাঁড়িয়ে আন্তর্জাতিক সমাবেশে দুটি কথা বলারও জো ছিল না। তাই প্রথম সুযোগেই মান স্বদেশের স্বপক্ষে দুটি কথা বলেন। জার্মানিকে তখনও ক্ষমা করেনি যারা তারা বিরক্ত হয়। কিন্তু জার্মানদের তো বিরূপ হবার কথা নয়। তবু তারাই বা তাদের একদলই হল তাঁর দেশত্যাগের হেতু। নিয়তির এমনই বিড়ম্বনা!

মান ইতিমধ্যে ইউরোপকেও অতিক্রম করেছিলেন। মানবসভ্যতার অন্যতম মূলগ্রন্থ ইহুদিদের পুরাতন টেস্টামেন্ট। তার একটি অসাধারণ অংশ যোসেফের উপাখ্যান। মান সেটিকে পুনর্লিখনের ও পুনর্ব্যাখ্যানের দায় নেন। জার্মানিতে বাস করে হিটলারি আমলে ইহুদিদের অতীতকে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অবলোকন কি নির্বিবাদে সম্ভবপর হত! বিশেষত চার ভলিয়ুম জুড়ে এপিক আকারে। এ কীর্তি ইউরোপের অতীত ও বর্তমানের সঙ্গে জড়িত হলেও কালোত্তর ও মহাদেশোত্তর। প্রথম তিন ভাগ সুইটজারল্যাণ্ডের নির্বাসনে বসে

লেখা। শেষ ভাগ আমেরিকায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে। তাঁর জীবনের এই কীর্তিই বোধ হয় পরম কীর্তি। এরপরে তিনি আর এর চেয়ে উচ্চে উঠতে পারেননি।

তবে আমেরিকায় থাকতেই তিনি তাঁর স্বদেশ সম্বন্ধে নির্ভয়ে ও মুক্তকণ্ঠে স্পষ্ট কথা বলে শেষ করেন। *ডকটর ফাউসটাস* রূপক আকারে জার্মানিরই উত্থান ও পতনের ইতিকথা। চিরকালের জার্মানির নয়, আধুনিক জার্মানির। ফাউস্ট যেমন তার উচ্চাভিলাষ পূরণের জন্যে শয়তানের সঙ্গে চুক্তি করেছিল ও আপনার আত্মাকে হারিয়েছিল, আধুনিক জার্মানিও তেমনি। নায়ক একজন সংগীতকার। উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে স্বেচ্ছায় তিনি সিফিলিস রোগে আক্রান্ত হন। মহাত্মা গান্ধীও তো আধুনিক সভ্যতাকে এক কালব্যাধির সঙ্গে তুলনা করেছেন। ইংল্যাণ্ড যার দ্বারা স্বেচ্ছায় আক্রান্ত হয়েছে। ভারতকেও সংক্রামিত করতে চেয়েছে।

মান তাঁর বক্তব্য প্রতিপাদনের জন্যে বার বার মারাত্মক রোগের আশ্রয় নিয়েছেন। অথচ তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের অধিকারী। আশি বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। সে-বয়সেও তাঁর কী ঋজু বলিষ্ঠ সুঠাম শরীর! আর কী ফুর্তি! চোখে দেখিনি, ফিলমে দেখেছি। যেদিন আমরা পশ্চিমবঙ্গ পিইএন সংস্থার তরফ থেকে কলকাতার ম্যাক্সমুলার ভবনে তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করি সেদিন। তাঁর বিধবা পত্নী কাতিয়া এখনও জীবিত। ফিলমে তাঁকে দেখা গেল। তিনি বলেন, তাঁরা কেউ বিশ্বাসই করতেন না যে হিটলার কখনো জার্মানির সর্বেসর্বা হবেন। আশ্চর্য! হিটলারও তো মিউনিখবাসী। মান তাহলে কতটুকু মানুষের সঙ্গে মিশতেন বা আশেপাশের খবর রাখতেন! মানস সরোবরেই তাঁর বিহার। সে-সরোবর সমতল থেকে অনেক উচ্চে।

কিন্তু সমকাল থেকে কী পরিমাণ উচ্চে তা ঠাহর করা শক্ত। সে-জার্মানি আর নেই, সে-ইউরোপও কি আর আছে? আর ইউরোপের সেই বুর্জোয়া শ্রেণি তার পশ্চিমাংশে এখনও বিভবশালী হলেও সংঘবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণির বর্ধিত হারে মজুরির দাবি মেটাতে গিয়ে মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে তাল রাখতে অক্ষম। তিন শতাব্দীর একটি বনেদি বার্গার পরিবার কেন, শত শত বার্গার পরিবার এখন দেউলে হতে বসেছে। টোমাস মান তাঁর আটাশ বছর বয়সে লেখা *টোনিও ক্রোএগার* গল্পে তাঁর নিজের সমস্যাটা চমৎকারভাবে তুলে ধরেছিলেন। পিতৃপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে তিনি কোনোদিন আর্টিস্ট হতে পারতেন না। সেটা নিরেট বুর্জোয়ার ঐতিহ্য নয়। তাতে না আছে অর্থ, না আছে কৌলীন্য। কবি বা চিত্রকর বা সংগীতকার বলে লোকের কাছে পরিচয় দেওয়া লজ্জাকর। তাদের জীবন যেন জিপসির জীবন—ছন্নছাড়া ভবঘুরে উচ্ছৃঙ্খল। কোনো ভদ্রলোকের ছেলে কখনো সাধ করে আর্টের পেছনে ছোটে! সে হয় অধ্যাপক, আইনজীবী, ডাক্তার, সিভিল বা মিলিটারি অফিসার, ব্যাঙ্কার, ইঞ্জিনিয়ার, কোম্পানি পরিচালক বা পলিটিশিয়ান। লোকে এঁদের দেখলে টুপি তুলে অভিবাদন করে। এঁদের তুলনায় একজন ঔপন্যাসিক বা নাট্যকারের পোজিশনটা কী! সফল হলে হাতে দুটো টাকা আসে। নয়তো অদ্যভক্ষ্য অবস্থা। কেই-বা এঁদের বিয়ে করতে, এঁদের ঘরসংসার করতে, এঁদের সন্তানের জননী হতে ইচ্ছুক! নিজে চরিত্রহীন হয়ে একাধিক চরিত্রহীনার সঙ্গে রাত কাটানো কি কাউকে তৃপ্তি দিতে পারে?

মাতৃকুল থেকে মান পেয়েছিলেন তাঁর শিল্পে ও সৌন্দর্যে সর্বগ্রাসী আগ্রহ, কিন্তু সে-আগ্রহ তাঁর পক্ষে সর্বনাশা হতে পারত, যদি-না তিনি তাঁর পিতৃকুলের পরিশ্রমী, সংযত, পিউরিটান, হিসাবি জীবনযাত্রার আদর্শে অবিচলিত থাকতেন। সমসাময়িক সাহিত্যিক গোষ্ঠীগুলির ওপর তিনি বীতশ্রদ্ধ হন। কিন্তু এর উলটো দিক হল জীবনবৈচিত্র্য থেকে স্বেচ্ছায় দূরে সরে থাকা। লেখার ভাগটা বেড়ে যায়। দেখার ভাগটা কমে যায়। ফাঁক ভরাতে হয় কল্পনা দিয়ে। কল্পনার দৌড় জীবনের দৌড়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে কি? মানের সৃষ্টি দুরূহ থেকে দুরূহতর হয়ে ওঠে। জীবনটাও অপেক্ষাকৃত নিঃসঙ্গ থেকে নিঃসঙ্গতর। তাঁর ভিতরে যে বোহেমিয়ান ছিল, তাকে তিনি শক্ত হাতে দমন করেন। তবু সে অদম্য, তাই তাঁর রচনার একটা হালকা দিকও ছিল। ছোটো ছোটো নভেলে বা গল্পে তার প্রকাশ।

কাইজারের জার্মানিতে রক্ষণশীল, ভাইমার রিপাবলিকে গণতন্ত্রী, অথচ সমাজতন্ত্রী নন, হিটলারি জমানায় আরও উদার, তিনি ছিলেন সামাজিক তথা রাজনৈতিক বিবর্তনে প্রগতিশীল। কিন্তু দেশ-বিদেশের

ইন্টেলেকচুয়ালদের কাছে লোকে যে লিডারশিপ প্রত্যাশা করে স্বকালের একজন অগ্রগণ্য ইন্টেলেকচুয়াল হয়েও মান সেরকম কোনো নেতৃত্ব দিয়ে যাননি। যেমন দিয়েছিলেন টলস্টয় বা ইবসেন, বার্নার্ড শ বা রম্যাঁ রলাঁ। এই পর্যন্ত বলা যেতে পারে যে, তিনি কখনো কারও মুখ চেয়ে বা মন জুগিয়ে লেখেননি। লিখেছেন নিজের শর্তে। ধনাগম হোক আর না-ই হোক। নামযশ হোক আর না-ই হোক। যেটি লিখবেন সেটি নিখুঁত হবে, এই তাঁর সাধ আর সাধনা, এইখানেই তাঁর সিদ্ধি আর ঋদ্ধি। উজ্জ্বল এক দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন মান। এমন এক বিক্ষুব্ধ দেশে আর কালে জন্মগ্রহণ ও জীবনধারণ করে দেশ থেকে দেশে বিতাড়নের মাঝখানে স্বকীয় লক্ষ্যে সর্বদা তন্ময় থাকাও কি একপ্রকার নেতৃত্ব নয়? কোথায় আমরা পাচ্ছি তাঁর দোসর? রম্যাঁ রলাঁও রাজনৈতিক কারণে দেশান্তরি হয়েছিলেন, কিন্তু বিদেশে বসে অখন্ড একাগ্রতার সঙ্গে 'মন্ত্রমুগ্ধ আত্মা' লিখতে পারেননি। সমসাময়িক ইউরোপের তথা বিশ্বের প্রত্যেকটি সমস্যা তাঁকে চিন্তান্বিত করেছিল। মান তাঁর তুলনায় স্বক্ষেত্রে অগ্রসর।

তবে মানের কোনো সৃষ্টি তাঁর সমসাময়িক ফরাসি কথাশিল্পী মার্সেল প্রুস্তের *বিগত কালের স্মৃতি*র মতো কালজয়ী হবে কি না সন্দেহ। এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের নাম করতে হলে প্রুস্তের সেই কীর্তিও উল্লেখ করতে হয়। যদিও তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়নি। দেবার সম্ভাবনাও ছিল না। কারণ বই শেষ করতে-না-করতেই তাঁর জীবন শেষ হয়। সে-সময় কেউ চিনতেও পারেনি তাঁকে। বুঝতেও পারেনি কী তিনি করে গেলেন। আর একখানি কালজয়ী উপন্যাসেরও উল্লেখ করা উচিত। জেমস জয়েস রচিত *ইউলিসিস*। জয়েসও ছিলেন দেশান্তরি। সেটা কিন্তু রাজনৈতিক কারণে নয়। প্রুস্তেরও তেমন দুর্ভাগ্য হয়নি। তাঁর দুর্ভাগ্য তাঁর শ্বাসরোগ। শয্যাশায়ী অবস্থায় তিনি লিখতেন। সঙ্গিনীও ছিলেন না তাঁর। মান সেদিক থেকে ভাগ্যবান।

সমালোচক হিসেবেও মানের খ্যাতি ছিল। টলস্টয়, গ্যেটে, শিলারের উপর তাঁর প্রবন্ধ প্রণিধানযোগ্য। এঁরাই ছিলেন তাঁর সাহিত্যগুরু। একলব্যের মতো মনে মনে তিনি এঁদের শিষ্য হতে, সমানধর্মা হতে, উত্তরসূরি হতে সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। পারলে হয়তো সমকক্ষ হতেন। কিন্তু সে কি সহজ কথা! তবে তাঁর স্বদেশের সমসাময়িক সাহিত্যাচার্যদের মধ্যে তিনিই শীর্ষস্থানীয়।

যুবক টোনিওর অন্তর্দ্বন্দ্বের কাহিনি শুনে তার রুশ শিল্পী বান্ধবী লিজাবেথা বলেছিলেন, 'তুমি একজন ভুল পথে চলা বুর্জোয়া। A bourgeois manque।' কথাটা বোধ হয় মানের বেলাও খাটে।

আমার সাহিত্যিক বিকাশ : উৎকল পর্ব

মোগলরা যখন ওড়িশা জয় করে নেয় তখন তাদের রাজকার্যের সুবিধার জন্যে ফারসি জানা কর্মচারীর দরকার হয়। তা ছাড়া এমন কর্মচারীর দরকার হয় যিনি মোগল প্রশাসন পদ্ধতিতে অভিজ্ঞ। রাজা টোডরমলের সঙ্গে কাজ করতে করতে সেরকম অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন হুগলি জেলার কোতরংনিবাসী আমার পূর্বপুরুষ। ওড়িশার রাজস্ব বন্দোবস্ত সারা হলে তিনি সেইখানেই বসবাস করতে শুরু করেন। রাজসরকার থেকে মিলে যায় জাহাঙ্গিরি তালুক। পুরুষানুক্রমে লাখেরাজ প্রধানত বালেশ্বর জেলায়। বংশের নাম হয় মহাশয় বংশ।

মোগল আমলের মতো ইংরেজ আমলেও ঘটে অনুরূপ ঘটনা। এবার ফারসি জানা কর্মচারীর নয়, ইংরেজি জানা কর্মচারীর বা উকিলের দরকার। সেইসূত্রে ওড়িশায় গিয়ে বসবাস করেন আমার মাতৃকুল। এঁদের আদিনিবাস কোথায় ছিল জিজ্ঞাসা করিনি। তবে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের বংশ এঁদের আত্মীয়। তার থেকে অনুমান হয় এঁরাও কলকাতার কাছাকাছি অঞ্চল থেকে স্থানান্তরী হন। এঁদের চালচলনও তার প্রমাণ। কলকাতার আধুনিকতম রেওয়াজ কী তা জানতে হলে এঁদের ওখানে যাওয়াই যথেষ্ট। দুই পরিবারের মাঝখানে দুই শতাব্দীর ব্যবধান। আমার মাতুলালয় কটকে। বাবা কাজ করতেন ঢেঙ্কানল রাজসরকারে।

বাংলাদেশ থেকে সামাজিক বা সাংস্কৃতিক কোনো অর্থেই বিচ্ছিন্ন না হলেও আমার পিতৃকুল স্বেচ্ছায় ও সানুরাগে ওড়িশার সঙ্গে একাত্ম হয়েছিলেন। ওড়িয়া বলে পরিচয় না দিলেও ওড়িয়াদের সঙ্গেই ছিল তাঁদের অন্তরের মিল। ওড়িয়ারাও তাঁদের পর মনে করতেন না। এঁদের বাড়ি ছিল ওঁদের বাড়ি। ওঁদের বাড়ি ছিল এঁদের বাড়ি। পরস্পরের সঙ্গে আত্মীয় সম্পর্ক পাতিয়ে তাঁরা একান্ত অন্তরঙ্গ বোধ করতেন। ভাষা এক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করত না। প্রত্যেক বাঙালিই ওড়িয়া জানতেন। শিক্ষিত ওড়িয়ারা তো বাংলা জানতেনই, অশিক্ষিতরাও বাংলা কীর্তন গাইতেন। বাদী পালা বলে একরকম কবিগান ছিল। তার ভাষা বাংলা। গাইয়েরা সবাই ওড়িয়া যাত্রায় বা নাটকে অভিনয় করতেন। ওড়িয়া ভাষা ও সাহিত্যের ওপর তাঁদের ঠিক ততখানি টান ছিল যতখানি বাংলার ওপর। তাঁদের বাড়িতে *কাশীদাসী মহাভারত*, *কৃত্তিবাসী রামায়ণ*, *কবিকঙ্কণ চন্ডী*-ও পড়া হত, *বৈষ্ণব পদাবলী*-ও গাওয়া হত, আবার উপেন্দ্র ভঞ্জ ও অভিমন্যু সামন্তসিংহারের *ছান্দ* অনুশীলন করা হত।

এই হল মোগল আমলের বাঙালিদের ঐতিহ্য। ইংরেজ আমলের বাঙালিদের ঐতিহ্য অন্যরূপ। প্রাচীন ওড়িয়া সাহিত্য তাঁদের কাছে গ্রিক। অথচ অত বড়ো রসের খনি আর নেই। আধুনিক কাব্য—তা সে বাংলাই হোক আর ওড়িয়াই হোক—এর কাছে স্বাদহীন। ওড়িয়ারা যে তাদের প্রাচীন সাহিত্যের জন্যে গর্বিত এর কারণ তাদের সাহিত্যও তাদের শিল্পের সঙ্গে একই সুরে বাঁধা। তবে তাদের ভুলটা এইখানে যে আর একটা কোণার্ক বা ভুবনেশ্বরের মন্দির যেমন চাইলেই গড়া যায় না, আর একটি রসসাহিত্যও তেমনি চেষ্টা করলেই রচা যায় না। শুধু 'ছান্দ' সাজিয়ে গেলেই হয় না। রাধানাথ রায়, মধুসূদন রাও, ফকিরমোহন সেনাপতি বুঝতে পেরেছিলেন যে প্রাচীনের দিন গেছে। তাকে ফিরিয়ে আনার প্রয়াস বৃথা। তারচেয়ে আধুনিক বাংলার মতো আধুনিক ওড়িয়া গদ্য ও পদ্য প্রবর্তন করা শ্রেয়। হয়তো রসের ভাগ কম পড়বে, নীতির ভাগ বেশি হবে। তবু সেই একমাত্র পথ। অন্য পন্থা নেই।

আমার ছেলেবেলায় আমাকে অবধানের পাঠশালায় পাঠানো হয়। সেখানেই বোধ হয় 'কেশব কোইলী' সুর করে পড়তে শিখি। আদিমতম ওড়িয়া 'ছান্দ'। কিন্তু স্কুলে গিয়ে যে ওড়িয়া কবিতার সঙ্গে পরিচয় হয় তার সুর জানানো সত্ত্বেও কেউ সুর করে পড়ত না। আমিও শিখিনি। তবে আধুনিক কবিতাও সুর করে পড়ার

প্রথা তখনও যায়নি। স্কুলের বাইরে শুনেছি। আমাদের যুগেই এ অভ্যাস উঠে যায়। আমরা যখন লিখি তখন পড়ার মতো করে লিখি, গাওয়ার মতো করে নয়। তবু তো ছন্দ মিল রেখে লিখেছি। এখন যাঁরা লিখছেন তাঁরা ওসব মানেন না।

সাহিত্যে অনুরাগ আমাদের বাড়িতে সকলের মধ্যে লক্ষ করেছি। বাংলা আর ওড়িয়ার সঙ্গে ছিল ইংরেজি আর সংস্কৃত। মা জয়দেবের *গীতগোবিন্দ* গান করে গোপালের আরতি করতেন। বাংলা আমি স্কুলে পড়িনি, পড়েছি বাড়িতেই। বাবা *বসুমতী* নিতেন, বছর বছর *বসুমতী*-র উপহার পেতেন। *বসুমতী* সংস্করণ গ্রন্থাবলি তো ছিলই, আরও ছিল কতরকম রাজনৈতিক গ্রন্থ। *নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, ফ্রঙ্কোপ্রাশিয়ান যুদ্ধের ইতিহাস, দারোগার দপ্তর, দেশের কথা, গার্হস্থ্য কোষ* ইত্যাদি। বাবা ইংরেজি অর্ধসাপ্তাহিক *বেঙ্গলি*ও নিতেন। আমাকে বলতেন পড়ে শোনাতে। ভারি তো আমার বিদ্যে! বুঝতে না পারলে বলতেন ডিকশনারি দেখতে। আলস্য কাটিয়ে ডিকশনারি দেখতে হত। এমনি করে ডিকশনারি দেখার অভ্যাস হয়। ইংরেজি আমি স্কুলে যেটুকু শিখেছি তার চেয়ে অনেক বেশি শিখেছি নিজের চেষ্টায়।

আমাদের স্কুলের লাইব্রেরিতে ইংরেজি বাংলা ওড়িয়া বই এন্তার ছিল। সব বাছা বাছা। ঢেঙ্কানলের মতো বহুদূরবর্তী দেশীয় রাজ্যে আমাদের স্কুলের লাইব্রেরিটি অপ্রত্যাশিত এক সৌভাগ্য। নোবেল প্রাইজ পাবার আগে রবীন্দ্রনাথের বাংলা বই ওড়িশার ছোট্ট একটি বুনো জায়গায় আনিয়ে রাখা কার আইডিয়া ছিল জানিনে। তবে আমার হাতে যখন পড়ে তখন তিনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। হেডমাস্টারমশায় ছিলেন বাঙালি থিয়োসফিস্ট। আর অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টারও উদারমতি বাঙালি। একজনের কাছে পেয়েছি বাংলায় রুচি, আরেক জনের কাছে ইংরেজিতে রুচি। হেডমাস্টারমহাশয় কেন জানিনে একদিন আমার হাতে স্কুলের ম্যাগাজিন সেকশনের ভার দেন। কী করে জানলেন যে আমি পড়ার বই ফেলে মাসিকপত্র পড়তে ভালোবাসি। আমাদের ম্যাগাজিন সেকশনে ছিল *ভারতী, মানসী* ও *মর্মবাণী* প্রমুখ সেকালের যাবতীয় প্রসিদ্ধ মাসিকপত্র। তারই মধ্যে *সবুজপত্র*। পড়ি সবই, কিন্তু সবচেয়ে মনোযোগ দিয়ে পড়ি *সবুজপত্র*। বারো বছর বয়সে আমি *সবুজপত্র*-এর আস্বাদন পাই ও মনে মনে সেই ভাবের ভাবুক হই।

দশ বছর বয়সেই আমার বঙ্কিমচন্দ্র পড়া হয়েছিল। শরৎচন্দ্রের আদি পাঠকদের মধ্যে আমিও একজন। আমাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে কয়েক জন ছিলেন যাঁদের বাড়িতেও বিস্তর বাংলা বই ছিল। মাঝে মাঝে পড়তে পেতুম। দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন ব্রাহ্ম। তাঁর লাইব্রেরিতে বসে অসংখ্য বাংলা বই পড়েছি। এমনি করে বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে আমার ব্যাপক পরিচয় ঘটে। ঠিক অতখানি ব্যাপক পরিচয় ওড়িয়া সাহিত্যের সঙ্গে হয়নি। তখনকার দিনে ওড়িয়া সাহিত্য বলতে সাধারণত যা বোঝাত তা প্রাচীন সাহিত্য ও আধুনিক পাঠ্যপুস্তক। তার বাইরে খুব বেশি বই ছিল না। থাকলে আমি নিশ্চয় পড়তুম। স্কুলের লাইব্রেরিতে অগুনতি ইংরেজি বই ছিল, যা পাঠ্য নয়। অপাঠ্যেই আমার অধিকতর রুচি। *স্কট, ডিকেনস* ইত্যাদি তো পড়তুমই, পড়তুম ইতিহাসের বই, ভূবৃত্তান্ত, কোষগ্রন্থ। যেমন—*চিলড্রেন্স এনসাইক্লোপিডিয়া, সেলফ এডুকেটর*। মাসিকপত্রের মধ্যে *মাই ম্যাগাজিন*।

বছর খানেক আমি একাই একটি মাসিকপত্র সম্পাদনা করি। ওড়িয়া ভাষায়। *প্রভা* তার নাম। অধিকাংশ রচনাই ছিল আমার। গদ্য, পদ্য, কাহিনি, নিবন্ধ। গম্ভীর ভাবের ও ভাষার সম্পাদকীয়। নাটক লিখে অভিনয়ও করিয়েছি বন্ধুদের দিয়ে। রাজবাড়িতে প্রায়ই থিয়েটার দেখতে যেতুম। থিয়েটারের ম্যানেজার ছিলেন আমার বাবা। আমার সমবয়সিদের কেউ কেউ অভিনয় করছে অথচ আমি তার সুযোগ পাচ্ছিনে, যদিও আমার বাবা স্বয়ং ম্যানেজার। লজ্জার মাথা খেয়ে তাঁকে জানাই আমার অভিলাষ। তিনি এককথায় উড়িয়ে দেন। সেইজন্যেই তো আমি বাড়িতেই থিয়েটার খুলে বসি। বাবা একদিন রাগ করেন, তাই সে-থিয়েটার ভেঙে যায়।

আমার ছোটোকাকা ছিলেন *উৎকল সাহিত্য* মাসিকপত্রের গ্রাহক তথা লেখক। তাঁর সৌজন্যে ওই পত্রিকার একরাশ পুরোনো সেট আমার হাতে পড়ে। দিনরাত পড়ি। পড়তে পড়তে ওয়াকিবহাল হই। আধুনিক ওড়িয়া

সাহিত্য গড়ে ওঠে যেসব পত্রিকা অবলম্বন করে তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ *উৎকল সাহিত্য*। সম্পাদক বিশ্বনাথ কর মহাশয় ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের একটি স্তম্ভ। সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেরও। বাংলাদেশে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের যে স্থান, ওড়িশায় বিশ্বনাথ কর মহাশয়েরও সেই স্থান। সাহিত্যের মান যাতে উচ্চ হয় এই ছিল উভয়ের ধ্যান। এরজন্যে রামানন্দবাবুকে লোকসান দিতে হয়েছিল, বিশ্বনাথবাবুকেও। আমার পরবর্তী জীবনে আমি এই দুই মহাপ্রাণ সাধকের সংস্পর্শে এসেছি। এঁরা দুজনেই আমাকে সাহিত্যের রাজ্যে পরিচিত হতে দিয়েছেন।

আমার উচ্চাভিলাষ ছিল আমি *প্রবাসী*-তে ও *উৎকল সাহিত্যে* লিখব। বছর ষোলো যখন বয়স তখন *প্রবাসী*-তে আমার টলস্টয়ের কাহিনির অনুবাদ বেরোয়। আঠারো বছর যখন বয়স তখন *উৎকল সাহিত্যে* আমার একটি সামাজিক প্রবন্ধ ছাপা হয়। ইতিমধ্যে আমার পিতৃব্যবন্ধু লক্ষ্মীনারায়ণ সাহু মহাশয় আমার একাধিক ওড়িয়া রচনা তাঁর *সহকার* মাসিকপত্রে প্রকাশ করেন। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজিতেও লিখতুম আর কটকের কলেজ ম্যাগাজিনে তা পত্রস্থ হত। পরে পাটনা কলেজ ম্যাগাজিনে। *প্রবাসী* ছাড়া *ভারতী*-তে আমি লিখেছি। উনিশ-বিশ বছর বয়সে এমন একটি সমাজবৈপ্লবিক প্রবন্ধও লিখি যার সুদীর্ঘ প্রতিবাদ লেখেন অমিয় চক্রবর্তীর জননী অনিন্দিতা দেবী, ছদ্মনাম 'বঙ্গনারী'। ঢেঙ্কানল ছেড়ে পুরীতে কিছুদিন পড়েছি, সেখানে সমুদ্রতীরে বেড়াবার সময় তাঁকেও বেড়াতে দেখেছি। তিনি আমার পরিচয় জানতেন না, জানলে অর্বাচীনকে বয়স্ক ব্যক্তি ভেবে অতটা সিরিয়াস হতেন না।

পুরী জেলা স্কুলে যে কয় মাস পড়ি তার অমৃতফল কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহীর সঙ্গে বন্ধুতা। তিনি জানতেন না যে আমি একজন প্রচ্ছন্ন সাহিত্যিক। আমিও জানতুম না যে তিনিও তাই। পরস্পরের প্রতি একটা টান অনুভব করতুম। সমুদ্রের ধারে বেড়াতুম। কালিন্দী গান গেয়ে শোনাতেন। এখনও মনে আছে তাঁর সুর আর কথা। তাঁর স্বকীয় নয়, ভিখারীচরণ পট্টনায়কের। আমাদের সেই আলাপই পরবর্তীকালে *সবুজযুগ* প্রতিষ্ঠার ভিত্তিশিলা। তখন কিন্তু সেটা স্বপ্নেও ভাবিনি। সাহিত্য নিয়ে নাড়াচাড়া করলেও আমার কল্পনা ছিল পক্ষীরাজের পিঠে চড়ে দেশ-বিদেশে যাব। সাংবাদিকতা করে নিজের খরচ চালাব। আমেরিকাই ছিল আমার আপাত লক্ষ্য।

ভূভারতের বিশিষ্ট সংবাদপত্রগুলির নমুনা আমি চিঠি লিখে আনিয়েছিলুম, পড়েছিলুম। ইংরেজি আমি অমনি করেই আয়ত্ত করেছিলুম। আমার ধারণা ছিল আমিও ইংরেজিতে সম্পাদকীয় লিখতে পারি। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার দিন আমি পাঠ্যপুস্তক ছেড়ে *মডার্ন রিভিউ* পড়ি। তখন অসহযোগ আন্দোলন শুরু হতে যাচ্ছে। কী হবে পাশ করে, যদি ইংরেজদের গোলামখানায় উচ্চশিক্ষার জন্যে যেতে না হয়? যাচ্ছি তো আমেরিকা, সেখানে কেই-বা জানতে চাইছে আমার পরীক্ষার ফলাফল? আর ইংরেজি যদি ঠিকমতো লিখতে পারি তো সার্টিফিকেট দেখতে চাইবে কে?

পরীক্ষাটা গুরুজনদের খাতিরে কোনোরকমে দেওয়া গেল। তারপরে রওনা হলুম কলকাতা। সেখানে সাংবাদিকতা হাতে-কলমে শিখে পালিয়ে যাব আমেরিকায়। কিন্তু বিধাতা বাম। *বসুমতী* সম্পাদক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ আমাকে উপদেশ দিলেন শর্টহ্যাণ্ড শিখতে। সেইসঙ্গে টাইপরাইটিং। এখন বুঝতে পারছি উদীয়মান সাংবাদিকের পক্ষে সেটা অবশ্য শিক্ষণীয়। তখন কিন্তু ভুল বুঝেছি—কী! আমি বাংলা লিখতে পারিনে! *সার্ভ্যান্ট* সম্পাদক শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী আমাকে প্রুফ সংশোধন করতে দেন। এখন বুঝতে পারছি সম্পাদক হতে হলে প্রুফ দেখা অপরিহার্য। তখন কিন্তু বিরক্ত হয়েছি—কী! আমি ইংরেজি লিখতে পারিনে! মন তো খারাপ হবেই। শরীরও খারাপ হল অর্থাভাবে যা-তা খেয়ে। ছোটোকাকার চিঠি পেয়ে ফিরে গেলাম ওড়িশায়। ভরতি হলুম কটক কলেজে। ইতিমধ্যে পাশ করেছিলুম। সামান্য একটা স্কলারশিপও জুটে গেল।

আমার পুরীর সহপাঠী কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী ও আমার ঢেঙ্কানলের সহপাঠী বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়ক কটকেও আমার সতীর্থ হন। এদের সঙ্গে যোগ দেন শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও হরিহর মহাপাত্র। আমরা পাঁচ জনে মিলে একটা ক্লাব করি, তার নাম 'ননসেন্স ক্লাব'। তার থেকে আসে একটি পত্রিকা চালানোর সংকল্প।

হাতে লেখা পত্রিকা। কেউ লিখত ইংরেজিতে, কেউ ওড়িয়ায়, কেউ বাংলায়। আমি লিখতুম তিন ভাষায়। হাতে লেখা পত্রিকার পাঠক কোথায়? পাঠক না থাকলে জানব কী করে লেখা কেমন হচ্ছে? অথচ আমাদের এমন সামর্থ্য নেই যে পত্রিকাখানা ছেপে বার করব। তাই অন্যত্র লেখা দিই। ইংরেজি রচনা কলেজ ম্যাগাজিনে সাদরে গৃহীত হয়। বাংলা রচনা *প্রবাসী*-তে প্রকাশিত হয়। ওড়িয়া রচনা *সহকার* ও *উৎকল সাহিত্য*-তে। পরে *ভারতী*-তেও বাংলা রচনা পত্রস্থ হয়।

ইন্টারমিডিয়েটে আশাতীত সফল হয়ে আমি পাটনা কলেজে ভরতি হই। সেখান থেকে লেখা পাঠাই কলকাতায় ও কটকে। আমাদের পাঁচ জনের সেই হাতে লেখা পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। ক্লাবও বিলুপ্ত। শরৎচন্দ্র পাটনার সহপাঠী হন, আর তিনজন কটকেই বিএ পড়েন। লেখার কাজ চালিয়ে যান। তাঁদের লেখা ও আমাদের লেখা একই পত্রিকায় দেখতে পাওয়া যায়। তখনও আমাদের মনে হয়নি যে আমরা একটা সাহিত্যিক গোষ্ঠী ও আমাদের নাম 'সবুজ দল'। কবে আর কেমন করে এই নামটার উদ্ভব হয় তা জোর করে বলতে পারব না। তবে 'সবুজ' এই শব্দটা ওড়িয়া ভাষায় নতুন। অথচ আমরা আমাদের ওড়িয়া রচনায় চালিয়ে দিয়েছিলুম। তাতে অনেক প্রাচীনপন্থীর আপত্তি ছিল। তা ছাড়া আমাদের সৃষ্টির মধ্যেই ছিল নতুনত্ব বা সবুজত্ব। 'সবুজপত্রে'র ভাবে ও ভাষায় যে জিনিস ছিল। আমাদের দৃষ্টিও নতুন বা সবুজ। আমরা সমস্ত অন্তঃকরণের সঙ্গে আধুনিক বিশ্বকে বন্দনা করেছিলুম, কেবলমাত্র দেশকে বা দেশের ঐতিহ্যকে নয়। দেশের চেয়ে যুগই ছিল আমাদের কাছে বড়ো, সেইজন্যে পরবর্তীকালে 'সবুজ সাহিত্য সমিতি'র মুখপত্রের নাম রাখা হয় *যুগবীণা*। হরিহর মহাপাত্র হন তার সম্পাদক। আর সমিতির কর্ণধার হন শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

এসব ঘটনা ঘটার আগেই আমি ওড়িয়া সাহিত্য থেকে বিদায় নিয়ে বাংলা সাহিত্যে আত্মনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিই। এমএ পড়তে পড়তে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বেশ কিছুদিন থেকে আমি অনুভব করেছিলুম যে সব্যসাচী হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যদি সাহিত্যের ভাণ্ডারে স্মরণীয় কিছু রেখে যেতে চাই তো আরও মন দিয়ে লিখতে হবে। আরও সময় দিয়ে লিখতে হবে। সাময়িক পত্রিকায় লিখে তৃপ্তি হয় না। বই লিখতে হবে। সাংবাদিক হওয়া আমার শেষ লক্ষ্য নয়, সাহিত্যিক হওয়াই শেষ লক্ষ্য। আমেরিকার স্বপ্নও মিলিয়ে আসছিল। চিত্ত জুড়ে ছিল ইউরোপ। ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে প্রবেশের উদ্যোগ করছিলুম। অকস্মাৎ একদিন স্থির করে ফেললুম যে এখন থেকে একটা ভাষাতেই সাহিত্য সৃষ্টি করব, সে-ভাষা ইংরেজি নয়, ওড়িয়া নয়, বাংলা।

তখনকার দিনে আমার ওড়িয়া কবিতা *উৎকল সাহিত্যে*-র প্রথম পৃষ্ঠায় স্থান পেত। আমার প্রবন্ধও স্বনামে ও বেনামিতে ওর অনেকখানি জুড়ত। বিশ্বনাথ কর মহাশয় আমাদের সবাইকে স্নেহ করলেও আমাকেই সবচেয়ে বেশি জায়গা দিতেন। সম্মানের স্থানও। *প্রবাসী* একবার আমার একটি বৃহৎ কবিতাকে রামানন্দবাবুর 'বিবিধ প্রসঙ্গ'-এর অব্যবহিত পরে স্থান দিলেও সেটা ছিল একটা ব্যতিক্রম। ওড়িয়ায় আমার একটা প্রতিষ্ঠা ছিল, বাংলায় তা নয়। ওড়িয়ায় আমি সুপরিচিত লোক, 'সবুজ দল'-এর একজন পান্ডা। বাংলায় আমি কেউ নই। 'কল্লোল' থেকে আমি দূরে। যদিও মনে মনে ওর কাছাকাছি।

একমাত্র বাংলা ভাষাই হবে আমার সাহিত্যের ভাষা, এমন একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া তখন ছিল জুয়া খেলার শামিল। ওড়িয়া ভাষার প্রথম শ্রেণির লেখক না হয়ে হব হয়তো বাংলা ভাষার দ্বিতীয় শ্রেণির লেখক। কী লাভ? কে মনে রাখবে? তখন কিন্তু আমি এসব গণনাকে মনে ঠাঁই দিইনি। আমার যদি কিছু বলবার থাকে আমি কোন ভাষায় সবচেয়ে সহজ ও সরসভাবে ব্যক্ত করতে পারব? এর উত্তর বাংলা ভাষায়। এর প্রধান কারণ বাংলা ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর সাধনায় কোদাল চালানোর কাজ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। ওড়িয়াতে এখনও অনেক বাকি। কোদাল চালানোর দায় আমি নিতে পারব না। আমি চাই তৈরির সড়ক। ওড়িয়াতে আধুনিক সাহিত্যের পথিকৃৎ যাঁরা তাঁদের কারও অনুসরণ করতে আমি নারাজ। আমার কবিতা রাধানাথ রায় বা মধুসূদন রায়ের ধারানুসারী নয়। গদ্যেও আমি ফকিরমোহনের উত্তরসূরি নই।

আমি ভেবে দেখলুম যে এঁদের ঐতিহ্যের উপযুক্ত হতে গেলে আমাকে স্বকীয়তা হারাতে হবে। অথচ লাভ যে বেশি কিছু হবে তাও নয়। আমার বন্ধুরা আমাকে ছাড়িয়ে যাবেন।

কমলবিলাসীর বিদায় লিখে আমি ওড়িয়া সাহিত্যের আসর থেকে বিদায় নিই। আমার আসরপ্রবেশ ১৯২১ সালে। বিদায় ১৯২৬ সালে। মাত্র পাঁচ বছরের সাহিত্যিক জীবন কি সার্থক হতে পারে? এর এক বছর বাদে আমি বিলেত চলে যাই। বিলেত থেকে ফিরে আসার পর আমার কর্মস্থল হয় বাংলাদেশ। ইতিমধ্যে *বিচিত্রা*-য় আমার ভ্রমণকাহিনি *পথে প্রবাসে* প্রকাশকালে রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী উভয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরে উভয়ের স্নেহভাজন হই। কাজকর্মের ধান্দায় বাংলা সাহিত্যের চর্চায় যে একমনা হব তার জো ছিল না। তাই একুশ বছর পরে চাকরি থেকে অকালে অবসর নিতে হল। সেটাও একটা কঠিন সিদ্ধান্ত। কেন, চাকরিতে থেকেও কি সাহিত্যসৃষ্টি করা যেত না? অনেকেই জিজ্ঞাসা করতেন। যেত, কিন্তু মোমবাতি দুই দিক থেকে জ্বলতে জ্বলতে অকালে নিবত। আরও বিশ বছর আমি বেঁচে থাকতুম না।

আমার প্রস্থানের পর আমার বন্ধুরা সংঘবদ্ধ হয়ে 'সবুজ সাহিত্য সমিতি' স্থাপন করেন। তারপরে *যুগবীণা* পরিচালনা করেন। কর্মজীবনে প্রবেশ করে আমার বিদায়ের পাঁচ-ছয় বছর বাদে তাঁদের উৎসাহ নিঃশেষ হয়ে যায়। এরপরে যিনি যা লেখেন তা ব্যক্তিগতভাবে। গোষ্ঠীগতভাবে আর নয়। মোটামুটি ১৯২১ থেকে শুরু করে ১৯৩১ বা ১৯৩২ পর্যন্ত ওড়িয়া সাহিত্যের 'সবুজ যুগ'। এর আগের যুগটিকে বলা হয় 'সত্যবাদী যুগ'। সত্যবাদী শান্তিনিকেতনের অনুকরণে স্থাপন করা হয়েছিল, সেখানে আমার কাকার সাথে একবার গেছি। *সত্যবাদী* মাসিকপত্র, *সমাজ* সাপ্তাহিক পত্রিকা এসবের সূচনাও দেখেছি। গোপবন্ধু দাশ, নীলকণ্ঠ দাশ, গোদাবরীশ মিশ্র এঁদের সাহিত্যকীর্তির সঙ্গেও আমার পরিচয় ছিল। এঁরা ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপ দেন। ফলে সাহিত্যে এক শূন্যতার উদ্ভব হয়। গঙ্গাধর মেহের, চিন্তামণি মহান্তি, নন্দকিশোর বল, পদ্মচরণ পট্টনায়ক এঁদের দিনও বিগত হয়েছিল। সেইজন্যে এত সহজে 'সবুজরা' শূন্যতা পূরণ করে।

'সবুজ' নন এমন অনেক সমবয়সি ও বয়সিনিও ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কুন্তলাকুমারী সাবত ও মায়াধর মানসিংহ পরে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। 'সবুজ' না হলেও এঁরা প্রাচীনপন্থী ছিলেন না। সত্যিকার প্রাচীনপন্থী ছিলেন বিচ্ছন্দচরণ পট্টনায়ক ও তাঁর দলবল। এঁদের বিশ্বাস ছিল 'ছান্দ' না হলে কবিতা হয় না, আর সব ইংরেজি বা বাংলার অনুকরণ। এঁদের চোখে আমরা ছিলুম রবিঠাকুরের চেলা, ওড়িয়াকে আমরা বিজাতীয় করে তুলছি। এ ধারণা শুধু যে এঁদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়। 'ছান্দ' যাঁরা লিখতেন না তাঁরাও মনে করতেন যে, আমরা ওড়িয়া কবিতার ঐতিহ্য থেকে সরে গেছি।

ইংরেজি ও বাংলার থেকে প্রেরণা না পেলে আমরা সত্যি এগোতে পারতুম না। বাংলা ভাষায় *বারোয়ারি উপন্যাস* দেখে আমাদেরও সাধ যায় ওড়িয়া ভাষায় বারোয়ারি উপন্যাস লিখতে। বৈকুণ্ঠ তো কবিতা ভিন্ন লিখবেন না, বাকি চার জনে বড়োজোর একখানা চার-ইয়ারি উপন্যাস লিখতে পারি, বারোয়ারি লিখতে হলে আরও আট জনকে বাইরে থেকে নিতে হয়। তাঁরা সবাই হয়তো 'সবুজ' নন। কালিন্দীর সম্পাদনায় লেখা হয় *বাসন্তী*। বিশ্বনাথ কর মহাশয় উৎসাহ দিয়ে *উৎকল সাহিত্য* পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশ করেন। উপন্যাস লিখতে আমার ভয় ছিল, কিন্তু এই উপন্যাস লিখতে গিয়ে এমন একটি ব্যাপার ঘটে যার প্রভাবে আমি ঔপন্যাসিক হয়ে উঠি ও উপন্যাসের পাথেয় পাই।

আমাদের পাঁচ বন্ধুর কবিতা একসূত্রে গেঁথে 'সবুজ কবিতা' নামে সংকলিত হয়। আমার অজ্ঞাতসারে আমার বন্ধুরা আমাকেই অগ্রস্থান ও অধিকাংশ জায়গা দেন। আমার কবিতা ও প্রবন্ধ একত্র করে আমার একার নামে 'সবুজ অক্ষর' বলে একখানি বই বহুকাল পরে প্রকাশিত হয়।

২

সতেরো থেকে বাইশ বছর বয়সের মধ্যে লেখা দশ-বারোটি কবিতা, উনিশ-কুড়িটি প্রবন্ধ, একটি গল্প ও একখানা বারোয়ারি উপন্যাসের তিনটি পরিচ্ছেদ—ওড়িয়া সাহিত্যে এইটুকুই আমার কাজ। কোনোদিন ভাবতেই পারিনি যে এইটুকুর জন্যে কেউ আমাকে মনে রাখবে বা আমার রচনাকে ওজন দেবে। আশ্চর্য

হয়ে যাই যখন দেখি ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাসে ‘সবুজ যুগ’ বলে একটা যুগ চিহ্নিত হয়েছে, তাতে আরও চার জনের পাশে আমার স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে। ওড়িয়া সাহিত্যের বৈষ্ণব যুগের পঞ্চসখার মতো আমরাও নাকি পঞ্চসখা। কিন্তু সখাদের মধ্যে কার্যকাল আমারই সবচেয়ে কম।

আমি যখন ভাষান্তরি ও দেশান্তরি হয়ে *পথে প্রবাসে* লিখছিলুম তখন আমার বন্ধুরা ধীরে ধীরে ‘সবুজ দল’ রূপে পরিচিত হচ্ছিলেন। পরে একদিন তাঁরা ‘সবুজ সাহিত্য সমিতি’ গঠন করে পুস্তক প্রকাশনায় উদ্যোগী হন। তাঁদের প্রথম উদ্যম *সবুজ কবিতা*। সেটি কেবল আমাদের পাঁচ জনারই পুষ্পাঞ্জলি। দ্বিতীয় উদ্যম *বাসন্তী*। তাতে ছিল আমাদের চার জন ও বাইরের পাঁচ জনের অংশ। এরপরে বাইরের লেখকদের বইও প্রকাশ করা হয়। *যুগবীণা* পত্রিকার দুয়ার সকলের জন্যে খুলে দেওয়া হয়। ততদিনে আমাদের দল না বাড়লেও সাহিত্যিক আদর্শের আদর বেড়েছে। ওড়িয়া সাহিত্যের সব্যসাচী লেখক হিসেবে কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী ক্রমে ক্রমে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। এখন তো তিনি ‘পদ্মভূষণ’ সম্মান পেয়ে ওড়িশার অদ্বিতীয় সাহিত্যিক হয়েছেন। তাঁর কন্যা নন্দিনী শতপথী ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী। তিনি নিজেও একজন সুলেখিকা। নারীপ্রগতির যে ধ্যান আমরা করেছিলুম নন্দিনীতে সে-ধ্যান প্রমূর্ত হয়েছে। আর হয়েছে বিখ্যাত গায়িকা সুনন্দাতে। বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়কের কন্যা সুনন্দা পট্টনায়ক। বৈকুণ্ঠও ‘সাহিত্য আকাদেমি’ পুরস্কার লাভ করে কবিরূপে বন্দিত হয়েছেন।

আমাদের সমসাময়িক ওড়িয়া সাহিত্যে আর একটি ধারা ছিল। ছান্দরসিক বিচ্ছন্দচরণ পট্টনায়ক যার প্রাণস্বরূপ। বিচ্ছন্দচরণকে আমি প্রতিক্রিয়ার নায়ক বলেই জানতুম। পরে দেখা গেল তিনি ও তাঁর বন্ধুরাও ‘প্রাচী সমিতি’ বলে অপর একটি সংগঠনে সংঘবদ্ধ হয়েছেন। প্রাচীন ওড়িয়া গ্রন্থ পুনরুদ্ধার করে সম্পাদনা ও প্রকাশনার ব্রত নিয়েছেন। তাঁদের প্রবর্তনা দিচ্ছেন আমাদের প্রিয় অধ্যাপক আর্তবল্লভ মহান্তী। নতুন কিছু সৃষ্টি না করলেও এঁদের নিষ্ঠার তুলনা হয় না। ওড়িশার গৌরব তার প্রাচীন রসসাহিত্য। ‘প্রাচী সমিতি’ প্রতিদ্বন্দ্বীর বেশে অবতীর্ণ হলেও ‘সবুজ সমিতি’র পরিপূরক।